মাও সে তুঙ্ এর নির্বাচিত রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ
১লা মে, ১৯৬০

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও

সূচীপত্র

প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ

॥ চীন প্রসঙ্গে আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ ॥

চীনা সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ

(মার্চ ১৯২৬)

কারা আমাদের শত্রু ? কারাই বা আমাদের বন্ধু ? এটাই হল বিপ্লবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। চীনের অতীতের সমস্ত বিপ্লবের সংগ্রামগুলো কেন এত অল্প সাফল্য অর্জন করেছে, তার মূল কারণ হচ্ছে, প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রকৃত বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করতে না পারা। বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথপ্রদর্শক ; বিপ্লবী পার্টি যখন তাঁদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে, তখন কোন বিপ্লবই সার্থক হতে পারে না। আমাদের বিপ্লবকে আমরা ভ্রান্ত পথে চালিত করব না এবং অবশ্যই সফল হব, এ বিষয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্য প্রকৃত বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করতে মনোযোগী হতে হবে। প্রকৃত শত্রুদের ও প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিপ্লবের প্রতি তাদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ অবশ্যই আমাদের করতে হবে।

চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা কি রকম ?

জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দিশ্রেণী।[১] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ আধা-

---

কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে। সে সময়ে পার্টির ভেতরে যে দু'ধরনের বিচ্যুতি ছিল, তার বিরোধিতা করার জন্যই তিনি এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তৎকালে পার্টির ভেতরকার প্রথম বিচ্যুতির প্রবক্তা ছিল ছেন তু-সিউ। এরা কেবলমাত্র কুওমিনতাঙের সঙ্গে সহযোগিতা করতেই মনোযোগ দিয়েছিল এবং কৃষকদেরকে ভুলে গিয়েছিল—এটা ছিল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ। দ্বিতীয় বিচ্যুতির প্রবক্তা ছিল চাং কুও-থাও। এরা কেবলমাত্র শ্রমিক-আন্দোলনের উপরই মনোযোগ দিয়েছিল এবং তারাও ভুলে গিয়েছিল কৃষকদেরকে—এটা ছিল 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ। বিপ্লবের শক্তির অপর্যাপ্ততা সম্বন্ধে উভয় সুবিধাবাদী বিচ্যুতির সমর্থকরাই সচেতন ছিল। কিন্তু উভয়ের কেউই জানত না যে, কোথায় শক্তির সন্ধান করা যায় এবং কোথায় ব্যাপক মিত্রবাহিনী পাওয়া যায়। কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়েছিলেন যে, কৃষকরাই হচ্ছে চীনের সর্বহারাশ্রেণীর ব্যাপকতম ও সবচেয়ে দৃঢ় মিত্রবাহিনী। এইভাবে তিনি চীন বিপ্লবের সবচেয়ে প্রধান মিত্রবাহিনীর সমস্যার মীমাংসা করেছেন। অধিকন্তু, তিনি আগে থেকে লক্ষ্য করেছিলেন যে, তৎকালীন জাতীয় বুর্জোয়ারা দ্বিধাগ্রস্ত শ্রেণী এবং বিপ্লবের উত্তাল জোয়ারে তা বিভক্ত হয়ে পড়বে, এর দক্ষিণপন্থী অংশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যাবে। ১৯২৭ সালের ঘটনাবলী থেকেই এটা প্রমাণিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক চীনে জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দিশ্রেণী পুরোপুরিভাবেই আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের লেজুড় এবং নিজেদের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল। এই শ্রেণীগুলি চীনের সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ এবং সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে এবং চীনের উৎপাদন-শক্তির বিকাশকে বাধা দেয়। তাদের অস্তিত্ব চীনা বিপ্লবের উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ অংগতিহীন। বিশেষ করে, বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিশ্রেণী সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নেয় এবং তারাই হচ্ছে চরম প্রতিবিপ্লবী চক্র। তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণ হল **রাষ্ট্রবাদীগোষ্ঠী**[২] এবং কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীগোষ্ঠী।

মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী। এই শ্রেণী চীনের শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে। মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী বলতে প্রধানতঃ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকেই[৩] বুঝায়। চীনা বিপ্লবের প্রতি তারা দ্বন্দ্বের মনোভাব পোষণ করে। যখন তারা বিদেশী পুঁজির আঘাতে এবং যুদ্ধবাজদের অত্যাচারে যন্ত্রণাবোধ করে, তখনই তারা বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু যখনই স্বদেশে সর্বহারাশ্রেণী সাহসের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে-বিপ্লবে অংশগ্রহণ করছে এবং বিদেশেও আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী সক্রিয় সমর্থন দান করছে এবং যখন তারা অনুভব করে যে, তাদের শ্রেণীর পক্ষে বৃহৎ বুর্জোয়া-শ্রেণীর স্তরে উন্নতি হবার আশা বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে, তখনই তারা বিপ্লব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা একটি মাত্র শ্রেণীর—জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনাধীনে রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী। নিজেকে তাই চি-থাওয়ের[৪] খাঁটি শিষ্য বলে জাহির করত এমন একজন পিকিংয়ের **চেন পাও**[৫] পত্রিকাতে লিখেছিল, 'সাম্রাজ্যবাদকে নিপাত করার জন্য তোমার বাম হাত তোল এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে নিপাত করার জন্য তোমার ডান হাত তোল।' *এই দু'টি* কথাই এই শ্রেণীর দ্বন্দ্বপূর্ণ ও আশংকাপূর্ণ অবস্থাকে স্পষ্ট করে তোলে। তারা শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ অনুসারে কুওমিনতাঙের জনকল্যাণের নীতির ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে, তারা রাশিয়ার সঙ্গে কুওমিনতাঙের মৈত্রীর এবং কুওমিনতাঙে কমিউনিস্ট[৬] ও বামপন্থীদের গ্রহণ করার বিরোধিতা করে। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াদের শাসনাধীনে রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা একেবারেই অসাধ্য কারণ বর্তমান দুনিয়ার

পরিস্থিতি হল বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী দু'টি বৃহৎ শক্তির চূড়ান্ত সংগ্রামের পরিস্থিতি। এই দু'টি বৃহৎ শক্তি দু'টি বৃহৎ পতাকা উত্তোলন করেছে : একটি হল বিপ্লবের লাল পতাকা—এটাকে তৃতীয় আন্তর্জাতিক উর্ধ্বে তুলে ধরছে, যা সারা দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীগুলোকে তার পতাকার তলে সমবেত হতে আহ্বান জানাচ্ছে ; অপরটি হল প্রতিবিপ্লবের শ্বেত পতাকা—এটাকে জাতিপুঞ্জ উর্ধ্বে তুলে ধরছে, যা বিশ্বের সমস্ত প্রতিবিপ্লবীদেরকে তার পতাকার তলে সমবেত হতে আহ্বান জানাচ্ছে। মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলো অনিবার্যভাবেই দ্রুত বিভক্ত হবে, এক অংশ বামে হেলে বিপ্লবী গোষ্ঠীতে যোগ দেবে এবং অন্য অংশ দক্ষিণে হেলে প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠীতে যোগ দেবে, তাদের 'স্বতন্ত্র' থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই, চীনের মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী যে 'স্বতন্ত্র' বিপ্লবের ধারণা পোষণ করে যাতে তারা প্রধান ভূমিকা নেবে, তা নিছক কল্পনা মাত্র।

পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী। উদাহরণস্বরূপ, মালিক-কৃষক[৭], মালিক-হস্তশিল্পী, নিম্নস্তরের বুদ্ধিজীবী—ছাত্রসমাজ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, নিম্নস্তরের সরকারী কর্মচারী, ক্ষুদে কেরানি, ক্ষুদে উকিল এবং ক্ষুদে ব্যবসায়ী ইত্যাদি সবাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা ও তার শ্রেণী-চরিত্রের দিক থেকে এর প্রতি গভীর মনোযোগ উচিত। মালিক-কৃষক ও মালিক-হস্তশিল্পী উভয়েই ক্ষুদে উৎপাদনের অর্থনীতিতে নিযুক্ত। এই পেটি-বুর্জোয়াদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্তর যদিও একই পেটি-বুর্জোয়া অর্থনৈতিক অবস্থায় থাকে, তবুও তারা তিনটি ভিন্ন শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখায় পড়ে তারা যাদের কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ ও খাদ্য আছে, অর্থাৎ যারা শারীরিক অথবা মানসিক শ্রম দ্বারা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য প্রতি বছর যতটুকু প্রয়োজন তার অধিক উপার্জন করে। এই ধরনের লোকেরা ধনী হতে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং মার্শাল চাওয়ের[৮] একান্ত অনুগত পূজারী, বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে মোহ না থাকলেও মাঝারি বুর্জোয়া স্তরে উন্নীত হতে এরা সর্বদাই অত্যন্ত ইচ্ছুক। লোকের নিকট সম্মান পায় এমন ক্ষুদে টাকাওয়ালাকে দেখে প্রায়শঃই তাদের মুখ দিয়ে লালা ঝরে। এই ধরনের লোক ভীরু, তারা সরকারী অফিসারকে ভয় করে এবং বিপ্লবকেও একটু ভয় করে। যেহেতু এদের অর্থনৈতিক অবস্থা মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার অত্যন্ত কাছাকাছি, তাই এরা মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রচারকে খুবই বিশ্বাস করে

এবং বিপ্লবের প্রতি সন্দেহের মনোভাব পোষণ করে। পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে এ অংশ সংখ্যালঘু এবং এরা দক্ষিণপন্থী। দ্বিতীয় শাখা তারা যারা অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে নিজেদের ভরণপোষণ করতে পারে। এই শাখার লোক প্রথম শাখার লোকদের থেকে অনেক ভিন্ন। তারাও ধনী হতে চায়, কিন্তু মার্শাল চাও কোনমতেই তাদের ধনী হতে দেয় না। তদুপরি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ, সামন্ত-জমিদার ও বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের দ্বারা উৎপীড়িত ও শোষিত হয়ে তারা অনুভব করে যে, দুনিয়া এখন আর আগের মতো নেই। তারা অনুভব করে যে, কেবলমাত্র পূর্বের মতো সমান পরিশ্রম করলে আজ বেঁচে থাকার মতো উপার্জন করতে পারবে না। কাজের সময় বাড়িয়ে প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে দেরীতে ফিরে ও পেশার প্রতি দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়েই কেবল জীবিকা নির্বাহ করা যায়। তাদের মুখে এখন গালাগাল ; বিদেশীদের 'বিদেশী শয়তান,' যুদ্ধবাজদের 'দস্যু সর্দার' এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের 'হৃদয়হীন ধনী' বলে গালাগালি করে। সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে এরা শুধু সন্দেহ করে যে, এটা সফল হবে কিনা (কারণ বিদেশী ও যুদ্ধবাজদের অতি শক্তিশালী মনে হতো), তারা আন্দোলনে যোগদানের ঝুঁকি নিতে চায় না এবং নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করে, কিন্তু কখনো বিপ্লবের বিরোধিতা করে না। এই শাখায় লোকসংখ্যা খুবই বেশি, পেটি-বুর্জোয়াদের প্রায় অর্ধেক। তৃতীয় শাখায় রয়েছে তারা যাদের জীবনযাত্রার ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে। এই শাখার লোক অনেকেই পূর্বে হয়তো কোন অবস্থাপন্ন পরিবারভুক্ত ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থায় উপনীত হচ্ছে যে, শুধু কোনমতে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম এবং তাদের জীবনযাত্রার ক্রমশঃই আরও অবনতি হচ্ছে। প্রতি বছরের শেষে তারা যখন একবার হিসাব-নিকাশ করে, তখন আঁৎকে উঠে বলে, 'হায়! আবার লোকসান!' কারণ এ ধরনের লোকেরা অতীতে সুদিনের মধ্যে জীবনযাপন করেছে, কিন্তু পরে বছর বছর তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে, তাদের ঋণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবনও ক্রমশঃ শোচনীয় হচ্ছে, তাই তারা 'ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভয়ে কেঁপে ওঠে।' এ ধরনের লোক মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে বেশি, কারণ তাদের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এমন একটা বৈপরীত্যের তুলনা রয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনে এ ধরনের লোক বেশ গুরুত্ব-পূর্ণ, তাদের সংখ্যাও কম নয় এবং এরাই পেটি-বুর্জোয়ার বামপন্থী অংশ।

পেটি-বুর্জোয়ার উপরোক্ত তিনটি শাখাই স্বাভাবিক সময়ে বিপ্লবের প্রতি ভিন্ন মনোভাব পোষণ করে, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ যখন বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার বৃদ্ধি পায়, বিজয়ের আলো চোখে পড়ে তখন শুধু পেটি-বুর্জোয়াদের বামপন্থী নয়, মধ্যপন্থী অংশও বিপ্লবে যোগদান করতে পারে, এমনকি সর্বহারাশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়াদের বামপন্থীদের বিরাট বৈপ্লবিক স্রোতে ভেসে দক্ষিণপন্থীরাও বিপ্লবের সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে-র আন্দোলন[৯] এবং বিভিন্ন স্থানের কৃষক-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়।

আধা-সর্বহারাশ্রেণী। এখানে আধা-সর্বহারা বলতে পাঁচ রকমের লোক বুঝায়: (১) আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য[১০], (২) গরীব কৃষক, (৩) ক্ষুদে হস্তশিল্পী, (৪) দোকান-কর্মচারী[১১], এবং (৫) ফেরিওয়ালা। আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও গরীব কৃষক হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ। কৃষক সমস্যা প্রধানতঃ তাদেরই সমস্যা। আধামালিক-কৃষক, গরীব কৃষক ও ক্ষুদে হস্তশিল্পীরা যে অর্থনীতিতে নিযুক্ত, তা হচ্ছে আরও ক্ষুদ্রাকারের ক্ষুদে উৎপাদনের অর্থনীতি। আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও গরীব কৃষক উভয়েই যদিও আধা-সর্বহারাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তবুও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে তাদেরকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। আধামালিক-কৃষক—এদের জীবন মালিক-কৃষকদের অপেক্ষা কষ্টকর, কারণ প্রতি বছরই তাদের খাদ্যশস্যের প্রায় অর্ধেক ঘাটতি পড়ে এবং এই ঘাটতি পূরণ জন্য তারা অন্যের থেকে জমি বর্গা নিতে বাধ্য হয়, অথবা নিজেদের শ্রমশক্তি আংশিকভাবে বিক্রি করতে বাধ্য হয়, অথবা ছোটখাট ব্যবসায় চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বসন্তের শেষে এবং গ্রীষ্মের প্রথমে শস্যাদি যখন কাঁচা থাকে এবং পুরানো মজুত শস্যও নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তারা অন্যের থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে এবং চড়া দামে শস্য কেনে। তাদের অবস্থা স্বভাবতঃই যারা মালিক-কৃষক—যাদের অপরের সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই—তাদের থেকে কষ্টকর, কিন্তু গরীব কৃষকদের থেকে উৎকৃষ্টতর। কারণ গরীব কৃষকদের নিজস্ব কোন জমি নেই, সারা বছর পরের জমি চাষ করে তারা শুধু অর্ধেক অথবা অর্ধেকেরও কম ফসল পায়; কিন্তু আধামালিক-কৃষক বর্গা-নেওয়া জমি থেকে যদিও অর্ধেক বা অর্ধেকেরও কম ফসল পায়, তবু তাদের নিজস্ব জমির সবটুকু ফসলই তারা

পায়। সুতরাং আধামালিক-কৃষকেরা মালিক-কৃষকদের থেকে অধিক বিপ্লবী, কিন্তু গরীব কৃষকদের থেকে কম বিপ্লবী। গরীব কৃষক হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের বর্গাচাষী এবং জমিদারদের দ্বারা শোষিত। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে তাদের আবার দু' অংশে ভাগ করা যায়। এক অংশের গরীব কৃষকদের কাছে অপেক্ষাকৃতভাবে পর্যাপ্ত কৃষি-যন্ত্রপাতি ও কিছু মূলধন আছে। এ ধরনের কৃষকেরা তাদের বার্ষিক শ্রমের ফলের অর্ধেকটা পেতে পারে। ঘাটতি পূরণের জন্য তারা পার্শ্ব-ফসল চাষ করে, মাছ বা চিংড়ি ধরে, মুরগী বা শূকর পোষে, অথবা নিজেদের শ্রমশক্তি আংশিকভাবে বিক্রি করে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে এবং এইভাবে তারা দুঃখকষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে বছরটা কাটিয়ে দেবার আশা পোষণ করে। অতএব, তাদের জীবনযাত্রা আধামালিক-কৃষকদের অপেক্ষা কষ্টসাধ্য, কিন্তু অন্য অংশের গরীব কৃষকদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তারা আধামালিক-কৃষকদের থেকে অধিক বিপ্লবী, কিন্তু অন্য অংশের গরীব কৃষকদের থেকে কম বিপ্লবী। অন্য অংশের গরীব কৃষকদের কথা বলতে গেলে, তাদের না আছে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষি-যন্ত্রপাতি, না আছে মূলধন; তাদের কাছে পর্যাপ্ত সার নেই, তাদের জমিতে কম ফসল ফলে এবং খাজনা দেবার পর তাদের কাছে প্রায় কিছুই থাকে না, সুতরাং আংশিকভাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করার আরও বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অজন্মার বছরে তারা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে করুণভাবে ভিক্ষা চায়, চার-পাঁচ দিন কাটাবার জন্য কয়েক মণ বা কয়েক সের খাদ্যশস্য ধার করে, এইভাবে ষাঁড়ের পিঠের বোঝার মতো তাদের ঋণ স্তূপীকৃত হতে থাকে। কৃষকদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে মন্দ অবস্থার, এবং বিপ্লবী প্রচারকে অতি সহজেই গ্রহণ করে। ক্ষুদে হস্তশিল্পীদেরকে আধা-সর্বহারাশ্রেণী বলা হয়, কারণ তাদের যদিও উৎপাদনের কিছু সহজ উপকরণ আছে, এবং স্বতন্ত্র পেশা রয়েছে, তবুও তারা প্রায়শঃই আংশিকভাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষকদের মতোই। তাদের সংসার খরচের ভারি বোঝা, উপার্জন ও জীবন নির্বাহের ব্যয়ের ব্যবধান এবং প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের জ্বালা ও বেকারত্বের আশংকার দিক থেকে গরীব কৃষকদের সংগে তাদের মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। দোকান-কর্মচারীরা হচ্ছে ভাড়াটে কর্মী, নিজেদের সামান্য বেতন দিয়েই তাদের পরিবারের খরচ চালাতে হয়, যদিও প্রতি বছরই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়,

তবুও তাদের বেতন সাধারণতঃ বেশ কয়েক বছর পর একবার মাত্র বাড়ে। আপনি যদি কখনো তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করেন, তাহলে তখনি তারা নিজেদের অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনাতে থাকবে। তাদের অবস্থা গরীব কৃষক ও ক্ষুদে হস্তশিল্পীদের থেকে বেশি আলাদা নয়; বিপ্লবী প্রচারকে তারা অতি সহজেই গ্রহণ করে। ফেরিওয়ালারা পণ্যদ্রব্য কাঁধের বাঁকেই বহন করুক কিংবা রাস্তার পাশে ছোট দোকান খুলেই বিক্রয় করুক, তাদের মূলধন কিন্তু অল্প এবং উপার্জিত অর্থও কম, এতে তাদের খাওয়া-পরার খরচ কুলায় না। তাদের অবস্থা গরীব কৃষকদের থেকে বেশি আলাদা নয়। তাই তাদেরও গরীব কৃষকদের মতো বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, যা বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করবে।

সর্বহারাশ্রেণী। চীনের আধুনিক শিল্প-সর্বহারার সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। চীন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ দেশ বলে এদের সংখ্যাও বেশি নয়। এই আনুমানিক বিশ লক্ষ শিল্প-শ্রমিক প্রধানতঃ পাঁচটি শিল্পে নিযুক্ত— রেলওয়ে, খনিজ, নৌ-পরিবহন, বস্ত্রশিল্প এবং জাহাজ তৈরী। তাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক বিদেশী পুঁজির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ। শিল্প-সর্বহারাশ্রেণী যদিও সংখ্যায় অধিক নয়, তবুও তারা চীনের নতুন উৎপাদন-শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে; আধুনিক চীনের তারাই সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শ্রেণী এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিচালক শক্তি। বিগত চার বছরের ধর্মঘটী আন্দোলনগুলোতে, যেমন নাবিক-ধর্মঘট[১২], রেলওয়ে ধর্মঘট[১৩], খাইলুয়ান ও চিয়াওচুওয়ের কয়লা খনির ধর্মঘট[১৪], শামিয়েন ধর্মঘট[১৫] এবং ৩০শে মের আন্দোলনের পর সাংহাই ও হংকংয়ের বিরাট ধর্মঘটে[১৬] এরা যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তার প্রতি তাকালেই আমরা চীন বিপ্লবে শিল্প-সর্বহারাশ্রেণীর অবস্থানের গুরুত্বটা বুঝতে পারব। কেন তারা এই ভূমিকা দখল করে আছে, তার প্রথম কারণ হচ্ছে তারা কেন্দ্রীভূত। অন্য কোন অংশের লোকই তাদের মতো এত কেন্দ্রীভূত নয়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নমানের। উৎপাদনের উপকরণ থেকে তারা বঞ্চিত, নিজেদের হাত দু'টি ছাড়া তাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই, ধনী হবার কোন আশা তাদের নেই এবং সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, সুতরাং তারা লড়াই করতে বিশেষ সক্ষম। শহরের কুলিদের শক্তিও মনোযোগ দেবার যোগ্য। তাদের অধিকাংশই

বন্দরের মুটে-মজুর এবং রিক্সাওয়ালা ; মেথর এবং রাস্তার ঝাড়ুদারও তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিজেদের হাত দু'টি ছাড়া এদের অন্য কোন সম্বল নেই, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা শিল্প-শ্রমিকদের মতোই, কিন্তু শিল্প-শ্রমিকদের অপেক্ষা এরা কম কেন্দ্রীভূত এবং উৎপাদন ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ। চীনে আধুনিক পুঁজিবাদী কৃষীকার্য এখনো খুব কম। গ্রাম্য সর্বহারাশ্রেণী বলতে বার্ষিক, মাসিক অথবা দৈনিক চুক্তির ক্ষেত-মজুরদেরই বোঝায়। এই ধরনের ক্ষেত-মজুরদের কাছে শুধু যে জমি এবং কৃষি-যন্ত্রপাতিই নেই তা নয়, এমনকি তাদের কোন মূলধনও নেই, তারা শুধু নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করেই বেঁচে থাকতে পারে। তাদের কাজের সময় এত দীর্ঘ, বেতন এত কম, শ্রমের অবস্থা এত শোচনীয় এবং কাজ এত নিরাপত্তাহীন যে, অন্য সকল শ্রমিকদের তুলনায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের লোকেরাই সবচেয়ে অধিক কষ্টভোগ করছে এবং কৃষক-আন্দোলনে এদের স্থান গরীব কৃষকদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক ভবঘুরে সর্বহারা, অর্থাৎ ভূমিহারা কৃষক এবং কাজে নিযুক্তির সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হস্তশিল্প-শ্রমিক। মানব-সমাজে তারা সবচেয়ে দুঃস্থ। দেশের বিভিন্ন স্থানেই তাদের গুপ্ত সংগঠন আছে, যেমন ফুকিয়েন ও কোয়াংতুঙে 'ত্রিগুণাত্মা সমিতি', হুনান, হুপে, কুইচৌ ও সেচুয়ানে 'ভ্রাতৃসংঘ', আনহুই, হোনান ও শানতুঙে 'বৃহৎ তরবারি সংঘ', চিলি[১৭] ও তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশে 'যুক্তিবাদী জীবন সংঘ' এবং সাংহাই ও অন্যান্য স্থানে 'সবুজ সংঘ'[১৮]। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে এগুলো ছিল তাদের পারস্পরিক সহায়ক সংগঠন। এই সমস্ত লোককে কি করে পরিচালিত করা যায় তা চীনের অন্যতম কঠিন সমস্যা। তারা নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করতে খুব সক্ষম, কিন্তু তাদের ধ্বংসাত্মক ঝোঁকও আছে, নির্ভুল নেতৃত্ব দিলে এরা একটি বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজশে লিপ্ত সমস্ত যুদ্ধবাজ, আমলা, মুৎসুদ্দিশ্রেণী, বড় জমিদারশ্রেণী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশই হল আমাদের শত্রু। শিল্প-সর্বহারাশ্রেণীই হল আমাদের বিপ্লবের পরিচালক শক্তি। সমস্ত আধা-সর্বহারাশ্রেণী এবং পেটি-বুর্জোয়ারাই আমাদের নিকটতম বন্ধু। দোদুল্যমান মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থীরা আমাদের শত্রু এবং বামপন্থীরা আমাদের

মিত্র হতে পারে—কিন্তু আমাদের সর্বদাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে।

টীকা

১। মূল অর্থে মুৎসুদ্দি মানে বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থার চীনা ম্যনেজার বা প্রধান কর্মচারী। মুৎসুদ্দিরা ছিল বিদেশী অর্থনৈতিক স্বার্থের বিশ্বস্ত সেবাদাস, এবং এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশী পুঁজির সঙ্গে।

২। **রাষ্ট্রবাদ**—এখানে তৎকালীন মুষ্টিমেয় ফ্যাসিবাদী নির্লজ্জ রাজনীতিবিদদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা চীনের রাষ্ট্রবাদী যুব সংঘ গঠন করেছিল, পরে যার নামকরণ করা হয়েছিল চীনা যুব পার্টি। ক্ষমতাসীন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তারা কমিউনিস্ট পার্টির এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করাটাকে নিজেদের প্রতিবিপ্লবী পেশা করেছিল।

৩। জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য মাও সে-তুঙের **নির্বাচিত রচনাবলীর** ২য় খণ্ডে 'চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি' শীর্ষক প্রবন্ধের ২য় অধ্যায়, ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য।

৪। তাই চি-থাও যুবাবস্থাতেই কুওমিনতাঙে যোগ দিয়েছিল এবং চিয়াং কাই-শেকের অংশীদার হয়ে স্টক-এক্সচেঞ্জে চোরাবাজারী করত। ১৯২৫ সালে সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর, সে কমিউনিস্টবিরোধী উস্কানির কাজে লিপ্ত হয় এবং ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী ক্যু'দেতা চালানোর জন্য মতাদর্শগত দিক দিয়ে প্রস্তুতি করেছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী কাজে সে ছিল চিয়াং কাই-শেকের অনুগত কুকুর। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চিয়াং কাই-শেকের শাসনের ধ্বংসের অনিবার্যতা দেখে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরুপায় হয়ে সে আত্মহত্যা করে।

৫। **ছেন পাও** সেই সময়ে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসনের সমর্থনকারী অন্যতম রাজনৈতিক চক্রের—সংবিধানের গবেষণা সমিতির মুখপত্র ছিল।

৬। ১৯২৩ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন কুওমিনতাঙের পুনর্গঠন করার, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করার এবং কমিউনিস্টদেরকে কুওমিনতাঙে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ক্যাণ্টনে কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী ও কৃষক-শ্রমিকদের সমর্থন করা—এই তিনটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করেন। সেই সময়ে কমরেড মাও সে-তুঙ এবং লী তা-চাও, লিন পো-ছু, ছু ছিউ-পাই ও অন্যান্য কমরেড ঐ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং কুওমিনতাঙকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সেই সময়ে কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য অথবা বিকল্প সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৭। মালিক-কৃষক বলতে কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে মাঝারি কৃষকদের বুঝিয়েছেন।

৮। মার্শাল চাও হচ্ছেন চীনা লোক কাহিনীতে সমাজের দেবতা, তাঁর পুরো নাম চাও কুঙ-মিঙ।

৯। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে সাংহাইয়ে ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক চীনা জনগণের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সারা দেশের জনগণ যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৫ সালের মে মাসে ছিংতাও ও সাংহাইয়ের জাপানী সূতাকলগুলোতে পর পর ধর্মঘট হয়, এই ধর্মঘট ব্যাপক আকারের রূপ নিয়েছিল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুর—উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা এটা দমন করতে আসে। ১৫ই মে সাংহাইয়ের জাপানী সূতাকলের মালিক কু চেং-হুং নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং ডজনখানেক শ্রমিককে আহত করে। ২৮শে তারিখে ছিংতাওয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ২৮ জন শ্রমিককে হত্যা করে। ৩০শে মে সাংহাইয়ে দু'হাজারেরও অধিক ছাত্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিদেশীদের এলাকাগুলোতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচার চালায় এবং এইসব এলাকা ফেরৎ আনার জন্য আহ্বান জানায়, এর পরেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ এলাকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে দশ হাজারের অধিক লোক জমায়েত হয় এবং উচ্চৈস্বরে 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!', 'সমগ্র চীনা জনগণ, এক হও!' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ জনতার উপর গুলি চালায়। ফলে বহু ছাত্র হতাহত হয়। এই ঘটনাই ৩০শে মের হত্যাকাণ্ড বলে পরিচিত। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডে

সমগ্র দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ-মিছিল করা হয় এবং শ্রমিক, ছাত্র ও দোকান-কর্মচারীদের ধর্মঘট ও হরতাল শুরু হয়, যা বিরাটাকারের সম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

১০। কমরেড মাও সে-তুঙ 'আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য' বলতে এখানে দরিদ্র কৃষকদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা অংশতঃ নিজেদের জমিতে চাষ করে এবং অংশতঃ অন্যদের কাছ থেকে বর্গা নেওয়া জমিতে কাজ করে।

১১। পুরানো চীনে দোকান-কর্মচারীরা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ এদের সংখ্যাগুরু স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া নিম্নস্তরের-দোকান-কর্মচারীর আর একটি অংশ সর্বহারাজীবন যাপন করত।

১২। ১৯২২ সালের প্রারম্ভে হংকংয়ের নাবিকগণ ও ইয়াংসির স্টীমারের নাবিকগণ ধর্মঘট করে। হংকংয়ের নাবিকরা দৃঢ়তার সঙ্গে আট সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট চালায়; তীব্র ও রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত হংকংয়ের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, নাবিকদের ইউনিয়নের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার, বন্দী শ্রমিকদের মুক্তি এবং শহীদদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এবং পরে ইয়াংসির স্টীমারের নাবিক ও শ্রমিকরাও ধর্মঘট শুরু করে দেয় এবং দুসপ্তাহ পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাবার পর তারাও বিজয়লাভ করে।

১৩। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে তা সংগঠনের কাজ চালাতে শুরু করে। ১৯২২-২৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত প্রধান প্রধান রেলওয়েতে ধর্মঘট হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল পিকিং-হানখৌ রেলওয়ের সাধারণ ধর্মঘট, যা ১৯২৩ সালের ৪টা ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রমিকরা সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার স্বাধীনতার জন্য চালিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সমর্থিত উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ উ পেই-ফু ও শিয়াও ইয়াও-নান ৭ই ফেব্রুয়ারী এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এটাই ইতিহাসের ৭ই ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ড নামে বিখ্যাত।

১৪। খাইলুয়ান কয়লার খনি হচ্ছে, খাইফিং ও লুয়ানচৌ কয়লা খনি দু'টির সাধারণ নাম। এটা চীনের হোপে প্রদেশে অবস্থিত এবং পরস্পরের সংলগ্ন বিশাল কয়লার খনি। সেই সময়ে সেখানে ৫০ হাজারের অধিক শ্রমিক-

কাজ করত। ১৯০০ সালেই হো থোয়ান আন্দোলনের সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা খাইফিং কয়লার খনি কেড়ে নিয়েছিল। পরে চীনা লোকেরা লুয়ানচৌ কয়লার খনি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে, কিছুকাল পরে এই কোম্পানি খাইফিং কয়লা খনির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ফলে খাইলুয়ান কয়লা খনির যুক্ত কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে উভয় খনিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দখল করে নেয়। খাইলুয়ান ধর্মঘট বলতে ১৯২২ সালের অক্টোবরের ধর্মঘটকেই বুঝায়। চিয়াওচুও কয়লার খনি হোনান প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত এবং চীনের প্রসিদ্ধ কয়লার খনি। চিয়াওচুও ধর্মঘট ১৯২৫ সালের পয়লা জুলাই থেকে ৯ই আগস্ট পর্যন্ত চলেছিল।

১৫। সে সময়ে শামিয়েন ছিল ক্যান্টন শহরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা—যারা শামিয়েন শাসন করত—১৯২৪ সালের জুলাই মাসে এক নতুন পুলিশ আইন জারী করে যে, ঐ এলাকা থেকে আসা-যাওয়ার সময় সমস্ত চীনাদের অবশ্যই নিজের ফটোযুক্ত পাশ দেখাতে হবে, কিন্তু বিদেশীরা সেখানে স্বাধীনভাবে আসা-যাওয়া করতে পারত। এই অযৌক্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৫ই জুলাই তারিখে শামিয়েনের শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করে। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা বাধ্য হয়ে ঐ নতুন পুলিশ আইন বাতিল করে।

১৬। সাংহাইয়ের ১৯২৫ সালের ৩০শে মের ঘটনার পর, ১লা জুন তারিখে সাংহাইয়ে এবং ১৯শে জুন হংকংয়ে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। সাংহাইয়ে ২ লক্ষের অধিক শ্রমিক এবং হংকংয়ে আড়াই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করে। সমগ্র দেশের জনগণের সমর্থন পেয়ে হংকংয়ের বিরাট ধর্মঘট লাগাতার-ভাবে ১৬ মাস ব্যাপী চলতে থাকে। বিশ্বের শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে এইটাই দীর্ঘতম ধর্মঘট ছিল।

১৭। চিলি হচ্ছে হোপে প্রদেশের পুরানো নাম।

১৮। 'ত্রিগুণাত্মক সমিতি,' 'ভ্রাতৃসংঘ,' 'বৃহৎ তরবারি সংঘ,' 'যুক্তিবাদী জীবন সংঘ', 'সবুজ সংঘ' প্রভৃতি ছিল জনতার মধ্যে আদিম ধরনের গুপ্ত সংগঠন। এই সংগঠনে প্রধানতঃ রয়েছে দেউলিয়া কৃষক, বেকার হস্তশিল্পী ও ভবঘুরে সর্বহারাগণ। সামন্ততান্ত্রিক চীনে প্রায়শঃই ধর্ম ও কুসংস্কারের সূত্রে এইসব লোক একত্রিত হতো এবং পিতৃপ্রধান ব্যবস্থার সংগঠনরূপে বিভিন্ন নামের সংগঠন গড়ে তুলত, তাদের কারো কারো বা অস্ত্রশস্ত্র ছিল। এই সংগঠনের

মাধ্যমে তারা সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য লাভ করত এবং আমলা ও জমিদার—যারা তাদের আত্যাচার করত—তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে কখনো কখনো তা ব্যবহার করত। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, কৃষক এবং হস্তশিল্পীরা এ ধরনের পশ্চাৎপদ সংগঠন থেকে কোন উপায় খুঁজে পেত না। অধিকন্তু, এই ধরনের পশ্চাৎপদ সংগঠন অতি সহজেই জমিদার ও স্থানীয় উৎপীড়কদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত হতো, আর এ ছাড়া তাদের অন্ধ-ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির কারণে কোন কোনটা বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হতো। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী ক্যু'দেতার সময়ে সে মেহনতী জনগণের ঐক্যকে বিনষ্ট করার ও বিপ্লবকে ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসেবে এই ধরনের পশ্চাৎপদ সংগঠনকে ব্যবহার করেছিল। আধুনিক শিল্প সর্বহারাশ্রেণীর শক্তি বিপুলভাবে বেড়ে ওঠার পর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকেরা ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাই এইসব আদিম ও পশ্চাৎপদ সংগঠনের অস্তিত্বের আর প্রয়োজন রইল না।

হুনানে কৃষক-আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট

(মার্চ ১৯২৭)

কৃষক সমস্যার গুরুত্ব

হুনানে[১] আমার সাম্প্রতিক সফরকালে আমি সিয়াংথান, সিয়াংসিয়াং, হেংশান, লিলিং এবং ছাংশা—এ পাঁচটি জেলার অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করেছি। ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত—এই ৩২ দিনে গ্রামঞ্চলে এবং জেলা-শহরগুলিতে আমি তথ্যানুসন্ধানী সম্মেলন আহ্বান করেছিলাম।

অভিজ্ঞ কৃষক এবং কৃষক-আন্দোলনে কার্যরত কমরেডগণ এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আমি মনোযোগের সঙ্গে তাঁদের রিপোর্ট শুনেছি এবং প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছি। হানখৌ ও ছাংশার ভদ্রলোকরা যা বলাবলি করেছে, কৃষক-আন্দোলনের কারণ ও পদ্ধতি সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নই ছিল একেবারে ঠিক তার উল্টো। এমন অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় আমি দেখেছি এবং শুনেছি যেগুলি সম্পর্কে এর আগে আমি অবহিত ছিলাম না। আমার বিশ্বাস, কথাটা অন্যান্য অনেক স্থান সম্পর্কেও সত্য। কৃষক-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বক্তব্য অবশ্যই দ্রুত শোধরাতে হবে। কৃষক-আন্দোলন সম্পর্কে বিপ্লবী

কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে সেই সময় পার্টির ভিতরে ও বাইরে যে খুঁতখুঁতে সমালোচনা চালানো হচ্ছিল তারই জবাবে কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লেখেন। ঐ সব সমালোচনার উত্তর দেবার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ হুনান প্রদেশে ৩২ দিন ধরে ঘটনাবলীর তদন্ত করেন এবং এই রিপোর্ট লেখেন। তখন ছেন তু-সিউয়ের নেতৃত্বে পার্টির ভেতরকার দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা কমরেড মাও সে-তুঙের অভিমত মেনে না নিয়ে তাদের নিজস্ব ভুল ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তাদের প্রধান ভুল ছিল এই যে, কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতায় ভয় পেয়ে কৃষকদের যে মহান বিপ্লবী সংগ্রাম তখন শুরু হয়ে গিয়েছে বা শুরু হবার পথে ছিল, তাকে সমর্থন জানাতে তারা সাহস করেনি। কুওমিনতাঙের তুষ্টি-বিধান করার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রধান মিত্রবাহিনী অর্থাৎ কৃষকদের তারা পরিত্যাগ করতে মনস্থ করে। এইভাবে তারা শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন ও সহায়হীন অবস্থায় ফেলে দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে কুওমিনতাঙ সমর্থ হয়েছিল, এবং প্রধানতঃ এই কারণে ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে সে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে, তার 'পার্টি শুদ্ধি অভিযান' চালাতে এবং জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস করে।

কর্তৃপক্ষ যেসব ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল সেগুলি অবশ্যই দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে। কেবলমাত্র এইভাবেই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ লাভবান হতে পারে। কারণ কৃষক-আন্দোলনের বর্তমান অভ্যুত্থান একটা অত্যন্ত বিরাট ঘটনা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের মধ্য, দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে কোটি কোটি কৃষক প্রবল ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার মতো তীব্র গতি ও প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে জেগে উঠবে। কোন শক্তি, সে যত প্রবলই হোক না কেন, এটাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। যেসব বেড়াজাল তাদের বেঁধে রাখে, সে সব-কিছুকেই ছিন্নবিছিন্ন করে তারা মুক্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হবে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের তারা কবরে পুঁতে ফেলবে। সমস্ত বিপ্লবী পার্টি ও দল এবং সমস্ত বিপ্লবী কমরেডকেই তাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে—গ্রহণ করা বা বর্জন করা তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে। তাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তাদের নেতৃত্ব দান করা? না, তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কেটে তাদের সমালোচনা করা? অথবা তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বিরোধিতা করা? এ তিনটার একটাকে বেছে নেবার স্বাধীনতা প্রতিটি চীনা লোকেরই আছে। তবে বাস্তব অবস্থা বেছে নেওয়ার কাজটা শীঘ্রই করে ফেলতে আপনাকে বাধ্য করবে।

সংগঠিত হোন!

হুনানের কৃষক-আন্দোলনের বিকাশকে মোটামুটি দু'টি পর্যায়কালে ভাগ করা যায়; প্রদেশের মধ্যে ও দক্ষিণভাগের যেখানে এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই অনেকখানি অগ্রগতি লাভ করেছে, সেখানকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাগ করা চলে। বিগত বছরের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়টা ছিল প্রথম পর্যায়কাল, অর্থাৎ সংগঠনের পর্যায়কাল। এই পর্যায়কালে জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত সময়টা ছিল গোপন কর্ম-তৎপতার সময়; জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিপ্লবী বাহিনী যখন চাও হেং-থিকে[২] বিতাড়িত করেছিল, সে সময়টা ছিল প্রকাশ্য কর্ম-তৎপরতার সময়। এই পর্যায়কালে কৃষক সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা তিন-চার লক্ষের বেশি ছিল না। তাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের সংখ্যা ছিল দশ লাখের সামান্য কিছু বেশি। তখন গ্রামাঞ্চলে কোন সংগ্রাম ছিল না বললেই চলে; এর ফলে অন্যান্য মহলে সমিতিগুলোর

খুব অল্প সমালোচনাই হতো। কৃষক সমিতির সদস্যরা উত্তরে অভিযানকারী সৈন্যবাহিনীর পথপ্রদর্শক, স্কাউট এবং বাহক হিসাবে কাজ করত বলে কোন কোন অফিসার কৃষক সমিতি সম্পর্কে প্রশংসাবাক্যও উচ্চারণ করছিল। বিগত অক্টোবর থেকে এ বছরের জানুয়ারী অবধি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়কাল, অর্থাৎ বিপ্লবী কর্ম-তৎপরতার পর্যায়কাল। এই সময়ে কৃষক সমিতির সদস্য সংখ্যা দ্রুত বেড়ে হল কুড়ি লাখ এবং তাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের সংখ্যা বেড়ে হল এক কোটি। যেহেতু সাধারণতঃ কৃষকরা কৃষক সমিতিতে যোগদানের সময় একটি সমগ্র পরিবারের পক্ষ থেকে মাত্র একজনের নাম লেখায়, সেজন্য কৃষক সমিতির সদস্যের সংখ্যা কুড়ি লাখ বলতে প্রায় এক কোটি জনসাধারণের আনুগত্য বোঝায়। হুনানের প্রায় অর্ধেক কৃষকই এখন সংগঠিত। সিয়াংথান, সিয়াং-সিয়াং, লিউইয়াং, ছাংশা, লিলিং, নিংসিয়াং, পিংকিয়াং, সিয়াংইং, হেংশান, হেংইয়াং, লেইয়াং, ছেনসিয়ান এবং আনহুয়া-এর মতো জেলাগুলোর প্রায় সমস্ত কৃষকেরাই কৃষক সমিতিগুলিতে যোগ দিয়েছে এবং তাদের নেতৃত্বাধীনে এসেছে। তাদের বিপুল সাংগঠনিক শক্তির ফলেই কৃষকেরা কর্মতৎপর হয়েছে এবং এইভাবে চার মাসের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে এক বিরাট বিপ্লব সম্পন্ন করেছে। ইতিহাসে এই বিপ্লবের তুলনা নেই।

স্থানীয় উৎস্বপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকেরা নিপাত যাক! কৃষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা চাই!

কৃষকদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থানীয় উৎপীড়ক, এবং উচ্ছৃংখল ভূস্বামীরা,- কিন্তু সাথে সাথে তারা বিভিন্ন পির্তৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ও বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, শহরের দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এবং গ্রামাঞ্চলের প্রচলিত কুপ্রথা ও কুনীতির বিরুদ্ধেও আঘাত হেনেছে। প্রলয়ংকরী ঝড়ো আক্রমণের সামনে যারা মাথা নত করে তারা বেঁচে যায়, আর যারা বাধা দেয় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে হাজার হাজার বছর ধরে সামন্ত ভূস্বামীরা যে বিশেষ অধিকার ভোগ করে আসছিল তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ভূস্বামীদের স্পষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতিটি কণা ধূলিসাৎ হচ্ছে। ভূস্বামীদের ক্ষমতা ভেঙ্গে পড়বার সাথে সাথে এখন কৃষক সমিতিগুলি ক্ষমতা প্রয়োগের একমাত্র যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং 'কৃষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা চাই' এই জনপ্রিয় শ্লোগানটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার

ঝগড়াঝাটির মতো ছোটখাট ব্যাপারও সমাধানের জন্য কৃষক সমিতির কাছে পেশ করা হয়। কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে কেউ উপস্থিত না থাকলে কোন কিছুরই মীমাংসা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, সমিতিই পল্লী অঞ্চলের সমস্ত ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করে—সোজা কথায় 'এরা যা বলে তাই হয়'। যারা সমিতির বাইরে রয়েছে, তারা সমিতি সম্পর্কে শুধু ভাল কথাই বলতে পারে এবং এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারে না। স্থানীয় উৎপীড়ক এবং উচ্ছৃংখল ভূস্বামীদের কথা বলার সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ মতভেদের কথা বিড়বিড় করে প্রকাশ করতেও সাহস করে না। কৃষক সমিতির শক্তি ও চাপের মুখে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের শীর্ষস্থানীয়রা সাংহাইয়ে পালিয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা হানখৌ, তৃতীয় স্তরেররা ছাংশা এবং চতুর্থ স্তরের লোকেরা গেছে জেলা শহরগুলোতে, আর পঞ্চম স্তরের এবং তারও নীচের চুনোপুঁটিরা গ্রামের কৃষক সমিতিগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ছোটখাট অসৎ ভদ্রলোকদের কেউ কেউ বলে 'এই রইল দশ ইউয়ান। দয়া করে আমাকে কৃষক সমিতিতে যোগ দিতে দিন।'

কৃষকেরা উত্তর দেয়: 'ছ্যাঃ! কে চায় তোমার নোংরা টাকা!'

অনেক মাঝারি ও ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং ধনী কৃষক, এমনকি অনেক মাঝারি কৃষকও, যারা আগে কৃষক সমিতির বিরোধিতা করেছে, তারা এখন ভর্তি হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বিভিন্ন স্থান সফরকালে আমি প্রায়ই এ রকম লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা আমার কাছে অনুনয় করে বলেছে: 'প্রাদেশিক রাজধানী থেকে আগত কমিটি-নেতা, আপনি দয়া করে আমার জামিন হোন!'

ছিং রাজবংশের শাসনকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংকলিত পারিবারিক আদমশুমারির জন্য ছিল একটি নিয়মিত তালিকাপুস্তক এবং আর একটি 'অন্য' তালিকাপুস্তক। প্রথমটি ছিল সৎ লোকের জন্য এবং দ্বিতীয়টি ছিল সিঁদেলচোর, দস্যু এবং অনুরূপ অবাঞ্ছিতদের জন্য। কোন কোন জায়গায় কৃষকরা এখন এই পন্থা অবলম্বন করে পূর্বে যারা কৃষক সমিতির বিরোধিতা করেছে, তাদের ভয় দেখায়। তারা বলে, 'এদের নাম অন্য তালিকাপুস্তকে লিখে রাখ!'

অন্য তালিকাপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হবার ভয়ে এই ধরনের লোকেরা কৃষক

সমিতিতে ভর্তি হবার জন্য নানা কৌশলে চেষ্টা করছে। এর উপর তাদের মন এতই নিবদ্ধ যে, সমিতির সভ্য তালিকায় তাদের নাম না লেখানো পর্যন্ত তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে না। কিন্তু প্রায়ই তাদের কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফলে তারা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় দিন কাটায়। সমিতির দ্বার রুদ্ধ থাকায় তাদের অবস্থা হয়েছে গৃহহীন ভবঘুরের মতো, অথবা গ্রাম্য কথায় যাকে বলে 'ছন্নছাড়া', তার মতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, চার মাস আগেও যাকে একটা 'কৃষক চক্র' বলে তুচ্ছ করা হতো, এখন তাই হয়েছে একটি অতি সম্মানিত প্রতিষ্ঠান। ভদ্রলোকদের ক্ষমতার কাছে আগে যারা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করত, এখন কৃষকদের ক্ষমতার কাছে তারা মাথা নত করে। তাদের পরিচিতি যা-ই হোক, সকলেই স্বীকার করে, বিগত অক্টোবর থেকে পৃথিবী বদলে গেছে।

'এটা ভয়ংকর!' অথবা 'এটা চমৎকার!'

গ্রামে কৃষক বিদ্রোহ সুখস্বপ্নের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। গ্রাম থেকে সংবাদ যখন শহরে পৌঁছাল, তখন সেখানকার ভদ্রলোকদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ হৈ চৈ পড়ে গেল। ছাংশায় আসার পরেই আমি সকল স্তরের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এবং অনেক গালগল্প শুনেছি। সমাজের মধ্য স্তর থেকে শুরু করে কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীরা পর্যন্ত এমন কোন লোক নেই যে সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে একটি বাক্যে পরিণত করে বলেনি, 'এটা ভয়ংকর!' শহরে 'এটা ভয়ংকর!' এই মতাবলম্বীদের অবাধ প্রচারের প্রভাবে অনেক একনিষ্ঠ বিপ্লবী-ব্যক্তিও মানসনয়নে পল্লীর ঘটনাবহুল চিত্র দেখে ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়েছে এবং 'ভয়ংকর' এই কথাটা তারা অস্বীকার করতে পারছিল না। এমনকি অতি প্রগতিশীল লোকও বলে, 'ভয়ংকর বটে, কিন্তু বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় এটা অপরিহার্য। সংক্ষেপে বলা যায়, 'ভয়ংকর' শব্দটা কেউই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারছিল না। কিন্তু ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বস্তুতঃ ঐতিহাসিক দায়িত্বসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই ব্যাপক কৃষকসাধারণ জেগে উঠেছে এবং পল্লীর গণতান্ত্রিক শক্তি গ্রাম্য সামন্ততান্ত্রিক শক্তির পতন ঘটাবার জন্য জেগে উঠেছে। পিতৃতান্ত্রিক-সামন্তশ্রেণীর স্থানীয় উৎপীড়ক এবং উচ্ছৃংখল ভূস্বামীশ্রেণী হাজার হাজার বছর ধরে স্বৈরাচারী সরকারের বুনিয়াদ তৈরী করে এসেছে, এবং তারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের ভিত্তি-

স্বরূপ। এইসব সামন্তশক্তিকে উচ্ছেদ করাই হল জাতীয় বিপ্লবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন চল্লিশ বছর ধরে জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করার কাজে একাগ্রভাবে লেগেছিলেন, তিনি এতদিন ধরে যা করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন, কৃষকরা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তা সম্পন্ন করেছে। শুধুমাত্র ৪০ বছরেই নয়—এমনকি আগের হাজার হাজার বছরেও এমন অভূতপূর্ব বিস্ময়কর সাফল্য আর অর্জিত হয়নি। এটা চমৎকার। এটা মোটেই 'ভয়ংকর' নয়। এটা আর যাই হোক 'ভয়ংকর' নয়। 'এটা ভয়ংকর!'—এই তত্ত্ব স্পষ্টত:ই ভূস্বামীদের স্বার্থের খাতিরে কৃষক উত্থানকে আঘাত হানার জন্য সৃষ্ট তত্ত্ব। স্পষ্টত:ই সামন্ততন্ত্রের পুরানো বিধিব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্যে এবং গণতন্ত্রের নতুন শৃংখলার প্রতিষ্ঠাকে বাধাদানের জন্যে এটা ভূস্বামীশ্রেণীর একটি তত্ত্ব এবং এটা স্পষ্টত: প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বও বটে। কোন বিপ্লবী কমরেডেরই এই বাজে কথা উচ্চারণ করা উচিত নয়। যদি আপনার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং যদি আপনি একবার গ্রামে গিয়ে তার চারিপাশে দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে নি:সন্দেহে আপনি আগের চেয়ে বেশি আনন্দ বোধ করবেন। এখন অগণিত হাজার হাজার ক্রীতদাস—কৃষকগণ—আঘাত করে ধরাশায়ী করছে তাদের নরখাদক শত্রুদের। কৃষকরা যা করছে তা সম্পূর্ণ ঠিক। তারা যা করছে—তা চমৎকার! 'এটা চমৎকার!' এই তত্ত্ব কৃষকদের ও অন্যান্য সকল বিপ্লবীদের। প্রত্যেকটি বিপ্লবী কমরেডেরই জানা উচিত যে, জাতীয় বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলের বিরাট পরিবর্তন সাধন। ১৯১১ সালের বিপ্লবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি, ফলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। এখন এই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে এবং বিপ্লবের সাফল্যের জন্য তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রত্যেকটি বিপ্লবী কমরেডকেই তা সমর্থন করতে হবে। তা না হলে তাকে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে যেতে হবে।

তথাকথিত 'বাড়াবাড়ি'র প্রশ্ন

আরও এক দলের লোক রয়েছে—যারা বলে, 'হ্যাঁ, কৃষক সমিতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু তারা বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে।' এটা মধ্যপন্থীদের অভিমত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি? সত্য বটে, গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা বেশ কিছুটা 'অবাধ্য'। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কৃষক সমিতি ভূস্বামীকে কিছুই বলতে দেয় না এবং তার প্রতিপত্তিও করে দেয় নির্মূল। এইভাবে

আঘাত করে ভূস্বামীকে ধূলিলুণ্ঠিত করে পদতলে রাখা হয়। কৃষকরা ভয় দেখায়—'আমরা তোমার নাম অন্য তালিকাপুস্তকে লিখব!' স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের তারা জরিমানা করে, তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে এবং তাদের পাল্কিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে। যে সমস্ত স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোক কৃষক সমিতির বিরোধিতা করেছে, জনগণ দল বেঁধে তাদের বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে, তাদের শূকর জবাই করে ও শস্য ছিনিয়ে নেয়। এমনকি তারা স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্র-পরিবারের মিসি-সাহেবা ও বিবিদের হাতীর দাঁতের খাটে দুই-এক মিনিট গড়াগড়িও দেয়। সামান্যতম বিরোধিতা করলেই তারা গ্রেপ্তার করে এবং ধৃত ব্যক্তির মাথায় লম্বা গাধার টুপি পরিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং বলতে থাকে—'কি হে অসৎ ভদ্রসম্প্রদায়, এখন চেন আমরা কারা!' তারা তাদের যা ইচ্ছে তাই করে এবং সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে পল্লী অঞ্চলে এক ধরনের ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। এটাকেই কোন কোন লোক 'বাড়াবাড়ি, 'ত্রুটি সংশোধন করার জন্য যথাযথ সীমা অতিক্রম করা' অথবা 'বাস্তবিকই অতিরিক্ত' বলে প্রচার করছে। এসব কথাবার্তা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাও ভুল। প্রথমতঃ, স্থানীয় উৎপীড়ক, অসৎ ভদ্রসম্প্রদায় এবং উচ্ছৃংখল ভূস্বামীরাই কৃষকদেরকে উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ করার জন্য বাধ্য করেছে। যুগ যুগ ধরে তারা নিজেদের ক্ষমতার বলে কৃষকদের উপর প্রভুত্ব করে এসেছে এবং তাদেরকে পদদলিত করেছে। সে জন্যেই কৃষকরা এমন প্রবলভাবে পালটা আঘাত হেনেছে। সবচেয়ে ভয়ানক বিদ্রোহ এবং সবচেয়ে প্রচণ্ড বিশৃংখলা ঘটেছে সেইসব স্থানে যেখানে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রসম্প্রদায় এবং উচ্ছৃংখল ভূস্বামীদের দৌরাত্ম্য ছিল সবচেয়ে জঘন্য। কৃষকরা সূক্ষ্মদর্শী। কে খারাপ আর কে নয়, কে সবচেয়ে মন্দ আর কে অতটা নয়, কার কঠিন শাস্তির প্রয়োজন আর কার লঘু দণ্ডের দরকার—কৃষকরা এ সবের সহজ ও নিখুঁত হিসেব রাখে এবং অপরাধের তুলনায় দণ্ড অধিক হয়েছে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লব কোন ভোজসভা নয়, বা প্রবন্ধ রচনা বা চিত্রাঙ্কন কিংবা সূচীকর্ম নয়; এটা এত সুমার্জিত, এত ধীর-স্থির ও সুশীল, এত নম্র, দয়ালু, বিনীত, সংযত ও উদার হতে পারে না।[৪] বিপ্লব হচ্ছে বিদ্রোহ—উগ্র বলপ্রয়োগের কাজ, যার দ্বারা এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে উৎখাত করে। গ্রামীণ

বিপ্লব এমন একটি বিপ্লব যার দ্বারা কৃষকশ্রেণী সামন্ত ভূস্বামীশ্রেণীর ক্ষমতা উচ্ছেদ করে। সবচেয়ে প্রচণ্ড শক্তি কাজে না লাগিয়ে কৃষকরা কোনমতেই ভূস্বামীদের হাজার হাজার বছরের গভীর পাকাপোক্ত ক্ষমতার উৎখাত করতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে একটা বিরাট বৈপ্লবিক উত্তাল জোয়ারের প্রয়োজন আছে। কারণ এর মাধ্যমেই কেবল লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলে একটা মহান শক্তিতে সংগঠিত করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলের বিরাট বৈপ্লবিক উত্তাল জোয়ারের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে যে কৃষক শক্তির উদ্ভব হয়েছে তার ফলেই উপরে উল্লিখিত কার্যকলাপ ঘটেছে—যাকে লোকেরা 'বাড়াবাড়ি' বলে প্রচার করছে। এরকম কার্যকলাপ কৃষক-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়কালে (বিপ্লবী কর্মতৎপরতার পর্যায়কালে) খুবই প্রয়োজন ছিল। এ পর্যায়ে কৃষকদের নিরংকুশ কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করা দরকার ছিল। দরকার ছিল কৃষক সমিতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচনা নিষিদ্ধ করা। দরকার ছিল ভদ্র সম্প্রদায়ের সমস্ত ক্ষমতার উচ্ছেদ করা এবং তাদের আঘাত দিয়ে ধূলিলুণ্ঠিত করে পদতলে দাবিয়ে রখো। এই পর্যায়ে 'অধিক বাড়াবাড়ির' লেবেল-আঁটা সমস্ত কর্মতৎপরতারই একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য রয়েছে। যথার্থভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেকটি পল্লী এলাকায় সাময়িকভাবে ত্রাসের সঞ্চার করা দরকার। তা না হলে গ্রামাঞ্চলের প্রতিবিপ্লবীদের কার্যকলাপ দমন করা কিংবা ভদ্র সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের পতন ঘটানো অসম্ভব হবে। ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে যথাযথ সীমা অতিক্রম করতে হবে, অন্যথায় ত্রুটির সংশোধন কখনো হতে পারে না[৫]। আগেই বলা হয়েছে, কৃষকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কেউ কেউ বলে 'এটা ভয়ংকর!' আবার কেউ কেউ বলে তারা 'বাড়াবাড়ি করছে'। আপাতদৃষ্টিতে শেষোক্ত বক্তব্য প্রথমটি থেকে ভিন্ন মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলে এবং বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী ভূস্বামীদের মতবাদেরই তারা প্রতিধ্বনি করে। যেহেতু, এ মতবাদ কৃষক-আন্দোলনের উত্থানকে ব্যাহত করছে, তাই বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করছে, অবশ্যই আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে তার বিরোধিতা করব।

তথাকথিত "ইতর লোকের আন্দোলন"

কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীরা বলে, 'কৃষক-আন্দোলন হল ইতর লোকের ও অলস কৃষকদের আন্দোলন।' ছাংশাতে এ অভিমত বেশ চালু। আমি

যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলাম, তখন আমি ভদ্রলোকদের বলতে শুনেছি : 'কৃষক সমিতি গঠন করা ঠিকই হয়েছে, কিন্তু এখন যে সমস্ত লোক এগুলো পরিচালনা করছে, তারা কোন কাজের নয়। তাদের বদলে দেওয়া উচিত!' দক্ষিণপন্থীরা যা বলছে, এ অভিমতও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি। তাদের উভয়ের মতেই কৃষক-আন্দোলন থাকাটা বাঞ্ছনীয় (আন্দোলনটা যেহেতু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, তাই কেউ এর বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস করে না), কিন্তু তাদের মতে যারা এই আন্দোলন পরিচালনা করছে, তারা কোন কাজের নয়। বিশেষ করে নিম্নস্তরের কৃষক সমিতির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত লোকদের তারা ঘৃণা করে এবং তাদেরকে বলে 'ইতর লোক'। সংক্ষেপে, ভদ্রলোকরা যে সমস্ত লোকদের ঘৃণার চোখে দেখে এসেছে, যাদের পদদলিত করে আবর্জনায় পুঁতে রেখেছিল, যাদের সমাজে কোন স্থান ছিল না এবং যাদের কথা বলারও অধিকার ছিল না, তারাই এখন উদ্ধতভাবে তাদের মাথা উঁচু করেছে। তারা যে শুধু তাদের মাথা উঁচু করেছে তাই নয়, উপরন্তু তারা ক্ষমতাও হস্তগত করেছে। তারা এখন থানা কৃষক সমিতিগুলোর (সবচেয়ে নিম্নস্তরের) পরিচালনার ভার নিয়ে সেগুলিকে প্রচণ্ড ও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। তারা তাদের কড়াপড়া নোংরা হাতগুলো তুলে ধরে ভদ্রলোকদের উপর আঘাত করছে। অসৎ ভদ্রলোকদের তারা দড়ি দিয়ে বাঁধে, লম্বা গাধার টুপি তাদের মাথায় পরিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। (সিয়াংথান এবং সিয়াংসিয়াংয়ে এটাকে তারা 'গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘোরানো' এবং লিলিংয়ে 'মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোরানো' বলে অভিহিত করেছে।) এমন একদিনও যায় না যেদিন তারা এসব ভদ্রলোকদের কানে কিছু কঠোর ও নির্দয় নিন্দাবাদ বর্ষণ না করে। তারা হুকুম জারি করছে ও সবকিছু পরিচালনা করছে। আগে যারা ছিল সবচেয়ে নীচে—তারাই এখন সকলের চেয়ে উঁচুতে অবস্থান করছে। একেই বলে 'উল্টে দেওয়া।'

বিপ্লবের অগ্রবাহিনী

কোন বিষয় বা মানুষ সম্পর্কে দু'টি বিপরীত ধারণা যেখানে রয়েছে, সেখানে দু'টি বিপরীত মতের উদ্ভব ঘটে। 'এটা ভয়ংকর!' ও 'এটা চমৎকার!', 'ইতর লোক' ও 'বিপ্লবের অগ্রবাহিনী'—এগুলো এর যথাযথ উদাহরণ।

আমরা উপরে বলেছি, যে কাজ বহু বছর ধরে অসম্পন্ন রাখা হয়েছিল, কৃষকরা সেই বৈপ্লবিক দায়িত্ব সমাধা করেছে এবং জাতীয় বিপ্লবের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে। কিন্তু এই মহান বৈপ্লবিক কর্তব্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কাজ কি সকল কৃষকের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে? না। তিন রকমের কৃষক আছে—ধনী, মাঝারি ও গরীব। এই তিন রকম কৃষক ভিন্নতর অবস্থার মধ্যে বাস করে, সুতরাং বিপ্লব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও পৃথক। প্রথম পর্যায়কালে যা ধনী কৃষকদের মনে নাড়া দিত, তা ছিল চিয়াং-সীতে উত্তরে অভিযানকারী বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটেছে, চিয়াং কাই শেক পায়ে জখম হয়ে[৬] বিমানযোগে কুয়াংতোংয়ে[৭] পালিয়ে গেছে এবং উ পেই-ফু[৮] পুনরায় ইয়ুয়ে-চৌ দখল করে নিয়েছে। কৃষক সমিতি নিশ্চয়ই বেশি দিন টিঁকবে না এবং তিন-গণনীতি[৯] কখনো সফল হতে পারে না, কারণ আগে এ সম্বন্ধে তারা কিছুই শোনেনি। থানা কৃষক সমিতির কোন কর্মী (সাধারণতঃ 'ইতর লোক' জাতীয় কেউ) হাতে একটি তালিকাপুস্তক নিয়ে ধনী কৃষকদের গৃহে গিয়ে যখন বলত—'তুমি কি কৃষক সমিতিতে যোগ দেবে?', ধনী কৃষকেরা তখন কিভাবে উত্তর দিত? ব্যবহারে মোটামুটি ভদ্র কেউ বলত—'কৃষক সমিতি? আমি যুগ যুগ ধরে এখানে বাস করছি এবং আমার জমি চাষ করছি। কৈ, এমন জিনিসের নাম তো এর আগে কখনো শুনিনি, কিন্তু তবু তো বেশ ভালভাবে জীবিকা নির্বাহ করছি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, এসব ছেড়ে দাও।' দুষ্টপ্রকৃতির ধনী কৃষকরা বলত—'কৃষক সমিতি! যত সব বাজে! মাথা কাটার সমিতি! মানুষকে বিপদে ফেল না!' তবুও, অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, কৃষক সমিতি কয়েক মাস হল গড়ে উঠেছে, এমনকি ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও সাহস করেছে। প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের মধ্যে যারা তাদের আফিমের নলচে পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেছে, কৃষক সমিতি তাদের বন্দী করে গ্রামের ভেতর দিয়ে তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। অধিকন্তু জেলা-শহরগুলোতে—সিয়াংথানের ইয়ান জুং-ছিউ এবং নিংসিয়াংয়ের ইয়াং চি-জে'র মতো কিছু সংখ্যক বড় ভূস্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে, ব্রিটিশবিরোধী সমাবেশের সময়ে এবং উত্তর অভিযানের মহান বিজয়ানুষ্ঠান উদ্‌যাপনের কালে প্রত্যেকটি থানায় হাজার হাজার কৃষক ছোট-বড় নিশান উড়িয়ে কাঁধে বাঁক ও কোদাল নিয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো বিরাট মিছিল বের করেছে। কেবলমাত্র

তখন থেকেই ধনী কৃষকরা হতবুদ্ধি ও ভীত হতে আরম্ভ করেছে। উত্তর অভিযানের মহান বিজয়ানুষ্ঠানের সময়েই তারা জানতে পেরেছে যে, চিউচিয়াং অধিকার করা হয়েছে, চিয়াং কাই-শেক পায়ে আঘাত পায়নি, আর পরিশেষে উ পেই-ফু পরাজিত হয়েছে। অধিকন্তু তারা দেখল 'লাল ও সবুজ রঙের ইস্তাহারে' 'তিন-গণনীতি জিন্দাবাদ!', কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ!', 'কৃষক জিন্দাবাদ!' প্রভৃতি শ্লোগান স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে। ধনী কৃষক অতিমাত্রায় হতবুদ্ধি ও ভীত হয়ে বলেছে—'কি? কৃষক জিন্দাবাদ! এ লোকগুলোকে এখন কি সম্রাট বলে গণ্য করতে হবে?'[১০] এইভাবে কৃষক সমিতি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমিতির লোকেরা ধনী কৃষকদের বলে—'আমরা তোমাদের নাম অন্য তালিকপুস্তকে লিখব!' অথবা বলে—'আর এক মাস পরে ভর্তি-ফি মাথাপিছু দশ ইউয়ান লাগবে!' এইসব অবস্থার চাপে পড়েই কেবল ধনী কৃষকরা আস্তে আস্তে সমিতিতে যোগ দিচ্ছে[১১]। ভর্তির জন্যে কেউ কেউ ৫০ সেণ্ট অথবা এক ইউয়ান দিচ্ছে। (নিয়মিত ভর্তির ফি মাত্র ১০০ ছিয়ান।) কেউ কেউ অন্য লোক তাদের অনুকূলে একটু সুপারিশ করার পরই কেবল ভর্তি হতে পারছে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক গোঁড়া ব্যক্তি রয়েছে, যারা আজও পর্যন্ত সমিতিতে যোগ দেয়নি। ধনী কৃষকরা যখন সমিতিতে যোগ দেয়, তখন তারা সাধারণতঃ পরিবারের ৬০-৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধের নাম লেখায়। কারণ তারা সর্বদা 'বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে ভর্তি'-র ভয়ে ভীত থাকে। যোগ দেবার পরে সমিতির জন্যে কোন প্রকার কাজ-কর্মে ধনী কৃষকরা আগ্রহ দেখায় না। আগাগোড়াই তারা থাকে নিষ্ক্রিয়।

মাঝারি কৃষকদের অবস্থা কি? তাদের আছে দোদুল্যমান মনোভাব। তারা মনে করে, বিপ্লব তাদের বিশেষ কিছু উপকারে আসবে না। তাদের হাঁড়িতে চাল আছে এবং মাঝরাতে দ্বারে করাঘাত করার মতো কোন পাওনাদার তাদের নেই। জিনিসটি আগে কোনদিন ছিল কিনা, এই দিক থেকে বিচার করে তারাও ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবতে থাকে—'কৃষক সমিতি কি সত্যই টিঁকে থাকতে পারবে?', 'তিন-গণনীতি কি সফল হতে পারবে?' তাদের সিদ্ধান্ত হল—'বুঝি বা নয়!' তারা মনে করে যে, এর সব কিছু ভগবানের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে এবং ভাবে, 'কৃষক সমিতি? কে জানে ভগবানের এটেই ইচ্ছে কিনা?' প্রথম পর্যায়কালে, সমিতির লোকেরা

তালিকাপুস্তক হাতে করে মাঝারি কৃষকদের কাছে গিয়ে বলত—'আপনি কি দয়া করে কৃষক সমিতিতে যোগ দেবেন?' মাঝারি কৃষক উত্তর দিত—'তাড়াহুড়োর কিছু নেই!' দ্বিতীয় পর্যায়কালে যখন কৃষক সমিতি তার বিপুল ক্ষমতার প্রয়োগ শুরু করেছে, কেবলমাত্র তখনই মাঝারি কৃষকরা ভর্তি হয়েছে। সমিতির ভেতরে তাদের ব্যবহার ধনী কৃষকদের তুলনায় ভাল ছিল, কিন্তু তবু এখনো তারা খুব বেশি উৎসাহী নয়। তারা এখনো অপেক্ষা করে দেখতে চায়। কৃষক সমিতির পক্ষে মাঝারি কৃষকদের ভর্তি করে নেওয়া এবং তাদের মধ্যে আরও অধিক ব্যাখ্যামূলক কাজ করা খুবই প্রয়োজন।

গরীব কৃষকরাই সর্বদা গ্রামাঞ্চলের তীব্র সংগ্রামের প্রধান শক্তি। গোপন ও প্রকাশ্য কর্মতৎপরতার দুটি পর্যায়েই তারা বীরত্বের সঙ্গে লড়ে চলেছে। তারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি সবচেয়ে সহজে সমর্থন জানায়। স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকদের তারাই হচ্ছে মারাত্মক শত্রু এবং বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করে তারা তাদের শিবিরের উপরে আক্রমণ করে। তারা ধনী কৃষকদের বলে, 'আমরা অনেক আগেই কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েছি। তোমরা এখনো দ্বিধা করছ কেন?' ধনী কৃষকরা বিদ্রূপের সঙ্গে উত্তর দেয়—'তোমাদের যোগ না দেবার কি আছে? তোমাদের মাথার উপরে না আছে একটা টালি, পায়ের নীচে না আছে এক ফালি জমি!' এটা সত্য যে গরীব কৃষকদের কিছুই হারাবার ভয় নেই। সত্যিই তাদের অনেকেরই 'মাথার উপর না আছে একটা টালি, পায়ের নীচে না আছে এক ফালি জমি।' বাস্তবিকই তাদের সমিতিতে যোগদানের বাধা কি? ছাংশা জেলার তদন্ত অনুসারে গ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ গরীব কৃষক, ২০ ভাগ মাঝারি কৃষক আর ভূস্বামী ও ধনী কৃষক হল শতকরা ১০ ভাগ। শতকরা ৭০ ভাগ গরীব কৃষককে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: একেবারেই নিঃস্ব এবং অল্প নিঃস্ব। একেবারেই নিঃস্ব[১২] হল শতকরা ২০ ভাগ, তারা সম্পূর্ণরূপে সহায়-সম্পদহীন অর্থাৎ তাদের জমিও নেই, অর্থও নেই এবং জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়ই তাদের নেই। তারা বাধ্য হয়েছে গৃহত্যাগ করে ভাড়াটিয়া সৈন্য হতে বা মজুর খাটতে কিংবা ভ্রাম্যমান ভিক্ষুক হতে। অল্প সহায়-সম্পদহীন হল বাকী ৫০ ভাগ। তারা অল্প নিঃস্ব[১৩] অর্থাৎ তাদের সামান্য জমি বা সামান্য অর্থ আছে। কিন্তু তারা যা উপার্জন করে, তার চেয়ে ব্যয় বেশি, এবং সারা বছরই তারা কঠোর পরিশ্রম করে ও দুঃখ কষ্টের ভেতর জীবনযাপন করে। এই

ধরনের লোকের মধ্যে আছে হস্তশিল্পী, বর্গাদার কৃষক (ধনী বর্গাদার কৃষকদের বাদ দিয়ে) এবং আধা-স্বত্বাধিকারী কৃষক। গরীব কৃষকদের বিরাট জনসাধারণ—যারা গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার সতকরা ৭০ ভাগ, তারাই কৃষক সমিতির মেরুদণ্ড, সামন্ত শক্তির উচ্ছেদসাধনের অগ্রবাহিনী এবং সেই বীরনায়ক যারা বহু বছরের অসম্পাদিত বৈপ্লবিক কাজকে সম্পাদন করেছে। গরীব কৃষকশ্রেণী (অসৎ ভদ্রলোকদের কথায় 'ইতর লোক') ছাড়া গ্রামাঞ্চলে বর্তমান বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের পতন ঘটানো এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হতো না। গরীব কৃষকরা সবচেয়ে বেশি বিপ্লবী হবার ফলে কৃষক সমিতির নেতৃত্ব লাভ করেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় পর্যায়েই একেবারেই নিম্নতম কৃষক সমিতির সভাপতি এবং কমিটি-সদস্যদের প্রায় সকলেই ছিল গরীব কৃষক। (হেংশান জেলার থানা সমিতির কমিটি-সদস্যদের মধ্যে একেবারে নিঃস্ব কৃষক ছিল শতকরা ৫০ ভাগ, অল্প নিঃস্ব কৃষক ছিল শতকরা ৪০ ভাগ, এবং দারিদ্র্য প্রপীড়িত বুদ্ধিজীবী ছিল শতকরা ১০ ভাগ।) গরীব কৃষকদের নেতৃত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গরীব কৃষক ব্যতীত বিপ্লব হতে পারে না। তাদের ভূমিকা অস্বীকার করার মানেই হল বিপ্লবকে অস্বীকার করা। তাদের আক্রমণ করার অর্থ বিপ্লবকে আক্রমণ করা। বিপ্লবের সাধারণ গতিমুখ সম্পর্কে তারা কখনই ভুল করেনি। তারা স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকদের মর্যাদা নষ্ট করে দিয়েছে। ছোট-বড় সকল স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের তারা ধুলিলুণ্ঠিত করেছে এবং পদতলে রেখেছে। বিপ্লবী কার্য-কলাপের সময় তাদের অনেক কাজ, যা 'অধিক বাড়াবাড়ি করা' হচ্ছে বলে লেবেল আঁটা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষেই বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন ছিল। হুনানের কিছু কিছু জেলা সরকার, কুওমিনতাঙের জেলা সদরদপ্তর এবং জেলা কৃষক সমিতি ইতিমধ্যেই কতকগুলি ভুল করেছে। এমনকি, কেউ কেউ ভূস্বামীদের অনুরোধে নিম্নস্তরের কৃষক সমিতিগুলোর কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য সৈন্য পর্যন্ত পাঠিয়েছে। হেংশান এবং সিয়াংসিয়াং জেলার জেলে বেশকিছু সংখ্যক থানা কৃষক সমিতির সভাপতি এবং কমিটি-সদস্যকে আটক করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল এবং এতে প্রতিক্রিয়াশীলদের স্পর্ধা বাড়িয়ে দেয়। এটা ভুল কিনা তার বিচার করতে হলে, আপনাকে শুধু খেয়াল করতে হবে, যেখানেই কৃষক সমিতির সভাপতি কিংবা কমিটি-সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়েছে,

সেখানেই স্থানীয় উচ্ছৃংখল ভূস্বামীরা কি রকম আনন্দিত হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভাবপ্রবণতা কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে। 'ইতর লোকের আন্দোলন' আর 'অলস কৃষকদের আন্দোলন' বলে যে প্রতিবিপ্লবী কথাবার্তা চলছে, আমাদের অবশ্যই তার বিরোধিতা করতে হবে এবং গরীব কৃষকশ্রেণীর উপর আক্রমণ করার জন্যে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সাহায্য করার ভুল যাতে না করি, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। যদিও অল্প সংখ্যক গরীব কৃষক নেতার কার্যকলাপে নিঃসন্দেহে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তবু তাদের অনেকেই এখন শুধরে উঠেছে। তারা নিজেরাই উদ্যমশীলতার সঙ্গে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করেছে এবং দস্যুবৃত্তির দমন করছে। কৃষক সমিতি যেখানে শক্তিশালী, জুয়াখেলা সেখানে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে এবং দস্যুবৃত্তি অন্তর্হিত হয়েছে। একথা আক্ষরিকভাবে সত্য যে, কোন কোন স্থানে পথে জিনিস পড়ে থাকলেও কেউ তা তুলে নেয় না এবং রাত্রিকালে দরজায় খিল এঁটে দেয় না। হেংশানের তদন্ত অনুসারে, গরীব কৃষক নেতাদের শতকরা ৮৫ জনই প্রভূত উন্নতিসাধন করেছে এবং নিজেদেরকে কর্মদক্ষ ও কঠোর পরিশ্রমী বলে প্রমাণ করেছে। শতকরা মাত্র ১৫ জনের কিছু বদভ্যাস আছে। বড়জোর এদের 'অস্বাস্থ্যকর সংখ্যালঘু' বলতে পারা যায়। তাদের 'ইতর লোক' বলে নির্বিচারে নিন্দা করার ব্যাপারে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের কথার প্রতিধ্বনি আমরা অবশ্যই করব না। 'অস্বাস্থ্যকর সংখ্যালঘু'র সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র 'কৃষক সমিতির শৃংখলাকে দৃঢ়তর কর' এই শ্লোগানের মাধ্যমে, জনগণের মধ্যে প্রচার চালিয়ে, 'অস্বাস্থ্যকর সংখ্যালঘু'কে শিক্ষিত করে এবং সমিতির শৃংখলাকে দৃঢ়বদ্ধ করেই করা যেতে পারে। যে গ্রেপ্তারে গরীব কৃষকশ্রেণীর মর্যাদার ক্ষতি হয়, এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোক-দের ঔদ্ধত্য বাড়ে—এমন গ্রেপ্তারের জন্যে কোন অবস্থাতেই সৈন্যদের নির্বিচারে পাঠানো উচিত নয়। এই বিষয়টির প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

চোদ্দটি মহান কীর্তি

কৃষক সমিতির সমালোচকদের অনেকেই অভিযোগ করে যে, এই সমিতি-গুলো বহু খারাপ কাজ করেছে। আমি আগেই বলেছি, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের উপর কৃষকদের আক্রমণ পুরোপুরি এক বিপ্লবী কর্মধারা এবং

সেগুলি কোনভাবেই দূষনীয় নয়। তবু কৃষকরা অনেক কাজ সম্পন্ন করেছে এবং লোকজনের সমালোচনার জবাব দেবার জন্য তাদের যাবতীয় কার্যকলাপকে এক এক করে আমাদের অবশ্যই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে; দেখতে হবে তারা সত্যই কি করেছে। তাদের গত কয়েক মাসের কার্যকলাপকে আমি শ্রেণীবিন্যস্ত করেছি এবং সেগুলির সারসংকলন করেছি। কৃষক সমিতিগুলোর নেতৃত্বে কৃষকরা নিম্নলিখিত চোদ্দটি মহান কীর্তি সম্পন্ন করেছে।

১। কৃষক সমিতির মধ্যে কৃষকদের সংগঠিত করা

এটাই হল কৃষকদের প্রথম মহান কীর্তি। সিয়াংথান, সিয়াংসিয়াং, হেংশানের মতো জেলাতে প্রায় সব কৃষকই সংগঠিত হয়েছে এবং এমন একটা সুদূর কোণও নেই যেখানে তারা তৎপর নয়। এইসব জেলাগুলো প্রথম সারিতে পড়ে। দ্বিতীয় সারিতে পড়ে ঈইয়াং, হুয়ারোং-এর মতো অন্যান্য জেলাগুলো, যেখানে কৃষকদের অধিকাংশই সংগঠিত, অসংগঠিত রয়ে গেছে এক ক্ষুদ্রাংশই। কোন কোন জেলায় যেমন ছেংপু, লিংলিং-এ এক ক্ষুদ্রাংশ সংগঠিত হলেও বেশির ভাগ কৃষক এখনো অসংগঠিত; এই জেলাগুলো তৃতীয় সারিতে পড়ে। ইউয়ান জু-মিংয়র[১৪] শাসনাধীন পশ্চিম হুনানে কৃষক সমিতির প্রচার এখনো পৌঁছায়নি, এখানকার অনেক জেলায় কৃষকরা সম্পূর্ণভাবে অসংগঠিত, এগুলি পড়ে চতুর্থ সারিতে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ছাংশাকে কেন্দ্র করে মধ্য হুনানের জেলাগুলিই সবথেয়ে অগ্রসর, দক্ষিণ হুনানের জেলাগুলি পড়ে দ্বিতীয় স্তরে এবং পশ্চিম হুনানে কৃষকরা কেবল সবে সংগঠিত হতে শুরু করেছে। গত নভেম্বরে সংগৃহীত প্রাদেশিক কৃষক সমিতির হিসাব অনুযায়ী সারা প্রদেশটির ৭৫টি জেলার মধ্যে ৩৭টিতে কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির সদস্যসংখ্যা মোট ১,৩৬৭,৭২৭। এইসব সদস্যের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ সংগঠিত হয় গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যখন সমিতিগুলির শক্তি বৃদ্ধি পায়, অথচ সেপ্টেম্বর অবধি সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র তিন থেকে চার লাখ। তারপর এল ডিসেম্বর ও জানুয়ারী এই দু'টি মাস। এ সময়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে কৃষক-আন্দোলন। জানুয়ারীর শেষাবধি সমিতির সদস্যসংখ্যা কম করেও ২০ লক্ষে উঠেছিল। যেহেতু সমিতিতে যোগদান করার সময় প্রত্যেকটি পরিবার সাধারণভাবে মাত্র একজনের নাম লেখায় এবং পরিবারগুলির গড়পড়তা সদস্যসংখ্যা পাঁচ, সেই হিসেবে কৃষক সমিতির অনুগামী সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটি। সমিতি-

গুলির এই বিস্ময়কর ও দ্রুততর প্রসারের ফলেই সমস্ত স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোক এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আর পৃথিবী এমন সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে দেখে জনসাধারণ বিস্মিত হয়ে পড়েছে, এবং গ্রামাঞ্চলে এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে এটাই হল কৃষকদের প্রথম মহান কীর্তি।

২। রাজনৈতিকভাবে ভূস্বামীদেরকে আঘাত করা

কৃষকরা নিজেদের সংগঠন খাড়া করার পর, প্রথম যে কাজ করেছে তা হল ভূস্বামীশ্রেণীর, বিশেষ করে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক মর্যাদা চুরমার করা অর্থাৎ পল্লীসমাজে ভূস্বামীদের কর্তৃত্বকে উৎখাত করা এবং কৃষকদের কর্তৃত্ব গড়ে তোলা। এটা হচ্ছে চরম গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক সংগ্রাম। দ্বিতীয় পর্যায়কালে অর্থাৎ বিপ্লবী কার্যকলাপের পর্যায়ে এটাই হল সংগ্রামের কেন্দ্র। এই সংগ্রামে জয়লাভ করা না গেলে খাজনা ও সুদ কমানো, জমি ও অন্যান্য উৎপাদন-উপকরণগুলি করায়ত্ত করা ইত্যাদি অর্থনৈতিক সংগ্রামে কোনমতেই জয়লাভ করা সম্ভব নয়। হুনানের সিয়াংসিয়াং, হেংশান, সিয়াংথান জেলার মতো অনেকস্থানে অবশ্য একটা এটা সমস্যা নয়, কেননা এসব জায়গায় ভূস্বামীশ্রেণীর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং কৃষকদের কর্তৃত্বই সেখানে একমাত্র কর্তৃত্ব। কিন্তু লিলিং-এর মতো জেলায় এখনো এমন কিছু স্থান আছে (যেমন লিলিং-এর পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে), যেখানে আপাতদৃষ্টিতে কৃষকদের কর্তৃত্বের তুলনায় ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব দুর্বল বলে মনে হয়, কিন্তু এসব স্থানে রাজনৈতিক সংগ্রাম তীব্র হয়নি বলে বাস্তবে ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব গোপনে গোপনে কৃষকদের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করছে। এইসব স্থানে কৃষকরা রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেছে—এমন কথা বলার সময় এখনও আসেনি এবং ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব পুরোপুরি চুরমার না হওয়া অবধি আরও জোরের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রাম তাদের অবশ্যই চালাতে হবে। সবকিছু ধরলে কৃষকরা ভূস্বামীদেরকে রাজনৈতিকভাবে আঘাত করার ব্যাপারে যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তা নিম্নরূপ :

হিসাব পরীক্ষা করা। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের হাতে স্থানীয় যে সাধারণ সম্পত্তির টাকা-পয়সা আসতো তা তারা প্রায়ই নিজেদের সুবিধার জন্য খরচ করতে তৎপর হতো এবং হিসাবপত্রও ঠিকমতো রাখা হতো

না। বহু স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোককে উৎখাত করবার উপলক্ষ হিসেবে কৃষকরা এখন হিসাব পরীক্ষা করাটা কাজে লাগাচ্ছে। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আর্থিক হিসাবনিকাশ করার জন্য বহুস্থানে হিসাব পরীক্ষা কমিটি স্থাপন করা হয়েছে। আর এইরকম কোন কমিটি নজরে পড়লেই স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা শিউরে ওঠে। যেসব জেলায় কৃষক-আন্দোলন সক্রিয়, সেখানে এ ধরনের হিসাব পরীক্ষাটি খুব প্রচলিত। এগুলি টাকাকড়ি উদ্ধার করবার জন্য অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের অপরাধ জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা, এবং এইভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার আসন থেকে তাদের নীচে ফেলে দেওয়া।

জরিমানা ধার্য করা। কৃষকরা তাদের যেসব অপরাধের জন্য জরিমানা ধার্য করে সেগুলি হল: হিসাব পরীক্ষায় উদ্‌ঘাটিত অনিয়ম, কৃষকদের বিরুদ্ধে অতীব দৌরাত্ম্য, কৃষক সমিতির পক্ষে ক্ষতিকর বর্তমান কার্যকলাপ, জুয়ার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা না মানা ও আফিমের হুঁকা ত্যাগ করতে অস্বীকার করা। কৃষকরা জরিমানা ধার্য করে এইরকম: এই স্থানীয় উৎপীড়ককে অত টাকা দিতে হবে, অমুক অসৎ ভদ্রলোককে অত দিতে হবে, আর এই অর্থের পরিমাণ দশ থেকে হাজার হাজার ইউয়ান পর্যন্ত ধার্য করা হয়। স্বভাবতঃই কৃষকরা যে ব্যক্তির উপর জরিমানা ধার্য করেছে, সে একেবারেই মুখ দেখাতে পারে না।

চাঁদা আরোপ। দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য, সমবায় কিংবা কৃষক ঋণ-দান সমিতি গঠনের জন্য বা অন্যান্য চাহিদার জন্য বিবেকবর্জিত ধনী ভূস্বামী-দেরকে চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয়। চাঁদা আরোপও একরকমের শাস্তি, তবে এই শাস্তি জরিমানার তুলনায় অপেক্ষাকৃত নরম প্রকৃতির। দুর্ভোগ এড়ানোর জন্য ভূস্বামীদের অনেকে স্বেচ্ছায় কৃষক সমিতিগুলিতে চাঁদা দেয়।

ছোটখাট প্রতিবাদ। কথায় বা কাজে যখন কেউ কৃষক সমিতির ক্ষতি করে এবং এই অপরাধ হয় ছোটখাট ধরনের, তখন কৃষকেরা দল বেঁধে দুষ্কৃত-কারীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় এবং তার কাছে বিধিমতো প্রতিবাদ জানিয়ে আসে। ফলে, সাধারণতঃ সেই ব্যক্তির কাছ থেকে 'এ কাজ আর করব না' জাতীয় এক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে সে ভবিষ্যতে কাজে বা কথায় কৃষক সমিতির মর্যাদার ক্ষতি না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন। কৃষক সমিতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য বিরাট জনতার সমাবেশ হয়। তারা অপরাধীর বাড়ীতে গিয়ে তার শূকর জবাই করে আর শস্যাদি নিয়ে খানা বানিয়ে খায়। এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল। সিয়াংথান জেলায় মাচিয়াহোতে সম্প্রতি এইরকম ঘটনা ঘটেছে। সেখানে পনেরো হাজার কৃষকদের একটি দল ছয় জন অসৎ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। চারদিন ধরে এ বিক্ষোভ প্রদর্শন চলে, আর এই চারদিনে ১৩০টিরও বেশি শূকর জবাই করে খাওয়া হয়। এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর কৃষকরা সাধারণতঃ জরিমানা ধার্য করে।

'লম্বা গাধার টুপি পরিয়ে' গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো। এ ধরনের ঘটনা খুবই সাধারণ। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের মাথায় একটা লম্বা কাগজের টুপি বসিয়ে দেওয়া হয়, তাতে লেখা থাকে—'অমুক স্থানীয় উৎপীড়ক' বা 'অমুক অসৎ ভদ্রলোক'। তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নেওয়া হয় আর সামনে ও পিছনে বিরাট জনতার মিছিল চলে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কখনো কখনো পিতলের ঘণ্টা বাজানো হয় ও নিশান দোলানো হয়। অন্য সবরকম শাস্তির চেয়ে এই ধরনের শাস্তিতে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা বেশি করে ভয়ে কাঁপে। একবার যার মাথায় গাধার টুপি পরানো হয়, তার আর মুখ দেখানোর উপায় থাকে না এবং আর কখনো সে মাথা তুলে চলতে পারে না। সেইজন্য ধনীদের অনেকেই লম্বা টুপি পরার চেয়ে জরিমানা দেওয়াটাকে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু কৃষকরা জেদ ধরলে তাদের এটা পরতেই হয়। উদ্ভাবনে পটু এমন এক থানার কৃষক সমিতি একজন অসৎ ভদ্রলোককে ধরে ঘোষণা করল যে সেইদিন তার মাথায় লম্বা গাধার টুপি পরানো হবে। অসৎ ভদ্রলোকটি ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু পরে কৃষক সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাকে সেইদিন গাধার টুপি পরানো হবে না। তারা এই যুক্তি দেখালো যে, লোকটিকে যদি সেইদিনই টুপি পরানো হয় তাহলে সে তার স্বভাবে কঠিন হয়ে উঠবে এবং তার ভয় ভেঙে যাবে, তাই তাকে বাড়ী ফিরে যেতে দিয়ে আর একদিন গাধার টুপি পরালেই বেশি ভাল হবে। কখন টুপি পরানো হবে সেটা জানতে না পেরে এই অসৎ ভদ্রলোক প্রতিদিন এক উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতে লাগল, সে আর স্বস্তির সঙ্গে বসে থাকতে বা ঘুমুতে পারত না।

জমিদারদের জেলার জেলে তালাবদ্ধ করা। লম্বা গাধার টুপি পরানোর চেয়ে এটা আরও গুরুতর শাস্তি। কোন স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জেলার জেলে তাকে প্রেরণ করা হয়। তাকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় এবং তাকে বিচার করে শাস্তি দেওয়ার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে বাধ্য করা হয়। বর্তমানে যাদের জেলে তালাবন্ধ করে রাখা হয়, তারা আর আগের লোক নয়। আগে অসৎ ভদ্রলোকেরা কৃষকদের তালাবদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করতো আর এখন করা হচ্ছে ঠিক তার উল্টো।

নির্বাসন। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধে অপরাধী তাদেরকে নির্বাসন দেওয়ার কোন ইচ্ছা কৃষকদের নেই; তারা বরং সেসব ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে বা হত্যা করতে চায়। এইসব ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হওয়া কিম্বা নিহত হবার ভয়ে পালিয়ে যায়। যেসব জেলায় কৃষক-আন্দোলন বেশ ভালভাবে গড়ে উঠেছে সেসব স্থান থেকে প্রায় সকল প্রধান স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা পালিয়ে গেছে—এর অর্থ নির্বাসনই দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়রা শাংহাইয়ে পালিয়ে গেছে, দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা গেছে হানখোয়ে, তৃতীয় স্তরেরা গেছে ছাংশায় এবং চতুর্থ স্তরের লোকেরা গেছে জেলা শহরগুলোতে। পলাতক স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের মধ্যে যারা শাংহাইয়ে পালিয়েছে, তারাই সবচেয়ে নিরাপদে আছে। হানখোয়ে যারা পালিয়েছে তাদের কাউকে কাউকে, যেমন হুয়ারোং-এর তিনজন অসৎ ভদ্রলোককে শেষ পর্যন্ত ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। যারা ছাংশাতে পালিয়েছিল তারা তাদেরই জেলা থেকে আগত প্রাদেশিক রাজধানীতে অধ্যয়নরত ছাত্র কর্তৃক যে-কোন সময় ধরা পড়ার বিপদের মধ্যে আছে। আমি নিজে ছাংশাতে দুইজনকে গ্রেপ্তার হতে দেখেছিলাম। জেলার শহরসমূহে যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা কেবল চতুর্থ স্তরের লোক এবং বহু চোখ ও কান সমন্বিত কৃষকরা সহজেই তাদের খুঁজে বের করতে পারে। কৃষকরা অবস্থাপন্নদের নির্বাসন দিয়েছে—এই অবস্থার উল্লেখ করে হুনানের প্রাদেশিক সরকারের অর্থদপ্তরের কর্মকর্তারা টাকা ওঠানোর ব্যাপারে তারা যে অসুবিধায় পড়ছে তা ব্যাখ্যা করে। এ থেকে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, কতখানি ব্যাপকভাবে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের তাদের নিজস্ব গ্রাম্য বাসভূমি থেকে উৎখাত করা হতো।

মৃত্যুদণ্ড। এর প্রয়োগ কেবল খুব বড় স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্র-

লোকদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। আর জনসাধারণের অপরাপর অংশের সঙ্গে মিলে কৃষকরা এই শাস্তি কার্যকরী করে। যেমন, নিং'সিয়াংয়ের ইয়াং চি-জে. ইয়ুয়েইয়াংয়ের চৌ চিয়া-কান, হুয়ারোংয়ের ফু তাও-নান ও সুন পো-চুকে সরকারী কর্তৃপক্ষ গুলি করে হত্যা করেছে কৃষক ও জনসাধারণের অন্যান্য অংশের চাপে। আর সিয়াংথাংয়ে, কৃষক ও জনসাধারণের অপরাপর অংশের লোকেরা জেলে তালাবদ্ধ ইয়ান রোং-ছিউকে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে ম্যাজিস্ট্রেটকে বাধ্য করেছে এবং কৃষকরা নিজেরাই তাকে হত্যা করেছে। কৃষকদের হাতেই নিহত হয়েছিল নিংসিয়ংয়ের লিউ চাও। লিলিংয়ের পেং চি-ফান এবং ঈইয়াংয়ের চৌ থিয়ান-চ্যুয়ে ও ছাও ইয়ূন-এর হত্যা করার ব্যাপারটা 'স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালত'-এর রায় সাপেক্ষে আটকে আছে। এ রকম একজন বড় স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকের হত্যাকাণ্ড সমগ্র জেলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে এবং সামন্ততন্ত্রের দুষ্ট অবশেষসমূহকে মুছে ফেলবার ব্যাপারে এই পদক্ষেপ খুবই কার্যকরী। প্রত্যেকটি জেলায় এইরকম বড় বড় স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের অস্তিত্ব আছে। কোন জেলায় আছে কয়েক ডজন, আবার কোন জেলায় অন্ততঃ কয়েকজন। আর প্রত্যেকটি জেলায়ই অন্ততঃপক্ষে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী কয়েকজনকে হত্যা করাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করার কার্যকরী পদ্ধতি। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা যখন ক্ষমতার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ছিল তখন তারা আক্ষরিক অর্থে কৃষকদের কোতল করত, আর তাতে তাদের চোখের পাতাও কাঁপত না। হো মাই-ছ্যুয়ান দশ বছর ধরে ছিল ছাংশা জেলার সিনথাং টাউনের প্রতিরক্ষাবাহিনীর কর্তা। প্রায় এক হাজার দারিদ্র্য প্রপীড়িত কৃষককে হত্যা করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সে দায়ী। এই কাজকে বাগাড়ম্বর করে সে বর্ণনা করত 'ডাকাত নিধন' বলে। আমার নিজের দেশ সিয়াং-থান জেলার ইনথিয়ান টাউনের প্রতিরক্ষাবাহিনার থাং চ্যুন-ইয়ান আর লুও শু-লিন এই দুজন ১৯১৩ সাল থেকে গত ১৪ বছরে পঞ্চাশজনেরও বেশি লোককে খুন করেছে, আর জ্যান্ত কবর দিয়েছে চারজনকে। যে পঞ্চাশ-জনেরও বেশি লোককে তারা হত্যা করে, তাদের প্রথম দু'জন ছিল একেবারেই নির্দোষ ভিক্ষুক। থাং চ্যুন-ইয়ান বলেছিল: 'এক জোড়া ভিখারী হত্যা করে শুরু করা যাক!' আর এইভাবে দু'টো জীবনকে খতম করে দেওয়া হয়।

আগেকার দিনে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের নিষ্ঠুরতা ছিল এই রকমের। তারা গ্রামাঞ্চলে যে শ্বেত সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তা ছিল এই রকমের। আর আজ যখন কৃষকেরা বিদ্রোহ করে জনকয়েককে মাত্র গুলি করে মেরেছে এবং প্রতিবিপ্লবীদের দমন করবার জন্য খানিকটা মাত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, তখন একথা বলার কি কোন যুক্তি আছে যে, এমন করা উচিত নয়?

৩। ভূস্বামীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে আঘাত করা

এলাকার বাইরে শস্য পাঠানো, শস্যের দাম জোর করে চড়ানো এবং মজুতদারী ও ফাটকাবাজারীর উপর নিষেধাজ্ঞা। হুনানের কৃষকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে সাম্প্রতিক মাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এটি একটি বিরাট ব্যাপার। গত অক্টোবর মাস থেকে গরীব কৃষকরা ভূস্বামী ও ধনী কৃষকদের শস্য বাইরে যাওয়া প্রতিরোধ করেছে এবং নিষিদ্ধ করে দিয়েছে জোর করে শস্যের দাম চড়ানো ও মজুতদারী ও ফাটকাবাজারী। ফলে, গরীব কৃষকরা তাদের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে সফল করতে পেরেছে। শস্যের বাইরে চালানের উপর এই নিষেধাজ্ঞাটি একেবারেই অলংঘনীয়। শস্যের দাম বেশ পড়ে গেছে আর মজুতদারী ও ফাটকাবাজারী লোপ পেয়েছে।

খাজনা ও জামানত বৃদ্ধির উপর নিষেধাজ্ঞা[১৫] এবং খাজনা ও জামানত কমানোর জন্য প্রচার। গত জুলাই-আগস্ট মাসে কৃষক সমিতিগুলি যখন দুর্বল ছিল, তখন চরমতম শোষণের দীর্ঘপ্রতিষ্ঠ প্রথা অনুসরণ করে ভূস্বামীরা একের পর এক প্রজাদের উপর খাজনা আর জামানত বৃদ্ধি করে নোটিশ জারী করত। কিন্তু, অক্টোবর মাসে যখন কৃষক সমিতিগুলো বেশ শক্তি অর্জন করল এবং যখন সেগুলি একযোগে খাজনা ও জামানত বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়াল তখন এ সম্পর্কে আর একটুও উচ্চবাচ্য করতে ভূস্বামীরা সাহস করেনি। নভেম্বর মাস থেকে পরবর্তীকালে কৃষকরা ভূস্বামীদের ওপরে যখন প্রাধান্য পেতে লাগল, খাজনা ও জামানত হ্রাসের জন্য প্রচার করার ব্যাপারে তারা তখন আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করল। কৃষকরা বলে, এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যে গত শরৎকালে খাজনা আদায়কালে কৃষক সমিতিগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, নাহলে গত শরৎকালেই আমরা খাজনা কমাতে পারতাম। আগামী শরৎকালে যাতে খাজনা হ্রাস হয় তার জন্য কৃষকরা এখন ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে, আর ভূস্বামীরাও জানতে চায় কেমন করে তা কমানো যাবে।

জামানত কমানোর ব্যাপারে হেংশান এবং অন্যান্য জেলায় ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রজাস্বত্ব বাতিল করার ওপর নিষেধাজ্ঞা। গত জুলাই ও আগস্ট মাসে ভূস্বামী কর্তৃক প্রজাস্বত্ব বাতিল ও জমি খারিজ দাখিল করার অনেক ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু অক্টোবরের পরে প্রজাস্বত্ব বাতিল করতে কেউই সাহস করেনি। আজ প্রজাস্বত্ব বাতিল করা বা জমি খারিজ দাখিল করার কথাই ওঠে না। যে সমস্যাটা এখনো দেখা দেয় তা হল ভূস্বামী নিজে যদি জমি চাষ করতে চায়, তাহলে প্রজাস্বত্ব বাতিল করা যাবে কিনা। কোন কোন জায়গায় কৃষকরা এমনকি এটাও ঘটতে দেয় না। আবার কোন কোন স্থানে ভূস্বামী নিজে যদি জমি চাষ করতে চায় তাহলে প্রজাস্বত্ব বাতিল করা যেতে পারে, কিন্তু তখন আবার প্রজা-কৃষকদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার সমাধান করতে একই রকম কোন পদ্ধতি এখনো স্থিরীকৃত হয়নি।

সুদ কমানো। আনহুয়াতে সাধারণভাবে সুদ কমানো হয়েছে। অন্যান্য জেলা থেকেও সুদ কমানোর খবর এসেছে। কিন্তু যেখানেই কৃষক সমিতিগুলি খুব শক্তিশালী, সেখানেই গ্রাম্য মহাজনী প্রকৃতপ্রস্তাবে লোপ পেয়েছে, কারণ তাদের অর্থ 'সাধারণের সম্পত্তিতে' পরিণত করা হবে এই ভয়ে ভূস্বামীরা ঋণদান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমানে যাকে বলা হয় সুদ কমানো, তা কেবল পুরানো ঋণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওইসব পুরানো ঋণের সুদই যে কেবল কমানো হয় তা নয়, উপরন্তু ঋণদাতাকে আসলটা আদায় করার ব্যাপারে চাপ দিতে প্রকৃতপক্ষে নিষেধ করা হয়। গরীব কৃষকরা বলে, 'আমাকে দোষ দিও না। বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি আগামী বছরে তোমার টাকা শোধ করে দেব।'

৪। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সামন্ততান্ত্রিক শাসন উচ্ছেদ করা—তু এবং তুয়ান[১৩] ধ্বংস করা

পুরানো তু (মহকুমা) এবং তুয়ানের (থানা) রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠন, বিশেষ করে 'তু' পর্যায়ের, অর্থাৎ জেলা পর্যায়ের ঠিক নিচের ধাপে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের হাতে। 'তু'র ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল দশ থেকে পঞ্চাশ বা ষাট হাজার লোকের

উপর ; তার নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ছিল—যেমন থানারক্ষী বাহিনী ; তার নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা ছিল—যেমন প্রতি মু জমির উপর কর[১৭] ধার্য করার ক্ষমতা, ইত্যাদি ; এবং তার নিজস্ব বিচার ক্ষমতাও ছিল—যেমন ইচ্ছামতো কৃষকদের গ্রেপ্তার করা, জেলে দেওয়া, বিচার করা এবং শাস্তি দান করার ক্ষমতা। যেসব অসৎ ভদ্রলোক এমন ক্ষমতাযন্ত্র পরিচালনা করত তারা প্রকৃত-পক্ষে ছিল গ্রামাঞ্চলের সম্রাট। তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, প্রাদেশিক সামরিক গভর্নর[১৮] কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়ে কৃষকরা অত মাথা ঘামাত না ; তাদের প্রকৃত 'মনিব' ছিল এইসব গ্রাম্য সম্রাটরা। এই ধরনের মনিব শুধু হুম্ শব্দ করলেই কৃষকরা বুঝত যে তাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহের ফলে ভূস্বামীশ্রেণীর কর্তৃত্ব সাধারণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, আর স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা স্বভাবতঃই ভেঙে পড়েছে। 'তু' ও 'তুয়ানের' প্রধানরা সকলেই জনসাধারণকে এড়িয়ে চলে এবং নিজেদের মুখ দেখাতে তারা সাহস করে না ; আর স্থানীয় সব ব্যাপার সমাধানের জন্য তারা কৃষক সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেয়। লোকজনকে তারা দূরে রাখে এই বলে, 'এটা আমার কাজ নয় !'

কৃষকদের আলাপ-আলোচনায় 'তু' এবং 'তুয়ানের' প্রধানদের কথা উঠলে তারা ক্রুদ্ধভাবে বলে, 'সেই বদমায়েসদের দল ! তারা শেষ হয়ে গেছে !'

তা বটে। যেখানেই বিপ্লবের ঝড় বয়েছে, সেখানেই গ্রাম্য শাসনব্যবস্থার পুরানো যন্ত্রগুলি সম্পর্কে 'শেষ হয়ে গেছে' কথাটা যথার্থ অবস্থা প্রকাশ করে।

৫। ভূস্বামীদের সশস্ত্র শক্তির উচ্ছেদ এবং কৃষকদের সশস্ত্র শক্তির প্রতিষ্ঠা

হুনান প্রদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের তুলনায় মধ্যাংশের ভূস্বামীদের সশস্ত্র শক্তির পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। প্রত্যেকটি জেলায় যদি গড়ে ৬০০টি রাইফেল ধরা যায়, তাহলে ৭৫টি জেলায় সর্বমোট রাইফেল সংখ্যা হবে ৪৫,০০০টি। বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। দক্ষিণ ও মধ্যাংশে যেখানে কৃষক-আন্দোলন বেশ ভালভাবে গড়ে উঠেছে, সেখানে কৃষকরা যে প্রচণ্ড গতিতে জেগে উঠেছে, তার ফলে ভূস্বামীশ্রেণী নিজের শক্তি টিঁকিয়ে

রাখতে পারেনি। তাদের সশস্ত্র শক্তিগুলি ব্যাপকহারে কৃষক সমিতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং কৃষকদের পক্ষে চলে গিয়েছে। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নিংসিয়াং, পিংচিয়াং, লিউইয়াং, ছাংশা, লিলিং, সিয়াংথান, সিয়াং-সিয়াং, আনহুয়া, হেংশান, হেংইয়াং প্রমুখ জেলায়। পাওছিংয়ের মতো কোন কোন জেলায় ভূস্বামীদের সশস্ত্র বাহিনীর অল্প অংশ একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু তাদের প্রবণতা হল আত্মসমর্পণের দিকে। আর একটা ক্ষুদ্রাংশ কৃষক সমিতিগুলির বিরোধিতা করছে, যেমন, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ইচাং, লিনউ এবং চিয়াহো প্রমুখ জেলার কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু কৃষকরা তাদের আক্রমণ করছে এবং অল্পকালের মধ্যে তাদের উচ্ছেদ করে ফেলবে। প্রতিক্রিয়াশীল ভূস্বামীদের কাছ থেকে এইভাবে যেসব সশস্ত্র শক্তি পাওয়া গিয়েছে, তাদের সবাইকে 'স্থায়ী পারিবারিক মিলিশিয়ায়'[১৯] পুনর্গঠিত করা হচ্ছে এবং তাদেরকে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসিত সরকারের নতুন ব্যবস্থার অধীনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে—যে সরকার কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারক। এইসব পুরানো সশস্ত্র শক্তিকে নিজেদের দলে আনা হল একটা উপায়, যার দ্বারা কৃষকরা তাদের নিজেদের সশস্ত্র শক্তি গড়ে তুলছে। আর একটা নতুন পদ্ধতি হল কৃষক সমিতির বর্শাবাহিনী গড়ে তোলা। বর্শাগুলিতে আছে হুল বসানো দু'দিকে কাটে এমন পাত, যা লম্বা লাঠির মাথায় বসানো থাকে। কেবল সিয়াংসিয়াং জেলায় এই অস্ত্রের সংখ্যা হল এক লাখ। অন্যান্য জেলায়, যথা সিয়াংথান, হেংশান, লিলিং এবং ছাংশার প্রত্যেকটিতে আছে ৭০,০০০-৮০,০০০, বা ৫০,০০০-৬০,০০০ কিম্বা ৩০,০০০-৪০,০০০টি করে। যেসব জেলায় কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার প্রত্যেকটিতে বর্শাবাহিনী দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে অস্ত্রসজ্জিত কৃষকরা গঠন করে 'অস্থায়ী পারিবারিক মিলিশিয়া'। বর্শাসজ্জিত এই বিরাট বাহিনী উপরে উল্লিখিত পুরানো সশস্ত্র বাহিনী থেকে আরও বড়। এই বাহিনী একটা নবজাত সশস্ত্র শক্তি, যাকে দেখামাত্র স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা ভয়ে কাঁপতে থাকে। হুনানের বিপ্লবী কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া উচিত যে, প্রদেশের ৭৫টি জেলার দু'কোটির বেশি কৃষকের মধ্যে যেন এই সশস্ত্র শক্তি সত্যই ব্যাপকভাবে গঠন করা হয়; যেন তরুণ বা পরিণত বয়স্ক প্রত্যেকটি কৃষকের একটা করে বর্শা থাকে, বর্শা একটি মারাত্মক অস্ত্র এমন মনে করে এর উপর যেন কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা না হয়।

বর্শা দেখলেই যার বুক কাঁপে সে সত্যই ভীরু! কেবল স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা তার ভয়ে ভীত, কিন্তু কোন বিপ্লবীর এতে ভয় পাওয়া উচিত নয়।

৬। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও তার সাকরেদদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্ছেদ

কৃষকরা জেগে না উঠলে জেলার সরকার যে পরিচ্ছন্ন হতে পারে না তা কুয়াংতোং প্রদেশের হাইফেংয়ে কিছুকাল আগে প্রমাণিত হয়েছিল। এখন আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি বিশেষ করে হুনানে। যে জেলায় ক্ষমতা স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের করায়ত্ত, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় সবাই দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী হবেই, তা সে যেই হোক না কেন। যে জেলায় কৃষকরা জেগে উঠেছে সেখানকার সরকার দুর্নীতিমুক্ত, তার ম্যাজিস্ট্রেট যেই হোক না কেন। আমি যে জেলাগুলো পরিদর্শন করেছি, সেসব জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেটকে সকল ব্যাপারে কৃষক সমিতির সঙ্গে আগে আলোচনা করতে হয়। যেসব জেলায় কৃষকদের ক্ষমতা খুব শক্তিশালী, সেসব স্থানে কৃষক সমিতির কথা 'বিস্ময়করভাবে ফলপ্রসূ' হয়েছে। সমিতি যদি স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকদের কাউকে সকালে গ্রেপ্তার করতে দাবি জানায় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট দুপুর পর্যন্ত দেরী করতে সাহস করে না। সমিতি যদি গ্রেপ্তারের দাবি জানায় দুপুরবেলা, তাহলে সে বিকেল পর্যন্ত দেরী করতে সাহস করে না। গ্রামে কৃষকদের শক্তি যখন কেবল মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছিল, ম্যাজিস্ট্রেট তখন স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কৃষকদের বিরোধিতা করেছিল। কৃষকদের শক্তি বাড়তে বাড়তে যখন জমিদারের শক্তির সমকক্ষ হল, ম্যাজিস্ট্রেটরা তখন দু-মুখো আচরণ করার চেষ্টা করত। এটা করতে গিয়ে সে কৃষক সমিতির কোন কোন প্রস্তাব গ্রহণ করত, আবার কতকগুলো বর্জন করত। কৃষক সমিতির কথা 'বিস্ময়করভাবে ফলপ্রসূ' হয়—এই মন্তব্য কেবল সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কৃষকদের শক্তি ভূস্বামীর শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে দিয়েছে। বর্তমানে সিয়াংসিয়াং, সিয়াংথান, লিলিং, হেংশান প্রমুখ জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই রকম :

(১) ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিপ্লবী গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে

গঠিত যুক্ত পরিষদ কর্তৃক সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিষদ আহ্বান করে ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং তার অফিসে এই সভা বসে। কোন কোন জেলায় একে বলা হয় 'জনসাধারণের সংস্থা ও স্থানীয় সরকারের যুক্ত পরিষদ'। আবার কোথাও একে বলা হয় 'জেলা সংক্রান্ত বিষয়ের পরিষদ'। এইসব সভায় উপস্থিতদের মধ্যে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়াও থাকেন জেলা কৃষক সমিতি, জেলার ট্রেড ইউনিয়ন সমিতি, বণিক সমিতি, নারী সমিতি, স্কুল কর্মচারী সমিতি, ছাত্র সমিতি এবং কুওমিনতাঙের জেলার সদর দপ্তরের[20] প্রতিনিধিরা। এইসব পরিষদে ম্যাজিষ্ট্রেট গণ-সংস্থাসমূহের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অনিবার্যভাবেই তাদের হুকুমে ওঠে-বসে। সেইজন্য হুনানের জেলা সরকারের ঐরূপ গণতান্ত্রিক কমিটির পদ্ধতি অবলম্বন করার ব্যাপারে বড় একটা সমস্যার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। বর্তমানে জেলা সরকারগুলি রূপে ও মর্মে, উভয় ক্ষেত্রেই বেশ গণতান্ত্রিক। গত দুই কি তিন মাসেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র মফস্বল অঞ্চলে কৃষকরা জেগে উঠবার পর এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের ক্ষমতা উচ্ছেদ করবার পর এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেটরা তাদের পুরানো অবলম্বন ধ্বসে পড়তে দেখে তাদের চাকরী রক্ষার খাতিরে অন্য অবলম্বনের তাগিদে জনসাধারণের সংস্থাসমূহের অনুগ্রহ লাভের জন্য তোষামোদ শুরু করেছে। তাই উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

(২) বিচার বিষয়ক সহকারীদের হাতে পরিচালনা করবার মতো মামলাদি বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। হুনানের বিচার প্রণালী হল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট একসাথে বিচার সম্পর্কিত বিষয়ের দায়িত্বেও অধিষ্ঠিত। আর বিচার পরিচালনার জন্য একজন সহকারী তাকে সাহায্য করে। ধনী হবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা পুরোপুরি নির্ভর করত ট্যাক্স ও খাজনা আদায়ের ওপর, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সৈন্য ও রসদ জোগাড় করার ওপর এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় ন্যায়-অন্যায়ের ধার না ধেরে জোর করে অর্থ আদায় করার ওপর। এই শেষের পদ্ধতিটি ছিল আয়ের সবচেয়ে নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য উপায়। গত কয়েক মাসে, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের পতনের ফলে সব আইন-ব্যবসায়ী ধাপ্পাবাজরা অদৃশ্য হয়েছে। কৃষকদের ছোট-বড় সবরকম সমস্যা এখন বিভিন্ন স্তরের কৃষক সমিতিগুলি মীমাংসা করে। তাই জেলার বিচারের সহকারীদের একেবারেই আর কিছু

করার নেই। সিয়াংসিয়াংয়ের ওইরকম একজন লোক আমাকে বলেছিল: 'যখন কৃষক সমিতি ছিল না, তখন প্রতিদিন গড়ে ষাটটি করে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা জেলা সরকারের কাছে পেশ করা হতো, আর এখন পেশ করা হয় গড়ে প্রতিদিন মাত্র চারটি কি পাঁচটি মামলা।' এইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পকেট ঘটনা-পরম্পরায় বাধ্য হয়ে খালি থাকে।

(৩) **সশস্ত্র রক্ষীদল, পুলিশ এবং সাকরেদরা এখন আশেপাশে ভেড়ে না এবং জোর করে অর্থ আদায় করতে তারা গ্রামে যেতে সাহস করে না।** অতীতে গ্রামের অধিবাসীরা শহুরে লোকদের ভয় করত কিন্তু এখন শহুরে লোকেরাই গ্রামের অধিবাসীদের ভয়ে ভীত। বিশেষ করে পুলিশ, সশস্ত্র রক্ষীদল এবং সাকরেদরা—জেলা সরকারের পোষ্য এইসব পাজি কুকুররা এখন গ্রামে যেতে ভয় করে। যদি তারা যায়ও, তবু তারা আগেকার মতো জোর করে অর্থ আদায় করতে সাহস করে না। কৃষকদের বর্শা নজরে পড়লেই তারা কাঁপতে থাকে।

৭। কৌলিক মন্দির ও কুলবৃদ্ধদের গোষ্ঠীগত আধিপত্য, শহর ও গ্রামের দেবদেবীর ধর্মীয় আধিপত্য এবং স্বামীদের পুরুষসুলভ আধিপত্যের উচ্ছেদ

চীনের পুরুষেরা সাধারণতঃ তিন ধরনের আধিপত্যের ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত; সেগুলি হল: (১) রাষ্ট্রব্যবস্থা (রাজনৈতিক কর্তৃত্ব)—এর বিস্তৃতি জাতীয়, প্রাদেশিক এবং জেলা সরকার থেকে থানা সরকার পর্যন্ত; (২) কুলব্যবস্থা (গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব)—এর বিস্তৃতি পূর্বপুরুষদের কেন্দ্রীয় মন্দির এবং তার শাখামন্দির থেকে পরিবারের প্রধান পর্যন্ত; এবং (৩) অতি-প্রাকৃত ব্যবস্থা (ধর্মীয় কর্তৃত্ব)—এর বিস্তৃতি নরকাধিপতি থেকে পাতাললোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নগর ও পল্লীর দেবদেবী পর্যন্ত, এবং স্বর্গাধিপতি থেকে স্বর্গলোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের দেবদেবী ও ভূতপ্রেতাত্মা পর্যন্ত। নারীদের পক্ষে উপরোক্ত তিন ধরনের আধিপত্যের দ্বারা শাসিত হওয়া ছাড়াও, তারা পুরুষদের দ্বারা শাসিত (স্বামীর কর্তৃত্বের দ্বারা)। এই চারটি কর্তৃত্ব—রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও স্বামীর কর্তৃত্ব—সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে। আর এগুলোই হচ্ছে চারটা মস্ত মোটা দড়ি যা চীনা জনগণকে, বিশেষ করে

কৃষকদের, বেঁধে রেখেছে। গ্রামাঞ্চলে কেমন করে কৃষকেরা ভূস্বামীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করেছে তা উপরে বলা হয়েছে। ভূস্বামীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হচ্ছে সমস্ত কর্তৃত্বের মেরুদণ্ড। ভূস্বামীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উচ্ছেদ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধর্মীয় ও স্বামীর কর্তৃত্ব সবই টলায়মান হয়ে পড়ে। কৃষক সমিতি যেখানে শক্তিশালী সেখানে কুলবৃদ্ধরা এবং মন্দিরের তহবিলের তত্ত্বাবধায়করা আর কুলবদ্ধ সমাজের নীচের তলার লোকজনদের উৎপীড়ন করতে কিংবা মন্দিরের তহবিল তছরুপ করতে সাহস করে না। কুলবৃদ্ধ ও তহবিলের তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে যারা সবচেয়ে খারাপ, তাদের স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের মতোই উৎখাত করা হয়েছে। বেত্রাঘাত, ডুবিয়ে মারা এবং জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো যেসব নিষ্ঠুর দৈহিক ও প্রাণঘাতী শাস্তি কৌলিক মন্দিরে প্রচলিত ছিল, এখন তা করতে কেউ সাহস করে না। কৌলিক মন্দিরসমূহের ভোজোৎসবে নারী ও গরীব লোকদেরকে যোগদান নিষিদ্ধ করে যে পুরানো আইন প্রচলিত ছিল তাও ভেঙে গিয়েছে। হেংশান জেলার পাইকুও-এর মহিলারা একত্র জড়ো হয়ে মন্দিরে ভীড় করে ঢুকে পড়ে, কোনরকমে লজ্জা না করে আসনে বসে পড়ে, এবং খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে অংশ নেয়। সে সমস্ত সম্ভ্রান্ত কুল মাতব্বরদের আর কোন উপায় থাকে না, তারা বাধ্য হয়ে মহিলাদের যা খুশী করতে দেয়। অন্য এক জায়গায়, যেখানে মন্দিরের ভোজোৎসবে গরীব কৃষকদের বাদ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কিছু সংখ্যক গরীব কৃষক দলবেঁধে ঢুকে পড়ে এবং পূর্ণতৃপ্তিতে খায় ও পান করে। সে সময় স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা—লম্বা জোব্বা পরিহিত ভদ্রলোকেরা সবাই ভয়ে দৌড় মারে। সর্বত্র যেখানেই কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সেখানেই ধর্মীয় কর্তৃত্ব টলে উঠেছে। অনেক জায়গায় কৃষক সমিতি দেবদেবীর মন্দিরকে তাদের অফিসের কাজের জন্য দখল করে নিয়েছে। সর্বত্র তারা কৃষকদের স্কুল খুলবার কাজে বা সমিতির খরচ নির্বাহের জন্য মন্দিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে বলে। এটাকে তারা বলে 'কুসংস্কার থেকে সাধারণের আয়'। লিলিং জেলায় কুসংস্কারমূলক কর্মকলাপ নিষিদ্ধ করা এবং মূর্তি ধ্বংস করার ধুম লেগেছে। এই জেলার উত্তরাঞ্চলীয় মহকুমাগুলোতে কৃষকরা মহামারীর দেবতাকে শান্ত করার জন্য প্রজ্বলিত ধূপ-মোমবাতি নিয়ে শোভাযাত্রা করতে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। লুখৌ-এর ফুপোলিংস্থিত তাও-মন্দিরে অনেক মূর্তি ছিল, কিন্তু

কুওমিনতাঙের আঞ্চলিক সদর দপ্তরের জন্য যখন আরও ঘরের দরকার পড়ল, তখন ছোট-বড় সব মূর্তিগুলোকে একসাথে কোণে গাদা করে রাখা হল। কৃষকেরা এতে কোন আপত্তি তোলেনি। তারপর থেকে কোন পরিবারে কারো মৃত্যু হলে দেবদেবীর প্রতি উৎসর্গ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং পবিত্র বাতি প্রদান করার ঘটনা খুবই কম ঘটেছে। কৃষক সমিতির সভাপতি সুন সিয়াও-শান এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বলে স্থানীয় তাওবাদী পুরোহিতরা তাঁকে খুব ঘৃণা করে। উত্তরের তৃতীয় মহকুমায় লোংফেং নানের কৃষকরা এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা কাঠের মূর্তিগুলোকে কেটে সেই কাঠ দিয়ে মাংস রাঁধে। দক্ষিণের অঞ্চলে অবস্থিত তোংফু মন্দিরের তিরিশটিরও বেশি মূর্তিকে ছাত্র ও কৃষকরা মিলে পুড়িয়ে ফেলে। মহামান্য পাও[২১]-এর দুটি মাত্র ছোট মূর্তি একজন বৃদ্ধ কৃষক ছিনিয়ে নিয়ে রক্ষা করে এবং বলে, 'পাপ করো না!' যেসব স্থানে কৃষকদের ক্ষমতা প্রাধান্য লাভ করেছে সেখানে বৃদ্ধ কৃষক এবং স্ত্রীলোকরাই শুধু দেবদেবীতে বিশ্বাস করে, যুবক ও মধ্যবয়স্ক কৃষকরা এখন আর ওসবে বিশ্বাস করে না। যেহেতু সমিতিগুলি যুবক ও মধ্যবয়স্ক কৃষকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে, সেজন্য ধর্মীয় কর্তৃত্বের উচ্ছেদ ও কুসংস্কার বিলুপ্তির কাজ সবত্র চলেছে। স্বামীর কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা গরীব কৃষকদের মধ্যে সর্বদাই দুর্বলতর, কারণ আর্থিক অবস্থার দরুণ গরীব কৃষক-নারীরা ধনিকশ্রেণীর নারীদের চেয়ে বেশি শ্রম না করে পারে না, তাই পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলার অধিকার, এমনকি সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাদেরই বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান দেউলিয়া অবস্থার ফলে নারীদের উপর পুরুষদের আধিপত্যের মৌলিক ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ভাঙ্গন ধরেছে। বর্তমান কৃষক-আন্দোলনের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক জায়গায় নারীরা পল্লী-নারী সমিতি সংগঠন করেছেন, নারীদের মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ এসেছে এবং স্বামীর কর্তৃত্ব দিনের পর দিন নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। এক কথায় কৃষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃপ্রধান মতাদর্শ ও ব্যবস্থা টলে উঠেছে। তবে বর্তমানে কৃষকরা ভূস্বামীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ধ্বংস করতে মনোনিবেশ করেছে। যেখানেই সেটাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়ে গেছে, সেখানেই তারা কুল, দেবদেবী এবং পুরুষের আধিপত্য এই তিনটি ব্যবস্থার উপর তাদের আক্রমণ শুরু করেছে। কিন্তু সেরকম আক্রমণ সবেমাত্র

শুরু হয়েছে, আর কৃষকরা যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ না করছে, ততক্ষণ ঐ তিনটির সবকটিকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা যায় না। সেজন্য আমাদের বর্তমান দায়িত্ব হল রাজনৈতিক সংগ্রামে কৃষকরা যাতে তাদের ব্যাপকতম কর্মপ্রচেষ্টা সংহত করে, সে ব্যাপারে তাদের নেতৃত্ব দেওয়া, যাতে করে ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থনৈতিক সংগ্রাম শুরু করা উচিত এর অব্যবহিত পরে, যাতে করে গরীব কৃষকদের ভূমি সমস্যা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যার মৌলিক সমাধান হয়ে যায়। কুলব্যবস্থা, কুসংস্কার এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে অসমতা সম্পর্কে বলা যায় যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে জয়লাভের স্বাভাবিক পরিণতিতেই সেগুলি লোপ পাবে। যদি জোর করে ও অকালে এইসব অবস্থাকে উচ্ছেদ করতে অতিরিক্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা এই অজুহাতের সুযোগ গ্রহণ করে এইসব প্রতিবিপ্লবী প্রচার চালাবে, যেমন, 'পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃষক সমিতির কোন ভক্তি নেই', 'কৃষক সমিতি দেবদেবীর নিন্দা করে ও ধর্ম বিনষ্ট করে' এবং 'কৃষক সমিতি স্ত্রীদের সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা সমর্থন করে'। আর এ সবকিছুর উদ্দেশ্যই হল কৃষক-আন্দোলনকে ধ্বংস করা। হুনানের সিয়াংসিয়াং এবং হুপেইয়ের ইয়াংসিনের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা একথা প্রমাণ করে। ওই ঘটনা হল এই যে, এখানে মূর্তি ধ্বংস করতে কৃষকরা বিরোধিতা করলে ভূস্বামীরা তার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। কৃষকরা এইসব মূর্তি নিজেই তৈরী করেছে এবং সময় এলে তারা নিজের হাতেই ঐসব মূর্তিকে ছুঁড়ে ফেলবে; অকালে তাদের পক্ষ থেকে অন্য কাউকে এ কাজ করবার দরকার নেই। এইসব বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার-নীতি হওয়া উচিত এইরকম—'তীর না ছুঁড়ে ধনুক টেনে ধর, কেবল দিক নির্দেশ কর।'[২২] দেবদেবীর মূর্তি ছুঁড়ে ফেলা, শহীদ কুমারী মন্দির এবং সতী ও চরিত্রবতী বিধবাদের খিলানগুলি টেনে নামানোর কাজ করবে কৃষকরা নিজেরাই, অন্য কারো পক্ষে তাদের হয়ে এ কাজ করা ভুল।

আমি যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলাম তখন কৃষকদের মধ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমিও প্রচার চালিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম:

'যদি আপনারা আটটি চিত্রাক্ষরে[২৩] বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনারা সৌভাগ্যের আশা করেন। যদি আপনি ভূস্থান বৈশিষ্ট্যের[২৪] শুভাশুভে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের কবরের অবস্থান থেকে

লাভবান হবার আশা করবেন। এ বছর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে স্থানীয় উৎপীড়ক, অসৎ ভদ্রলোক এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী সকলেই একসঙ্গে তাদের আসন থেকে উৎখাত হয়েছে। এটা কি করে সম্ভব যে, মাত্র কয়েক মাস আগে তাদের সকলের ভাগ্য ভাল ছিল এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কবরগুলির সুনির্বাচিত অবস্থানের সুফল ভোগ করেছে, আর হঠাৎ গত কয়েক মাসে তাদের সবাইয়ের ভাগ্য খারাপ হয়ে গেল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কবর একই সময় সুফলপ্রদ প্রভাব খাটানো বন্ধ করে দিল? স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা আপনাদের কৃষক সমিতির ব্যাপারে এ কথা বলে আসছে যে, 'কি আশ্চর্য! আজ পৃথিবীটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কমিটির লোকদের পৃথিবী। কাণ্ডখানা ছ্যাখো, কমিটির কোন একজন লোকের সঙ্গে মুখোমুখী না হয়ে তুমি প্রস্রাব করতেও যেত পার না!' কথাটি খুবই সত্য। শহর ও গ্রাম, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতি, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি সকলেরই কার্যকরী কমিটির সভ্য আছে—সত্য বটে পৃথিবীটা কমিটির লোকদের। কিন্তু এ সবগুলি কি আটটি চিত্রাক্ষর এবং পূর্বপুরুষদের কবরের অবস্থানের জন্য হয়েছে? কি অদ্ভুত! গ্রামাঞ্চলের সকল দরিদ্র হতভাগ্যদের আটটি চিত্রাক্ষর হঠাৎ শুভ হয়ে পড়েছে! এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কবরগুলি হঠাৎ লাভজনক প্রভাব প্রয়োগ করতে শুরু করেছে! দেবদেবীর কথা বলছেন? আচ্ছা, সবকিছু দিয়ে তাদের পুজো করুন। কিন্তু আপনাদের যদি কেবল মহামান্য কুয়ান[২৫] এবং করুণার দেবী থাকত আর কৃষক সমিতি না থাকত তাহলে আপনারা কি স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের উচ্ছেদ করতে পারতেন? ঐসব দেব ও দেবীরা বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক করে। আপনারা শত শত বছর ধরে তাদের পুজো করে এসেছেন, অথচ তারা আপনাদের উপকারার্থে স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকদের একজনকেও উচ্ছেদ করেনি! এখন আপনারা আপনাদের খাজনা কমাতে চান। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই—কিভাবে আপনারা সেটা করবেন? আপনারা কি দেবদেবীর উপর বিশ্বাস করবেন, না কৃষক সমিতির উপর বিশ্বাস করবেন?'

আমার এসব কথা শুনে কৃষকরা হো হো করে হেসে উঠল।

৮। রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার

যদি আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দশ হাজার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হতো,

তাহলেও কি তারা মফস্বলের দূরতম অঞ্চলব্যাপী নর-নারী, তরুণ-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে অতটা রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে পারত, যতটা দিয়েছে কৃষক সমিতিগুলি অত অল্প সময়ের মধ্যে? আমার মনে হয় না যে তারা তা করতে পারত। 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!', 'যুদ্ধবাজরা নিপাত যাক!', 'দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা নিপাত যাক!', 'স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোক নিপাত যাক!'—এই রাজনৈতিক শ্লোগানগুলোর পাখা গজিয়েছে; অগুন্তি গ্রামের তরুণ, মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের কাছে ওই শ্লোগানগুলি উড়ে গিয়ে পৌঁছেছে; এইগুলি তাদের মনে গেঁথে গেছে, আর পরে মন থেকে ঠাঁই পেয়েছে তাদের ঠোঁটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রীড়ারত একদল শিশুর প্রতি লক্ষ্য করুন। তাদের কেউ যদি আর একজনের প্রতি রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকায়, মাটিতে পদাঘাত করে এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত নাড়তে থাকে, তাহলে তক্ষুণি আপনি তীক্ষ্ণ স্বরের চিৎকার শুনতে পাবেন, 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!'

সিয়াংথান অঞ্চলে রাখাল বালকদের মধ্যে যখন মারামারি বাধে, তখন তাদের একজন সাজে থাং শেং-চি এবং অপরজন সাজে ইয়ে খাই-সিন[২৬]। যখন একজন হেরে গিয়ে দৌড়ে পালায় এবং আরেকজন তার পিছু ধাওয়া করে, তখন দেখা যায়, যে ধাওয়া করে সে হল থাং শেং-চি, আর যাকে ধাওয়া করা হয় সে হল ইয়ে খাই-সিন। 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিপাত যাক!' এই গানটি শহরের প্রায় প্রত্যেকটি বালকবালিকা নিঃসন্দেহে গাইতে পারে এবং এখন গ্রামাঞ্চলেরও অনেক বালকবালিকা এটা গাইতে শিখেছে।

কোন কোন কৃষক ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ইচ্ছাপত্রের আবৃত্তিও করতে পারে। তারা 'স্বাধীনতা', 'সমতা', 'তিন-গণনীতি' এবং 'অসম চুক্তি' শব্দগুলি ওই ইচ্ছাপত্র থেকে বেছে নিয়ে অনেকটা কাঁচাভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করেছে। ভদ্রগোছের জনৈক ব্যক্তি পথে একজন কৃষকের সামনা-সামনি পড়েছিল। লোকটি তার উন্নাসিকতা বজায় রেখে কৃষকটির জন্য পথ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। তখন কৃষকটি সরোষে বলে, 'এই ব্যাটা জুলুমবাজ, তুমি তিন-গণনীতির কথা শোননি?' আগে কৃষকরা যখন ছাংশার সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত শাকসব্জির ক্ষেত থেকে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে শহরে প্রবেশ করত, পুলিশ তখন তাদের হয়রানি করত। এখন তারা একটা অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে, সে অস্ত্র হল তিন-গণনীতি।

এখন কোন পুলিশ যখন শাকসব্জি বেচাকেনায় ব্যস্ত কোন কৃষককে মারে বা গালিগালাজ করে, কৃষকটি তখন তৎক্ষণাৎ তিন-গণনীতির উল্লেখ করে জবাব দেয় এবং তা পুলিশকে চুপ করিয়ে দেয়। সিয়াংথানে একবার যখন মহাকুমা কৃষক সমিতি এবং একটি থানার কৃষক সমিতির মধ্যে একটি বিষয়ে বিরোধ দেখা দিল, তখন থানার কৃষক সমিতির সভাপতি ঘোষণা করল, 'মহকুমা কৃষক সমিতির অসম চুক্তির বিরোধিতা করি আমরা!'

গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার সম্পূর্ণরূপে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির একটি কীর্তি। অতি সহজ শ্লোগান, কার্টুন ও বক্তৃতা কৃষকদের মধ্যে এমন একটা ব্যাপক ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যে মনে হয় যেন তাদের প্রত্যেকে কোন রাজনীতির বিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসেছে। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত কমরেডদের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃটিশবিরোধী বিক্ষোভ, অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন ও উত্তর-অভিযানের মহান বিজয়োৎসব পালন—এই তিনটি বিরাট গণসমাবেশের সময় রাজনৈতিক প্রচার হয়েছিল খুবই ব্যাপক। এইসব ঘটনার সময়ে যেখানে কৃষক সমিতির অস্তিত্ব ছিল, সেখানেই ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রচার চালানো হয়েছে এবং সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে এক প্রচণ্ড প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এর ফল হয়েছে বিরাট। এখন থেকে ঐসব সহজ শ্লোগানের মর্মবাণী ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ করে তুলবার এবং তার অর্থ পরিষ্কার করবার প্রতিটি সুযোগ যত্নসহকারে কাজে লাগানো উচিত।

৯। কৃষকদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সমিতি যখন গ্রামাঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল তখন কৃষকেরা যা পছন্দ করে না, সেইসব জিনিসকে তারা নিষেধ করতে কিম্বা তার উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে শুরু করল। বাজী ধরে খেলা, জুয়াখেলা এবং আফিমখোরী হল তিনটি জিনিস যা সবচেয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বাজী ধরে খেলা। যেখানে কৃষক সমিতিগুলি ক্ষমতাশালী, সেখানে মাচিয়াং, ডোমিনো এবং তাসখেলা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সিয়াংসিয়াংয়ের চতুর্দশ মহাকুমার কৃষক সমিতি দু'ঝুড়ি মাচিয়াং পুড়িয়ে দিয়েছে।

আপনি যদি গ্রামাঞ্চলে যান, এসব কোন খেলাই কাউকে আর খেলতে দেখবেন না। এই নিষেধাজ্ঞা যেই অমান্য করুক, তাকে কোন প্রশ্রয় না দিয়ে তক্ষুণি শাস্তি দেওয়া হয়।

জুয়াখেলা। আগে যারা পাঁড় জুয়াড়ী ছিল এখন তারা নিজেরাই জুয়াখেলা বন্ধ করছে। যেসব জায়গায় কৃষক সমিতি শক্তিশালী, সেসব জায়গা থেকে আবর্জনা একেবারেই সাফ করে ফেলা হয়েছে।

আফিমখোরী। এর ওপর নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত কঠোর। কৃষক সমিতি যখন আফিমের নলকে জমা দিতে আদেশ করে, কেউ তখন সামান্যতম আপত্তি তুলতেও সাহস করে না। লিলিং জেলায় জনৈক অসৎ ভদ্রলোক তার নলচে জমা দেয়নি বলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়।

কৃষকদের এই আফিমখোরদের 'নিরস্ত্রীকরণের আন্দোলন' উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী কর্তৃক উ পেই-ফু এবং সুন চুয়ান-ফাংয়ের[২৭] সৈন্যবাহিনীকে নিরস্ত্র করার চেয়ে কম প্রভাববিস্তারী নয়। বিপ্লবী বাহিনীর অফিসারদের অনেকেরই পিতা, যেসব বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আফিমের প্রতি নেশাগ্রস্ত ছিল এবং নলচে কখনো হাতছাড়া করত না, 'সম্রাটরা' (অসৎ ভদ্রলোকেরা কৃষকদের ব্যঙ্গ করে এই নামে ডাকে) তাদেরকেও নিরস্ত্র করে ফেলেছে। 'সম্রাটরা' যে কেবল আফিমের চাষ ও আফিম সেবন নিষিদ্ধ করেছে তাই নয়, তার চলাচলও বন্ধ করে দয়েছে। কুইচৌ থেকে পাওছিং, সিয়াংসিয়াং, ইয়োসিয়ান এবং লিলিংদের মধ্য দিয়ে যে আফিম চিয়াংসীতে রপ্তানীকরা হতো তার অনেকখানি মাঝ পথে আটকে দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে সরকারের অর্থ বিভাগের সঙ্গে সংঘাত ঘটেছে। ফলে উত্তরে অভিযানকারী সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের তাগিদে প্রাদেশিক কৃষক সমিতি নিম্ন পর্যায়ের কৃষক সমিতিগুলির প্রতি 'আফিম চলাচলের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে' আদেশ দেয়। কিন্তু এতে কৃষকরা খুবই বিক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়েছে।

এই তিনটি ছাড়াও অনেক জিনিস আছে, যা কৃষকরা নিষিদ্ধ করেছে কিংবা যার উপর বাধানিষেধ আরোপ করেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

হুয়াকু (পুষ্প ঢাক)। এটা এক ধরনের অশ্লীল অনুষ্ঠান যা অনেক জায়গায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পাল্কি (সেদান চেয়ার)। অনেক জেলায়, বিশেষ করে সিয়াংসিয়াংয়ে, পাল্কি ভাঙার অনেক ঘটনা ঘটেছে। পাল্কি যারা ব্যবহার করে, তাদেরকে কৃষকরা সবচেয়ে ঘৃণা করে; কৃষকরা পাল্কিগুলি সব সময় ভেঙে ফেলতে প্রস্তুত কিন্তু কৃষক সমিতি তা করতে তাদের নিষেধ করে। সমিতির কর্মকর্তারা কৃষকদের বলে: 'তোমরা যদি পাল্কিগুলি ভেঙে ফেল তাহলে কেবল ধনীদের অর্থ বাঁচবে আর বাহকরা বেকার হয়ে পড়বে। তাতে কি আমাদের নিজের লোকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কৃষকরা নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেছে—পাল্কিবাহকদের পারিশ্রমিক বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা ধনীদের শাস্তি দেওয়ার সমতুল।

মদ চোলাই ও চিনি তৈরী। মদ চোলাই ও চিনি তৈরী করতে খাদ্যশস্যের ব্যবহার সব জায়গায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মদ চোলাইকারকরা এবং চিনি শোধনকারীরা নিয়তই অভিযোগ করছে। হেংশান জেলায় ফুতিয়ানপুতে মদ চোলাই করা নিষিদ্ধ করা হয়নি, কিন্তু সেখানে মদের দাম খুব নীচে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, ফলে মদ্য ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসা লাভজনক না দেখে বাধ্য হয়ে এটা বন্ধ করে দেয়।

শুয়োর। পরিবার প্রতি কত সংখ্যক শুয়োর রাখা যাবে, তার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কারণ শুয়োররা খাদ্যশস্য খেয়ে ফেলে।

হাস-মুরগী। সিয়াংসিয়াংয়ে হাস-মুরগী পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু মহিলারা এতে আপত্তি করে। হেংশান জেলার ইয়াংথাংয়ের প্রত্যেকটি পরিবার মাত্র তিনটি করে পুষতে পারে, ফুথিয়ানপুতে পারে পাঁচটি করে। অনেক জায়গায় হাস পালন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, কারণ হাস মুরগীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। তারা যে কেবল খাদ্যশস্য খেয়ে ফেলে তাই নয়, উপরন্তু তারা ধানগাছ নষ্ট করে দেয়।

ভোজ। ভূরিভোজ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। সিয়াংথান জেলার শাওশানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, অতিথিদেরকে মাত্র তিন রকমের জৈব খাদ্য পরিবেশন করা চলবে। ঐ তিন রকম হল মুরগী, মাছ এবং শুয়োরের মাংস। বাঁশের করুল, সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া (কেল্প) এবং দক্ষিণ চীনের সেমই পরিবেশন করাও নিষিদ্ধ। হেংশান জেলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ভোজোৎসবে আটপ্রস্ত খাদ্য পরিবেশন করা চলবে, তার বেশি নয়।[২৮] লিলিং জেলার পূর্ব-তৃতীয় মহকুমায় মাত্র পাঁচপ্রস্ত পরিবেশন করতে দেওয়া হয়, আর উত্তর-

দ্বিতীয় মহকুমায় করা হয় মাংসের তিনটি প্রস্ত ও শাকসব্জির তিনটি প্রস্ত মাত্র। পশ্চিম-তৃতীয় মহকুমায় বসন্ত উৎসবের ভোজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিয়াংসিয়াং জেলায় সব রকম 'ডিম-পিঠার ভোজ' নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও এটাকে কোনক্রমে ভূরিভোজ বলা যায় না। সিয়াংসিয়াং জেলার দ্বিতীয় মহকুমায় একটি পরিবারে ছেলের বিয়েতে 'ডিম-পিঠার ভোজ' দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয়েছে দেখে কৃষকরা দল বেঁধে সে বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং উৎসব পণ্ড করে দেয়। সিয়াংসিয়াং জেলার চিয়ামো টাউনে জনসাধারণ দামী খাবার খাওয়া থেকে বিরত হয়েছে এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনুষ্ঠানে কেবল ফলই পরিবেশন করে।

বলদ। বলদ কৃষকদের একটি মূল্যবান সম্পদ। 'এ জীবনে বলদ হত্যা করলে পরের জীবনে তুমি বলদ হবে'—কথাটি প্রায় ধর্মীয় অনুশাসন পরিণত হয়েছে। বলদকে কোনক্রমেই হত্যা করা চলবে না। ক্ষমতা অর্জন করার আগে কৃষকরা বলদ হত্যার বিরোধিতা করতে কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিতে পারত। এটাকে নিষিদ্ধ করার কোন উপায় তাদের ছিল না। কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার পর তাদের ক্ষমতা এমনকি বলদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং শহরে তারা বলদ হত্যা নিষিদ্ধ করেছে। জেলা শহর সিয়াংথানের ছয়টি কসাইখানার মধ্যে এখন পাঁচটিই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাকীটিতে কেবল রুগ্ন ও কাজের অযোগ্য বলদ জবাই করা হয়। হেংশান জেলার সর্বত্র বলদ হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। জনৈক কৃষকের একটি বলদের একটি পা ভেঙে গেলে কৃষকটি পূর্বাহ্নে কৃষক সমিতির অনুমতি নিয়েই কেবল তাকে হত্যা করতে সাহস করেছে। চুচৌয়ের বাণিজ্য পরিষদ হঠকারিতা করে একটি বলদ হত্যা করলে কৃষকরা শহরে এসে তার কৈফিয়ৎ তলব করে এবং পরিষদ জরিমানা দেওয়া ছাড়াও ক্ষমা ভিক্ষা করে আতসবাজী ছোড়ে।

বাউণ্ডুলে বা ভবঘুরে। লিলিং জেলায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বসন্ত উৎসবের অভিনন্দন জানিয়ে ঢোল বাজানো, আঞ্চলিক দেবদেবীর গুণকীর্তন করা কিংবা পদ্মগীত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যান্য জেলায় এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, কিংবা হয়তো আপনা থেকেই এইসব আচার-অনুষ্ঠান লোপ পেয়েছে, কারণ কেউ আর সেগুলি পালন করে না। 'গুণ্ডা ভিক্ষুক' বা 'ভবঘুরে' যারা আগে অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির ছিল, এখন কৃষক সমিতির কাছে নত হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। সিয়াংথান

জেলার শাওশানে ভবঘুরেরা বৃষ্টি দেবতার মন্দিরকে নিয়মিতভাবে তাদের আস্তানায় পরিণত করেছিল এবং তারা কাউকে ভয় করত না। কিন্তু কৃষক সমিতি গড়ে ওঠার পর তারা চুপচাপ সরে পড়েছে। একই জেলার হুতি থানার কৃষক সমিতি এ রকম তিনটি ভবঘুরেকে পাকড়াও করে এবং ইঁটের ভাঁটির জন্য এঁটেল মাটি বইতে তাদের বাধ্য করে। নববর্ষের আমন্ত্রণ ও উপহারজনিত অপচয়কারী রীতিনীতিকে নিষিদ্ধ করে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে।

এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক ছোটখাট নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, লিলিংয়ে মহামারীর দেবতাকে শান্ত করবার জন্য প্রজ্বলিত ধূপ মোমবাতি নিয়ে শোভাযাত্রা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নৈবেদ্যের জন্য দামী জিনিস ও ফল ক্রয়, প্রেতাত্মার উৎসবে কাগজে পোশাক পোড়ানোর শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান এবং বসন্ত উৎসবে সৌভাগ্য কামনা করে পোষ্টার লাগানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিয়াংসিয়াং জেলার কুসুইতে জল নলচেয় করে ধূমপান করাও নিষিদ্ধ। এই জেলার দ্বিতীয় মহকুমায় আতসবাজী ছোড়া এবং অনুষ্ঠানমূলক বন্দুক ছোড়া নিষিদ্ধ, প্রথমটির জন্য জরিমানা হল ১.২০ ইউয়ান এবং দ্বিতীয়টির জন্য ২.৪০ ইউয়ান। সপ্তম ও বিংশ মহকুমায় মৃত ব্যক্তির জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অষ্টাদশ মহকুমায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার টাকা উপহার দেওয়া নিষিদ্ধ। এই ধরনের সংখ্যাতীত নিষেধাজ্ঞাকে সাধারণভাবে কৃষকদের নিষেধাজ্ঞা ও বাধানিষেধ আরোপ করা বলে অভিহিত করা হয়।

দু'দিক থেকে এসব নিষেধাজ্ঞার বিরাট তাৎপর্য আছে। প্রথমতঃ, এগুলি বাজী ধরে খেলা, জুয়াখেলা এবং আফিম সেবনের মতো খারাপ সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিপ্রকাশ। ভূস্বামীশ্রেণীর বিকৃত রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে এইসব রীতিনীতির সৃষ্টি হয় এবং ঐ শ্রেণীর কতৃত্ব যখনই উচ্ছেদ করা হল তখন ঐ রীতিনীতিকেও শেষ করে দেওয়া হল। দ্বিতীয়তঃ, শহরের ব্যবসায়ী কর্তৃক শোষণের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি এক ধরনের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা; যেমন ভোজ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে উপহার দেবার জন্য দামী বস্তু ও ফল ক্রয় ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা এই রকমের। শিল্পজাত দ্রব্য খুবই দামী এবং কৃষিজাত দ্রব্য খুবই শস্তা বলে কৃষকেরা অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে যায় এবং ব্যবসায়ীরা নির্মমভাবে তাদেরকে শোষণ করে;

সেইজন্ত নিজেদের রক্ষা করার উদ্দেশ্তে কৃষকদের মিতব্যয়কে উৎসাহ দিতেই হবে। উপরে উল্লিখিত এলাকার বাইরে খাদ্যশস্য চালান দেবার উপর নিষেধাজ্ঞার যুক্তি হল এই যে, গরীব কৃষকদের খাবার জন্য যথেষ্ট খাদ্য নেই এবং বাজার থেকে তাদের কিনে খেতে হয়, তাই এটা করে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি রোধ করা হয়। এসবের কারণ হল কৃষকদের দারিদ্র্য এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে বিরোধ। তাদের এই পদক্ষেপ দ্বারা এটা বোঝায় না যে, তারা তথাকথিত প্রাচ্য সংস্কৃতির বিধিনিয়ম[২৯] বাঁচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্তে শিল্পজাত দ্রব্য কিংবা শহর ও গ্রামের মধ্যে বাণিজ্য বর্জন করছে। অর্থনৈতিকভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্তে কৃষকদের অবশ্যই জিনিসপত্র মিলিতভাবে কিনবার জন্য খরিদ্দারদের সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে। সমিতিগুলি যাতে ঋণদান সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সরকারের পক্ষেও সে ব্যাপারে সাহায্য করা প্রয়োজন। এইসব ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দাম কম রাখবার উপায় হিসেবে খাদ্যশস্যের বাইরে চালান দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা কৃষকরা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করবে, আর অর্থনৈতিক আত্মরক্ষার জন্য কোন কোন শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানীর উপর নিষেধজ্ঞাও তখন তাদের জারী করতে হবে না।

১০। ডাকাতি নির্মূলীকরণ

আমার মতে হ্যু আর থাং, ওয়েন এবং উ থেকে শুরু করে ছিং সম্রাট ও প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অবধি কোন শাসনকর্তাই আজও পর্যন্ত ডাকাতি নির্মূল করার ব্যাপারে অতখানি শক্তি দেখাতে পারেনি, যেমনটা আজ দেখিয়েছে কৃষক সমিতিগুলি। কৃষক সমিতি যেখানে শক্তিশালী, সেখানেই ডাকাতির চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। আশ্চর্যের বিষয়, অনেক জায়গায় শাকসব্জি চুরি করে এমন ছিঁচকে চোরও লোপ পেয়েছে। কোন কোন জায়গায় এখনও কিছু কিছু ছিঁচকে চোরের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যেসব জেলা আমি পরিদর্শন করেছি, এমনকি যেসব জায়গায় আগে দস্যুতার খুব প্রাদুর্ভাব ছিল সেসব স্থানেও দস্যুর চিহ্নমাত্র নেই। কারণ হল: প্রথমতঃ, কৃষক সমিতির সভ্যরা পাহাড় ও উপত্যকার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, আর তারা বর্শা ও লাঠি হাতে নিয়ে শত শত সংখ্যায় জমায়েত হতে পারে এক ডাকে; তাই দস্যুরা আর কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠবার

পর থেকে চালের দাম পড়ে গেছে ; গত বসন্তে এক তান চালের দাম ছিল ছয় ইউয়ান, কিন্তু গত শীতে তা ছিল মাত্র দুই ইউয়ান। ফলে, জনসাধারণের জন্য খাদ্য সমস্যার গুরুত্ব আগের চেয়ে কমে গেছে। তৃতীয়ত:, গুপ্ত সংগঠনের সভ্যরা[৩০] কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েছে, এখানে তারা প্রকাশ্যে এবং আইন-সম্মতভাবে নিজেদের বীরত্ব জাহির করতে এবং অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশ করতে পারে। ফলে 'পর্বত', 'মন্দির', 'ধর্মশালা' ও 'নদী'র[৩১] মতো গুপ্ত সংগঠনের অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন নেই। যারা তাদের উৎপীড়ন করত সেইসব স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকের শুয়োর ও ভেড়া জবাই করার এবং তাদের উপর গুরুভার অতিরিক্ত কর এবং জরিমানা আদায় করার মাধ্যমে কৃষকরা নিজেদের ক্রোধ প্রকাশ করার জন্য এখন যথেষ্ট নির্গম পথ খুঁজে পেয়েছে। চতুর্থত:, সেনাবাহিনী এখন অধিক সংখ্যায় সৈন্য সংগ্রহ করেছে এবং 'অবাধ্যদের' অনেকে তাতে যোগদান করেছে। এইভাবে কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতির অভিশাপ বন্ধ হয়ে গেছে। এই বিষয়ে ভদ্রলোক ও সম্পদশালী ব্যক্তিরাও কৃষক সমিতিকে অনুমোদন করে। তাদের মন্তব্য হল, 'কৃষক সমিতির কথা বলছ? তা যাই বল, সত্যি কথা বলতে কি, তাদের সপক্ষেও কিছু বলবার আছে।'

বাজী ধরে খেলা, জুয়াখেলা ও আফিম সেবন নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে এবং ডাকাতি নির্মূলীকরণের ব্যাপারে কৃষক সমিতিগুলি সাধারণ অনুমোদন লাভ করেছে।

১১। অত্যধিক করের বিলোপসাধন

যেহেতু দেশ এখনও ঐক্যবদ্ধ হয়নি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করা যায়নি, সেইজন্য কৃষকদের উপর ধার্য করা সরকারী ট্যাক্স ও করের গুরুভার, বা অন্য কথায় বলা যায় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার দূর করার এখনও কোন উপায় নেই। যাহোক, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা যখন গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করত তখন কৃষকদের উপর যে অত্যধিক কর—যেমন প্রতি মু জমির উপর অতিরিক্ত কর—ধার্য করা হতো, তা কৃষক-আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে কিম্বা অন্তত পক্ষে কমে এসেছে। এটাকেও কৃষক সমিতির কীর্তিসমূহের একটি বলে বিবেচনা করা উচিত।

১২। শিক্ষার জন্য আন্দোলন

চীন দেশে শিক্ষা সব সময় শুধু ভূস্বামীদের একটা অধিকার হয়ে এসেছে এবং কৃষকদের তাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ভূস্বামীদের সংস্কৃতি কৃষক-দেরই সৃষ্টি, কারণ ভূস্বামীদের সংস্কৃতি কৃষকদের ঘাম ও রক্ত দিয়েই তৈরী। চীনদেশে শতকরা নব্বই জন লোকের কোন শিক্ষা নেই, আর এদের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ হল কৃষক। যখন গ্রাম অঞ্চলে ভূস্বামীদের শক্তি উৎখাত করা হল, তখনই শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য কৃষকদের আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। লক্ষ্য করুন, যে কৃষকরা এতকাল স্কুলকে ঘৃণা করে এসেছে, তারা কিন্তু আজ আগ্রহের সঙ্গে নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে চলেছে! কৃষকরা সব সময় 'বিদেশী ধরনের স্কুলকে' অপছন্দ করে এসেছে। আমার ছাত্রাবস্থায় আমি যখন গ্রামে ফিরে গিয়ে দেখলাম যে কৃষকরা 'বিদেশী ধরনের স্কুলের বিরোধী' তখন আমিও 'বিদেশী ধরনের ছাত্র ও শিক্ষকদের' সাধারণ স্রোতের সঙ্গে নিজেকে এক করে ভাবতাম আর ওই শিক্ষার সমর্থনে দাঁড়াতাম, মনে করতাম, কোন-না-কোনভাবে কৃষকরা ভুল করছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন গ্রামাঞ্চলে ছয় মাস বাস করেছিলাম এবং আমি এই সময় ইতিমধ্যেই একজন কমিউনিস্ট হয়েছি এবং মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করেছি শুধু তখনই আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমারই ভুল হচ্ছিল আর কৃষকরাই ছিল সঠিক। গ্রামাঞ্চলের প্রথমিক স্কুলসমূহে যে পাঠ্যবই পড়ান হতো তা লেখা ছিল সম্পূর্ণরূপে শহরের বিষয় নিয়ে এবং তা গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনের পক্ষে যথাযথ ছিল না। তাছাড়া কৃষকদের প্রতি প্রাথমিক স্কুলসমূহের শিক্ষকদের মনোবৃত্তি ছিল খুব খারাপ এবং তারা কৃষকদের পক্ষে সহায়ক হওয়া তো দূরের কথা, তারা হয়ে উঠল কৃষকদের অপছন্দের লোক। সেইজন্য কৃষকরা আধুনিক স্কুলের (যাকে তারা বলত 'বিদেশী স্কুল') চেয়ে পুরানো ধরনের পাঠশালা (যাকে তারা বলত 'চীনা বিদ্যালয়') এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের চেয়ে পুরানো ধরনের পাঠশালার গুরুমশাইদের বেশি পছন্দ করত। এখন কৃষকরা উৎসাহের সঙ্গে নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করছে—এই স্কুলকে তারা বলে কৃষকদের স্কুল। এসবের কোন-কোনটিকে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে এবং কোন-কোনটিকে সংগঠিত করা হচ্ছে ; আর গড়ে প্রতি থানায় একটা করে স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এই স্কুলগুলি স্থাপনের ব্যাপারে কৃষকরা খুবই উৎসাহী এবং কেবলমাত্র এগুলিকেই তারা নিজেদের স্কুল বলে মনে করে। নৈশ স্কুলগুলির আয় আসে 'কুসংস্কার

থেকে সাধারণের আয়', কৌলিক মন্দিরের তহবিল এবং অন্যান্য অব্যবহৃত সামাজিক তহবিল ও সম্পত্তি থেকে। জেলার শিক্ষাবোর্ড এই অর্থ সরকারী স্কুল অর্থাৎ কৃষকদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম 'বিদেশী ধরনের স্কুল' প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে চেয়েছিল, আর কৃষকরা তাকে কৃষকদের স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে চেয়েছিল। এই বিবাদের পরিণতিতে উভয় পক্ষই অর্থের কিছু কিছু অংশ লাভ করে। কোন কোন স্থানে কৃষকরা সবটাই পেয়েছে। কৃষক-আন্দোলনের বিকাশলাভের ফলে কৃষকদের সাংস্কৃতিক মান দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র প্রদেশের গ্রামগুলিতে হাজার হাজার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি দিন লাগবে না। যে 'সার্বজনীন শিক্ষা' সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত 'শিক্ষা-বিদরা' চারিদিক মুখরিত করে তুলেছে, যা এখনও পর্যন্ত এটা ফাঁকা বুলি মাত্র রয়ে গেছে, তা থেকে কৃষক-স্কুল প্রতিষ্ঠার ঘটনাটা একেবারেই স্বতন্ত্র।

১৩। সমবায় আন্দোলন

সমবায় সমিতিটা কৃষকদের সত্যিই দরকার, বিশেষতঃ খরিদ্দারদের সমবায়, বাণিজ্যিক সমবায় এবং ঋণদান সমবায়। তারা যখন জিনিস কেনে, তখন ব্যবসায়ীরা তাদের শোষণ করে ; তারা যখন তাদের ক্ষেতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে, ব্যবসায়ীরা তখন তাদের ঠকায় ; তারা যখন টাকা বা চাল ধার করে, সুদখোর মহাজনরা তখন নিষ্ঠুরভাবে তাদের লুট করে। এই তিনটি সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে তারা খুবই আগ্রহী। গত শীতে ইয়াংসি উপত্যকায় যুদ্ধ করার সময়ে যখন বাণিজ্যের পথগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং হুনানে লবণের দাম বেড়ে গেল, তখন কৃষকরা তাদের লবণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক সমবায় সমিতি গঠন করেছিল। ভূস্বামীরা যখন টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দিল, তখন ঋণদান সংস্থা গঠন করবার জন্য কৃষকরা বহু চেষ্টা করেছিল, কারণ টাকা ধার করা তাদের দরকার ছিল। একটা বড় সমস্যা হল এই সংগঠনের জন্য একটি বিস্তারিত ও যথাযথ নিয়ম-কানুনের অভাব। আপনা-আপনি গজিয়ে ওঠা কৃষকদের এইসব সমবায় সমিতিগুলি প্রায়শই সনবায় কর্মনীতির সঙ্গে খাপ খায় না বলে যেসব কমরেড কৃষকদের মধ্যে কাজ করছেন তাঁরা সব সময় আগ্রহের সঙ্গে 'নিয়মকানুন' সম্পর্কে খোঁজ করেন। যদি উপযুক্তভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহলে কৃষক সমিতির বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলনও সর্বত্র বিস্তারলাভ করতে পারে।

১৪। রাস্তা নির্মাণ ও বাঁধ মেরামত

এটাও কৃষক সমিতির কীর্তিসমূহের একটি। কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার আগে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। অর্থ ছাড়া রাস্তা মেরামত করা যায় না, আর ধনীরা এ ব্যাপারে নিজেদের গাঁট থেকে খরচ করতে অনিচ্ছুক ছিল। সেইজন্ম রাস্তাগুলি খুব খারাপ অবস্থায় পড়ে ছিল। যদি রাস্তা মেরামতের কোন কাজ করাও হতো তবু তা একটা খয়রাতী কাজ হিসেবে করা হতো, যেসব লোক 'পরকালের জন্ম পুণ্যসঞ্চয় করতে ইচ্ছুক' তাঁদের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হতো এবং কিছু সরু, কোনরকমে বাঁধানো পথ তৈরী করা হতো। কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার পর রাস্তা কত চওড়া হবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়ে আদেশ জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানের যাতায়াতের প্রয়োজনানুযায়ী তা তিন, পাঁচ, সাত বা দশ ফুট চওড়া হতে পারে এবং রাস্তার পাশে বসবাসকারী প্রত্যেকটি ভূস্বামীকে রাস্তাটির অংশবিশেষ তৈরি করে দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। একবার আদেশ দেওয়া হয়ে গেলে তা অমান্য করে এমন সাহস কার আছে? অল্প সময়ের মধ্যে অনেক ভাল রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এটা কোন খয়রাতী নয় বরং বাধ্যবাধকতার ফল, কিন্তু এই ধরনের খানিকটা বাধ্যবাধকতা মোটেই খারাপ জিনিস নয়। বাঁধ দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। নির্মম ভূস্বামীরা সব সময় প্রজাকৃষকদের কাছ থেকে যতটা পারা যায় শুষে নিতে তৎপর থাকত, কিন্তু তারা বাঁধ মেরামতের জন্ম সামান্য পরিমাণ অর্থও কখনোই ব্যয় করত না। তারা পুকুর শুকিয়ে যেতে দিত এবং প্রজাকৃষকদের উপবাসে রাখত। একমাত্র খাজনা ছাড়া আর কিছু নিয়েই তারা মাথা ঘামাত না। এখন কৃষক সমিতি হয়েছে, এখন বাঁধ মেরামত করতে ভূস্বামীদের বাধ্য করার জন্ম তাদের প্রতি সরাসরি আদেশ জারী করা যায়। যদি কোন জমিদার তা করতে অস্বীকার করে, তাহলে সমিতি তাকে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে: 'ঠিক আছে! তুমি যদি মেরামত না কর, তাহলে তুমি চাঁদা হিসেবে ধান দেবে, আর তার পরিমাণ হবে প্রতিদিন কাজের জন্ম এক তৌ করে।' ভূস্বামীর পক্ষে এটা আরও ক্ষতিকর বলে সে তাড়াতাড়ি মেরামতের কাজটা করে দেয়। ফলে অনেক খারাপ বাঁধ এখন ভাল হয়ে উঠেছে।

ওপরে যে চৌদ্দটি কাজের উল্লেখ করা হল, তার সবগুলিই কৃষক সমিতির

নেতৃত্বে কৃষকরা সম্পন্ন করেছে। মৌখিক প্রেরণা ও বিপ্লবী তাৎপর্যের দিক থেকে এদের কোন্‌টি খারাপ? পাঠকগণ, দয়া করে এগুলি সম্পর্কে আরেক-বার ভেবে দেখবেন। আমার মনে হয়, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরাই সেগুলিকে কেবল খারাপ বলবে। বিস্মিত হতে হয়, নানছাং[৩২] থেকে খবর এসেছে যে, চিয়াং কাই-শেক, চাং চিং-চিয়াং[৩৩] এবং এই ধরনের অন্যান্য ভদ্রলোকেরা হুনানের কৃষকদের কার্যকলাপকে আদৌ অনুমোদন করে না। হুনানের দক্ষিণপন্থী নেতা লিউ ইয়ুয়ে-চি[৩৪] প্রমুখ ব্যক্তিগণ চিয়াং ও চাংয়ের মতো একই মত পোষণ করে এবং বলে, 'তারা তো একেবারে লাল হয়ে গেছে।' কিন্তু এরকম একটু লাল না হলে জাতীয় বিপ্লব কি করে হবে? রাতদিন 'জনসাধারণকে জাগ্রত করা' সম্পর্কে হৈ চৈ করা এবং জনসাধারণ যখন সত্যই জেগে ওঠে, তখন আতঙ্কে মুমূর্ষু হয়ে ওঠার ব্যাপারটির সঙ্গে মহামান্য শে'র ড্রাগন প্রীতির[৩৫] পার্থক্য কোথায়?

টীকা

১। হুনান প্রদেশ তখন ছিল সমগ্র চীন দেশের কৃষক-আন্দোলনের কেন্দ্র।

২। সে সময় হুনানের শাসনকর্তা ছিল চাও হেং-থি। সে ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের দালাল। ১৯২৬ সালে উত্তরে অভিযানকারী সৈন্য-বাহিনী তাকে উচ্ছেদ করে।

৩। ১৯১১ সালের বিপ্লব ছিং রাজবংশীয় স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। এই বছরের ১০ই অক্টোবর তারিখে, ছিং সরকারের নয়া সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী সংস্থাগুলির প্রেরণায় উছাং শহরে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এর পরে বিভিন্ন প্রদেশে পরপর বিদ্রোহ ঘটে এবং অতিসত্বরই ভেঙে পড়ে ছিং রাজবংশের শাসন। ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে নানকিং শহরে স্থাপিত হয় চীন প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার, আর সান ইয়াৎ-সেন নির্বাচিত হলেন এর অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট। কৃষক, শ্রমিক ও শহরে পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের মৈত্রীর ভেতর দিয়ে জয়লাভ করে এই বিপ্লব। কিন্তু যে চক্র এই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল, তারা ছিল আপোষপন্থী, তারা কৃষকদের প্রকৃত হিতসাধন করেনি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের

চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছিল বলে রাষ্ট্রক্ষমতা এসে পড়ল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ—ইউয়ান শি-খাইয়ের হাতে, আর বিপ্লব হল ব্যর্থ।

৪। এগুলি কনফুসিয়াসের গুণাবলী—তাঁর অন্যতম শিষ্যের বর্ণনা অনুসারে।

৫। প্রাচীন চীনা উক্তিতে বলা হয় 'ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে যথাযথ সীমা অতিক্রম করতে হবে।' আগে লোকদের কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে কথাটিকে প্রায়শঃই উল্লেখ করা হতো, প্রতিষ্ঠিত শৃংখলার গণ্ডির মধ্যে হলে সংস্কার সাধন মেনে নেওয়া হতো, কিন্তু যেসব কর্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল পুরানো নিয়ম-শৃংখলাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, তা নিষিদ্ধ করা হতো। এই সীমারেখার মধ্যেকার কার্যকলাপকে মনে করা হতো 'যথাযথ', কিন্তু পুরানো নিয়ম-শৃংখলাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যা করা হতো, তাকে বলা হতো 'যথাযথ সীমা অতিক্রম'। সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী শিবিরের মধ্যকার সুবিধা-বাদীদের মতবাদ ছিল এটা। কমরেড মাও সে-তুঙ এই ধরনের সংস্কারবাদী মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন। আলোচ্য বিষয়ে তিনি যে বলেছেন 'ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে যথাযথ সীমা অতিক্রম করতে হবে, অন্যথায় ত্রুটির সংশোধন কথনও হতে পারে না'—তার অর্থ হল শোধনবাদী অর্থাৎ সংস্কারবাদী পদ্ধতি নয়, পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করতে জনগণের বিপ্লবী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

৬। ১৯২৬ সালের শীতকালে এবং ১৯২৭ সালের বসন্তকালে উত্তরে অভিযানকারী সৈন্যবাহিনী যখন ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করছিল, চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী স্বরূপটি তখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়নি, এবং কৃষক সাধারণ তখনও মনে করত সে বিপ্লবের পক্ষে। ভূস্বামী ও ধনী কৃষকরা তাকে অপছন্দ করত এবং গুজব রটায় যে উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী পরাজিত হয়েছে আর চিয়াং কাই-শেক পায়ে আঘাত পেয়েছে। ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল চিয়াং কাই-শেক যখন শাংহাই ও অন্যান্য স্থানে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটাল, শ্রমিকদের হত্যা করল, কৃষকদের দমন করল এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করল তখনই তার প্রতিবিপ্লবী স্বরূপটা পরিপূর্ণ-রূপে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে ভূস্বামীরা ও ধনী কৃষকরা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তাকে সমর্থন করতে শুরু করে।

৭। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের (১৯২৪-২৭) সময়কালে কুয়াংতোং ছিল প্রথম বিপ্লবী ঘাঁটি।

৮। উ পেই-ফু ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সবচেয়ে বিখ্যাতদের মধ্যে একজন। যে ছাও খুন ১৯২৩ সালে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সভ্যদের ঘুষ দেবার কৌশল অবলম্বন করে কুখ্যাত হয়, তার সাথে একযোগে উ পেই-ফু উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের চিলি (হোপেই প্রদেশে) চক্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ছাও খুনকে নেতা হিসেবে সমর্থন করে এবং এই দুইজনকে সাধারণভাবে 'ছাও-উ' বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯২০ সালে আনহুই চক্রের যুদ্ধবাজ তুয়ান ছী-রুইকে পরাজিত করার পর উ পেই-ফু পিকিংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়। সে ছিল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের দালাল। ১৯২৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তার নির্দেশে পিকিং-হানখৌ রেলপথ বরাবর ধর্মঘটী শ্রমিকদের হত্যা করা হয়। ১৯২৪ সালে চাং জুও-লিনের সঙ্গে যুদ্ধে (যেটা সাধারণভাবে 'চিলি এবং ফেংথিয়ান চক্রের মধ্যকার যুদ্ধ' বলে খ্যাত) পরাজিত হয় এবং তাকে পিকিং সরকার থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু জাপানী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় সে ১৯২৬ সালে চাং জুও লিনের সঙ্গে তার শক্তি যোগ করে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী ১৯২৬ সালে যখন কুয়াংতোং থেকে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন উ পেই-ফু ছিল প্রথম শত্রু, যাকে উচ্ছেদ করা হয়।

৯। তিন-গণনীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রের নীতি এবং গণকল্যাণের নীতির প্রশ্নে চীনদেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংক্ষে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের মূলনীতি ও কর্মসূচী। ১৯২৪ সালে কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণায় সান ইয়াৎ-সেন তিন-গণনীতিকে পুনরায় ব্যাখ্যা করেন, এই ব্যাখ্যায় তিনি জাতীয়তাবাদকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হিসেবে প্রচার করেন এবং শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। পুরানো তিন-গণনীতি এইভাবে নতুন তিন-গণনীতিতে বিকাশলাভ করে, যার মধ্যে ছিল তিনটি মহান নীতি অর্থাৎ রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি সহায়তা। এই নতুন তিন-গণনীতি হয়ে উঠেছিল প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙের মধ্যে সহযোগিতার রাজনৈতিক ভিত্তি। দ্রষ্টব্য—'নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে', 'মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।

১০। 'দীর্ঘজীবী'-র চীনা প্রতিশব্দ ওয়ানস্‌সুই অর্থাৎ 'দশ হাজার বছর' —চীন সম্রাটকে অভিভাদন জানাবার প্রচলিত রীতি। বর্তমানে এরই মানে দাঁড়িয়েছে 'সম্রাট'।

১১। ধনী কৃষকদের কৃষক সমিতিতে যোগ দিতে দেওয়া উচিত হয়নি—কথাটি ১৯২৭ সালে কৃষক জনসাধারণ তখনও বুঝতে পারেনি।

১২। কমরেড মাও সে তুঙ এখানে যে 'একেবারেই নিঃস্ব' কৃষকদের কথা বলছেন, তার অর্থ ক্ষেতমজুর (গ্রাম্য সর্বহারা) এবং গ্রাম্য ভবঘুরে সর্বহারা বোঝায়।

১৩। 'অল্প নিঃস্ব' বলতে গ্রাম্য আধা-সর্বহারা বোঝায়।

১৪। ইউয়ান জু-মিং ছিল কুইচৌ প্রদেশের যুদ্ধবাজ। সে তখন হুনানের পশ্চিমাংশ শাসন করতো।

১৫। বর্গা নেওয়ার শর্ত হিসেবে বর্গা কৃষক সাধারণতঃ টাকায় বা জিনিসে জমিদারের কাছে জামিন রাখতো, এবং প্রায়শঃই তার জমির মূল্যের একটা বড় অংশই এতে চলে যেতো। খাজনা দেবার জামিন হিসেবে একে ধরা হলেও আসলে এটা ছিল অতিরিক্ত শোষণের একটা পদ্ধতি।

১৬। হুনানে তু হল মহকুমার সমকক্ষ এবং তুয়ান থানার সমকক্ষ। তু ও তুয়ানের পুরানো আমলের প্রশাসন ছিল ভূস্বামীদের শাসনের হাতিয়ার।

১৭। প্রতি মু জমির উপর কর ধার্য করা হল নিয়মিত করের উপর একটি অতিরিক্ত কর। ভূস্বামী পরিচালিত সরকার নির্মমভাবে এই কর কৃষকদের উপর ধার্য করত।

১৮। উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের শাসনামলে প্রদেশের সামরিক প্রধানকে বলা হতো 'সামরিক গভর্ণর'। কিন্তু সে ছিল প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রদেশের এক-নায়ক সর্বেসর্বা, সমগ্র প্রদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তার করায়ত্ত থাকত। সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে যোগসাজস করে তারা স্থানীয় একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সামন্ততান্ত্রিক-সামরিক ব্যবস্থা চালু রাখত।

১৯। 'স্থায়ী পারিবারিক মিলিশিয়া' ছিল গ্রামাঞ্চলে সেই সময় সংগঠিত নানা ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর একটি। 'পারিবারিক' কথাটি ব্যবহার করবার কারণ হল, প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের কাউকে না কাউকে এতে যোগ দিতে হতো। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর অনেক স্থানে ভূস্বামীরা এই 'পারিবারিক মিলিশিয়া'র কর্তৃত্বভার দখল করে নেয় এবং সেগুলিকে প্রতি-

বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করে।

২০। সেই সময় উহানে অবস্থিত কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বাধীনে অনেক স্থানের কুওমিনতাঙের জেলা সদর দপ্তর ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি সহায়তা—এই তিনটি মহান নীতি অনুসরণ করত। এগুলো ছিল কমিউনিস্ট, কুওমিনতাঙের বামপন্থী ও অন্যান্য বিপ্লবীদের বিপ্লবী মৈত্রীজোট।

২১। মহামান্য পাও (পাও চেং) ছিলেন সুং রাজবংশের (৯৬০-১১২৭ খ্রীঃ) রাজধানী খাইফেং-এর অধ্যক্ষ। পুরানো সমাজে সমান্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণীর প্রতারণামূলক প্রচারের ফলে লোকে মনে করত যে, তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ কর্মচারী এবং তিনি যেসব মামলার বিচার করেছিলেন তার প্রত্যেকটিতে সঠিক রায় প্রদান করেছিলেন।

২২। এই বাক্যটি **মেনসিয়াস** শীর্ষক বই থেকে উদ্ধৃত। এর মর্ম হচ্ছে যে, ধনুর্বিদার একজন দক্ষ শিক্ষক অপরকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শুধু নাটকীয় ভঙ্গীতে ধনুক টেনে ধরেন কিন্তু তীর ছোড়েন না। অর্থাৎ কৃষকরা যাতে পূর্ণ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে, এবং যাতে নিজেদের উদ্যোগে, সচেতনভাবে কুসংস্কার ও অন্যান্য খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করবার জন্য অগ্রণী হয় তার জন্য কমিউনিস্টদের উচিত কৃষকদের পরিচালনা করা। কমিউনিস্টরা এ ব্যাপারে তাদের উপর হুকুম করবে না, বা তাদের হয়ে এ কাজ করে দেবে না।

২৩। আটটি চিত্রাক্ষর হল পুরানো চীনদেশে ভাগ্যগণনার একটি পদ্ধতি। এর ভিত্তি ছিল যথাক্রমে কোন ব্যক্তির জন্মের বছর, মাস, দিন এবং ঘণ্টার প্রত্যেকটির জন্য দু'টি করে বৃত্তাকার চিত্রাক্ষর পরীক্ষা।

২৪। ভূস্থান বৈশিষ্ট্য হল পুরানো চীনদেশের একটা কুসংস্কার। এই কুসংস্কার অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে, কারো পূর্বপুরুষের কবরের অবস্থান সেই ব্যক্তির ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ভূস্থান বৈশিষ্ট্য বিশারদরা দাবি করে যে, তারা কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান ও তার পরিপার্শ্ব শুভ কিনা, তা বলে দিতে পারে।

২৫। মহামান্য কুয়ান (কুয়ান ইয়ু, ১৬০-২১৯ খ্রীঃ) 'তিনটি রাজ্যের' যুগের একজন যোদ্ধা। চীনা জনসাধারণ ব্যাপকভাবে তাকে আনুগত্য ও যুদ্ধের দেবতা হিসেবে পূজা করত।

২৬। থাং শেং-চি ছিলেন একজন জেনারেল। সে সময়ে ইনি বিপ্লবের পক্ষে ছিলেন এবং উত্তর অভিযানে যোগ দেন। ইয়ে থাই-সিন ছিলেন জেনারেল। তিনি উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের পক্ষে ছিলেন এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

২৭। সুন ছুয়ান-ফাং ছিল একজন যুদ্ধবাজ। তার শাসন চিয়াংসু, চেচিয়াং, ফুচিয়ান, চিয়াংসী এবং আনহুই এই পাঁচটি প্রদেশে বিস্তৃত ছিল। সাংহাইয়ের শ্রমিকদের অভ্যুত্থানকে রক্তের স্রোতে দমন করবার জন্য সে দায়ী ছিল। চিয়াংসী প্রদেশের নানছাং-চিউচিয়াং অঞ্চলে উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী কর্তৃক ১৯২৬ সালের শীতকালে তার প্রধান সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে যায়।

২৮। চীনে পরিবেশনের সময় আলাদাভাবে খাবার না দিয়ে দেওয়া হয় একটা গামলা বা প্লেটে—সবার জন্য।

২৯। 'প্রাচ্য সংস্কৃতির বিধিনিয়ম' ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ। এতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বর্জন করা হতো এবং প্রাচ্যের কৃষি উৎপাদনের পশ্চাৎপদ পদ্ধতি ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সমর্থন করা হতো।

৩০। গুপ্ত সমিতি সম্পর্কে জানবার জন্য এই খণ্ডে প্রকাশিত 'চীনা সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ' প্রবন্ধের ১৮ নং টীকা, পৃঃ ২৮ দ্রষ্টব্য।

৩১। 'পর্বত', 'মন্দির', 'ধর্মশালা', 'নদী' হল নিজেদের উপদলকে চিহ্নিত করবার জন্য আদিম গোপন সমিতি কর্তৃক ব্যবহৃত নাম।

৩২। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে যখন উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী নানছাং দখল করল, তখন চিয়াং কাই-শেক এই সুযোগ গ্রহণ করে সেখানে তার সদর দপ্তর স্থাপন করে। সে তার চারিদিকে কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীদের এবং কিছু সংখ্যক উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের রাজনীতিকদের জড়ো করল, আর সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করে উহানের বিরুদ্ধে তার প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র চালায়। উহান তখন ছিল বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল। ঘটনার পরিণামে ১৯২৭ সালে ১২ই এপ্রিলে সে শাংহাইতে তার প্রতিবিপ্লবী ক্যুদেতা ঘটাল, এবং ভয়ংকর গণহত্যা চালাল।

৩৩। চাং চিং-চিয়াং ছিল কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীদের একজন নেতা। সে চিয়াং কাই-শেকের পরামর্শদাতা ছিল।

৩৪। লিউ ইয়ুয়ে-চি ছিল 'বাম সমিতি'র প্রধান। এই সমিতি ছিল হুনানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্টবিরোধী সমিতি।

৩৫। ইয়ে শে'র ড্রাগন প্রীতি হচ্ছে সিয়াংয়ের (৭৭-৬ খ্রীঃ পূঃ) *সিন স্যু* বই থেকে নেওয়া একটি গল্প। এতে বলা হয় যে, লর্ড শে ড্রাগনকে খুব ভালবাসতেন। তিনি তাঁর অস্ত্রাদি, হাতিয়ার এবং সমগ্র প্রাসাদটিকে ড্রাগনের চিত্র ও ভাস্কর্য মূর্তি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই অনুরাগের কথা শুনে একটি প্রকৃত ড্রাগন আকাশ থেকে নেমে এলো। সে জানালা থেকে ইয়ে কোংয়ের বাড়ীর ভেতরে উঁকি মারল আর নিজের লেজটি দরজার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। ইয়ে কোং ড্রাগনকে দেখে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেলেন। দেখা গেল যে, বাস্তবে ইয়ে কোং ড্রাগনকে ভালবাসতেন না, ভালবাসতেন কেবল ড্রাগনের সদৃশ সবকিছু। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রূপক ব্যবহার করে দেখাতে চেয়েছেন যে চিয়াং কাই-শেক ও তার মতো ব্যক্তিরা যদিও বিপ্লবের কথা বলে, তবু তারা বিপ্লবের ভয়ে ভীত এবং তার বিরোধী।

দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ

চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?

(অক্টোবর ৫, ১৯২৮)

১। দেশের ভেতরকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

কুওমিনতাঙের নতুন যুদ্ধবাজদের বর্তমান শাসনটা আগের মতোই শহরে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর আর গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় জমিদারশ্রেণীর শাসন। এই শাসন বৈদেশিক ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, আর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নতুন যুদ্ধবাজদের দ্বারা পুরানো যুদ্ধবাজদের বদলিয়েছে এবং শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উৎপীড়ন আগের চেয়েও অধিক তীব্রতর করে তুলেছে। কোয়াংতুং থেকে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়েছিল, মাঝপথে তার নেতৃত্ব মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদারশ্রেণীর কুক্ষিগত হয়েছে এবং তখন থেকেই সেটা প্রতিবিপ্লবের পথে মোড় নিয়েছে। সারা দেশের শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ জনগণ, এমনকি বুর্জোয়াশ্রেণীও[১] আগের মতোই প্রতিবিপ্লবী শাসনাধীনে রয়েছে এবং সামান্যতম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিও অর্জন করেনি।

পিকিং ও থিয়েনচিন দখল করার আগে চাং চো-লিনের[২] বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙের নতুন যুদ্ধবাজদের চারটি চক্র—অর্থাৎ চিয়াং চক্র, কুই চক্র, ফেং চক্র এবং ইয়েন চক্র[৩] একটি সাময়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই শহরগুলি দখল করার পর এই ঐক্য সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গিয়েছিল, এই চার চক্রের ভেতরে তীব্রতর লড়াইয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, আর চিয়াং ও কুই এই দু'টি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ-প্রস্তুতি চলছিল। চীন দেশের ভেতরকার যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন চক্রের দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকেই প্রতিফলিত করে। এই জন্যই, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে চীনকে বিভক্ত করার অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন

এই প্রবন্ধটি হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের জন্য ১৯২৮ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক লিখিত প্রস্তাবের 'রাজনৈতিক সমস্যা এবং সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের কর্তব্য' শীর্ষক অংশ।

চক্র কোন অবস্থাতেই আপোষ করতে পারবে না, এবং যে-কোন আপোষেই তারা পৌছাক না কেন, তা হবে কেবলমাত্র সাময়িক। আজকের সাময়িক আপোষই আগামীকালের আরও বিরাটাকারের যুদ্ধকে জন্ম দেবে।

একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চীনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এই বিপ্লব কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্পন্ন হতে পারে। ১৯২৬-২৭ সালের যে বিপ্লব কোয়াংতুং থেকে শুরু হয়ে ইয়াংসি নদীর দিকে বিস্তৃত হয়েছিল, তাতে সর্বহারাশ্রেণী দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব দিতে না পারার ফলে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদারশ্রেণী এই নেতৃত্বকে কব্জা করে নিয়েছিল, বিপ্লবকে প্রতিবিপ্লবে বদলে দিয়েছিল। এইভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করেছিল। এই পরাজয়ে চীনা সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষকরা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল, চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীও (মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদার-শ্রেণী নয়) আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু, বিগত কয়েক মাসে উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শহরগুলিতে শ্রমিকদের সুসংগঠিত ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের বিদ্রোহ বিকাশলাভ করেছে। ক্ষুধা ও ঠাণ্ডার কারণে যুদ্ধবাজদের বাহিনীগুলোর সৈন্যদের মধ্যে একটা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াং চিং-ওয়ে এবং ছেন কুঙ-পো চক্রের উস্কানিতে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় ও ইয়াংসি নদীর ধারে বুর্জোয়াশ্রেণী বেশ ব্যাপক সংস্কারবাদী আন্দোলন[৪] বিস্তৃত করছে। এই ধরনের আন্দোলনের বিকাশ একটা নতুন ঘটনা।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশানুসারে চীনা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—চীনে সাম্রাজ্যবাদের এবং তার হাতিয়ার যুদ্ধবাজদের শাসনকে উৎখাত করা, জাতীয় বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করা, ভূমি-বিপ্লবকে কার্যকরী করা, কৃষকদের উপর জমিদারশ্রেণীর সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে নিশ্চিহ্ন করা। ১৯২৮ সালের মে মাসে চিনান হত্যাকাণ্ডের[৫] পরে এই ধরনের বিপ্লবী আন্দোলন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

২। চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ও টিঁকে থাকার কারণ[৬]

একটি দেশের অভ্যন্তরে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় একটি বা কয়েকটি ছোট ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক

ক্ষমতার দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকাটা এমন একটা ব্যাপার, যা দুনিয়ার অন্যান্য দেশে আর কখনো ঘটেনি। এই উদ্ভুত ব্যাপারটার উদ্ভবের বিশেষ কারণ আছে। শুধুমাত্র উপযুক্ত শর্তেই এটা টিঁকে থাকতে ও বিকাশলাভ করতে পারে।

প্রথমত:, কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশে বা সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন কোন উপনিবেশে[৭] এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে না। এটা ঘটতে পারে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ শাসনাধীন ও অর্থনীতিগত ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এবং আধা-ঔপনিবেশিক চীনেই। কারণ, এই ধরনের অদ্ভুত রাজনৈতিক ব্যাপার অবশ্যই আর একটি অদ্ভুত ব্যাপারের সহগামী এবং সেটা হল শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যেকার যুদ্ধ। চীনা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবার প্রথম বছর (১৯১২ সাল) থেকেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের এবং দেশের অভ্যন্তরে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর আর জমিদারশ্রেণীর সমর্থিত নতুন এবং পুরানো যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন চক্র একে অন্যের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে। এটাই হল আধা-ঔপনিবেশিক চীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশেই, এমনকি সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন উপনিবেশেও এ ধরনের ব্যাপার কখনো দেখতে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ শাসনাধীন চীনের মতো দেশেই এ ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারটা উদ্ভবের দুটি কারণ ছিল, যথা স্থানীয় কৃষি অর্থনীতি (ঐক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়), এবং দেশকে ভাগ ও শোষণ করার উদ্দেশ্যে প্রভাবাধীন অঞ্চল সৃষ্টি করার সাম্রাজ্যবাদী নীতি। শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল ধরে ভাঙনের ও যুদ্ধের ফলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যাতে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা চারদিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত একটি বা কয়েকটি ছোট ছোট লাল এলাকার উদ্ভব ঘটতে পারে এবং দৃঢ়ভাবে তা টিঁকে থাকতে পারে। হুনান-কিয়াংসী সীমান্তের ঘাঁটি এলাকা হচ্ছে এমন অনেক ছোট ছোট এলাকার অন্যতম। কিছু কিছু কমরেডদের মনে কঠিন বা সংকটজনক সময়ে প্রায়ই এই ধরনের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার টিঁকে থাকা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে এবং তাঁদের মধ্যে হতাশার মনোবৃত্তি গজিয়ে ওঠে। এর কারণ হল যে, তাঁরা এই লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ও এর টিঁকে থাকা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি। আমরা যদি শুধু এই কথাটুকু উপলব্ধি করি যে, চীনে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার

অভ্যন্তরে ভাঙন ও যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে, তাহলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব, টি'কে থাকা এবং ক্রমবর্ধমান বিকাশ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ, চীনের যেসব অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রথমে উদ্ভব ঘটে এবং দীর্ঘকাল ধরে টি'কে থাকতে সক্ষম হয়, তা সেসব অঞ্চলে নয়, যেখানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েনি, যেমন, সেছুয়ান, কুইচৌ ইয়ুন্নান এবং উত্তর চীনের বিভিন্ন প্রদেশে, বরং এমন সব অঞ্চলে প্রথমে তার উদ্ভব ঘটে এবং দীর্ঘকাল ধরে টি'কে থাকতে সক্ষম হয়, যেখানে ১৯২৬-২৭ সালে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যসাধারণ ব্যাপকভাবে জেগে উঠেছিল, যেমন, হুনান, কোয়াংতুং হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশে। এই-সব প্রদেশের বহু স্থানেই ব্যাপক আকারের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছিল। জমিদারশ্রেণীর এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকেরা বহু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়েছিল। তাই, ক্যান্টন শহরে জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ঘটেছিল এবং তিন দিন ধরে তা টি'কে ছিল, কোয়াংতুং প্রদেশের হ্যাইফেঙ ও লুফেঙে, হুনান প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে, হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে এবং হুপে প্রদেশের হুয়াং-আন প্রভৃতি স্থানে কৃষকদের ঘাঁটি এলাকা[৮] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান লাল-ফৌজের কথা বলতে গেলে, সেটা জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ থেকে বিছিন্ন হয়ে এসেছে, যা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ট্রেনিং পেয়েছিল এবং শ্রমিক-কৃষকসাধারণের প্রভাবাধীন ছিল। যাদের দ্বারা লালফৌজের ইউনিট গঠিত হতে পারে, তারা ইয়েন সি-সান, চাং চো-লিনের মতো বাহিনী থেকে কোনমতেই বেরিয়ে আসতে পারে না—যা কোন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ট্রেনিং পায়নি এবং শ্রমিক-কৃষকদের প্রভাব একটুও লাভ করেনি।

তৃতীয়তঃ, ছোট ছোট এলাকায় জনসাধারনের রাজনৈতিক ক্ষমতার দীর্ঘ-কাল ধরে টি'কে থাকা সম্ভব কি না, তা নির্ভর করে দেশব্যাপী বিপ্লবী পরিস্থিতি বিকশিত হচ্ছে কি না সেই শর্তের উপর। যদি দেশব্যাপী বিপ্লবী পরিস্থিতি বিকশিত হতে থাকে, তাহলে ছোট ছোট লাল এলাকা যে শুধু নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল ধরে টি'কে থাকবে তাই নয়, পরন্তু, দেশব্যাপী রাজ-নৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে অবশ্যই তা অনেক শক্তির মধ্যে অন্যতম শক্তিতে পরিণত হবে। যদি দেশব্যাপী বিপ্লবী পরিস্থিতি অব্যাহতভাবে

বিকশিত না হয়ে বরং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে নিশ্চল থাকে, তাহলে ছোট ছোট লাল এলাকার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকা অসম্ভব হবে। দেশের অভ্যন্তরে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদারশ্রেণীর ভেতরকার এবং আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর ভেতরকার অব্যাহত ভাঙন ও যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে চীনা বিপ্লবী পরিস্থিতিও অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে। সে জন্যই, ছোট ছোট লাল এলাকাগুলো শুধু যে নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকবে তা নয়, বরং তা অব্যাহতভাবে বিস্তৃত হতে থাকবে এবং ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যের দিকে উপনীত হতে থাকবে।

চতুর্থতঃ লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার টিঁকে থাকার একটা অপরিহার্য শর্ত হল যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন নিয়মিত লালফৌজের অস্তিত্ব। কেবলমাত্র যদি স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনী[৯] থাকে এবং কোন নিয়মিত লালফৌজ না থাকে, তাহলে কেবল জমিদারদের পোষা রক্ষী বাহিনীর সঙ্গেই মোকাবিলা করা সম্ভব, কিন্তু কোন নিয়মিত শ্বেত বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। অতএব শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সক্রিয় সমর্থন সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন নিয়মিত সৈন্যবাহিনী না থাকলে একটি ঘাঁটি এলাকা সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব, আর তার দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকা ও ক্রমবর্ধমান বিকাশলাভ করা তো আরও অসম্ভব। তাই, 'শ্রমিক-কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা'র মতাদর্শ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা কমিউনিস্ট পার্টি ও ঘাঁটি এলাকার শ্রমিক-কৃষকসাধারণকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

পঞ্চমতঃ, লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার দীর্ঘকালীন অস্তিত্ব এবং বিকাশের জন্য উপরোক্ত শর্তগুলো ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত থাকা প্রয়োজন, সেটা হল কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনকে শক্তিশালী হতে হবে এবং তার নীতি নির্ভুল হতে হবে।

৩। হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে স্বাধীন এলাকা এবং আগস্টের পরাজয়

যুদ্ধবাজদের মধ্যে ভাঙন ও যুদ্ধ শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার শাসনশক্তিকে দুর্বল করে। অতএব, এই সুযোগ-সুবিধা পেয়েই ছোট ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু, যুদ্ধবাজদের মধ্যে যুদ্ধ প্রতিদিনই

চলে না। যখনই একটি বা কয়েকটি প্রদেশে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতা সাময়িকভাবে স্থায়ী হয়, তখনই সেখানকার শাসকশ্রেণীগুলো অপরিহার্যভাবেই জোট বাঁধে এবং এই লাল রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধ্বংস করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যে স্থানে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করার এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করা না হয়, সে স্থানে শত্রুর দ্বারা তার উৎখাত হয়ে যাবার আশংকা থাকে। এই কারণেই, বর্তমান বছরের এপ্রিল মাসের আগে বেশ অনুকূল সময় গড়ে ওঠা বহু লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা, যেমন, ক্যান্টন, হাইফেঙ এবং লুফেঙ, হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকা, দক্ষিণ হুনান, লিলিঙ আর হুয়াংআন প্রভৃতি স্থানের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা একের পর এক বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এপ্রিল মাসের পর থেকে হুনান-কিয়াংসী সীমান্তের স্বাধীন এলাকা দক্ষিণ চীনে শাসনশক্তির সাময়িক স্থায়িত্বের কালের সম্মুখীন হয়েছিল, হুনান-কিয়াংসী প্রদেশ দু'টিতে প্রেরিত 'দমন বাহিনী'র সংখ্যা মাঝে মাঝে আট, ন'টি রেজিমেণ্ট বা তারও বেশি এমনকি কখনো কখনো ১৮টি রেজিমেণ্ট পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চার রেজিমেণ্টেরও কম সৈন্যশক্তি নিয়ে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ চার মাস ধরে সংগ্রাম করেছি। তার ভেতর দিয়েই দিনের পর দিন আমাদের স্বাধীন এলাকা বিস্তৃত করা হয়েছে, ভূমি-বিপ্লবকে গভীরতর করা হয়েছে, জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠনকে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং লালফৌজ ও লালরক্ষী বাহিনীকে প্রসারিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, হুনেন-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি-সংগঠনের (স্থানীয় ও সৈন্যবাহিনীর) নীতির নির্ভুলতা। পার্টির বিশেষ কমিটির ও ফৌজী কমিটির নীতি তখন ছিল নিম্নরূপ:

শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা, লোসিয়াও পর্বতমালার[১০] মধ্যে-ভাগে রাজনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি করা এবং পলায়নবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

স্বাধীন এলাকায় ভূমি-বিপ্লবকে গভীরতর করা।

সৈন্যবাহিনীর পার্টি-সংগঠনের সাহায্যে স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের বিকাশকে উন্নত করা এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় সশস্ত্র শক্তির বিকাশকে উন্নত করা।

সুবিধাজনক সময়ে আক্রমণরত শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য লাল-ফৌজের ইউনিটগুলোকে কেন্দ্রীভূত করা এবং একটি একটি করে শত্রুর দ্বারা ধ্বংস হওয়াটা এড়ানোর জন্য সৈন্যবাহিনীর বিভক্তিকরণের বিরোধিতা করা।

স্বাধীন এলাকাকে বিস্তৃত করার জন্য তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে এগিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করা এবং বেপরোয়া অগ্রগতির নীতির বিরোধিতা করা।

এই সঠিক রণকৌশলের কারণে ও ভৌগোলিক পরিবেশ আমাদের সংগ্রামের অনুকূল থাকায়, এবং হুনান ও কিয়াংসী প্রদেশের আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকায় আমরা এপ্রিল থেকে জুলাই এই চার মাসে বহু সংগ্রামে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। যদিও শত্রুবাহিনী আমাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল, তবু তারা এই স্বাধীন এলাকা ধ্বংস করতে পারেনি এবং এই স্বাধীন এলাকার ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির গতিও রোধ করতে পারেনি, বরং আমাদের এই স্বাধীন এলাকা হুনান ও কিয়াংসীর উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করেই চলেছে। আগস্টের পরাজয়ের একমাত্র কারণ হলো, কিছু সংখ্যক কমরেড এ কথা উপলব্ধি করতে পারেননি যে, সে সময়টা ছিল শাসকশ্রেণীগুলোর সাময়িক স্থায়িত্বের সময় এবং তাঁরা শুধু শাসকশ্রেণীগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ভাঙনের সময়েই প্রযোজ্য রণনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং বেপরোয়া অগ্রগতির জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। ফলতঃ, সীমান্ত এলাকা এবং দক্ষিণ হুনান উভয় স্থানেই আমাদের পরাজয় ঘটেছিল। হুনান প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি কমরেড তু সিউ-চিঙ তখনকার অবস্থা না দেখে এবং পার্টির বিশেষ কমিটি, ফৌজী কমিটি ও পার্টির ইউংশিন জেলা-কমিটি যুক্ত বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেই যান্ত্রিকভাবে হুনান প্রাদেশিক কমিটির আদেশ অনুসরণ করেছিলেন এবং লালফৌজের ২৯ নং রেজিমেণ্টের সংগ্রামকে এড়িয়ে বাড়ী ফিরে যেতে চাওয়ার অভিমতই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। এটা সত্যিই একটা মারাত্মক ভুল। সেপ্টেম্বর মাসের পর পার্টির বিশেষ কমিটি ও ফৌজী কমিটি ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল বলেই এই পরাজয় থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি কাটানো গিয়েছিল।

৪। হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশে হুনান কিয়াংসী সীমান্তের স্বাধীন এলাকার ভূমিকা

নিঙকাঙকে কেন্দ্র করে হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে গঠিত শ্রমিক-কৃষকদের সশস্ত্র স্বাধীন এলাকার তাৎপর্য সীমান্তের কয়েকটি জেলার মধ্যে নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ নয়। হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশগুলোর শ্রমিক-কৃষকদের অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে এই তিনটি প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ার এই ধরনের স্বাধীন এলাকাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী এই তিনটি প্রদেশে অভ্যুত্থানের বিকাশসাধনে সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ জরুরী কর্তব্য হচ্ছে এইরূপ: সীমান্ত এলাকার ভূমি-বিপ্লবের এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার যে প্রভাব রয়েছে, তাকে হুনান ও কিয়াংসীর উত্তর অংশে এবং হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত করা; সংগ্রামের ধারায় অবিরামভাবে লালফৌজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং গুণগতভাবে উন্নত করা, যাতে এই তিনটি প্রদেশের আসন্ন সাধারণ অভ্যুত্থানে লালফৌজ তার প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে; জেলায় জেলায় স্থানীয় সশস্ত্র শক্তি অর্থাৎ লালরক্ষী বাহিনী ও শ্রমিক-কৃষকদের অভ্যুত্থানকারী বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও গুণগতভাবে উন্নত করা, যাতে তারা জমিদারদের দ্বারা লালিত রক্ষী বাহিনীর ও ছোট ছোট সশস্ত্র উইনিটের বিরুদ্ধে এখন লড়াই করতে পারে এবং ভবিষ্যতে সীমান্ত এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুরক্ষিত করতে পারে; লালফৌজের কর্মীদের সাহায্যের উপর স্থানীয় সংস্থাগুলোর নির্ভরশীলতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস করা এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল করা, যাতে সীমান্ত এলাকার কর্মিগণ সীমান্ত এলাকার কাজের ভার গ্রহণ করতে পারেন এবং স্থানীয় সংস্থাগুলো ভবিষ্যতে লালফৌজের জন্য ও সম্প্রসারিত স্বাধীন এলাকার জন্য কর্মী পাঠাতে পারে।

৫। অর্থনৈতিক সমস্যা

শ্বেত শাসনের দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সৈন্য ও জনগণের জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব এবং নগদ টাকার অভাব এক চরমতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বছর থেকে সীমান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাধীন এলাকায় শত্রুদের কঠোর অবরোধের কারণে লবণ, কাপড় ও ঔষধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চরম অভাব এবং দারুণ মূল্যবৃদ্ধি

সব সময়েই দেখা দিয়েছে। সুতরাং ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের[১১] জীবনযাত্রায় এবং লালফৌজের সৈন্যসাধারণের জীবনযাত্রার অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, কোন কোন সময়ে এই অশান্তি সত্যসত্যই চরম মাত্রায় উঠেছে। লাল-ফৌজকে একদিকে লড়াই করতে হচ্ছে, অপরদিকে অর্থাদিও সংগ্রহ করতে হচ্ছে। খাদ্যশস্য ছাড়া সৈন্যদের মাথাপিছু দৈনিক যে ৫ সেণ্ট করে খাদ্যভাতা দেওয়া হতো তারও অভাব ঘটছে, তাদের খাদ্য অপুষ্টিকর, অনেকেই অসুস্থ, হাসপাতালে আহত সৈন্যদের অবস্থা আরও শোচনীয়। অবশ্যই সারা দেশব্যাপী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগে এ রকম দুঃখ-কষ্ট অপরিহার্য, কিন্তু এই দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষাকৃতভাবে কাটিয়ে উঠাটা জীবনযাত্রাকে কিছুটা সহজ করাটা, বিশেষ করে লালফৌজের জন্য সরবরাহের ব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃতভাবে উন্নত করাটা আশু প্রয়োজন। সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠন যদি অর্থনৈতিক সমস্যার যথাযথ সমাধান করার জন্য উপায় খুঁজে বের করতে না পারে, তাহলে শত্রু-শক্তির অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের অবস্থায় স্বাধীন এলাকাকে বড় বেশি দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। এই অর্থনৈতিক সমস্যার যথাযথ সমাধানের দিকে অবশ্যই প্রত্যেকটি পার্টি-সদস্যকে নজর দিতে হবে।

৬। সামরিক ঘাঁটির সমস্যা

সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের আরও একটি কর্তব্য হচ্ছে পাঁচটি কুয়ো[১২] ও চিউলুঙের সামরিক ঘাঁটি এলাকাগুলোকে সুসংবদ্ধ করা। ইউংশিন, লিংসিয়েন, নিঙকাঙ এবং সুইচুয়ান জেলার সংযোগস্থলে পাঁচটি কুয়ো পাহাড়ী এলাকা এবং ইউংশিন, নিঙকাঙ, ছালিং ও লিয়েনহুয়া জেলার সংযোগস্থলে চিউলুঙ পাহাড়ী এলাকা উভয়েরই উৎকৃষ্ট সংস্থানিক সুবিধা রয়েছে। এটা কেবলমাত্র বর্তমানে সীমান্ত এলাকার জন্যই নয়, বরং ভবিষ্যতে হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশে অভ্যুত্থানের বিকাশ সাধনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি; বিশেষ করে পাঁচটি কুয়ো এলাকা —যেখানে জনগণের সমর্থনও যেমন আছে তেমনি সংস্থানিক বন্ধুরতাও আছে। এই ঘাঁটিগুলোকে সুসংবদ্ধ করার উপায় হচ্ছে: প্রথম, পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা; দ্বিতীয়, যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুত করা; তৃতীয়, লাল-ফৌজের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল হাসপাতাল স্থাপন করা। এই তিনটি কাজ কার্যকরী করতে সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনকে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

টীকা

১। কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। 'জাপান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীনীতি সম্পর্কে' (ডিসেম্বর, ১৯৩৫) এবং 'চীনা বিপ্লব ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (ডিসেম্বর, ১৯৩৯)—এই দুটি প্রবন্ধের মধ্যে কমরেড মাও সে-তুঙ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

২। চাং চো-লিন ছিল ফেংথিয়েন চক্রের যুদ্ধবাজদের পাণ্ডা। ১৯২৪ সালে দ্বিতীয় চিলি-ফেংথিয়েনযুদ্ধে উ পেই-ফু পরাজিত হবার পর চাং চো-লিন উত্তর চীনে সবচাইতে শক্তিশালী যুদ্ধবাজে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৬ সালে, সে উ পেই-ফুয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে পিকিং অভিমুখে অভিযান করে তা দখল করেছিল। ১৯২৮ সালের জুন মাসে সে পিকিং থেকে রেলযোগে উত্তর-পূবে পশ্চাদপসরণ করছিল, তখন জাপান সাম্রাজ্যবাদী—যারা তাকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছিল, তাদেরই সংস্থাপিত বোমায় পথের মধ্যে সে নিহত হয়।

৩। 'চিয়াং চক্র' অর্থাৎ 'চিয়াং কাই-শেক চক্র'। 'কুই চক্র' মানে কোয়াংসী প্রদেশের যুদ্ধবাজ লি চোং-জেন ও পাই ছুং-শি চক্র। 'ফেং চক্রের' অর্থ হচ্ছে ফেং ইউ-সিয়াং চক্র। 'ইয়েন চক্র' মানে শানসী যুদ্ধবাজ ইয়েন সি-সান চক্র। যুদ্ধবাজ এই চারটি চক্র একত্রিত হয়ে চাং চো-লিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ১৯২৮ সালের জুন মাসে পিকিং ও থিয়েনচিনকে দখল করেছিল।

৪। ১৯২৮ সালের ৩রা মে, জাপান আক্রমনকারীর চিনান দখল এবং চিয়াং কাই-শেকের প্রকাশ্যভাবে ও নির্লজ্জভাবে জাপানের সঙ্গে আপোষ করার পর জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, যা ১৯২৭ সালের প্রতিবিপ্লবী ক্যু-দেতার সমর্থন করেছিল, তার এক অংশ নিজেদের স্বার্থের জন্য ক্রমে ক্রমে চিয়াং কাই-শেকের শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দল গঠন করেছিল। ওয়াং চিং-ওয়ে, ছেন কুঙ-পো ও অন্যদের প্রতিবিপ্লবী মতলববাজ চক্র এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিল এবং কুওমিন তাঙের ভেতরে তথাকথিত 'পুনর্গঠন দল' সৃষ্টি হয়েছিল।

৫। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে চিয়াং কাই-শেক উত্তরে গিয়ে চাং চো-লিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। ব্রিটিশ-আমেরিকান শক্তিকে উত্তর চীনে বিস্তারলাভে বাধা দানের উদ্দেশ্যে জাপান সাম্রাজ্য-বাদীরা সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সানতুং প্রদেশের রাজধানী চিনান দখল করে নেয়

এবং থিয়েনচিন-পুখৌ রেললাইন কেটে দেয়। ওরা যে তারিখে জাপান আক্রমণকারী বাহিনী চিনানে অনেক চীনা অধিবাসীকে হত্যা করেছিল। এটা চিনান হত্যাকাণ্ড বলে পরিচিত।

৬। চীনা লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার সাংগঠনিক রূপ, সোভিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতার সাংগঠনিক রূপের অনুরূপ। সোভিয়েত অর্থাৎ প্রতিনিধি-পরিষদ, ১৯০৫ সালে বিপ্লবের কালে রুশ শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সৃষ্টি এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। মার্কসবাদের তত্ত্ব থেকে লেনিন এবং স্তালিন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের কালে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রই হচ্ছে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের সবচেয়ে উপযোগী রূপ। লেনিন ও স্তালিনের বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব, ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বে সর্বপ্রথম এই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্রকে বাস্তবে রূপ দিল। চীনে ১৯২৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর কমরেড মাও সে-তুঙের পরিচালনাধীন চীনা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণের বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটেছে, জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিনিধি-পরিষদের রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু, চীনা বিপ্লবের এই পর্যায়ে, এই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি থেকে এটা ভিন্ন।

৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, প্রাচ্যের অনেক ঔপনিবেশিক দেশ, যা পূর্বে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড সাম্রাজ্যবাদের শাসনাধীন ছিল, তা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই সকল দেশে ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়ারা এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিরা বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাপান সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুক্তফ্রণ্ট গঠন করেছিল, জাপানবিরোধী ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল। এইভাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপান সাম্রাজ্যবাদকে এই ঔপনি

বেশিক দেশগুলো থেকে বিতাড়িত করা হল। তবু আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের আগেকার ঔপনিবেশিক শাসন অব্যাহত রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু উপনিবেশগুলোর জনগণ জাপানবিরোধী যুদ্ধের সময়ে বেশ বলিষ্ঠ সশস্ত্র শক্তি গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা পূর্বেকার মতো জীবনযাপন করতে চাননি। অধিকন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিশালী হবার কারণে, আমেরিকা ছাড়া সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ যুদ্ধের মধ্যে পালটে যাবার বা দুর্বল হবার কারণে এবং অবশেষে চীনা বিপ্লবের বিজয়ের ফলে চীনে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে ফাটল ধরার কারণে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা গভীরভাবে নড়ে উঠেছিল। এইভাবে, প্রায় চীনের মতোই প্রাচ্যের বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের পক্ষে, অন্ততঃ কোন কোন ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের পক্ষে ছোট অথবা বড় বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা ও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলোকে ঘেরাও করার বিপ্লবী যুদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাওয়া এবং ক্রমে ক্রমে অভিযান চালিয়ে শহরগুলো দখল করা ও এই ঔপনিবেশিক দেশে দেশব্যাপী বিজয় অর্জন করা সম্ভব।

৮। ১৯২৭ সালে, চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়ে পর পর বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরোধিতা করার জন্য বিভিন্ন স্থানের জনগণের প্রথম প্রত্যাঘাতের কথা এখানে বলা হয়েছে। ১৯২৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর, ক্যান্টনে, শ্রমিকেরা ও বিপ্লবী সৈনিকেরা একসঙ্গে বিদ্রোহ করলেন, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করলেন। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থিত ও সাহায্য-প্রাপ্ত প্রতিবিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তীব্রভাবে লড়াই করলেন, কিন্তু, শক্তির বৈষম্য খুব বেশি বলে জনগণের এ বিদ্রোহটা ব্যর্থ হল। কোয়াংতুং প্রদেশের পূর্বে সমুদ্রতীরবর্তী হাইফেঙ ও লুফেঙের কৃষকেরা ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কমরেড পেঙ পাইয়ের নেতৃত্বে এক শক্তি-শালী আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করেছিলেন। ছেন চিওং-মিনের প্রতিবিপ্লবী চক্রের বিরুদ্ধে ক্যান্টন থেকে পরিচালিত এই আন্দোলনটা জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীকে দুবার পূর্ব অভিযানের বিজয় অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল, চিয়াং কাই-শেক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে, সেখানকার কৃষকেরা তিনবার

বিদ্রোহ করেছিলেন এবং হাইফেঙ-লুফেঙ নিকটবর্তী এলাকায় যে বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত টিঁকে ছিল। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুনান প্রদেশের পূর্ব অঞ্চলে বিদ্রোহী কৃষকেরা লিউইয়াং, পিংচিয়াং লিলিং এবং চুচৌ সংলগ্ন এলাকাগুলো দখল করেছিলেন। প্রায় একই সময় হুপে প্রদেশের উত্তর-পূর্ব দিকের সিয়াওকান, মাছেঙ এবং হুয়াংআন প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার কৃষক সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ত্রিশ দিনের অধিক সময় পর্যন্ত তাঁরা হুয়াংআন জেলাশহর দখল করে রেখেছিলেন। দক্ষিণ হুনানে, ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে ইচাং ছেনচৌ, লেইইয়াং ইউংশিং ও চিসিং জেলার বিদ্রোহী কৃষকেরা যে বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করেছিলেন, তা তিন মাসেরও বেশি টিঁকে ছিল।

৯। লালরক্ষী বাহিনী—এটা হচ্ছে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার জনসাধারণের সশস্ত্র সংগঠন। এর সদস্যরা উৎপাদনের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি।

১০। লোসিয়াও পর্বতমালা হচ্ছে কিয়াংসী ও হুনান প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত বিরাট পর্বতমালা। চিংকাং পাহাড় এই পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

১১। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ 'পেটি-বুর্জোয়া' এই শব্দটির দ্বারা কৃষকদের ছাড়া যেসব লোকদের কথা বুঝিয়েছেন, তারা হচ্ছে হস্তশিল্পী ক্ষুদে ব্যবসায়ী, বিভিন্ন স্বাধীন পেশাদারী এবং পেটি বুর্জোয়াদের থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীরা। চীনে এই ধরনের সামাজিক সম্প্রদায় প্রধানতঃ শহরে-নগরে বাস করে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলেও তাদের সংখ্যা বেশ প্রচুর।

১২। 'পাঁচটি কুয়ো'র অর্থ হচ্ছে চিংকাং পাহাড়ের পাঁচটি গ্রাম—বড় কুয়ো, ছোট কুয়ো, উঁচু কুয়ো, মাঝারি কুয়ো ও নীচু কুয়ো। কিয়াংসী প্রদেশের পশ্চিমে ইউংশিন, নিঙকাঙ, সুইজুয়ান ও হুনান প্রদেশের পূর্বে লিংসিয়েনে এগুলি অবস্থিত।

চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম

(নভেম্বর ২৫, ১৯২৮)

হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে স্বাধীন এলাকা এবং আগস্টের পরাজয়

বর্তমান পৃথিবীতে চীনই একমাত্র দেশ, যেখানে শ্বেত শাসনের পরিবেষ্টনীর মধ্যে এক বা একাধিক ছোট ছোট অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ঘটেছে। বিশ্লেষণ করে ধরা পড়ছে যে, এই ঘটনার অন্যতম কারণ হচ্ছে চীনের মুৎসুদ্দি ও জমিদারশ্রেণীর মধ্যে অবিরাম খেয়োখেয়ি ও যুদ্ধ। যতদিন এই খেয়োখেয়ি ও যুদ্ধ চলবে, ততদিন শ্রমিক ও কৃষকদের সশস্ত্র স্বাধীন এলাকার অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব। তাছাড়া, এর অস্তিত্ব ও বিকাশ নিম্ন-লিখিত শর্তগুলির ওপর নির্ভর করছে: (১) গভীর গণভিত্তি, (২) দৃঢ় পার্টি-সংগঠন, (৩) রীতিমতো শক্তিশালী লালফৌজ, (৪) সামরিক কার্যকলাপের উপযোগী ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, এবং (৫) জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সম্পদ।

পরিবেষ্টনরত শাসকশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে স্বাধীন এলাকার রণনীতি হবে পরিবর্তনশীল। শাসকশ্রেণীর সামরিক স্থায়িত্বের সময় এটা হবে এক রকম আবার তাদের খেয়োখেয়ির সময় তা হবে আর এক রকম। শাসকশ্রেণীগুলি যখন বিভক্ত, যেমন, হুনান ও হুপে প্রদেশে[১] লি সুং জেন ও তাং শেং চি'র মধ্যে এবং কোয়াংতুং প্রদেশে[২] চ্যাং ফা-কুয়েই এবং লি চি-শেন-এর মধ্যে যুদ্ধের সময়ে, তখন আমাদের রণনীতি তুলনামূলকভাবে দুঃসাহসিক হতে পারে এবং সামরিক অভিযানের মাধ্যমে অধিকৃত অঞ্চলের আয়তন তুলনামূলকভাবে বড় হতে পারে। তবে আমাদের অবশ্যই কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলবার ওপর জোর দিতে হবে, যাতে শ্বেত সন্ত্রাস আঘাত হানলে নির্ভর করার মতো কিছু অঞ্চল আমাদের অধিকারে থাকে। আর যখন শাসকশ্রেণীগুলির রাজত্ব তুলনামূলকভাবে স্থায়ী, যেমন এ বছর এপ্রিল মাসের পরে দক্ষিণের

এই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করা কমরেড মাও সে-তুঙ-এর একটি রিপোর্ট

প্রদেশগুলিতে হয়েছে, তখন আমোদের রণনীতি অবশ্যই হবে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাবার। এরকম সময়ে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হবে দুঃসাহসিক অভিযানের জন্ম আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দেওয়া; আর স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে (জমি-বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, পার্টির সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় সশস্ত্র শক্তির সংগঠন) সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হবে আমাদের কর্মীদের ছড়িয়ে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে অবহেলা করা। কিছু ছোট ছোট লাল এলাকায় যে পরাজয় ঘটেছে, তার কারণ হচ্ছে, হয় উপযুক্ত বাস্তব অবস্থার অভাব, না হয় কৌশলগত বিষয়ে বিষয়ীগত ত্রুটি। শাসকশ্রেণীগুলির সাময়িক স্থায়িত্ব এবং তাদের খেয়োখেয়ি—এই দুই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করার ব্যাপারে ব্যর্থতাই হচ্ছে কৌশলগত ত্রুটির একমাত্র কারণ। সাময়িক স্থায়িত্বের সময় কিছু কিছু কমরেড আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দুঃসাহসিক অভিযানের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, এমনকি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পর্যন্ত তাঁরা শুধুমাত্র লালরক্ষী বাহিনীর ওপর ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। শত্রুরা যে জমিদারদের প্রেরিত সৈন্যদল ছাড়াও নিয়মিত সৈন্য-বাহিনী নিয়ে সংগঠিত আক্রমণ করতে পারে, এ কথাটাই তাঁরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করার কাজে অবহেলা করেছিলেন, এবং আমাদের সামর্থ্যের কথা চিন্তা না করেই ইচ্ছেমতো সম্প্রসারণের জন্ম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কেউ সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির কথা বললে, বা স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এলাকাগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করে নিজেদের অবস্থানকে দুর্ভেদ্য করে তোলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে সুসংবদ্ধ করবার কথা বললে তাঁরা তাকে 'রক্ষণশীল' হিসেবে চিহ্নিত করতেন। এদের ভুল ধারণাগুলির জন্যই আগস্ট মাসে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে এবং চতুর্থ লালফৌজের পরাজয় বরণ করতে হয়।

হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের কাজ শুরু হয়েছিল গত অক্টোবর মাসে। শুরুতে জেলাগুলোর পার্টি-সংগঠনগুলি ছিল পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী বলতে চিংকাং পাহাড়ের কাছে য়ুয়ান ওয়েন-সাই এবং ওয়াং সো'র নেতৃত্বে দুটি মাত্র ছোট দল ছিল। প্রতিটি দলের ছিল মাত্র ষাটটি করে ভাঙা রাইফেল। অন্যদিকে, য়ুংসীন, লিয়েনহুয়া, চালিং ও

লিংসীয়েনের কৃষকদের আত্মরক্ষা বাহিনীগুলোর জমিদারশ্রেণী পুরোপুরি নিরস্ত্র করে ফেলেছিল, জনগণের বিপ্লবী উদ্যমও হয়ে পড়েছিল অবদমিত। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই নিংকাং, য়ুংসীন, চালিং ও সুইজুয়ান জেলাতে পার্টি-কমিটি গঠিত হয়েছে, লিংসীয়েনে গঠিত হয়েছে বিশেষ এক জেলা পার্টি-কমিটি, এবং লিয়েনহুয়াতেও একটি পার্টি-সংগঠন কাজ করতে শুরু করেছে ও ওয়ানান জেলা কমিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। লিংসীয়েন ছাড়া প্রত্যেক কাউন্টিতেই কয়েকটা করে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে। নিংকাং, চালিং, সুইজুয়ান ও য়ুনসীনে, বিশেষ করে শেষ দু'টি জেলাতে জমিদারদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি গেরিলা অভ্যুত্থান ঘটেছে। এগুলো জনগণকে জাগিয়ে তুলেছে, এবং বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। সে সময় পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লব খুব বেশি এগিয়ে যায়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠনগুলোকে বলা হতো শ্রমিক, কৃষক ও যোদ্ধাদের সরকার। সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যদের কমিটি[৩] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সৈন্যরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেতে গেলে, তাদের পরিচালনার জন্য গঠিত হতো সংগ্রাম-কমিটি। পার্টির পরিচালক সংস্থা ছিল ফ্রন্ট কমিটি (তার সম্পাদক ছিলেন মাও সে-তুঙ), শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থানের সময় হুনান প্রাদেশিক কমিটি এই কমিটিকে সংগঠিত করেছিল। মার্চের প্রথমদিকে দক্ষিণ হুনান বিশেষ কমিটির অনুরোধে ফ্রন্ট কমিটিকে ভেঙে দিয়ে ডিভিশনাল পার্টি কমিটি হিসেবে (তার সম্পাদক ছিলেন হো তিং-থিং) পুনর্গঠিত করা হল। এটা হল সেনাবাহিনীর পার্টি সংগঠনগুলির ভারপ্রাপ্ত কমিটি, স্থানীয় পার্টি-সংগঠনগুলির ওপর এর কোন কর্তৃত্ব রইল না। এদিকে মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে দক্ষিণ হুনানে পাঠানো হল বিশেষ কমিটির অনুরোধে, এবং তার ফলে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে একমাসেরও বেশি শত্রুর অধিকারে চলে গেল। মার্চের শেষে পরাজয় ঘটল দক্ষিণ হুনানে। এপ্রিলে চু তে ও মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন বাহিনীগুলি দক্ষিণ হুনানের কৃষক বাহিনীর সঙ্গে একসাথে নিংকাঙে সরে গিয়ে সীমান্ত অঞ্চলে স্বাধীন এলাকা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করল।

এপ্রিলের পর থেকে হুনান কিয়াংসীর স্বাধীন এলাকা সাময়িক স্থায়িত্বসম্পন্ন শাসকশক্তির সম্মুখীন হল। আমাদের 'দমন' করার জন্য হুনান এবং কিয়াংসী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সৈন্যদের অন্ততঃ আট-নটা বাহিনীকে, কখনও কখনও আঠারোটা পর্যন্ত বাহিনী পাঠাত। কিন্তু

তবুও চার রেজিমেণ্টেরও কম সৈন্য নিয়ে আমরা চার মাস ধরে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছি, প্রতিদিন আমাদের স্বাধীন এলাকার অধীন ভূখণ্ডকে সম্প্রসারিত করেছি, কৃষি-বিপ্লব গভীরতর করে তুলেছি এবং জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা, লালফৌজ ও লালরক্ষী বাহিনীকে সম্প্রসারিত করেছি। সীমান্ত অঞ্চলের পার্টি-সংগঠনগুলির (স্থানীয় ও সামরিক) সঠিক নীতির জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ কমিটি (যার সম্পাদক ছিলেন মাও সে-তুঙ) এবং সেনাবাহিনীর পার্টি কমিটির (যার সম্পাদক ছিলেন চেন ঈ) কর্মনীতিগুলি ছিল নিম্নরূপ:

শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালানো, লোশিয়াও পর্বতমালার মাঝামাঝি অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং পলায়নী মনোবৃত্তির বিরোধিতা করা।

স্বাধীন এলাকায় কৃষি-বিপ্লবকে গভীরতর করা।

সেনাবাহিনীর পার্টি সংগঠনগুলির সাহায্যে স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির বিকাশ ঘটানো এবং নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলির বিকাশ ঘটানো।

হুনানের তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকা এবং কিয়াংসীর তুলনামূলকভাবে দুর্বল শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো।

য়ুংসীনের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা, সেখানকার জনগণের স্বাধীন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

অনুকূল সময়ে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করার জন্য লালফৌজের ইউনিট-গুলিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং আলাদাভাবে একে একে ধ্বংসপ্রাপ্তিকে এড়াবার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করার বিরোধিতা করা।

স্বাধীন এলাকার অধীনস্থ ভূখণ্ডকে সম্প্রসারিত করার জন্য ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে এগিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করা এবং হঠকারিতামূলক অগ্রগতির সাহায্যে সম্প্রসারণের নীতির বিরোধিতা করা।

এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এই চার মাসে আমরা যে বেশ কয়েকটি সামরিক বিজয় অর্জন করেছি এবং জনগণের স্বাধীন এলাকাকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছি, তার মূলে ছিল আমাদের সঠিক রণকৌশল, আমাদের সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল সীমান্ত এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা এবং হুনানে ও কিয়াংসী থেকে

আগত আক্রমণকারী সৈন্যদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের অক্ষমতা। আমাদের তুলনায় কয়েকগুণ শক্তিশালী হয়েও শত্রুরা আমাদের এলাকার সম্প্রসারণকে ঠেকাতে পারেনি, ধ্বংস করা তো দূরের কথা। হুনান ও কিয়াংসীর ওপর আমাদের সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়েছে। আগষ্ট মাসের পরাজয়ের একমাত্র কারণ হল এই যে, সেই সময়টা যে শাসকশ্রেণীর সাময়িক স্থায়িত্বের সময়, এটা না বুঝতে পেরে কিছু কমরেড শাসকশ্রেণীর মধ্যে খেয়োখেয়ির সময়ের উপযুক্ত কর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং দক্ষিণ হুনানে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালানোর জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। তার ফলে সীমান্ত এলাকা ও দক্ষিণ হুনান—দু' জায়গাতেই আমাদের পরাজয় ঘটেছিল। হুনান প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি তু সিউ-চিং এবং প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ কমিটির সম্পাদক ইয়াং কাই-মিং বাস্তব পরিস্থিতিটাই বুঝতে পারেননি। মাও সে-তুঙ, ওয়ান সী-সিয়েন এবং অন্যান্য যেসব কমরেড এদের মতের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন, তাঁরা তখন ছিলেন বহুদূরে য়ুংসীনে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এঁরা পার্টির সেনাকমিটি, বিশেষ কমিটি এবং য়ুংসিন কাউন্টি কমিটির যুক্ত সভার প্রস্তাবগুলিকে—যা আবার হুনান প্রাদেশিক কমিটির মতামতের বিরোধী ছিল—অগ্রাহ্য করেন। দক্ষিণ হুনানে অভিযান চালানোর জন্য হুনান প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশকে এঁরা যান্ত্রিকভাবে কার্যকরী করেন এবং লালফৌজের ২৯তম রেজিমেন্টের যুদ্ধ এড়িয়ে ঘরে ফিরবার ইচ্ছাকেই অনুসরণ করলেন। ফলে সীমান্ত অঞ্চল ও দক্ষিণ হুনান—দু'জায়গাতেই পরাজয় ঘটল।

প্রথমে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে উ শাঙের নেতৃত্বে অষ্টম বাহিনী হুনান থেকে নিংকাং আক্রমণ করে, য়ুংসিনে ঢুকে পড়ে, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে (আমাদের সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী একটা রাস্তা থেকে তাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের ধরতে পারে না) এবং তারপর আমাদের সমর্থক জনগণের ভয়ে লিয়েনহুয়ার মধ্য দিয়ে তাড়াহুড়া করে চালিং-এ পিছিয়ে যায়। ইতিমধ্যে লিংসিয়েন ও চালিং আক্রমণের জন্য নিংকাং থেকে অগ্রসরমান লালফৌজের প্রধান বাহিনী লিংসিয়েনে পৌছানোর পর নিজেদের পরিকল্পনা পাল্টে ফেলে এবং দক্ষিণ হুনানের দিকে এগোতে থাকে। অন্যদিকে, কিয়াংসী থেকে ওয়াংচুন ও চিন হান-তিঙের নেতৃত্বে তৃতীয় বাহিনীর পাঁচটি রেজিমেন্ট এবং হু ওয়েন-তৌ-এর নেতৃত্বে ষষ্ঠ বাহিনীর ছ'টি রেজিমেন্ট

একসঙ্গে য়ুংসিনে আক্রমণ শুরু করে। তখন য়ুংসিনে আমাদের মাত্র এক রেজিমেণ্ট সৈন্য ছিল। ব্যাপক জনগণের সাহায্যে আত্মগোপন করে থেকে তারা চারদিক থেকে গেরিলা আক্রমণ চালায়, এবং এই এগারো রেজিমেণ্ট শত্রুসৈন্যকে পঁচিশ দিন ধরে য়ুংসিন কাউণ্টি শহরের ত্রিশ লী ব্যাসার্ধের মধ্যে আটকে রাখে। শেষপর্যন্ত শত্রুর তীব্র আক্রমণের মুখে য়ুংসিন আমাদের হাতছাড়া হয়, এবং কিছুদিন পরে লিয়েনহুয়া ও নিংকাংও আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই সময় কিয়াংসী শত্রুসৈন্যদের মধ্যে হঠাৎ অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। হু ওয়েন-তৌ'র অধীনস্থ ষষ্ঠ বাহিনী তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে চ্যাংশাতে ওয়াং চুনের তৃতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। কিয়াংসীর বাকী পাঁচটি রেজিমেণ্ট তখন তাড়াতাড়ি য়ুংসিন কাউণ্টি শহরে পিছিয়ে যায়। আমাদের প্রধান বাহিনী দক্ষিণ হুনানে সরে না গেলে, এই শত্রু বাহিনীকে আমরা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারতাম, আমাদের স্বাধীন সরকারের এলাকাকে প্রসারিত করে কিয়ান, আন্‌ফু ও পিংসিয়াংকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারতাম, এবং একে সিংকিয়াং ও লিউইয়াং-এর সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের প্রধান বাহিনী দূরে থাকায় এবং বাকী রেজিমেণ্টটি অত্যন্ত ক্লান্ত থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, কিছু সৈন্য য়ুয়ান ওয়েন-সাই এবং ওয়াং সো'র নেতৃত্বাধীন ইউনিট দু'টির সহযোগিতায় চিংকাং পাহাড় রক্ষার জন্য থেকে যাবে, এবং বাকী সৈন্যদের নিয়ে আমি এগিয়ে গিয়ে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হব এবং তাদের ফিরিয়ে আনব। ইতিমধ্যে আমাদের প্রধান বাহিনী দক্ষিণ হুনান থেকে কুয়েইতুঙের দিকে পিছিয়ে আসে, এবং আমরা ২৩শে আগস্ট তাদের সঙ্গে মিলিত হই।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে লালফৌজের প্রধান বাহিনীটি লিংসিয়েনে এসে পৌঁছায়। ২৯তম রেজিমেণ্টের অফিসার ও সৈন্যরা তখন রাজনৈতিক দোদুল্যমানতা দেখাচ্ছিল এবং দক্ষিণ হুনানে তাদের ঘরে ফিরবার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। তারা নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। আবার ২৮তম রেজিমেণ্ট দক্ষিণ হুনানে না গিয়ে দক্ষিণ কিয়াংসীতে যাবার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু কোনমতেই তারা য়ুংসিনে ফিরে যেতে চাইছিল না। তু শিউ-চিং ২৯তম রেজিমেণ্টে ভুল চিন্তাকেই প্রশ্রয় দিল, সামরিক কমিটিও তাদের বুঝিয়ে উঠতে পারল না। ফলে ১৭ই জুলাই প্রধান বাহিনী লিংসিয়েন থেকে চেনচৌ'র দিকে রওনা হল। ২৪শে জুলাই চেনচৌতে ফ্যান শি-শেঙের নেতৃত্বাধীন শত্রুবাহিনীর

সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমদিকে সফল্য অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হল এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেল। এরপর ২৯নং রেজিমেণ্ট নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ঝিচাঙের পথে গৃহাভিমুখে এগোতে শুরু করল। এর ফল দাঁড়াল এই যে, এই বাহিনীর একটি অংশ লোচাঙে হু ফেং-চ্যাঙের দস্যু-বাহিনীর হাতে ধ্বংস হয়ে গেল, আরেকটি অংশ চেনচৌ-ইচাং অঞ্চলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং তাদের কোন খবর আর পাওয়া গেল না, শুধু দিনের শেষে শ'খানেকের মতো সৈন্যকে আবার জড়ো করা গেল। তবে আশার কথা এই যে, বাহিনীর প্রধান অংশ ২৮নং রেজিমেণ্টের খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হল না, ১৮ই আগস্ট তারা কুয়েইতুং দখল করল। ২৩শে আগস্ট এদের সঙ্গে চিংকাং পাহাড়ের সৈন্যরা এসে মিলিত হল, এবং তারপর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, এই সম্মিলিত বাহিনী চুংয়ি ও শাংয়ু'র পথে ফিরে যাবে। চুংয়িতে পৌঁছাবার পর ব্যাটেলিয়ান-কম্যাণ্ডার য়ুয়াং চুং চুয়ান এক কোম্পানি পদাতিক বাহিনী ও এক কোম্পানি গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে দলত্যাগ করে। কোম্পানি দু'টিকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল বটে, কিন্তু আমাদের রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার ওয়াং এর-চো এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। আমাদের বাহিনী গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবার আগেই হুনান ও কিয়াংসী থেকে আগত শত্রুসৈন্যরা সুযোগ বুঝে ৩০শে আগস্ট চিংকাং পাহাড় আক্রমণ করল। সুবিধাজনক অবস্থান থেকে প্রত্যাক্রমণ চালিয়ে আমাদের এক ব্যাটেলিয়ানেরও কম সৈন্য শত্রুদের ধ্বংস করল এবং ঘাঁটি এলাকাকে রক্ষা করল।

আগস্ট মাসে আমাদের পরাজয়ের কারণগুলি হচ্ছে: (১) দোদুল্যমান ও গৃহ-প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী কিছু অফিসার ও সৈন্য তাদের লড়াইয়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, এবং অন্যদিকে দক্ষিণ হুনানে যেতে অনিচ্ছুক সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহ কমে আসে; (২) গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে দীর্ঘপথ চলার দরুণ আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে; (৩) লিয়েংসিয়েন থেকে কয়েকশো লী দূরে চলে যাওয়ায় সীমান্ত এলাকা থেকে তারা সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; (৪) দক্ষিণ হুনানের জনগণকে তখনও পর্যন্ত জাগিয়ে তুলতে না পারায় আমাদের অভিযান সম্পূর্ণভাবেই একটি হঠকারী সামরিক অভিযানে পর্যবসিত হয়; (৫) শত্রুদের পরিস্থিতি আমাদের অজানা ছিল; এবং (৬) প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাব ছিল, অফিসার ও সৈন্যরা অভিযানের উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারেনি।

স্বাধীন এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমান বছরের এপ্রিল মাস থেকে লাল এলাকাগুলি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২৩শে জুন (য়ুংশিন ও নিংকাং সীমান্তে) লুংয়ুয়ানকৌর যুদ্ধে আমরা চতুর্থবার কিয়াংসীর শত্রুসৈন্যদের পরাজিত করি, এবং তারপর থেকে সীমান্ত এলাকার বিকাশ চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, এবং নিংকাং, য়ুংশিন ও লিয়েনহুয়া কাউন্টি তিনটি, কিয়ান ও আনফু'র কিছু অংশ, সুইচুয়ানের উত্তরাংশ এবং লিংশিয়েনের দক্ষিণ পূর্ব অংশ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। লাল এলাকাগুলিতে অধিকাংশ জমিই বন্টন করা হয়েছে, এবং বাকী জমিও বন্টন করা হচ্ছে। জেলা ও ছোট শহরগুলির সর্বত্রই রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগঠিত করা হয়েছে। নিংকাং, য়ুংশিন, লিয়েনহুয়া ও সুইচুয়ানে কাউন্টি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি সীমান্ত এলাকার সরকার গঠিত হয়েছে। গ্রামগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বাহিনী এবং জেলা ও কাউন্টি স্তরে লালরক্ষী বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। জুলাই মাসে কিয়াংসীর শত্রু-বাহিনী এবং আগস্ট মাসে হুনান ও কিয়াংসীর বাহিনী একযোগে চিংকাং পাহাড় আক্রমণ করে। সমস্ত কাউন্টি শহর এবং সীমান্ত এলাকার সমতলভূমি শত্রুদের দখলে চলে যায়। শান্তিরক্ষা বাহিনী ও জমিদারদের ভাড়াটে বাহিনী প্রভৃতি শত্রুদের ফেউরা লাগামছাড়া হয়ে পড়ে, শহর ও গ্রামাঞ্চল জুড়ে শ্বেতসন্ত্রাস বিরাজ করতে থাকে। অধিকাংশ পার্টি ও সরকারী সংগঠন ভেঙে পড়ে। ধনী কৃষকরা ও পার্টির মধ্যেকার সুবিধেবাদীরা বিপুল সংখ্যায় শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেয়। ৩০শে আগস্ট চিংকাং পাহাড়ের যুদ্ধের পরেই কেবল হুনানের শত্রুসৈন্যরা লিংসিয়েনে হটে যায়, কিন্তু কিয়াংসীর সৈন্যরা তখনও সমস্ত জেলা শহর এবং অধিকাংশ গ্রাম দখল করে থাকে। তবে শত্রুরা কখনই পার্বত্য এলাকা দখল করতে সক্ষম হননি। এসব এলাকার মধ্যে ছিল নিংকাঙের পশ্চিম ও উত্তরের জেলাগুলি; য়ুংসিনের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণের যথাক্রমে তিয়েনলুং, শিয়াওসিকিয়াং ও ওয়ানিয়েনশান জেলাগুলি; লিয়েনহুয়ার শানসি জেলা; সুইচুয়ানের চিংকাংশান জেলা; এবং লিয়েংসিয়েনের সিংশিকাং ও তায়ুয়ান জেলা। জুলাই ও আগস্ট মাসে লালফৌজের একটি বাহিনী বিভিন্ন কাউন্টির লালরক্ষীদের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে ছোট-বড় বহু লড়াই চালায়, এবং মাত্র ত্রিশটি রাইফেল হারিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত পাহাড়ী এলাকায় সরে যায়।

চুংয়ি ও শাংয়ু'র মধ্য দিয়ে আমাদের সৈন্যরা যখন চিংকাং পাহাড়ে ফিরে আসছিল, তখন লিউ শি-য়ি'র অধীনস্থ দক্ষিণ কিয়াংসী শত্রুবাহিনীর ৭নং স্বাধীন ডিভিশন সুইচুয়ান পর্যন্ত আমাদের পিছনে ধাওয়া করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর আমরা লিউ শি-য়িকে পরাস্ত করে কয়েকশো রাইফেল দখল করি এবং সুইচুয়ান অধিকার করি। ২৬শে সেপ্টেম্বর আমরা চিংকাং পাহাড়ে ফিরে আসি। ১লা অক্টোবর আমরা নিংকাঙে চৌ হুন-য়ুয়ানের নেতৃত্বাধীন শিউং শি-হুই'র একটি বাহিনীকে পরাজিত করে সমগ্র নিংকাং কাউন্টি পুনরুদ্ধার করি। ইতিমধ্যে কুয়েইতুঙে অবস্থানকারী হুনানের শত্রুসৈন্যদের ২৬ জন ইয়েহ চুং-জু'র নেতৃত্বে আমাদের পক্ষে চলে আসে। পি চান-য়ুনের নেতৃত্বে তাদেরকে একটি বিশেষ বাহিনীতে সংগঠিত করা হয়। ৯ই নভেম্বর আমরা লুংয়ুয়ানকৌ এবং নিংকাঙের কাউন্টি শহরে চৌ'র ব্রিগেডের একটি রেজিমেন্টকে বিধ্বস্ত করি। পরের দিনই আমরা এগিয়ে গিয়ে য়ুংশিন দখল করি, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার নিংকাঙে সরে আসি। বর্তমানে আমাদের এলাকা দক্ষিণে সুইচুয়ান কাউন্টির চিংকাং পাহাড়ের ঢালু অংশ থেকে উত্তরে লিয়েন-হুয়া কাউন্টির সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র নিংকাং এবং সুইচুয়ান লিংসিয়েন ও য়ুংশিনের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এই এলাকা উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত অবিভক্ত একটি সরু অঞ্চল গড়ে তুলেছে। তবে লিয়েনহুয়ার শানসি জেলা এবং য়ুংশিনের তিয়েনলুং ও ওয়ানিয়েনশান জেলা এই অবিভক্ত অঞ্চলের সঙ্গে খুব দৃঢ়ভাবে যুক্ত নয়। শত্রুরা এখন সামরিক আক্রমণ ও অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে আমাদের ঘাঁটি এলাকাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, আর আমরা তাদের এইসব আক্রমণকে ব্যর্থ করার প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছি।

সামরিক প্রশ্ন

সীমান্ত এলাকার সংগ্রাম হচ্ছে পুরোপুরিভাবে একটি সামরিক ব্যাপার। কাজেই পার্টি ও জনসাধারণ উভয়কেই যুদ্ধের উপযোগী করে তৈরী রাখতে হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মূল প্রশ্নই হয়ে উঠেছে কীভাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে। স্বাধীন সরকারকে অবশ্যই সশস্ত্র থাকতে হবে। এই এলাকা যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন, সশস্ত্র শক্তি না থাকলে বা যথেষ্ট না হলে, অথবা শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় ভুল রণকৌশল অবলম্বন করলে শত্রু সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকা দখল করে নেবে। সংগ্রাম

প্রতিদিনই তীব্র হয়ে উঠছে, এবং সেজন্য আমাদের সমস্যাগুলিও হয়ে উঠছে অতিশয় জটিল ও গুরুতর।

সীমান্ত এলাকার লালফৌজ গড়ে উঠেছে নিম্নলিখিতদের নিয়ে: (১) চাওচৌ ও সোয়াতৌ-এ[৪] ইয়ে তিং ও হো লুঙের অধীনস্থ প্রাক্তন সৈন্য; (২) য়ুগাঙের ভূতপূর্ব জাতীয় সরকারের[৫] রক্ষীবাহিনী; (৩) পিংকিয়াং ও লিউইয়াঙের[৬] কৃষকেরা; (৪) দক্ষিণ হুনানের কৃষক[৭] এবং স্থইকৌশানের শ্রমিক[৮]; (৫) শু কে-শিয়াং, তাং শেং-চি, পাই চু-শি, চু পেই-তে, উ শাং এবং শিউং শি-হুই'র বাহিনী থেকে বন্দী হওয়া সৈন্য; এবং (৬) সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির কৃষক। তবে আগে যারা ইয়ে তিং ও হো লুঙের অধীনে ছিল, সেইসব সৈন্যদের, রক্ষীবাহিনীর ও পিংকিয়াং ও লিউইয়াঙের কৃষকদের মধ্যে এক বছরেরও বেশি সময় যুদ্ধের পর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট আছে। দক্ষিণ হুনানদের কৃষকদের মধ্যেও হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশি। এ কারণে প্রথম চার ধরনের সৈন্যরা এখনও পর্যন্ত চতুর্থ লালফৌজের প্রধান শক্তি হলেও, শেষ দু' ধরনের সৈন্যদের সংখ্যা অনেক বেশি। আবার শেষের দুই ধরনের সৈন্যদের মধ্যে কৃষকদের সংখ্যার তুলনায় ধৃত বন্দী সৈন্যদের সংখ্যাও অনেক বেশি। এদের মধ্য থেকে আরও নতুন সৈন্য না পাওয়া গেলে জনবলের গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে। তা সত্ত্বেও রাইফেলের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সৈন্য সংখ্যা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। রাইফেল সহজে খোয়া যায় না, কিন্তু সৈন্যরা আহত বা নিহত হয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে বা পালিয়ে যায়, ফলে সৈন্য সংখ্যা সহজেই কমে যায়। হুনান প্রাদেশিক কমিটি আনি-য়ুয়ান[৯] থেকে শ্রমিকদের এখানে পাঠাবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি রাখবেন।

শ্রেণী ভিত্তির বিচারে লালফৌজের কিছু অংশ এসেছে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য থেকে, আর কিছু এসেছে ভবঘুরে সর্বহারাদের মধ্য থেকে। অবশ্য এই শেষ ধরনের সৈন্যদের সংখ্যা বেশি না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তবে তারাও যুদ্ধ করতে পারে, এবং প্রতিদিন যুদ্ধ চলার ফলে হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে, এবং তার ফলে এদের মধ্য থেকে লোক জোগাড় করাও আর সহজসাধ্য থাকছে না। এই পরিস্থিতিতে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, রাজনৈতিক শিক্ষার ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়া।

লালফৌজের সৈন্যদের অধিকাংশই ভাড়াটে সৈন্যদের মধ্য থেকে এলেও

একবার লালফৌজে ঢুকবার পরেই তাদের চরিত্র পাল্টে যায়। প্রথমতঃ, লালফৌজ ভাড়াটে সৈন্য প্রথা তুলে দিয়েছে, এখানে তারা অনুভব করে যে তারা যুদ্ধ করছে, নিজেদের জন্য, জনগণের জন্য, আর কারও জন্য নয়। এখনও পর্যন্ত লালফৌজে নিয়মিত মাইনে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই, তাদের দেওয়া হয় ফসল, রান্নার তেল, নুন, জ্বালানি কাঠ, তরিতরকারি কিনবার জন্য টাকা, এবং সামান্য হাতখরচা। সামান্ত এলাকার বাসিন্দা লালফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের সবাইকেই জমি দেওয়া হয়েছে। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যারা এসেছে, তাদের জমি দেওয়াটা বেশ অসুবিধের ব্যাপার।

রাজনৈতিক শিক্ষা পাবার পর লালফৌজের যোদ্ধারা হয়ে উঠেছে শ্রেণী সচেতন, এবং আয়ত্ত করেছে জমি-বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক-কৃষকদেরকে সশস্ত্র করে তোলা প্রভৃতি বিষয়ের মূল শিক্ষাকে। তারা যে যুদ্ধ করছে তাদের নিজেদের জন্য, শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য, এটাও তারা বোঝে। সেজন্যই তারা বিনা অভিযোগে এই তীব্র সংগ্রামের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে। প্রত্যেক কোম্পানি, ব্যাটেলিয়ন বা রেজিমেণ্টের মধ্যে আছে সৈন্যদের কমিটি, এগুলি সৈন্যদের স্বার্থ দেখে এবং রাজনৈতিক ও জনগণের জন্য কাজ করে।

অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করেছে যে, পার্টি-প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিটি[১০] তুলে দেওয়াটা কোনমতেই ঠিক হবে না। পার্টি শাখাগুলি কোম্পানি স্তরেই সংগঠিত এবং সে কারণে বিশেষতঃ কোম্পানি স্তরে পার্টি-প্রতিনিধি থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাকে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে সৈন্যদের কমিটি রাজ-নৈতিক শিক্ষা চালিয়ে যায় ও গণ-আন্দোলনের কাজ পরিচালনা করে। একই সঙ্গে তাকে পার্টি-শাখার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, কোম্পানির পার্টি-প্রতিনিধি যত দক্ষ, সেই কোম্পানিও তত উন্নত হয়। কোম্পানি কম্যাণ্ডারের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করা খুবই অসুবিধাজনক। নীচের স্তরের কর্মীদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা বেশি হওয়ায়, প্রায়ই ধৃত শত্রুসৈন্যরা খুব কম সময়ের মধ্যেই প্লেটুন লিডার বা কোম্পানি কম্যাণ্ডার হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাসে ধৃত কেউ কেউ ইতিমধ্যেই ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডার হয়ে গেছে। মনে হতে পারে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর নাম যেহেতু লালফৌজ, অতএব এতে পার্টি-প্রতিনিধি না থাকলেও চলে। এটা

অত্যন্ত ভুল ধারণা। একসময় দক্ষিণ হুনানে ২৮নং রেজিমেণ্টে এই পদ্ধতি তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকাল আবার এই ব্যবস্থা চালু করতে হয়। আর পার্টি-প্রতিনিধিদের 'পরিচালক' নামে অভিহিত করলে, যাদেরকে ধৃত সৈন্যরা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে, কুওমিনতাঙ বাহিনীর সেই পরিচালকদের সঙ্গে এটা গুলিয়ে যাবে। নাম পাল্টালেই ব্যবস্থার চরিত্র পাল্টায় না। সেজন্যই আমার নাম না পাল্টাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পার্টি-প্রতিনিধিদের হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশি। শিক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য আমরা ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি বটে, তবে আমরা আশা করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং হুনান ও কিয়াংসীর প্রাদেশিক কমিটি পার্টি-প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার যোগ্য অন্তত: ত্রিশজন কমরেডকে এখানে পাঠাবেন।

সাধারণত:, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আগে একজন যোদ্ধার ছ' মাস থেকে এক বছর শিক্ষার দরকার হয়। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা গতকাল ভর্তি হলেও আজই তাদের যুদ্ধে অংশ নিতে হচ্ছে, যুদ্ধ করতে হচ্ছে কোন শিক্ষা না পেয়েই। যুদ্ধের পদ্ধতি না জানার ফলে তাদের লড়তে হচ্ছে শুধুমাত্র সাহসের ওপর নির্ভর করে। যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষা ও বিশ্রামের জন্য সময় পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন একমাত্র যা করতে হবে, তা হচ্ছে সামনাসামনি যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা, এবং এভাবে শিক্ষার জন্য কিছু সময় পাওয়া। বর্তমানে আমরা ১৫০ জন নিম্নপদস্থ অফিসারের একটি বাহিনীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি, এবং এই শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আমরা আশা করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং দুটি প্রাদেশিক কমিটি প্লেটুন লিডার ও কোম্পানি কম্যাণ্ডার থেকে শুরু করে ওপরের স্তরের আরও কিছু অফিসার পাঠাবেন।

হুনান প্রাদেশিক কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যোদ্ধাদের সুখ-সুবিধের দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য, এবং তারা যাতে সাধারণ শ্রমিক বা কৃষকদের চেয়ে অন্ততঃ কিছুটা ভাল অবস্থায় থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা করার জন্য। আসলে কিন্তু তুলনামূলকভাবে যোদ্ধাদের অবস্থাই বেশি খারাপ। ফসল ছাড়া রান্নার তেল, নুন, জ্বালানি কাঠ ও তরিতরকারির জন্য তারা প্রতিদিন মাথাপিছু মাত্র ৫ সেণ্ট করে পেয়ে থাকে। এবং এটা দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। শুধু এইসব খরচ বাবদই প্রতি মাসে দশ হাজার রূপোর ডলারেরও বেশি খরচ হয়। এর সবটাই স্থানীয় উৎপীড়কদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

করে জোগাড় করতে হচ্ছে।[১১] আমাদের পাঁচ হাজার লোকের পুরো সেনা-বাহিনীরই এখন শীতের তুলোভরা কোট থাকলেও এখনও বস্ত্রের অভাব রয়ে গেছে। কন্‌কনে শীতের মধ্যেও অনেককেই এখনও শুধু দু-ভাঁজ করা পাতলা সুতির জামা গায়ে দিয়ে কাটাতে হচ্ছে। ঘটনাক্রমে আমরা কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত। তাছাড়া, প্রত্যেকেই আমরা দুঃখ-কষ্টকে সমানভাবে ভাগ করে নিই—বাহিনীর কম্যাণ্ডার থেকে পাচক পর্যন্ত প্রত্যেকেই শস্য বাদে ওই ৫ সেণ্ট খাদ্যভাতা দিয়েই জীবন কাটাচ্ছে। হাতখরচা হিসেবেও সবাই একই পরিমাণ ভাতা পাচ্ছে—তা ২০ সেণ্টই হোক বা ৪০ সেণ্টই হোক।[১২] কাজেই কারও বিরুদ্ধেই যোদ্ধাদের কোন অভিযোগ নেই।

প্রতিটি যুদ্ধের পরেই কিছু-না-কিছু লোক আহত হয়। তাছাড়া অপুষ্টির জন্য ও ঠাণ্ডা লেগে এবং অন্যান্য কারণেও বহু অফিসার ও সৈনিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পাহাড়ের ওপর আমাদের হাসপাতালগুলিতে চীনা ও পাশ্চাত্য দুই ধরনের চিকিৎসারই ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু ওষুধ ও ডাক্তারের প্রচণ্ড অভাব। বর্তমানে সেখানে আটশোরও বেশি রোগী আছে, হুনানের প্রাদেশিক কমিটি আমাদের ওষুধ পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও পর্যন্ত কিছুই এসে পৌঁছায়নি। আমরা এখনও আশা করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও দুই প্রাদেশিক কমিটি আমাদের কিছু আয়োডিন ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ডাক্তার শিগ্‌গিরই পাঠিয়ে দেবেন।

জিনিসপত্রের অভাব এবং প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ পরিচালনা সত্ত্বেও লালফৌজ যে চালিয়ে যেতে পারছে, তার পেছনে পার্টির ভূমিকা ছাড়াও লালফৌজের মধ্যে গণতন্ত্রের অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অফিসাররা সৈন্যদের পেটায় না; অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হয়; সৈন্যরা স্বাধীনভাবে সভা করতে পারে, নিজেদের মনের কথা খুলে বলতে পারে; ফালতু আদবকায়দাগুলো বাতিল করা হয়েছে; হিসাবপত্র সকলেই পরীক্ষা করতে পারে। সৈন্যরা নিজেরাই মেস চালায়। রান্নার তেল, নুন, জ্বালানি কাঠ ও তরিতারকারির বাবদ বরাদ্দ পাঁচ সেণ্টের মধ্য থেকে সামান্য কিছু হাত-খরচা তারা সঞ্চয়ও করতে পারে, যার পরিমাণ মাথাপিছু প্রতিদিন প্রায় ছয় বা সাত তামার পয়সার মতো হবে। একে বলা হয় 'মেস-খরচ থেকে উদ্বৃত্ত'। এইসব কারণে সৈন্যরা খুবই সন্তুষ্ট। বিশেষ করে আমাদের হাতে সম্প্রতি বন্দী হওয়া সৈন্যরাও আমাদের বাহিনী ও কুওমিনতাঙ বাহিনীর মধ্যেকার বিরাট

পার্থক্যটা ধরতে পারে। মনের দিক থেকে তারা নিজেদের মুক্ত মনে করে, যদিও লালফৌজের মধ্যে জীবনধারনের সুযোগ-সুবিধা শ্বেত বাহিনীর সুযোগ-সুবিধার চেয়ে অনেক কম। এই সেদিনও শ্বেত বাহিনীর মধ্যে যে সৈন্যরা এতটুকু সাহস দেখাতে পারত না, আজ লালফৌজে যোগ দিয়ে তারাই অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিচ্ছে। গণতন্ত্রের এমনিই প্রভাব। লালফৌজ যেন একটি অগ্নিকুণ্ড, তার মধ্যে বন্দী সৈন্যরা এসে পড়া মাত্রই তাদের চরিত্র পাল্টে যায়। চীনে জনগণের পক্ষে যেমন গণতন্ত্রের প্রয়োজন, ঠিক তেমান প্রয়োজন সৈন্যবাহিনীরও। সামন্ততান্ত্রিক ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীকে[১৩] নস্যাৎ করার জন্য আমাদের হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল সৈন্যবাহিনীর মধ্যকার এই গণতন্ত্র।

এখন পার্টি-সংগঠনের চারিটি স্তর আছে : কোম্পানি শাখা, ব্যাটেলিয়ান কমিটি, রেজিমেণ্ট কমিটি ও সৈন্যবাহিনীর কমিটি। প্রত্যেক কোম্পানিতে একটি শাখা আছে, আর কোম্পানির প্রতিটি স্কোয়াডে একটি করে গ্রুপ আছে। 'পার্টি-শাখাগুলি সংগঠিত হয়েছে কোম্পানির ভিত্তিতে'। এতো প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়েও লালফৌজ যে ভেঙে পড়েনি এটাই তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। দু'বছর আগে আমরা যখন কুওমিনতাঙ বাহিনীতে ছিলাম, তখন সামরিক বাহিনীর মধ্যে আমাদের পার্টির কোন সাংগঠনিক ভিত ছিল না, এমনকি, ইয়ে তিঙের বাহিনীতেও[১৪] প্রত্যেক রেজিমেণ্টে মাত্র একটি করে পার্টি-শাখা ছিল। তার ফলে কোন কঠিন পরীক্ষার সামনে আমরা টিঁকে থাকতে পারিনি। বর্তমানে লালফৌজের মধ্যে পার্টির সদস্য ও অ-সদস্যদের সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে ১ : ৩, বা গড়ে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন পার্টি-সদস্য। সম্প্রতি আমরা যুদ্ধে সক্ষম সৈনিকদের মধ্য থেকে আরও বেশি সংখ্যায় পার্টি-সদস্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, যাতে এই অনুপাতকে বাড়িয়ে ৫০ : ৫০ করা যায়।[১৫] এখন কোম্পানি শাখাগুলিতে দক্ষ পার্টি-সম্পাদকের অভাব আছে। যেসব সক্রিয় কর্মী বর্তমানে তাদের নিজেদের জায়গায় আর কাজ করতে পারছেন না, তাঁদের মধ্য থেকে কিছু সক্রিয় কর্মী আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় কমিটিকে অনুরোধ করছি। দক্ষিণ হুনান থেকে যেসব কর্মী এসেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সামরিক বাহিনীর মধ্যেই পার্টির কাজ করছেন। কিন্তু আগস্ট মাসে দক্ষিণ হুনানে পিছু হটার সময় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছেন, তাই বর্তমানে অতিরিক্ত লোক আমাদের নেই।

লালরক্ষী বাহিনী ও শ্রমিক-কৃষকের সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারী দলগুলিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী। এই বাহিনীগুলির অস্ত্র হল বর্শা ও গাদা বন্দুক, তারা সংগঠিত হয়েছে শহরতলী-ভিত্তিতে। প্রত্যেকটি শহরতলীতে একটি করে বাহিনী আছে, শহরতলীর জনসংখ্যার ভিত্তিতে এগুলি আকারে ছোট বা বড় হয়ে থাকে। এদের কাজ প্রতিবিপ্লব দমন করা, শহরতলীতে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে রক্ষা করা, এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় লাল-ফৌজ ও লালরক্ষী বাহিনীদের সাহায্য করা। য়ুংসিনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারী দলগুলি প্রথমে গুপ্তবাহিনী হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সমগ্র কাউন্টিটি আমাদের দখলে আসার পর তারা আত্মপ্রকাশ করেছে। সীমান্ত এলাকার অন্যান্য কাউন্টিতেও এখন এই সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তার নামও অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে। লালরক্ষীদের প্রধান অস্ত্র পাঁচ-ঘড়া রাইফেল। অবশ্য কিছু কিছু নয়-ঘড়া এবং এক-ঘড়ার রাইফেলও আছে, মোট রাইফেল আছে—নিংকাঙে ১৪০টি, য়ুংসিনে ২২০টি, লিয়েনহুয়াতে ৪৩টি, চালিং-এ ৫০টি, লিংসিয়েনে ৯০টি, সুইচুয়ানে ১৩০টি, এবং ওয়ানানে ১০টি—মোট ৬৮৩টি। লালফৌজই এর অধিকাংশ রাইফেল যোগান দিয়েছে। তবে লালরক্ষীরা নিজেরাও শত্রুর কাছ থেকে কিছু কিছু রাইফেল কেড়ে নিয়েছে। জমিদারদের সৈন্য ও শান্তি সংরক্ষণ বাহিনীর বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে কাউন্টিগুলিতে অধিকাংশ লালরক্ষীই ক্রমশঃ নিজেদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। ২১শে মে'র ঘটনার আগে[১৬] সব কাউন্টিতেই কৃষকদের আত্মরক্ষাবাহিনী ছিল। রাইফেল ছিল য়ুংসিয়েনে ৩০০টি, সালিং-এ ৩০০টি, লিংসিয়েনে ৬০টি, সুইচুয়ানে ৫০টি, য়ুংসিনে ৮০টি, লিয়েনহুয়াতে ৬০টি, নিংকাঙে ৬০টি (য়ুয়ান ওয়েনসাই-এর সৈন্যরা) এবং চিংকাং পাহাড়ে ৬০টি (ওয়াং সো'র বাহিনা)—মোট ৯৭০টি। সেই ঘটনার পর য়ুয়ান ও ওয়াঙের সৈন্যদের রাইফেলগুলি রক্ষা পেয়েছিল, এবং এছাড়া সুইচুয়ানে ৬টি এবং লিয়েনহুয়াতে ১টি রাইফেল রক্ষা পেয়েছিল। বাকি সমস্ত রাইফেলই জমিদাররা কেড়ে নিয়েছিল। সুবিধা-বাদী লাইন গ্রহণের জন্যই কৃষকদের আত্মরক্ষাবাহিনী তাদের রাইফেলগুলি রক্ষা করতে পারেনি। এখন কাউন্টিগুলিতে লালরক্ষীদের হাতে খুব কমই রাইফেল আছে, এবং সংখ্যায় তা জমিদারদের রাইফেলের তুলনায় অর্ধেকের কম। লালফৌজের উচিত তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা। নিজেদের যুদ্ধ-ক্ষমতার ক্ষতি না করে, জনগণকে সশস্ত্র করার কাজে লালফৌজকে সবরকম

সাহায্যই দিতে হবে। আমরা এই নিয়ম চালু করেছি যে, লালফৌজের প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ানে চারটি করে কোম্পানি থাকবে এবং প্রত্যেক কোম্পানির হাতে ৭৫টি রাইফেল থাকবে। এর সঙ্গে বিশেষ কাজে নিযুক্ত কোম্পানি, মেসিনগান কোম্পানি, ট্রেঞ্চ-মর্টার কোম্পানি, রেজিমেণ্টের সদর দপ্তর ও তিনটি ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়ার্টার—এদের সবার রাইফেলগুলি ধরলে প্রত্যেক রেজিমেণ্টের হাতে ১,০৭৫টি রাইফেল থাকবে। যুদ্ধের সময় দখলীকৃত রাইফেল যথাসম্ভব স্থানীয় বাহিনীগুলিকে সশস্ত্র করার জন্য কাজে লাগাতে হবে। কাউণ্টি থেকে যাদের লালফৌজের শিক্ষা-শিবিরে পাঠানো হয়েছে এবং সেখানে যাদের শিক্ষালাভ শেষ হয়েছে, তাদের মধ্য থেকেই লালরক্ষী বাহিনীর কম্যাণ্ডার নিয়োগ করা উচিত। স্থানীয় শক্তিগুলিকে পরিচালনার জন্য লাল-ফৌজ বাইরে থেকে ক্রমশই কমসংখ্যক কম্যাণ্ডার পাঠাবে। চু পেই-তে শান্তি-সংরক্ষণ বাহিনী ও জমিদারদের সৈন্যদের সশস্ত্র করে তুলছে। এদিকে সীমান্ত এলাকার কাউণ্টিগুলিতে জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনীর আকার এবং যুদ্ধ-ক্ষমতাও বেশি। এসব কারণেই আমাদের স্থানীয় লাল বাহিনীগুলিকে সম্প্রসারিত করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। লালফৌজের নীতি হচ্ছে কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং লালরক্ষী বাহিনীর নীতি হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া। বর্তমান মুহূর্তে প্রতিক্রিয়ার শাসন যখন সাময়িক স্থায়িত্বলাভ করেছে, তখন শত্রু লাল-ফৌজকে আক্রমণ করার জন্য বিপুল সৈন্য সমাবেশ করতে পারে। এই কারণেই লালফৌজের পক্ষে ছড়িয়ে পড়ার নীতি গ্রহণ করা সুবিধাজনক হবে না। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সৈন্যদলকে ছড়িয়ে দেওয়ার নীতি প্রায় সব সময়েই আমাদের পরাজয় ঘটিয়েছে, আর সৈন্যদলকে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে আমাদের থেকে কম সংখ্যক, সমান সংখ্যক, কিংবা সামান্য কিছু বেশি সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রায়ই আমাদের জয় হয়েছে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কয়েক সহস্র লী ব্যাপী এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তাঁরা আমাদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখছেন। লালরক্ষীদের পক্ষে ছড়িয়ে পড়ার নীতিটি সুবিধাজনক, এবং সমস্ত কাউণ্টিতেই তারা এখন এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচারে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হচ্ছে ধৃত শত্রুসৈন্যদের মুক্তি দেওয়া এবং আহতদের চিকিৎসা করা। যখনই শত্রুবাহিনীর সৈন্য, প্লেটুন লিডার, কোম্পানি বা ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডার আমাদের হাতে বন্দী হয়,

আমরা তাদের মধ্যে প্রচার চালাই। তাদের দু'দলে ভাগ করা হয়—একদল যারা থেকে যেতে চায়, এবং অন্য দল যারা ফিরে যেতে চায়। যারা ফিরে যেতে চায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং সেই সঙ্গে তাদের ফিরে যাওয়ার পথ-খরচাও দিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে 'কমিউনিস্ট দস্যুরা দেখামাত্রই সবাইকে খুন করে'—শত্রুর এই কুৎসা সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। আমাদের এই ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইয়াংচি-শেঙের ৮নং ডিভিসনের **দশ দিনের খবর** নামে পত্রিকাটি মন্তব্য করেছে: 'কি শয়তানি!' লালফৌজের সৈন্যরা বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা দেখায় এবং তাদের জন্য সাদর বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'আমাদের নতুন ভাইদের বিদায় অনুষ্ঠানে' বন্দীরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তৃতা করে। আহত শত্রুদের চিকিৎসা করেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শত্রুদের মধ্যে লি ওয়েন-পিনের মতো ধূর্ত ব্যক্তিরা আমাদের দেখাদেখি যুদ্ধ-বন্দীদের হত্যা করা বন্ধ করেছে এবং আহতদের চিকিৎসা করা শুরু করেছে। তা সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যরা পরের যুদ্ধেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এবং ইতিমধ্যেই দু'বার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া, প্রয়োজন মতো লিখিত প্রচারও আমরা করি, যেমন প্রাচীরের গায়ে শ্লোগান লেখা। আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই শ্লোগান লিখে সব প্রাচীর ভরিয়ে দিই। আমাদের এইসব শ্লোগান লেখার খুবই অভাব আছে। আমরা আশা করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও দুই প্রাদেশিক কমিটি শ্লোগান লেখার জন্য আমাদের এখানে কিছু লোক পাঠাবেন।

সামরিক ঘাঁটি প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, আমাদের প্রথম ঘাঁটি চিংকাং পাহাড়ের অবস্থান নিংকাং, লিং সিয়েন, সুইচুয়ান ও য়ুংশিন—এই চারটি কাউন্টির সংযোগস্থলে। উত্তরে ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত নিংকাং কাউন্টির মাওপিং থেকে দক্ষিণে ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত সুইচুয়ান কাউন্টির হুয়ানগাও এর দূরত্ব ৯০ লী। পূর্বের ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত য়ুংশিন কাউন্টির নাসান থেকে পশ্চিমের ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত লিংসিয়েন মহকুমার শুইকৌ-এর দূরত্ব ৮০ লী। এই ৫৫০ লী পরিধির মধ্যে আছে নাসান থেকে শুরু করে লুঙয়ুয়ানকৌ (দুইই য়ুংশিন কাউন্টিতে), সিনচেং, মাওপিং, তালুং (সবগুলি নিংকাং কাউন্টিতে), শিতু, শুইকৌ, সিয়াৎসুন (সবগুলিই লিংসিয়েন কাউন্টিতে), ইংপানসু, তাইচিয়াপু, তাফেন, তুইজেচিয়েন, হুয়ানগাও, য়ুতৌকিয়াং এবং চে-আও (সবগুলি সুইচুয়ান কাউন্টিতে), এবং সেখান থেকে আবার নাসান। এই পর্বতমালায়

রয়েছে ধানের ক্ষেত, এবং বড়ো কুয়ো, ছোট কুয়ো, উঁচু কুয়ো, মাঝের কুয়ো, নীচের কুয়ো, জেপিং, সিয়াচুয়াং, সিংচো, সাওপিং পাইনীহ ও সোফু প্রভৃতি গ্রাম। এসব অঞ্চলে আগে পলাতক সৈনিক ও ডাকাতদের আড্ডা ছিল। কিন্তু এখন এগুলো আমাদের ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হয়েছে। এখানকার জনসংখ্যা দু' হাজারেরও কম এবং ধানের উৎপাদন দশ হাজার পিকুলের কম। সুতরাং সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সমস্ত শস্য আনতে হচ্ছে নিংকাং, য়ুংসিন এবং সুইচুয়ান কাউন্টি থেকে। পাহাড়ী অঞ্চলের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথগুলিই সুরক্ষিত। আমাদের হাসপাতাল, বিছানা ও পোশাক তৈরীর কারখানা, অস্ত্র তৈরীর বিভাগ এবং বাহিনীর পশ্চাদভাগের দপ্তরগুলি এখানেই অবস্থিত। বর্তমানে শস্য প্রভৃতি নিংকাং থেকে পর্বতাঞ্চলে আনা হচ্ছে। যদি আমাদের যথেষ্ট সরবরাহ বজায় থাকে, তবে শত্রু কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে পারবে না। আমাদের দ্বিতীয় ঘাঁটি চিউলুং পাহাড়ের অবস্থান নিংকাং, য়ুংসিন, লিয়েনহুয়া ও সালিং কাউন্টির সংযোগস্থলে। চিংকাং পাহাড়ের ঘাঁটির তুলনায় এই ঘাঁটিটি কম গুরুত্বপূর্ণ। চারটি কাউন্টির স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী এটিকে তাদের সবচেয়ে পশ্চাতের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে এবং এই ঘাঁটিটিও সুরক্ষিত। চারিদিকে শ্বেত শাসনের বেড়াজালের মধ্যে অবস্থিত স্বাধীন লাল এলাকার পক্ষে পাহাড়ী অঞ্চলের রণনৈতিক সুবিধাগুলো ব্যবহার করা একান্তই প্রয়োজনীয়।

ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্ন

সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ভূমি সংক্রান্ত পরিস্থিতি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, শতকরা ৬০ ভাগের বেশি জমি ছিল জমিদারদের এবং শতকরা ৪০ ভাগের কম জমি ছিল কৃষকদের হাতে। জমির মালিকানা কিয়াংসী অঞ্চলের সুইচুয়ান কাউন্টিতেই সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত, সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জমিই জমিদারদের হাতে। তারপরেই য়ুংসিন মহকুমা, সেখানে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জমি জমিদারদের হাতে। ওয়ানান, নিংকাং ও লিয়েনহুয়াতে কৃষকমালিকের সংখ্যা এর থেকে বেশি, তবে সমস্ত জমির এক বিরাট অংশের, অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ জমি জমিদারদের কুক্ষিগত আর কৃষকদের হাতে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ। হুনান অঞ্চলের সালিং ও লিংসীয়েন কাউন্টিতে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জমিই জমিদারদের হাতে।

মধ্যবর্তী শ্রেণীর প্রশ্ন। এই ধরনের ভূমি সংক্রান্ত পরিস্থিতির ফলে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত ও পুনর্বণ্টন করলে অধিকাংশ লোকেরই সমর্থন পাওয়া যাবে।[১৭] সাধারণভাবে গ্রামবাসীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: বড় ও মাঝারি স্তরের জমিদারশ্রেণী, ক্ষুদে জমিদার ও কৃষকদের নিয়ে গঠিত মধ্যবর্তী শ্রেণী, এবং মাঝারি ও গরীব কৃষকের শ্রেণী। ধনী কৃষকদের স্বার্থ প্রায়ই ছোট জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাধারণতঃ মোট জমির তুলনায় ধনী কৃষকের জমির পরিমাণ সামান্যই, কিন্তু তার সঙ্গে ছোট জমিদারদের জমি যোগ করলে পরিমাণটি আর সামান্য থাকে না। সম্ভবতঃ অবস্থাটা সমগ্র দেশেই মোটামুটি এই রকম। জমি সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত ও বণ্টন করার ভূমি সংক্রান্ত নীতি সীমান্ত এলাকাগুলিতে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, লাল এলাকায় বড় ও মাঝারি জমিদারশ্রেণী ও মধ্যবর্তী শ্রেণী—এই উভয়কেই আক্রমণ করা হচ্ছে। এটা নীতি হলেও এই নীতি প্রয়োগের সময় মধ্যবর্তী শ্রেণীর কাছ থেকে আমরা প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছি। বিপ্লবের প্রথমদিকে এই মধ্যবর্তী শ্রেণী গরিব কৃষকশ্রেণীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে বলে মনে হলেও বাস্তবক্ষেত্রে ভূমি-বণ্টনের কাজে বিলম্ব ঘটানোর জন্য তারা নিজেদের চিরকালের সামাজিক পদমর্যাদা ও গোষ্ঠীকর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে গরীব কৃষকদের ভয় দেখিয়ে এসেছে এবং অবদমনের চেষ্টা করে এসেছে। যখন এভাবেও আর বিলম্ব ঘটানো সম্ভব হয় না, তখন তারা নিজেদের কুক্ষিগত জমির সঠিক পরিমাণ গোপন করেছে, অথবা ভাল জমিগুলিকে নিজেদের হাতে রেখে খারাপ জমিগুলি ছেড়ে দিয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে পদদলিত এবং বিপ্লবের বিজয় সম্পর্কে অনিশ্চিত দরিদ্র কৃষকরা এই সময়টিতে প্রায়ই মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলোর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে এবং কোন দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভরসা পায়নি। কেবল বিপ্লবের উত্তাল অগ্রগতির সময়েই তারা গ্রামে মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলোর বিরুদ্ধে এই ধরনের দৃঢ় ব্যবস্থা নেয়। যেমন, এক বা একাধিক কাউন্টিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীর কয়েকটা পরাজয় বরণ এবং লালফৌজের পরাক্রম বার বার প্রদর্শিত হবার সময়ে। ভূমি বণ্টনের কাজে বিলম্ব ঘটার এবং জমির মালিকানা লুকানোর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটেছিল য়ুংসিন মহকুমায়, যেখানে মধ্যবর্তী শ্রেণী সংখ্যায় সব থেকে বেশি। ২৩শে জুন লুংওয়ানকৌতে লালফৌজের যখন বিরাট জয় হল এবং জেলা সরকার ভূমি-বণ্টনের কাজে দেরী করানোর জন্য কিছু লোককে

শাস্তি দিল, কেবলমাত্র তখনই এই অঞ্চলে ভূমি-বণ্টনের কাজ প্রকৃতপক্ষে সম্পন্ন হল। প্রতিটি কাউন্টিতে সামন্ততান্ত্রিক পারিবারিক প্রথা চালু থাকায়, এক-একটি গ্রামের বা কয়েকটি গ্রামের সব পরিবার একই গোষ্ঠীর লোক হওয়ায়, এই গোষ্ঠী-মানসিকতা দূর হয়ে গ্রামের লোকদের মধ্যে নিজেদের শ্রেণী-সচেতনতা আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে।

শ্বেত-সন্ত্রাসের মধ্যে মধ্যবর্তী শ্রেণীর দল পরিবর্তন। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময়ে মধ্যবর্তী শ্রেণীর ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল বলে শ্বেত-সন্ত্রাসের আঘাত শুরু হতেই মধ্যবর্তী শ্রেণী সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষে যোগ দিল। য়ুংসিন ও নিংকাঙে এই ছোট জমিদার ও ধনী কৃষকরাই বিপ্লবী কৃষকদের ঘরে আগুন লাগানোর জন্য প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল। প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্দেশে তারাই বেপরোয়াভাবে বিভিন্ন বাড়ীতে আগুন লাগায় ও গ্রেপ্তার করে। লালফৌজ নিংকাং, সিনচেং, কুচেং ও লুংসী অঞ্চলে ফিরে আসার পর কয়েক হাজার কৃষক প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে য়ুংসিনে পালিয়ে গেল, কমিউনিস্টরা তাদের হত্যা করবে, প্রতিক্রিয়ার এই প্রচারে তারা বিভ্রান্ত হয়ে। 'যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে, তাদের হত্যা করা হবে না', এবং 'যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে, তাদের সাদরে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তারা ফিরে এসে নিজেদের ফসল কেটে ঘরে তুলুক'—আমরা এই প্রচার চালাবার পরেই কেবল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধীরে ধীরে ফিরে এল।

সমগ্র দেশেই যখন বিপ্লবে ভাঁটা চলেছে, তখন আমাদের অঞ্চলগুলিতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এই মধ্যবর্তী শ্রেণীকে দৃঢ়ভাবে নিজেদের কব্জার মধ্যে রাখা। এই শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার মূল কারণ হল, বিপ্লব এদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। কিন্তু যখন সমগ্র দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জোয়ার আসে, দরিদ্র কৃষকশ্রেণী তখন ভরসা পায় এবং সাহসী হয়ে ওঠে, আর মধ্যবর্তী শ্রেণী সে সময়ে ভয় পায়, কব্জার বাইরে যেতে তারা সাহস করে না। লী স্থং-জেন এবং তাং শেং-চির মধ্যেকার যুদ্ধ হুনানেও ছড়িয়ে পড়ার সময় সালিং-এর ছোট জমিদাররা কৃষকদের সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করেছিল, এমনকি কেউ কেউ নববর্ষের উপহার হিসেবে শুয়োরের মাংস কৃষকদের ভেট পাঠিয়েছিল (যদিও তার আগেই লালফৌজ সালিং থেকে স্থইচুয়ানে ফিরে গেছে)। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর এ ধরনের ঘটনা আর ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। এখন সমগ্র দেশে প্রতিবিপ্লবের জোয়ার বইছে, তারই প্রচণ্ড আঘাতে জর্জরিত হয়ে শ্বেত-

শাসনের অঞ্চলের মধ্যবর্তী শ্রেণী প্রায় সম্পূর্ণভাবে বড় জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এবং দরিদ্র কৃষকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।[১৮]

মধ্যবর্তী শ্রেণীর দলত্যাগের কারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চাপ। শ্বেত এলাকা ও বিপ্লবী এলাকা আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধরত দু'টি দেশের মতো। শত্রুর সুদৃঢ় অবরোধ ও পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতি আমাদের ভুল ব্যবহার—এই দুইয়ের ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। নুন, বস্ত্র, ওষুধপত্র ইত্যাদি সব প্রয়োজনীয় জিনিস দুষ্প্রাপ্য. তাদের দামও অত্যন্ত বেশি। কৃষিজাত দ্রব্যাদি, যেমন কাঠ, চা, তেল ইত্যাদি বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না, ফলে কৃষকদের নগদ টাকা আয়ের পথও বন্ধ হয়ে আছে এবং সমগ্র জনগণই তার ফলে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে। এই ধরনের কষ্ট স্বীকারে দরিদ্র কৃষকরা অধিকতর সক্ষম, কিন্তু অত কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মধ্যবর্তী শ্রেণী জমিদারশ্রেণীর পক্ষে চলে যাবে। জমিদারশ্রেণীর মধ্যে এবং চীনের যুদ্ধবাজদের মধ্যে বিভেদ ও যুদ্ধ না চলতে থাকলে এবং দেশব্যাপী একটি বিপ্লবী পরিস্থিতি বিকশিত হয়ে না উঠলে ছোট ছোট লাল এলাকাগুলির ওপর প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপ পড়বে, শেষ পর্যন্ত সেগুলি টিঁকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। কারণ, এই ধরনের অর্থনৈতিক চাপ শুধু মধ্যবর্তী শ্রেণীর পক্ষেই অসহনীয় নয়, একদিন এই চাপ শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক ও লালফৌজের সৈন্যদের কাছেও অসহনীয় হয়ে উঠবে। য়ুংসিম ও নিংকাং কাউন্টিতে এমন একটা সম গেছে, যখন রান্নার নুনও জোটানো যায়নি। আর অন্য জিনিসের কথা দূরে থাক, বস্ত্র ও ওষুধপত্রের সরবরাহও একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নুন আবার পাওয়া যাচ্ছে, যদিও দাম এখনও অত্যন্ত বেশি। বস্ত্র ও ওষুধ এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। কাঠ, চা ও তেল—যেগুলো প্রচুর পরিমাণে নিংকাং, পশ্চিম য়ুংসিন ও উত্তর সুইচুয়ানে উৎপন্ন হয় (সবই বর্তমানে আমাদের এলাকাধীন) —তা হাইরে পাঠানো যাচ্ছে না।[১৯]

ভূমি-বণ্টনের মাপকাঠি। ভূমি বণ্টনের জন্য একটি শহরতলীকে একক হিসেবে ধরা হয়। পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে যেখানে চাষের জমি কম আছে—যেমন য়ুংসিনের সিয়াওকিয়াং জেলায়, সেখানে কখনও কখনও তিন বা চারটে শহরতলীকে একক হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু এ জাতীয় ঘটনা খুবই কম। নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, তরুণ—সমস্ত অধিবাসীই সমান ভাগ পায়। কেন্দ্রীয় কমিটির

পরিকল্পনানুযায়ী বর্তমানে একটা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ঐ পরিকল্পনাতে শ্রমশক্তিকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়েছে। যে শ্রমশক্তি দেয় না সে যে পরিমাণ জমি পায় তার থেকে দ্বিগুণ জমি পায় সে যে শ্রমশক্তি দেয়।[20]

মালিক-কৃষকদের সুবিধে দেওয়ার প্রশ্ন। এই প্রশ্নটির পর্যালোচনা এখনও পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। মালিক-কৃষকদের মধ্যে ধনী চাষীরা অনুরোধ করেছে উৎপাদন-ক্ষমতাকে মাপকাঠি হিসাবে ধরার জন্য, অর্থাৎ যাদের লোকবল ও মূলধন (যথা, চাষের উপকরণ) বেশি আছে তাদের বেশি জমি দেওয়া উচিত। তাদের মতে, সমহারে বণ্টন অথবা শ্রমশক্তি অনুযায়ী বণ্টন তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। তারা আকারে-ইঙ্গিতে এটাও জানিয়েছে যে, তারা আরও বেশি উদ্যোগ নিয়ে রাজী আছে, এবং তাদের মূলধন বিনিয়োগের সঙ্গে তাদের এই উদ্যোগ যুক্ত করলে তারা আরও বেশি ফসল ফলাতে পারবে। আর সবাইকে যে হারে জমি দেওয়া হচ্ছে তাদেরও তাই দেওয়া হবে, তাদের বিশেষ উদ্যোগ ও বাড়তি মূলধনকে (অব্যবহৃত ফেলে রেখে) অবহেলা করা হবে—এটা তারা পছন্দ করছে না। এখনও কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ভূমি-বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করেই এখানে কাজ চলছে। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পর একটা রিপোর্ট পেশ করা হবে।

ভূমি-কর। নিংকাঙে করের হার হচ্ছে ফসলের শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট হারের চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ বেশি। কর সংগ্রহের কাজ এখনও চলছে, তাই এখনও কোন পরিবর্তন করা উচিত হবে না, তবে আগামী বছরে করের হার কমানো হবে। আমাদের শাসনাধীন সুইচুয়ান লিংসিয়েন ও য়ুংসিনে এমন কতকগুলো পাহাড়ী অঞ্চল আছে, যেখানে কৃষকরা এতোই দারিদ্র্য-পীড়িত যে তাদের ওপর কোনরকম কর বসানো উচিত হবে না। আমাদের সরকার ও লালরক্ষীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্বেত এলাকার স্থানীয় অত্যাচারীদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। লালফৌজের রসদ জোগানোর ব্যাপারে চালটা এখনকার মতো আসছে নিংকাঙের ভূমি-কর থেকে, আর নগদ টাকার সবটাই সংগৃহীত হচ্ছে স্থানীয় অত্যাচারীদের বাজেয়াপ্ত ধনসম্পত্তি থেকে। অক্টোবর মাসে সুইচুয়ানে গেরিলা অভিযানের সময়ে আমরা দশ হাজার

য়ুয়ানের কিছু বেশি সংগ্রহ করেছিলাম। তা দিয়ে আমাদের কিছুদিন চলবে। সেটা ব্যয় হয়ে গেলে কি করা যাবে, তা পরে ঠিক করতে হবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন

কউন্টি, জেলা ও শহরতলী স্তরে সব জায়গাতেই জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু আসলে তা হয়েছে নামেই। অনেক জায়গাতেই শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের কোন পরিষদ নেই। শহরতলী অঞ্চলের জেলার, এমনকি কাউন্টি সরকারগুলির কার্যকরী কমিটিগুলি পর্যন্ত কোন-না-কোন জনসভা থেকে নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে অহূত জনসমাবেশে বিভিন্ন প্রশ্ন আলোচিত হতে পারে না, জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও তা খুবই কার্যকরী সাহায্য করতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, এই ধরনের জনসভাগুলোকে বুদ্ধিজীবীরা বা আত্মস্বার্থসন্ধানী ব্যক্তিরা অতি সহজেই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। কোন কোন জায়গায় পরিষদ আছে, কিন্তু তাকে কার্যকরী কমিটি নির্বাচনের প্রয়োজনে একটি অস্থায়ী সংস্থা মাত্র বলে মনে করা হয়। একবার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরই সব কর্তৃত্ব ঐ কমিটি একচেটিয়াভাবে দখল করে নেয়, তারপর আর পরিষদের কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। তাই বলে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের পরিষদ যে একেবারেই নেই তা নয়, কিন্তু তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার ও শিক্ষার অভাবই তার কারণ। ইচ্ছামতো নির্দেশ চালানোর সামন্ততান্ত্রিক বদ অভ্যাসটি মানুষের মনে, এমনকি সাধারণ পার্টি-সভ্যদের মনেও এমন দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে, এক মুহূর্তে তা দূর করা যাবে না। যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখনই তারা এই সোজা পথটি বেছে নেয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের ঝামেলা তারা একেবারেই পছন্দ করে না। যখন বিপ্লবী সংগ্রামে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কার্যকারিতা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, জনগণ যখন বুঝতে পারে যে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা তাদের নিজেদের শক্তিগুলিকে সংহত করার সবশ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাদের সংগ্রামের পক্ষে খুবই সহায়ক, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ব্যবহার গণ-সংগঠনগুলিতে ব্যাপক ও কার্যকরীভাবে তখনই কেবল সম্ভব হয়। সর্বস্তরের পরিষদগুলির জন্য (কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়াকে ভিত্তি করে) আমরা একটা বিস্তারিত নিয়ম-বিধি রচনা করছি, এবং এর সাহায্যে আমরা ধীরে ধীরে আগের ত্রুটিগুলি শুধরে নিতে

পারি। বর্তমানে লালফৌজের সব স্তরেই সৈনিক প্রতিনিধিদের সম্মেলন-গুলিকে স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, যাতে সৈনিকদের শুধু কমিটিই থাকবে এবং কোন সম্মেলন না থাকার ত্রুটিটি শোধরানো যায়।

বর্তমানে জনসাধারণ 'শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সরকার' বলতে সাধারণত: কার্যকরী কমিটিকেই বোঝেন, কারণ এখনও তাঁরা পরিষদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন এবং তাঁরা মনে করেন একমাত্র কার্যকরী কমিটিই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। কোন পরিষদ না থাকায় কার্যকরী কমিটি প্রায় সময়েই জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কাজ চালায়। ভূমি বাজেয়াপ্ত করার ও পুন-র্বণ্টনের কাজে দোদুল্যমানতা ও আপোষের মনোভাব, অর্থের অপচয় বা তহবিল তছরুপ, শ্বেত-বাহিনীর সম্মুখীন হলেই পশ্চাদপসরণ কিংবা তাদের বিরুদ্ধে ভগ্নোদ্যমে যুদ্ধে নামা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, কমিটির পূর্ণ অধিবেশন খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সবকিছু সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত নেয়, বা যা কিছু ঐ কমিটির স্থায়ী কমিটি। জেলা ও শহরতলীর সরকারগুলিতে আবার স্থায়ী কমিটির অধিবেশনও বসে কখনো-সখনো। আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ পরিচালনা করে শুধুমাত্র সেই চারজন ব্যক্তি যারা অফিসে বসে—যেমন, সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও লালরক্ষী (অথবা অভ্যুত্থানকারী) বাহিনীর নায়ক। সুতরাং, সরকারের কাজকর্মেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কর্মধারা বিশেষ কার্যকারী হয়ে ওঠেনি।

প্রথম দিকে ছোট জমিদার ও ধনী কৃষকেরা সরকারী কমিটিগুলিতে, বিশেষ করে শহরতলী অঞ্চলের কমিটিগুলির মধ্যে ঢুকবার জন্য খেয়োখেয়ি শুরু করে দিত। লাল ফিতে লাগিয়ে ও উৎসাহের ভান করে নানা ফন্দিতে তারা সরকারী কমিটিগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ত, সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ নিজেরা করায়ত্ত করে নিত, এবং দরিদ্র কৃষক সদস্যদের কমিটির অকিঞ্চিৎকর ভূমিকায় বসিয়ে দিত। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের মুখোস খুলে দিতে পারলে এবং গরীব কৃষকরা দৃঢ়তা অবলম্বন করলেই কেবল তাদের দূর করে দেওয়া সম্ভব হবে। ব্যাপক-ভাবে না হলেও এই ধরনের অবস্থা বেশ কিছু জায়গায় বিরাজ করছে।

জনগণের মধ্যে পার্টির বিরাট কর্তৃত্ব ও মর্যাদা আছে, তুলনামূলকভাবে সরকারের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা অনেক কম। কারণ, কাজের সুবিধার জন্য সরকারী সংস্থাগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে পার্টি অনেক বিষয় সোজাসুজি নিজেই পরিচালনা করে। এ ধরনের অনেক উদাহরণ আছে। অনেক জায়গায়

সরকারী সংগঠনগুলিতে নেতৃস্থানীয় পার্টি-সভ্যদের কোন গ্রুপই নেই, বাকী-গুলিতে গ্রুপ থাকলেও সেগুলি ঠিকমতো কাজ করে না। এখন থেকে সরকারকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ পার্টিকে অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। একমাত্র প্রচারের কাজ ছাড়া, যে সব কর্মনীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পার্টি সুপারিশ করে, সেগুলোকে সরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে দিয়েই কাজে পরিণত করতে হবে। সরাসরি সরকারকে নির্দেশ দেবার যে ভুল পদ্ধতি কুওমিনতাঙরা অনুসরণ করে, সেটা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

পার্টি-সংগঠনের প্রশ্ন

সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একথা বলা যেতে পারে যে, একুশে মে'র ঘটনার কাছাকাছি সময়ে সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির পার্টি-সংগঠন-গুলির কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল সুবিধাবাদীদের হাতে। প্রতিবিপ্লব যখন শুরু হল, তখন কোন দৃঢ় সংগ্রামই প্রায় সংগঠিত হয়নি। গত বছরের অক্টোবর মাসে লালফৌজ (শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম বাহিনীর প্রথম ডিভিশনের প্রথম রেজিমেণ্ট) যখন সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলিতে এসে পৌঁছাল, তখন সামান্য সংখ্যক আগে থেকে লুকিয়ে থাকা পার্টি-সদস্যই শুধু বেঁচে ছিলেন, পার্টি-সংগঠনগুলিকে শত্রুরা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। গত নভেম্বর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে পার্টিকে পুনঃসংগঠিত করা হয় এবং মে মাসের পরবর্তীকালে বিপুলভাবে পার্টির সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু তবুও বিগত বারো মাস ধরে সুবিধাবাদের প্রকাশ ব্যাপকভাবেই ধরা পড়েছে। শত্রু এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম চালাবার মনোবলহীন কিছু কিছু সদস্য দূরবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল এবং তাদের এই কাজকে তারা অভিহিত করেছিল 'শত্রুর জন্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করা' বলে। অন্যান্য সদস্যরা সক্রিয় থাকলেও পা বাড়িয়েছিল অন্ধ অভ্যুত্থানের পথে। এ দুটিই পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রকাশ। দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম ও আন্তঃপার্টি শিক্ষার মধ্যে পোড় খাবার পর এ ধরনের ঘটনা কমে এসেছে। গত বছর লাল ফৌজের মধ্যেও এই পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শ বিদ্যমান ছিল। শত্রু এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হয় বেপরোয়া যুদ্ধ, না হয় সবাই মিলে পালানোর প্রস্তাব উত্থাপিত হতো। কোন্ ধরনের সামরিক কাজ পরিচালিত হবে, এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় প্রায়ই একই লোক এই দু'ধরনের ধারণাই প্রকাশ করে

বসত। সুদীর্ঘ অন্তঃপার্টি সংগ্রাম ও বাস্তব ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে, যেমন বেপরোয়া যুদ্ধের ফলে ক্ষয়ক্ষতি এবং সবাই মিলে দ্রুত পলায়নের সময়ের বিপর্যয়সমূহের মধ্য দিয়ে, এই সুবিধাবাদী মতাদর্শকে ধীরে ধীরে শুধরে নেওয়া গেছে।

স্থানিক মনোভাব। সীমান্ত এলাকার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। কোন কোন জায়গা এখনও হাত-মুষলের যুগেই রয়ে গেছে (পাহাড়ী অঞ্চলে সাধারণতঃ ধান ভানার জন্য এখনও কাঠের মুষলই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সমতলভূমিতে ব্যবহৃত হয় পাথরের মুষল)। সব জায়গারই সামাজিক সংগঠনের একক হচ্ছে গোষ্ঠী, একই পারিবারিক পদবী নিয়ে তা গড়ে উঠেছে গ্রামের পার্টি-সংগঠন-গুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, পার্টি-শাখার সভা কার্যতঃ একটি গোষ্ঠী সভায় পর্যবসিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারণ পার্টি-শাখার সদস্যদের সবারই পদবী এক এবং তারা থাকেও খুবই ঘনিষ্ঠভাবে। এই ধরণের অবস্থায় একটি 'জঙ্গী বলশেভিক পার্টি' তৈরী করা রীতিমতো কঠিন কাজ। এরা অনেকেই বোঝেন না যে, কমিউনিস্টরা এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির বা এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের মধ্যে কোন গভীর বিভেদের রেখা টানে না, কিংবা ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টি, জেলা বা শহরাঞ্চলের মধ্যে গভীর বিভেদ রেখা টানা উচিত নয়। কাউন্টি-গুলির পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে, এমনকি একই কাউন্টির বিভিন্ন জেলা ও শহরগুলির পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যেও প্রচণ্ড স্থানিক মনোভাব রয়ে গেছে। এই স্থানিক মনোভাব দূর করার ব্যাপারে যুক্তির প্রয়োগ খুবই সীমিত ফল দিতে পারে। বরং এ ব্যাপারে অনেক বেশি ফল দিয়েছে শ্বেত-নিপীড়ন, যা একেবারেই স্থানিক ব্যাপার নয়। যেমন, দুটি প্রদেশের যখন প্রতিবিপ্লবী 'রক্ত অবদমন' অভিযানের সময় মানুষ সংগ্রামের মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে একই সুখ-দুঃখ বরণ করে নিতে বাধ্য হয়, এবং তার ফলে তাদের স্থানিক মনোভাব ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে থাকে। এই ধরণের বহু শিক্ষার মধ্য দিয়ে স্থানিক মনোভব কমে আসছে।

স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারিদের প্রশ্ন। সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির আরও একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যেকার বিভেদ। স্থানীয় অধিবাসী এবং যাদের পূর্বপুরুষরা কয়েক শ' বছর আগে উত্তরদিক থেকে এখানে এসেছিল, সেই বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যে একটা ব্যাপক বিভেদ অনেকদিন ধরেই চলে

আসছে। এদের এই বংশানুক্রমিক রেষারেষি খুবই গভীর এবং প্রায়শঃই প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার বিস্ফরণ ঘটে। সংখ্যায় কয়েক নিযুত এই-সব বহিরাগত বসবাসকারীরা ফুকিয়েন-কোয়াংতুং সীমান্ত থেকে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট অঞ্চলে বাস করে। পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী এই সব বহিরাগতরা সমতলভূমির স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা সব সময়েই নিপীড়িত হয়েছে, এবং তারা কোনদিনই কোন রকম রাজনৈতিক অধিকার পায়নি। এই ভেবে গত দু' বছরের জাতীয় বিপ্লবকে তারা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে যে, এবার তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার দিন এসেছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা তাদেরকে এখনও আগের মতোই নিপীড়িত হতে হচ্ছে। আমাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে নিংকাং, সুইচুয়ান, লিংসীয়েন ও সালিং-এ স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যেকার এই সমস্যাটি বিরাজ করছে। নিংকাঙেই এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি গুরুতর। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নিংকাঙের স্থানীয় বিপ্লবীরা বহিরাগত বসবাসকারীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্থানীয় জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করে এবং ১৯২৬-২৭ সালে সমস্ত কাউন্টির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। গত বছর জুন মাসে চু পেই-তের অধীনস্থ কিয়াংসী সরকার বিপ্লবের বিরুদ্ধে চলে যায়। সেপ্টেম্বর মাসে নিংকাঙের বিরুদ্ধে যে 'দমন' অভিযান শুরু হয়, তাতে জমিদাররা চু পেই-তের সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে এবং আবার স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারীদের বিরোধটিকে জাগিয়ে তোলে। তত্ত্বের দিক থেকে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যেকার এই বিভেদ শোষিত শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া উচিত নয়, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তো কখনই নয়। তবু তাই ঘটেছে এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাস হিসেবে এটা থেকেই যাচ্ছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সীমান্ত এলাকায় পরাজয়ের পর স্থানীয় জমিদাররা প্রতিক্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নিংকাঙে ফিরে এসেই এই গুজব ছড়াতে শুরু করল যে, বহিরাগতরা স্থানীয় অধিবাসীদের খুন করতে আসছে। এর ফলে অধিকাংশ স্থানীয় কৃষক অধিবাসীরা আমাদের দল ছেড়ে গিয়ে সাদা ফিতে লাগিয়ে বাড়ীতে আগুন লাগাবার জন্য এবং পাহাড়ে তল্লাসী চালাবার জন্য শ্বেত-সৈন্যবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। আবার অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে লালফৌজ যখন শ্বেত-বাহিনীকে উচ্ছেদ করল, তখন স্থানীয়

কৃষক অধিবাসীরা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে পালিয়ে গেল এবং বহিরাগত কৃষকরা এসে তাদের সম্পত্তি দখল করে বসল। এই অবস্থা পার্টির মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে প্রায়ই অর্থহীন বিরোধের সৃষ্টি হতে থাকে। এ বিষয়ে আমরা যে সমাধান দিচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, একদিকে যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে তারা যাতে জমিদারদের প্রভাব কাটিয়ে বিনা উৎকণ্ঠায় ফিরে আসে তার জন্য এই ঘোষণা করতে হবে যে, 'যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে তাদের খুন করা হবে না' এবং 'যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে তারা ফিরে এলেই তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে'; আর অন্যদিকে, আমাদের কাউন্টি সরকারগুলিকে দিয়ে বহিরাগত বসবাসকারী কৃষকরা যেসব সম্পত্তি দখল করেছে, সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ জারী করাতে হবে। এ ছাড়া স্থানীয় কৃষকদের যে উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এই মর্মে এক নোটিশ সরকার-গুলিকে দিয়ে চারদিকে টাঙিয়ে দিতে হবে। পার্টির অভ্যন্তরে এই দুই অংশের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাকে আরও তীব্র করে তুলতে হবে।

আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিদের দলত্যাগ। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় (জুন মাসে) পার্টি-সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রকাশ্যে ও ঢালাওভাবে। তারই সুযোগে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বহু ব্যক্তি পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়ে। এবং এইভাবে সীমান্ত এলাকায় পার্টির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি দশ হাজারেরও ওপরে ওঠে। শাখা ও জেলা কমিটিগুলির নেতারা অধিকাংশই নতুন সদস্য, তাদের জন্য উপযুক্ত আন্তঃপার্টি শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবই হয়নি। শ্বেত-সন্ত্রাস আঘাত হানবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিরা দল ছেড়ে দেয় এবং আমাদের কমরেডদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিবিপ্লবীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। তার ফলে, শ্বেত এলাকায় অধিকাংশ পার্টি-সংগঠনই ভেঙে পড়ে। সেপ্টেম্বরের পর খুব দৃঢ়ভাবে ঘরের জঞ্জাল সাফ করার কাজ শুরু করে এবং সভ্যপদের জন্য কড়াকড়িভাবে শ্রেণীগত যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেয়। য়ুংসিন ও নিংকাঙের সমস্ত পার্টি সংগঠনকেই বাতিল করে দেওয়া হয় এবং পার্টি-সভ্যদের নতুন তালিকা তৈরী করার কাজ শুরু করা হয়। পার্টি-সভ্যদের সংখ্যা যথেষ্ট কমে গেলেও সংগ্রামী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আগে সমস্ত পার্টি-সংগঠনই ছিল প্রকাশ্য। কিন্তু সেপ্টেম্বরের পর থেকে গোপন পার্টি-সংগঠন তৈরী করা হল, যাতে প্রতিক্রিয়াশীলেরা ফিরে এলেও কাজ চালিয়ে যাবার জন্য

পার্টিকে প্রস্তুত রাখা যায়। সেই সঙ্গে আমরা শ্বেত এলাকার ভেতরে ঢুকে শত্রু শিবিরের মধ্যে কাজ চালাবার জন্য সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু নিকটবর্তী শহরগুলিতে এখনও পর্যন্ত পার্টি-সংগঠনের কোন ভিত্তি স্থাপন করা যায়নি। কারণ, প্রথমতঃ, শহরগুলিতে শত্রু বেশি শক্তিশালী; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সৈন্যরা শহরগুলি অধিকার করে থাকার ফলে বুর্জোয়াদের স্বার্থের ওপর খুব বেশি আঘাত করেছিল, এবং তার ফলে, পার্টি-সভ্যদের পক্ষে এখন সেখানে পা রাখাই কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরে নিচ্ছি এবং শহরগুলিতে পার্টি-সংগঠন তৈরী করার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখনও বিশেষ ফললাভ করতে পারা যায়নি।

পার্টির পরিচালক সংস্থাসমূহ। পার্টি-শাখার কার্যকরী কমিটির নতুন নামকরণ হয়েছে শাখা-কমিটি। শাখা-কমিটির ওপরে আছে জেলা কমিটি এবং তার ওপর কাউন্টি কমিটি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জেলা ও কাউন্টির মাঝখানে একটি বিশেষ জেলা কমিটি তৈরী করা হয়েছে, যেমন যুংসিনে পেসিয়াং বিশেষ জেলা কমিটি এবং দক্ষিণ-পূর্ব বিশেষ জেলা কমিটি। সীমান্ত এলাকায় নিংকাং, যুংসিন, লিয়েনহুয়া, সুইচুয়ান ও লিংসিয়েনে মোট পাঁচটি কাউন্টি কমিটি আছে। চালিং-এও একটা কাউন্টি কমিটি ছিল, কিন্তু সেখানে কাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে গত শীতকালে এবং এবারের বসন্তকালে সংগঠিত অধিকাংশ পার্টি-সংগঠনগুলিই শ্বেত প্রতিক্রিয়াশীলরা ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে গত ছ'মাসে শুধুমাত্র নিংকাং ও যুংসিনের নিকটবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতেই কাজ করা গেছে। সেই কারণে চালিং কমিটিকে বিশেষ জেলা কমিটিতে পরিণত করা হয়েছে। যুংসিন ও আনজেন-এ কমরেডদের পাঠানো হয়েছিল। সেখানে যেতে হয় চালিং-এর মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারা কিছুই করতে না পেরে ফিরে এসেছে। জানুয়ারী মাসে সুইচুয়ানে ওয়ানান কমিটির সঙ্গে আমাদের যুক্ত সভা হবার পর গত ছ'মাস ধরে শ্বেত প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের সঙ্গে আমাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সেপ্টেম্বরে লালফৌজ যখন এক গেরিলা অভিযানে ওয়ানানে গেল, একমাত্র তখনই আবার আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হই। ওয়ানান থেকে যে আশীজন বিপ্লবী কৃষক আমাদের বাহিনীর লোকদের সঙ্গে চিংকাং পাহাড়ে চলে এসেছিল, তারা ওয়ানান লালরক্ষী বাহিনী হিসেবে সংগঠিত হয়েছে। আনফুতে কোন পার্টি-সংগঠন নেই। যুংসিন সীমান্তে

অবস্থিত কীয়ানের কাউন্টি কমিটি আমাদের সঙ্গে মাত্র দু'বার যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, আমাদের আর কোনরকম সাহায্য করেনি—ব্যাপারটি কিন্তু খুবই অদ্ভুত। কুয়েইতুং কাউন্টির শাতিয়েন অঞ্চলে মার্চ এবং আগস্ট মাসে দু'বার ভূমি-বণ্টন করা হয়েছিল। সেখানে পার্টি সংগঠনসমূহ গড়ে তোলা হয়েছে দক্ষিণ হুনান বিশেষ কমিটির পরিচালনাধীনে। এর কেন্দ্র লুংসীর অন্তর্গত সিহারতুং-এ অবস্থিত। এই কাউন্টি কমিটিগুলির ওপরে রয়েছে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার বিশেষ কমিটি। ২০শে মে নিংকাঙের মাওপিং-এ সীমান্ত এলাকার প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কংগ্রেস প্রথম বিশেষ কমিটির সদস্য হিসেবে তেইশজনকে নির্বাচিত করে। কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন মাও সে-তুঙ। জুলাই মাসে হুনান প্রাদেশিক কমিটি ইয়াং কাই-মিংকে পাঠান, এবং তিনি অস্থায়ী কার্যকরী-সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ইয়াং অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর জায়গায় আসেন তান্ চেন-লিন্। আগস্ট মাসে লালফৌজের প্রধান বাহিনী দক্ষিণ হুনানে চলে যাবার পর শ্বেত প্রতিক্রিয়াশীলদের বাহিনী সীমান্ত এলাকার ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করে। আমরা তখন য়ুংসীনে একটি জরুরী সভায় মিলিত হই। অক্টোবর মাসে লালফৌজ নিংকাঙে ফিরে এলে মাওপিং-এ সীমান্ত এলাকার দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই অক্টোবর থেকে তিন দিনের অধিবেশন 'রাজনৈতিক সমস্যাবলী এবং সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের কর্তব্য' শীর্ষক প্রস্তাবসহ কতকগুলি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। কংগ্রেস নিম্নলিখিত উনিশজনকে দ্বিতীয় বিশেষ কমিটির সদস্য হিসেবে নিবাচিত করে—তান্ চেন-লিন্, চু তে, চেন ঈ, লুং চাও-চিং, চু চ্যাং-চিয়ে, লিউ তিয়েন-চিয়েন য়ুয়ান পান-চু, তান জু-সুং, তান পিং, লী চুয়ে-ফেই, সুং ঈ-য়ুয়ে, য়ুয়ান ওয়েন-সাই, ওয়াং সো-সুং, চেন্ চেং-জেন, মাও সে-তুঙ, ওযান্ সী-সীয়েন, ওয়াং সো, ইয়াং কাই-মিং এবং হো তিং-ইং। তান চেন-লিনকে (একজন শ্রমিক) সম্পাদক এবং চেন চেং-জেনকে (একজন বুদ্ধিজীবী) সহ সম্পাদক করে পাঁচজনের একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয়। ১৪ই নভেম্বরে লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস থেকে তেইশজনের একটি সেনাবাহিনীর কমিটি নির্বাচিত হয়। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে নিয়ে একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয় এবং চু তে তার সম্পাদক হন। সীমান্ত এলাকার বিশেষ কমিটি এবং সেনাবাহিনীর কমিটি দুটোই ফ্রণ্ট-কমিটির অধীনে থাকে।

৬ই নভেম্বর ফ্রন্ট-কমিটিকে পুনর্গঠিত করা হয়। নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক মনোনীত হন: মাও সে-তুঙ, চু তে, স্থানীয় পার্টির সদরদপ্তরের সম্পাদক (তান চেন-লিন), একজন শ্রমিক কমরেড (সুং চিয়াও-শেং) এবং একজন কৃষক কমরেড (মাও কো-ওয়েন)। মাও সে তুঙ নির্বাচিত হন ফ্রন্ট-কমিটি সম্পাদক। কিছুদিনের জন্য এই কমিটি একটি সম্পাদকীয় দপ্তর, একটি প্রচার বিভাগ, একটি সংগঠন বিভাগ, একটি শ্রমিক-আন্দোলনের কমিশন এবং একটি সামরিক বিষয়ের কমিশন তৈরী করে। স্থানীয় পার্টি-সংগঠনগুলির দায়িত্বে থাকে ফ্রন্ট-কমিটি। মাঝেমাঝেই ফ্রন্ট-কমিটিকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হয়, এবং সে কারণে বিশেষ কমিটিকে রাখার প্রয়োজন আছে। আমাদের মতে, সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শগত নেতৃত্বের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির পার্টি-সংগঠনসমূহ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কৃষকদের নিয়েই সংগঠিত হয়েছে। সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শগত নেতৃত্ব ছাড়া এই সংগঠনগুলি বিপথে যাবেই। কাউন্টি শহরগুলিতে ও অন্যান্য বড় বড় শহরের শ্রমিক-আন্দোলনের প্রতি আমাদের গভীর দৃষ্টি দিতে হবে, তাছাড়া সরকারী সংগঠনগুলিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়াতে হবে। পার্টির সমস্ত স্তরের পরিচালক সংস্থাগুলিতেও শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকদের সংখ্যার অনুপাত আরও বাড়াতে হবে।

বিপ্লবের চরিত্রের প্রশ্ন

আমরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চীন সংক্রান্ত প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করি। নিঃসন্দেহে চীন এখনও পর্যন্ত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই রয়েছে। চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করার কর্মসূচী বলতে বোঝায়, বহিঃক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে পূর্ণ জাতীয় মুক্তি অর্জন করা, এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শহরগুলি থেকে মুৎসুদ্দি শ্রেণীর শক্তি ও প্রভাব মুছে দেওয়া, গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কসমূহ ধ্বংস করার জন্য কৃষি বিপ্লব সম্পূর্ণ করা, এবং যুদ্ধবাজদের সরকারকে উৎখাত করা। এই ধরনের একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার পরই আমরা সমাজতন্ত্রে যাওয়ার সত্যিকারের বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করতে পারব। গত বছর বহু জায়গায় আমরা যুদ্ধ চালিয়েছি এবং এখন সমগ্র দেশেই বিপ্লবের জোয়ারে যে ভাঁটা পড়েছে, সে সম্পর্কে আমরা খুবই সচেতন। একদিকে, গোটাকয়েক ছোট

ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপিত হয়েছে, আর অন্যদিকে সমগ্র দেশে জনগণের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু পর্যন্ত নেই—শ্রমিক, কৃষক, এমনকি, গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদেরও বাক্-স্বাধীনতা বা সভা-সমাবেশ করবার স্বাধীনতা নেই। আর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধ। লালফৌজ যেখানেই যাক, জনগণ সবজায়গাতেই উৎসাহহীন, তারা কাছে আসে না, এবং কেবল আমাদের প্রচারের পরেই তারা ধীরে ধীরে গিয়ে সংগ্রামে যোগ দেয়। শত্রুসৈন্যের যে-কোন বাহিনীর মুখোমুখিই আমরা হই না কেন, তাদের মধ্যে আর বিদ্রোহ হচ্ছে না, তারা আমাদের পক্ষে চলেও আসছে না, এবং যুদ্ধটা আমাদের করতেই হচ্ছে। এমনকি ২১শে মে'র ঘটনার পর শত্রুদের যে বাহিনী থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক 'বিদ্রোহীদের' আমরা পেয়েছিলাম, সেই ষষ্ঠ বাহিনী সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। আমাদের বিচ্ছিন্নতা আমরা তীব্রভাবে অনুভব করছি। আমরা আশা করছি, শিগগিরই এই অবস্থার অবসান ঘটবে। কেবল গণতন্ত্রের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করার মধ্যে দিয়েই—যাতে শহরের পেটি-বুর্জোয়াদেরও সমাবেশ ঘটাতে হবে—আমরা বিপ্লবকে একটা উত্তাল জোয়ারে পরিণত করতে পারব যার ঢেউ সমগ্র দেশেই ছড়িয়ে পড়বে।

এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আমরা বেশ ভালভাবেই পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতি এই নীতি প্রয়োগ করতে পেরেছিলাম। মার্চ মাসে দক্ষিণ হুনানের বিশেষ কমিটির প্রতিনিধি নিংকাঙে এলেন। আমরা নাকি খুবই কম অগ্নিসংযোগ ও খুন করেছি, এবং 'পেটি বুর্জোয়াদের সর্বহারা বানিয়ে তারপর তাদের বিপ্লবে ঠেলে নামানো'-র তথাকথিত নীতিটি কাজে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছি, অর্থাৎ আমরা নাকি দক্ষিণে ঝুঁকে পড়েছি—এইসব বলে তিনি আমাদের তীব্র সমালোচনা করেন। ফ্রন্ট-কমিটির নেতৃত্ব পুনর্গঠিত হল এবং নীতিও বদলে দেওয়া হল। এপ্রিল মাসে আমাদের গোটা বাহিনী সীমান্ত এলাকায় এসে পৌছাবার পরও সেখানে খুব বেশি অগ্নিসংযোগ বা খুন করা হল না। কিন্তু শহরগুলির মাঝারি ব্যবসায়ীদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল এবং গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষক ও ছোট জমিদারদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক টাকা আদায়ের কাজ খুবই কঠোরভাবে চালু করা হল। দক্ষিণ হুনানের বিশেষ কমিটি প্রদত্ত 'সমস্ত কারখানাই শ্রমিকদের' শ্লোগানটি চারিধারে ব্যাপকভাবে

প্রচার করা হল। পেটি-বুর্জোয়াদের ওপর আক্রমণ করার এই উগ্র বামপন্থী নীতিটি পেটি বুর্জোয়াদের অধিকাংশকেই ঠেলে দিল জমিদারদের দিকে। ফলে তারা সাদা ফিতে গায়ে এঁটে আমাদের বিরোধিতা করতে শুরু করল। ধীরে ধীরে এই নীতি আবার পাল্টানো হল এবং তারপর থেকে পরিস্থিতিও অনুকূল হয়ে এল। বিশেষভাবে সুফল পাওয়া গেছে সুইচুয়ানে, কারণ কাউন্টি শহর ও অন্যান্য গঞ্জগুলির ব্যবসায়ীরা আমাদের আর এখন অবিশ্বাসের চোখে দেখছে না, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ লালফৌজ সম্বন্ধে ভাল কথাই বলছে। সাওলিন-এর হাটে (তিন দিন অন্তর দুপুর হাট বসে) এখন প্রায় কুড়ি হাজার লোক এসে জমা হচ্ছে যা এর আগে কোনদিনই হয়নি। এটা আমাদের নীতির সঠিকতাই প্রমাণ করছে। জমিদাররা জনগণের ওপর এর আগে দুর্বিষহ করের বোঝা ও জবরদস্তিমূলক আদায়ের পদ্ধতি চাপিয়েছিল। সুইচুয়ানের শান্তিরক্ষীদল[২১] হুয়ানগাও থেকে সাওলিন পর্যন্ত ৭০ লী দীর্ঘ পথে পাঁচটি পথ-কর আদায় করত, কোন কৃষি-পণ্যই রেহাই পেত না। ঐ রক্ষীদলকে উৎখাত করে এই পথ-কর আমরা বন্ধ করে দিয়েছি এবং এই কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা কৃষক এবং ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের সমর্থন লাভ করেছি।

কেন্দ্রীয় কমিটি চাইছেন আমরা এমন একটা রাজনৈতিক কর্মসূচী তৈরী করি, যাতে পেটি-বুর্জোয়াদের স্বার্থগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়; এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমরা প্রস্তাব করছি যে, কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিকদের স্বার্থ, কৃষি বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নগুলিকে বিবেচনা করে সমগ্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যই একটি সাধারণ দিকনির্দেশ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করুন।

প্রধানতঃ কৃষি-অর্থনীতির দেশ চীনের বিপ্লবের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামরিক কাজের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিকাশ সাধন। আমরা প্রস্তাব করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি যেন সামরিক কাজের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আমাদের স্বাধীন এলাকার স্থান নির্বাচনের প্রশ্ন

উত্তর কোয়াংতুং থেকে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবে লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। এই পর্বতমালাটি আমরা ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করেছি। এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে তুলনা করলে

দেখা যায় যে, নিংকাংকে কেন্দ্র করে মধ্যবর্তী অংশটাই আমাদের সশস্ত্র স্বাধীন এলাকার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। উত্তরাংশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা আক্রমণ বা প্রতিরক্ষা কোন দিক থেকেই আমাদের পক্ষে বিশেষ উপাযোগী নয়, এবং এই অংশটা শত্রুর প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলির খুবই কাছাকাছি। দ্রুতগতিতে চ্যাংসা বা উহান দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা ছাড়া লিউইয়াং, লিলিং, পিংসিয়াং এবং টুংকুতে কোন বড় বাহিনী মোতায়েন করা খুবই বিপজ্জনক হবে। দক্ষিণ অশেংর ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা উত্তরাংশের চেয়ে নিঃসন্দেহে ভাল, কিন্তু সেখানে আমাদের গণভিত্তি মাঝের অংশের মতো অত দৃঢ় নয়। তা ছাড়া মাঝের অংশ থেকে আমরা হুনান ও কিয়াংসীর ওপর যে বিরাট রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারি, ঐ অংশ থেকে তা সম্ভব নয়। ঐ অংশে আমাদের যে-কোন কাজের প্রভাব ঐ দুই প্রদেশের নীচের দিকের নদী-উপত্যকাগুলির ওপর পড়তে পারে। মাঝের অংশে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছে: (১) একটি গণভিত্তি, যা আমরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গড়ে তুলেছি; (২) পার্টি-সংগঠনের উপযুক্ত ভিত্তি; (৩) এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সংগঠিত এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে বেশ অভিজ্ঞ স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী—যা একটি দুর্লভ কৃতিত্ব। লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে এই স্থানীয় বাহিনী মিলিত হলে তাকে ধ্বংস করা যে-কোন শত্রুবাহিনীর পক্ষেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে; (৪) চমৎকার সামরিক ঘাঁটি চিংকাং পাহাড় এবং সমস্ত কাউন্টিতেই আমাদের স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর চমৎকার ঘাঁটি; এবং (৫) এই স্থান থেকে দুটি প্রদেশের ওপরে এবং তাদের নিম্নাংশের নদী-উপত্যকাগুলির ওপরে প্রভাব বিস্তার করা যায়, দক্ষিণ হুনান বা দক্ষিণ কিয়াংসীর তুলনায় যার রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। তারা যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা শুধু সেই প্রদেশের মধ্যেই অথবা বড়জোর সেই প্রদেশের পশ্চাদ্‌ভূমিতে এবং নদী-উপত্যকাগুলির ওপরের দিকের অংশেই সীমিতি। আর মধ্যবর্তী অংশের অসুবিধা হল এই যে, দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীন এলাকা হিসাবে থাকার ফলে এই অংশ বার বার শত্রুদের বিরাট বিরাট 'অবরোধ ও অবদমনের' সম্মুখীন হয়েছে, এবং তার ফলে এই অংশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, বিশেষতঃ নগদ টাকার অভাব অত্যন্ত অসুবিধেজনক।

এখানকার কাজের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জুন ও জুলাই মাসের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হুনান প্রাদেশিক কমিটি তিনটি পৃথক পরিকল্পনার কথা

জানিয়েছেন। প্রথমে য়ুয়ান তে-শেং এসে লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যে অংশে রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করার যে পরিকল্পনা আমাদের ছিল, তা অনুমোদন করলেন। তারপর তু সিউ-চিং এবং ইয়াং কাই-মিং এসে জোর দিয়ে বললেন, সীমান্ত এলাকাকে রক্ষা করার জন্য মাত্র দু'শো রাইফেলধারী সৈন্য ও লালরক্ষী বাহিনীকে রেখে লালফৌজের উচিত 'বিনা দ্বিধায়' দক্ষিণ হুনানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাঁদের মতে, এইটাই 'সম্পূর্ণ সঠিক' নীতি। এবার তৃতীয় বার, প্রায় দিন দশেক পর, য়ুয়ান তে-শেং আবার এলেন একটি বার্তা নিয়ে। সেই বর্তায় আমাদের প্রচুর সমালোচনা করা ছাড়াও বিশেষ জোর দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হল—লালফৌজ যেন পূর্ব হুনানের দিকে এক্ষুণি যাত্রা করে। এটিও নাকি 'সম্পূর্ণ সঠিক' নীতি, এবং আমরা যেন 'বিনা দ্বিধায়' এই নীতিকে কার্যকরী করি। এইসব অনমনীয় নির্দেশের ফলে আমরা উভয়-সংকটে পড়ে গেলাম, কারণ নিদেশ না মানার অর্থ অবাধ্যতা, অথচ নির্দেশ পালন করা মানেই সুনিশ্চিত পরাজয়। দ্বিতীয় বার্তাটি আসার পর সেনাবাহিনীর কমিটি, সীমান্ত এলাকার বিশেষ কমিটি এবং পার্টির য়ুংসিন কাউন্টি কমিটির একটি যুক্ত সভা হয় এবং তাঁরা প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশাবলী কার্যকরী না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারণ তাঁরা দক্ষিণ হুনানে যাত্রা করা বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তু সিউ-চিং এবং ইয়াং কাই-মিং প্রাদেশিক কমিটির পরিকল্পনাটিকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন, এবং ২৯ নং রেজিমেণ্টের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছার সুযোগ নিয়ে কয়েকদিন পর চেনচৌ কাউন্টি শহর আক্রমণ করার জন্য লালফৌজকে দিয়ে যান। এইভাবে এঁরা সীমান্ত এলাকা ও লালফৌজের পরাজয় ডেকে আনেন। লালফৌজ প্রায় অর্ধেক সৈন্য হারায়, সীমান্ত এলাকার অসংখ্য বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং বহু লোককে খুন করা হয়। একের পর এক কাউন্টি শত্রুদের দখলে চলে যায় এবং সেইসব অঞ্চলের কিছু কাউন্টি আজ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। হুনান, হুপে ও কিয়াংসী প্রদেশের জমিদার-শাসকদের মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু না হওয়া সত্ত্বেও লালফৌজের প্রধান বাহিনীর পক্ষে পূর্ব হুনানে যুদ্ধযাত্রা করাটা নিঃসন্দেহে ভুল হয়েছিল। জুলাই মাসে আমরা যদি দক্ষিণ হুনানের দিকে না এগোতাম তাহলে সীমান্ত এলাকায় আগস্ট মাসের পরাজয় এড়ানো যেত, এবং কিয়াংসী প্রদেশের চ্যাংশুতে কুওমিনতাঙের ষষ্ঠ বাহিনীর সঙ্গে ওয়াং চুনের কুওমিনতাঙ বাহিনীর যে যুদ্ধ চলছিল, তার সুযোগ নিয়ে য়ুংসিনের শত্রুসৈন্যদের বিধ্বস্ত

করা যেত, কিয়ান ও আনফু দখল করা যেত, আমাদের অগ্রগামী বাহিনী পিং-সিয়াং পৌঁছাতে পারত, এবং লোসিয়াও পর্বতমালার উত্তরাংশে পঞ্চম লাল-ফৌজ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাও সম্ভব হতো। যা ঘটে গেছে তা সত্ত্বেও আমাদের সদর দপ্তরের পক্ষে উপযুক্ত কেন্দ্র হতো নিংকাং এবং শুধুমাত্র গেরিলাবাহিনীগুলিকেই পূর্ব হুনানে পাঠানো উচিত ছিল। জমিদারদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি এবং শক্তিশালী শত্রুবাহিনী তখনও হুনান সীমান্তে পিংসিয়াং, চালিং ও য়ুসীয়েন-এ অপেক্ষা করছিল। তখন আমরা আমাদের প্রধান বাহিনীকে উত্তরদিকে সরিয়ে নিলে শত্রুদেরই সুবিধে করে দেওয়া হতো। কেন্দ্রীয় কমিটি দাক্ষিণ বা পূর্ব হুনানের দিকে এগিয়ে যাবার প্রশ্নটিকে আমাদের বিবেচনা করতে বলেছিলেন। কিন্তু এই দুটোই ছিল বিপজ্জনক পথ। পূর্ব হুনান অভিযানের প্রস্তাবটি কার্যকরী হয়নি ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণ হুনান অভিযানটি ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আমাদের সব সময়েই মনে রাখা উচিত।

জমিদারশ্রেণীর শাসন-ব্যবস্থায় এখনও ভাঙন ধরেনি, এবং সীমান্ত এলাকার চারিপাশে শত্রুর যেসব 'দমন' বাহিনী রয়েছে, তাদের সংখ্যা দশ রেজিমেণ্টেরও বেশি। কিন্তু আমরা যদি নগদ টাকা সংগ্রহের উপায় খুঁজে বের করতে পারি (খাদ্য ও বস্ত্রের সমস্যাটা এখন আর বড় সমস্যা নয়), তাহলে সীমান্ত এলাকায় আমাদের কাজকর্মের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এই শত্রু বাহিনীগুলির সঙ্গে, এমনকি তাদের চেয়েও বড় বাহিনীর সঙ্গে আমরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। লালফৌজ যদি অন্য কোথাও সরে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে এই সীমান্ত এলাকা বিগত আগস্ট মাসের মতোই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। আমাদের লালরক্ষী বাহিনীর সবটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না ঠিকই, তবে আমাদের পার্টি এবং গণভিত্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাত আসবে, এবং তাছাড়া, পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের পা রাখবার মতো জায়গা থাকলেও সমতল-ভূমিতে বিগত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মতোই আমাদের আত্মগোপন করে থাকতে হবে। আর লালফৌজ যদি অন্য কোথায়ও চলে না যায়, তবে যে ভিত্তি আমাদের আছে তারই ওপর দাঁড়িয়ে আশেপাশের এলাকাগুলিতে আমরা ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ ঘটাতে পারব, এবং আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যদি আমরা লালফৌজকে আরও সম্প্রসারিত করতে চাই, তবে তার একমাত্র পথ হচ্ছে চিংকাং পাহাড়ের কাছাকাছি যে সব

জায়গায় আমাদের দৃঢ় গণভিত্তি আছে—যেমন নিংকাং, য়ুংসিন, লিংসীয়েন এবং সুইচুয়ান মহকুমায়—সেসব জায়গায় শত্রুকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে আটকিয়ে রাখা, এবং হুনান ও কিয়াংসী এই দুই প্রদেশের শত্রু সৈন্যদের মধ্যেকার স্বার্থের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানো, সব দিক থেকেই তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন-বোধ জাগিয়ে রাখা, এবং এভাবে তাদের কেন্দ্রীভূত হতে না দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। লালফৌজকে আমার সম্প্রসারিত করতে পারি সঠিক কৌশল গ্রহণ করে, জয়ের সম্ভাবনা ছাড়া যুদ্ধে না নেমে, এবং অস্ত্র দখল করে ও শত্রু সৈন্য বন্দী করে। লালফৌজের প্রধান বাহিনীটি যদি দক্ষিণ হুনানে অভিযানে না যেত, তাহলে এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সীমান্ত এলাকার জনগণের মধ্যে যে প্রস্তুতিমূলক কাজ হয়েছিল, তার ভিত্তিতে আগস্ট মাসে লালফৌজকে নিশ্চিতভাবেই আরও সম্প্রসারিত করা যেত। এই ভুল সত্ত্বেও লালফৌজ আবার সীমান্ত এলাকায় ফিরে এসেছে। সেখানে ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল, জনগণও বন্ধুভাবাপন্ন, এবং এমনকি এখনও সম্ভাবনা খুব খারাপ নয়। কেবল-মাত্র যুদ্ধ পরিচালনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে ও সীমান্ত এলাকার মতো বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধের সাহস দেখাতে পারলেই লালফৌজ নিজের অস্ত্র-শস্ত্র বাড়াতে পারে, শিক্ষা দিয়ে ভাল সৈন্য তৈরি করতে পারে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সীমান্ত এলাকায় লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। হুনান, হুপে, কিয়াংসী এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশেরই জমিদারশ্রেণীর মধ্যে এই ঘটনা তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে হলেও এই ঘটনা স্থিরপ্রতিজ্ঞভাবে চারিপাশের প্রদেশগুলির শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মনে আশা-ভরসা জাগিয়ে তুলছে সৈনিকদের কথা ভাবুন, সীমান্ত এলাকার বিরুদ্ধে 'দস্যু-দমন' অভিযানকে যুদ্ধবাজরা প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই বলে বিবৃতি দিচ্ছে যে, 'একটা বছর চলে গেল, দস্যু-দমনের প্রচেষ্টায় দশ লক্ষ ডলার খরচ হয়ে গেল' (লু তি-পিং), কিংবা লালফৌজে '২০,০০০ সৈন্য ও ৫,০০০ রাইফেল আছে' (ওয়াং চুন)। এইসব বিবৃতি ওদের সৈন্য ও ভগ্নোদ্যম ছোট অফিসারদের মনোযোগ আমাদের দিকে আকৃষ্ট করছে। শত্রুপক্ষ থেকে অবশ্যই আরও বেশি সংখ্যায় সৈন্য দল ছেড়ে আমাদের বাহিনীতে যোগদান করবে এবং তারা এইভাবে লালফৌজে সৈন্য ভর্তির আর একটি উৎসমুখ খুলে দেবে। তাছাড়া সীমান্ত এলাকায় লাল ঝাণ্ডা যে কখনও নামানো যায়নি, এই ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে কমিউনিস্ট-পার্টির শক্তি কী বিরাট এবং শাসনশ্রেণীগুলি কত

সেউলিয়া। সমগ্র দেশব্যাপী এই ঘটনার একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। সুতরাং আমরা মনে করি, এবং আগেও একথা আমরা সব সময়েই মনে করেছি যে, লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্য অংশে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলা এবং তার সম্প্রসারণ ঘটানোটা একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় ও সঠিক কাজ।

টীকা

১। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে এই যুদ্ধ হয়েছিল।

২। ১৯২৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই যুদ্ধ হয়েছিল।

৩। লালফৌজে সৈনিক প্রতিনিধিদের সম্মেলন ও সৈনিকদের কমিটির ব্যবস্থা পরবর্তীকালে বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯৪৭এ গণমুক্তিফৌজ কর্মীদের নেতৃত্বে সৈনিকদের সম্মেলন ও সৈনিকদের কমিটির পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে।

৪। কমরেড ইয়ে তিং এবং হো লুঙের অধীন এইসব সৈন্যরা ১৯২৭এর ১লা আগস্ট নানচাং অভ্যুত্থান ঘটায়। কোয়াতুং প্রদেশের চাওচৌ ও সোয়াতৌ-এর দিকে এগোবার পথে এরা পরাজিত হয় এবং কমরেড চু তে, লিন পিয়াও ও চেন-ঈ দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি ইউনিট কিয়াংসীর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ হুনানে সরে যায় গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার জন্য। ১৯২৮এর এপ্রিলে তারা চিংকাং পাহাড়ে কমরেড মাও সে-তুঙের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

৫। ১৯২৭ সালের বিপ্লবী দিনগুলিতে উচাংএ অবস্থিত জাতীয় সরকারের রক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধারা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ১৯২৭এর জুলাই মাসের শেষের দিকে ওয়াং চিং-ওয়েই এবং তার সাকরেদরা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর নানচাং অভ্যুত্থানে যোগ দেবার জন্য এই বাহিনী উচাং ছেড়ে যাবার পথে যখন শুনল যে, বিপ্লবী সৈন্যরা ইতিমধ্যেই নানচাং ছেড়ে দক্ষিণে যাত্রা করেছে, তখন এই বাহিনী পিংকিয়াং ও লিউইয়াং-এর সশস্ত্র কৃষকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য নানা ঘুরপথে পশ্চিম কিয়াংসীর অন্তর্গত সিউশুইতে গিয়ে পৌঁছাল।

৬। ১৯২৭এর বসন্তকালে হুনান প্রদেশের পিংকিয়াং ও লিউইয়াং অঞ্চলে বেশ শক্তিশালী একটি সশস্ত্র কৃষকবাহিনী তৈরী হয়। ২১শে মে তারিখে চ্যাং-

শাতে সু কে-সিয়াং ক্ষমতা দখলের জন্য প্রতিবিপ্লবী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বিপ্লবী জনগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তখন প্রতিবিপ্লবীদের ওপর প্রত্যাঘাত হানবার জন্য ৩১শে মে তারিখে কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী চ্যাংশার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সুবিধাবাদী চেন তু-সিউ তাদের মাঝপথে আটকে দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। এরপর এই বাহিনীর একটি অংশকে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য পুনর্গঠিত করা হয়। ১লা আগস্ট নানচাং অভ্যুত্থান ঘটার পর, এই সশস্ত্র কৃষকেরা, কিয়াংসী প্রদেশের সিউশুই ও টুংকুতে এবং হুনান প্রদেশের পিংকিয়াং ও লিউইয়াং এ উচাং জাতীয় সরকারের আগেকার রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর তারা কিয়াংসী প্রদেশের পিংসিয়াঙের সশস্ত্র কয়লা খনি শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থান ঘটায়। কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে এরা চিংকাং পাহাড়ে চলে আসে।

৭। ১৯২৮এর শুরুতে কমরেড চু তের নেতৃত্বে দক্ষিণ হুনানে যখন বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধ চলছিল তখন ইচাং, চেন চৌ, লেইয়াং, য়ুংসিন ও জেসিং তালুকে কৃষকদের সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলিতে ইতিপূর্বেই কৃষক-আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে কমরেড চু তের নেতৃত্বে তারা চিংকাং পাহাড়ে এসে কমরেড মাও সে-তুঙের বাহিনীতে যোগ দেয়।

৮। হুনান প্রদেশের চ্যাংনিং অঞ্চলে সুইকৌসান সীসার খনির জন্য বিখ্যাত। ১৯২২এ সেখানকার খনি শ্রমিকরা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি ট্রেড ইউনিয়ন তৈরী করে এবং বহু বছর ধরে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। ১৯২৭এর শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থানের পর অনেক খনি শ্রমিক লালফৌজে যোগ দেয়।

৯। কিয়াংসী প্রদেশে পিংসিয়াং তালুকে অবস্থিত আনিয়ুয়ান কয়লা খনিতে ১২,০০০ শ্রমিক কাজ করত, এর মালিক ছিল হান-ইয়ে-পিং লোহা ও ইস্পাত কোম্পানি। কমিউনিস্ট পার্টির হুনান প্রাদেশিক কমিটি প্রেরিত সংগঠক কমরেডরা ১৯২১ সালে ঐখানে পার্টি সংগঠন ও খনি শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে তোলেন।

১০। ১৯২৯এ লালফৌজে পার্টি-প্রতিনিধিদের নতুন নামকরণ হয় পলিটিক্যাল কমিশার বা রাজনৈতিক প্রতিনিধি। ১৯৩১এ কোম্পানি পলিটিক্যাল কমিশারদের নাম পাল্টে পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর বা রাজনৈতিক নির্দেশক রাখা হয়।

১১। সেনাবাহিনীর আংশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় অত্যাচারীদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীতি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। ঘাঁটি অঞ্চলের সম্প্রসারণ ও সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর সংগ্রহ করে সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করা হতো এবং তার প্রয়োজনও ছিল।

১২। এই সময় থেকে সমান-সমান নগদ টাকা দেওয়ার এই রীতিটি লালফৌজে বহু বছর চালু ছিল। পরে পর্যাদা অনুযায়ী সামান্য কিছু কমবেশি টাকা অফিসার ও সৈন্যদের দেওয়া হতো।

১৩। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। কারণ, লালফৌজের প্রথম যুগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর জোর না দিলে যেসব কৃষকরা নতুন লালফৌজে ভর্তি হতো, বা যেসব শ্বেত বাহিনীর বন্দী সৈন্যরা লালফৌজে যোগ দিত, তাদের মধ্যে বিপ্লবী উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া যুদ্ধবাজদের প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীর কর্মধারা (যার প্রভাব আমাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা দিত) দূর করাও সম্ভব হতো না। তবে সেনাবাহিনীতে গণতন্ত্র সামরিক শৃঙ্খলার সীমা লঙ্ঘন নিশ্চয়ই করবে না। গণতন্ত্র সামরিক শৃঙ্খলাকে শক্তিশালীই করে, দুর্বল করে না। সুতরাং, প্রয়োজনীয় পরিমাণে যেমন গণতন্ত্রের প্রসার ঘটাতে হবে, তেমনি উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর অতি-গণতন্ত্রের দাবি নিশ্চিহ্নভাবে রুখতে হবে। লালফৌজের প্রথম যুগে একটা সময়ে এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে অতি-গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমরেড মাও সে-তুঙের সংগ্রাম সম্বন্ধে জানার জন্য এই খণ্ডেই মুদ্রিত 'পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে' রচনাটি দেখুন।

১৪। ১৯২৬ এ উত্তরাভিযানের সময় কমরেড ইয়ে তিং একটি স্বাধীন রেজিমেণ্ট পরিচালনা করতেন। কমিউনিস্টদের নিয়ে এর কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল এবং এটি একটি দুধর্ষ বাহিনী হিসেবে খ্যাতিলাভ করে। বিপ্লবী সেনাবাহিনী উচাং দখল করার পর এটিকে সম্প্রসারিত করে ২৪নং ডিভিশনে পরিণত করা হয়, এবং নানচাং অভ্যুত্থানের পর এই ডিভিশনটিকে আবার একাদশ সেনাবাহিনীতে পরিবর্তিত করা হয়।

১৫। লালফৌজের পরবর্তী অভিজ্ঞতা এইটাই প্রমাণ করে যে, পার্টির

বাইরের লোক ও পার্টি-সদস্যের আনুপাতিক হার হওয়া উচিত ২ : ১। সাধারণভাবে এই অনুপাতিক হারটি লালফৌজে এবং পরবর্তী সময়ে গণ-মুক্তিফৌজে মেনে চলা হতো।

১৬। চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে প্রতিবিপ্লবী কুওমিনতাঙ সেনানায়কেরা চ্যাংশার ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন ও অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনগুলির প্রাদেশিক সদর দপ্তরগুলির ওপর আক্রমণ চালায় এবং কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষকদের দলে দলে গ্রেপ্তার ও হত্যা করে। এই ঘটনা ওয়াং চিং-ওয়েই এর নেতৃত্বাধীন উহান্ চক্র এবং চিয়াং কাই-শেকএর নেতৃত্বাধীন নানকিং চক্র—এই দুই প্রতিবিপ্লবী কুওমিনতাঙ চক্রের প্রকাশ্য সহযোগিতার সূত্রপাতকেই সূচিত করেছিল।

১৭। ১৯২৮এ হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলের ভূমি-সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা হচ্ছে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্তকরণ ও পুনর্বণ্টন। পরে কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়েছেন যে, কৃষি সংগ্রামে অনভিজ্ঞতার দরুণ, জমিদারদের জমির বদলে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করা ভুল হয়েছিল। ১৯২৯এর এপ্রিলে, কিয়াংসীর সিংকুয়ো তালুকে যে ভূমি-আইন গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে 'সমস্ত জমি বাজেয়াপ্তকরণ' করার ধারাটি বদলে 'সমস্ত সরকারী জমি ও জমিদারের জমি বাজেয়াপ্তকরণ'-এর ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

১৮। গ্রামাঞ্চলে মধ্যবর্তীশ্রেণীর সমর্থন লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কমরেড মাও সে-তুঙ তাই এই শ্রেণীর সঙ্গে অতিরিক্ত কঠোর ব্যবহারের ভ্রান্তনীতি শুধরে দেন। বর্তমান প্রবন্ধটি ছাড়াও, এই শ্রেণীর প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করা উচিত, সে সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙের মতামত লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা প্রস্তাবে (নভেম্বর, ১৯২৮) এবং 'বেপরোয়া গৃহদাহ ও হত্যা নিষিদ্ধ করা,' 'ছোটো ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করা' শীর্ষক প্রস্তাবেও দেওয়া আছে। ১৯২৯এর জানুয়ারী মাসে লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর ঘোষণা এবং ১৯২৯এর এপ্রিল মাসে গৃহীত সিংকুয়ো কাউন্টির ভূমি আইন (১৭নং টীকা দ্রষ্টব্য) ইত্যাদির মধ্যেও কমরেড মাও সে-তুঙের মতামত পাওয়া যাবে। চতুর্থ বাহিনীর উপরোক্ত ঘোষণায় বলা হয়েছিল: 'শহরে ব্যবসায়ীরা, যারা ধীরে ধীরে কিছু সম্পত্তি তৈরি করেছে, যতক্ষণ কর্তৃত্ব মেনে চলবে তাদের আয়ে হাত দেওয়া হবে না।'

১৯। বিপ্লবী যুদ্ধের প্রসার, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলগুলির সম্প্রসারণ ও বিপ্লবী

সরকার কর্তৃক শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষার নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছিল, এবং পরে অবস্থার পরিবর্তন সত্যিই ঘটেছিল। এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের শিল্প ও বাণিজ্যকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা এবং উগ্র বামপন্থী কর্মনীতিগুলির দৃঢ় বিরোধিতা করা হয়েছিল।

২০। ভূমি বণ্টনের জন্য শ্রমশক্তি উপযুক্ত মাপকাঠি নয়। লাল এলাকাগুলিতে মাথাপিছু সমানভাবে নতুন করে ভূমি বণ্টন করা হয়েছিল।

২১। শান্তি বাহিনী ছিল এক ধরনের স্থানীয় প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী।

পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে

(ডিসেম্বর, ১৯২৯)

লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর কমিউনিস্ট পার্টি-সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের অ-সর্বহারাসুলভ চিন্তাধারা বিরাজ করছে। পার্টির সঠিক লাইন অনুসরণে এটা খুবই বড় বাধার সৃষ্টি করছে। যদি সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করা না হয়, তাহলে লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী তার কাঁধে ন্যস্ত চীনের মহান বিপ্লবী সংগ্রামের কর্তব্যভার অবশ্যই বহন করতে পারবে না। পার্টির মূল ইউনিট-গুলির বিপুল-সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি কৃষক এবং অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়াদের থেকে উদ্ভূত লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। এখানেই নিহিত রয়েছে চতুর্থ বাহিনীর পার্টি-সংগঠনের ভিতরকার বিভিন্ন রকম ভুল চিন্তাধারার উৎস। কিন্তু, এইসব ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় সংগ্রামের অভাব এবং পার্টি-সদস্যদের সঠিক লাইনে শিক্ষাদানের অভাব—এটাও এর অস্তিত্ব ও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বর মাসের

কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর নবম কংগ্রেসের একটি প্রস্তাব হিসাবে। চীনের গণফৌজ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। চীনের লালফৌজ (জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় যা অষ্টম রুট বাহিনী এবং নতুন চতুর্থ বাহিনী হিসেবে এবং বর্তমানে গণমুক্তিফৌজ হিসেবে পরিচিত) সংগঠিত হয় ১৯২৭ সালের ১লা আগস্ট নানচাং অভ্যুত্থানের সময় এবং ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তার বয়স দু'বছর পেরিয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে নানা ধরনের ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে লালফৌজের পার্টি-সংগঠন বিরাট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। বর্তমান প্রস্তাবটি তারই সার-সংকলন। পুরোপুরি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর ভিত্তি করে লালফৌজকে গড়ে তুলতে এবং পুরানো ধরনের সেনাবাহিনীর প্রভাব নির্মূল করতে এই প্রস্তাবটি বিশেষভাবে সাহায্য করে। শুধু চতুর্থ বাহিনীতেই নয়, ক্রমান্বয়ে লালফৌজের অন্যান্য শাখাতেও এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়, এবং এভাবে সমগ্র চীনা লালফৌজটিই সাচ্চা একটি গণফৌজে পরিণত হয়। পার্টির কাজ ও রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে গত ত্রিশ বছরে চীনের সশস্ত্র গণফৌজে প্রচণ্ড বিকাশ ঘটেছে, এবং বর্তমানে এ দুটি কাজকে আলাদা মনে হলেও, এই প্রস্তাবে বিধৃত মূল লাইন এখনও পর্যন্ত অপরিবর্তিতই আছে।

চিঠির মর্মবাণী অনুসারে এই কংগ্রেস চতুর্থ বাহিনীর পার্টি-সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের অ-সর্বহারাসুলভ চিন্তাধারার অভিব্যক্তি, তার উৎস ও সংশোধন করার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছে এবং সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য কমরেডদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে

লালফৌজের কোন কোন কমরেডের মধ্যে নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ খুবই বিকাশলাভ করেছে। এটা নিজেকে এইভাবে প্রকাশ করে।

(১) এইসব কমরেড সামরিক ব্যাপার ও রাজনীতিকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করেন এবং সামরিক ব্যাপার যে রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের অন্যতম যন্ত্র মাত্র, এ কথা তাঁরা অস্বীকার করেন। এমনকি, কেউ কেউ আরও বলেন, 'সামরিক ব্যাপারে ভাল হলে স্বভাবতই রাজনীতিতে ভাল হবে, সামরিক ব্যাপারে ভাল না হলে রাজনীতিতেও ভাল হতে পারে না।' এইভাবে তাঁরা আরও দূরে চলে গেছেন, তাঁদের মতে সামরিক ব্যাপার রাজনীতির উপর নেতৃত্ব করে।

(২) তাঁরা মনে করেন যে, শ্বেত বাহিনীর মতো লালফৌজেরও কর্তব্য হচ্ছে কেবলমাত্র যুদ্ধ করা। তাঁরা এ কথা জানেন না যে, চীনা লালফৌজ হচ্ছে বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য একটা সশস্ত্র বাহিনী। বিশেষ করে বর্তমানে, লালফৌজ যে কেবলমাত্র যুদ্ধই করে, তা অবশ্যই নয়। শত্রুর সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য লড়াই করা ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানো, জনসাধারণকে সংগঠিত করা, তাঁদের সশস্ত্র করা এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ও পার্টি-সংগঠন স্থাপনের কাজে তাঁদের সাহায্য করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকেও এর কাঁধে তুলে নিতে হবে। নিছক লড়াই করার জন্যই লালফৌজ লড়াই করে না, পরন্তু লড়াই করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানোর জন্য, জনসাধারণকে সংগঠিত করার জন্য, তাঁদেরকে সশস্ত্র করার জন্য এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে তাঁদের সাহায্য করার জন্য। এইসব উদ্দেশ্য ছাড়া লড়াই হয়ে ওঠে অর্থহীন, আর লালফৌজের অস্তিত্বেরও কোন তাৎপর্য থাকে না।

(৩) তাই, সাংগঠনিক দিক দিয়ে, এইসব কমরেডরা লালফৌজের রাজনৈতিক কার্যনির্বাহক সংস্থাগুলিকে সামরিক কার্যনির্বাহক সংস্থাগুলির

অধীনে স্থান দেন এবং তাঁরা এই শ্লোগান তোলেন যে, 'সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তরকেই বাইরের কার্য পরিচালনার ভার দেওয়া হোক।' এই ধরনের চিন্তাধারা যদি বাড়তে দেওয়া হয়, তাহলে, তা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার বিলই ডেকে আনবে, ডেকে আনবে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবারই বিপদ —এটা হবে সেই যুদ্ধবাজদের পথ অনুসরণ করার মতো, যে পথ কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী অনুসরণ করছে।

(৪) সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে প্রচার-টিমের গুরুত্বও উপেক্ষা করেন। জনসাধারণের সংগঠনের প্রশ্নে তাঁরা সৈন্যবাহিনীতে সৈনিক-সমিতি সংগঠিত করার কাজ এবং স্থানীয় শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সংগঠিত করার কাজ উপেক্ষা করে চলেন। ফলে, প্রচার এবং সাংগঠনিক কাজ সবই বাতিল হয়।

(৫) কোন যুদ্ধে জিতলেই তাঁরা অহংকারী হয়ে ওঠেন, আর যুদ্ধে হারলে হয়ে পড়েন হতাশ।

(৬) স্ববিভাগীয়বাদ—তাঁরা শুধু চতুর্থ বাহিনীর কথাই চিন্তা করেন এবং এ কথা তাঁরা জানেন না যে, স্থানীয় জনসাধারণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করাটা লালফৌজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটা হচ্ছে ক্ষুদে-দলবাদেরই এক বর্ধিত রূপ।

(৭) কিছু কমরেড চতুর্থ বাহিনীর সংকীর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে মনে করেন যে, এ ছাড়া আর কোন বিপ্লবী শক্তির অস্তিত্ব নেই। তাই, নিজেদের শক্তি বজায় রাখার এবং সংগ্রামকে এড়িয়ে যাবার চিন্তা এঁদের খুবই প্রবল। এটা সুবিধাবাদেরই অবশেষ।

(৮) বিষয়ীগত এবং বিষয়গত অবস্থাকে উপেক্ষা করে কিছু কিছু কমরেড বিপ্লবের তাড়াহুড়ার ব্যাধিতে ভোগেন, জনসাধারণের মধ্যে কঠোরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাজ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, মোহাবিষ্ট হয়ে তাঁরা শুধু বড় বড় কাজ করতেই চান। এটা হচ্ছে অন্ধক্রিয়াবাদেরই অবশেষ।[১]

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের উৎস হল :

(১) নীচু রাজনৈতিক মান। তার ফলে সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা এবং লালফৌজ ও শ্বেত বাহিনীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পারা।

(২) ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর মনোবৃত্তি। বিগত যুদ্ধগুলোতে ধৃত বহু বন্দী সৈন্য লালফৌজে যোগ দিয়েছে, এই ধরনের ব্যক্তিরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর প্রবল মনোবৃত্তি। তার ফলেই, নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তি রচিত হয়েছে নিম্নস্তরে।

(৩) উপরোক্ত কারণ দুটি থেকেই উদ্ভূত হয় তৃতীয় কারণ, সেটা হল সামরিক শক্তির উপর অতি-বিশ্বাস এবং জনসাধারণের শক্তির উপর অবিশ্বাস।

(৪) পার্টি সামরিক কাজের প্রতি সক্রিয়ভাবে নজর দেয়নি এবং তা আলোচনা করেনি, কিছু কিছু কমরেডদের নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের উৎপত্তির সেটাও একটা কারণ।

সংশোধনের পদ্ধতি :

(১) শিক্ষার মাধ্যমে পার্টির ভিতরে রাজনৈতিক মান উন্নত করা, নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের তাত্ত্বিক উৎস নির্মূল করা এবং লালফৌজ ও শ্বেত বাহিনীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যকে স্পষ্ট করা। সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাবাদের ও অন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ নির্মূল করা, চতুর্থ বাহিনীর স্ববিভাগীয়বাদকে ভেঙে দেওয়া।

(২) অফিসার ও সৈনিকদের রাজনৈতিক ট্রেনিং, বিশেষ করে প্রাক্তন যুদ্ধবন্দীদের শিক্ষাদান জোরদার করে তোলা। সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব, লালফৌজে ভর্তির জন্য সংগ্রামে অভিজ্ঞ শ্রমিক-কৃষককে স্থানীয় সরকার কর্তৃক বাছাই করা। এইভাবে, নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের উৎস সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করা, এমকি নিশ্চিহ্ন করা।

(৩) লালফৌজের পার্টি-সংগঠনকে সমালোচনা করার জন্য স্থানীয় পার্টি-সংগঠনকে উদ্বুদ্ধ করা এবং লালফৌজকে সমালোচনা করার জন্য জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে লালফৌজের পার্টি-সংগঠন এবং অফিসার ও সৈনিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

(৪) সামরিক কাজের প্রতি পার্টিকে সক্রিয়ভাবে নজর দিতে হবে এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। সমস্ত কাজ সৈন্যসাধারণের মাধ্যমে কার্যকরী করার পূর্বে সে সম্পর্কে পার্টিতে আলোচনা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

(৫) লালফৌজের জন্য এমন সব নিয়মকানুন রচনা করা, যার মধ্য দিয়ে তাদের কর্তব্য স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়, স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয় লালফৌজের

সামরিক কাজের ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাজের ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্ক, লাল-ফৌজ আর জনসাধারণের মধ্যেকার সম্পর্ক; স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয় সৈনিক-সমিতিগুলোর ক্ষমতা আর সামরিক ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক।

উগ্র-গণতন্ত্র সম্পর্কে

লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মেনে নেবার পর, উগ্র-গণতন্ত্রের অভিব্যক্তি অনেক কমে গেছে। যেমন, এখন পার্টির সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃতভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে, লালফৌজের ভেতরে তথাকথিত 'নিচুতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' প্রয়োগ করা হোক এবং 'নিম্নতর স্তরে প্রথমে সব বিষয়ে আলোচিত হোক, তারপর উচ্চতর স্তরে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক' ইত্যাদি ভুল দাবি আর কেউ উত্থাপন করেন না। কিন্তু আসলে, এই ধরনের কমে যাওয়াটা শুধু সাময়িক ও বাহ্যিক অভিব্যক্তি, এর অর্থ এই নয় যে, উগ্র-গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে ইতিমধ্যেই নির্মূল করা হয়েছে। অন্য কথায়, উগ্র-গণতন্ত্রের মূল এখনো বহু কমরেডের মনে গভীরভাবে বাসা বেঁধে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সিদ্ধান্তগুলো কার্যকরী করতে বিভিন্ন ধরনের নিমরাজীমূলক মনোভাবের প্রকাশই এর প্রমাণ।

সংশোধনের পদ্ধতি :

(১) তত্ত্বের ক্ষেত্রে উগ্র-গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করা। প্রথম, এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, উগ্র-গণতন্ত্রের বিপদ হচ্ছে পার্টি-সংগঠনের ক্ষতি করা, এমনকি তার পুরোপুরি সর্বনাশ করা এবং পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে দুর্বল করা, এমনকি তার পুরোপুরি ধ্বংসসাধন করা, পার্টিকে তার সংগ্রামের দায়িত্ব বহন করতেও অক্ষম করে তোলা, এর ফলে, বিপ্লবের পরাজয়ই ডেকে আনা হয়। দ্বিতীয়, এটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত যে, উগ্রগণতন্ত্রের উৎস রয়েছে পেটি-বুর্জোয়াদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উচ্ছৃঙ্খলতায়। এটাকে পার্টির ভেতরে টানলেই, তা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উগ্র-গণতান্ত্রিক ভাবধারায় রূপলাভ করে। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী কর্তব্যের সঙ্গে এই ভাবধারা একেবারেই অসংগতিপূর্ণ।

(২) সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীভূত পরিচালনায় গণতান্ত্রিক জীবন সুনিশ্চিত করা। তার লাইন হচ্ছে নিম্নরূপ :

(১) পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার নির্ভুল পরিচালনার লাইন থাকতে হবে এবং সমস্যা দেখা দিলেই তা সমাধানের উপায় বের করতে হবে যাতে করে নিজেদেরকে নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(২) উচ্চতর সংস্থাকে নিম্নতর সংস্থার অবস্থা ও জনসাধারণের জীবনের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে হবে, যাতে করে সঠিক পরিচালনার বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে।

(২) পার্টির সকল স্তরের সংস্থারই বিবেচনাহীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, অবশ্যই তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে হবে।

(৪) উচ্চতর সংস্থার যেসব সিদ্ধান্ত কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে অবশ্যই নিম্নতর সংস্থায় এবং পার্টি-সদস্যসাধারণের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে। তার পদ্ধতি হচ্ছে সক্রিয় ব্যক্তিদের সভা, অথবা পার্টি-শাখার সভা, এমনকি, কলামের[২] পার্টি-সদস্যদের সভাও (যখন-অবস্থানুসারে সম্ভব) ডাকতে হবে, সে রকম সভায় রিপোর্ট প্রদানের জন্য লোক পাঠাতে হবে।

(৫) পার্টির নিম্নতর সংস্থাগুলোকে ও পার্টি-সদস্যসাধারণকে উচ্চতর সংস্থার নির্দেশাদির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করতে হবে, যাতে করে এর তাৎপর্য তাঁরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন এবং তা পালন করার পদ্ধতি স্থির করতে পারেন।

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে

চতুর্থ আর্মির পার্টি-সংগঠনে সংগঠনিক শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ নিম্নলিখিতভাবে অভিব্যক্ত হয়:

(ক) সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠের মেনে না নেওয়া। যেমন, যখন সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন তাঁরা আন্তরিকভাবে পার্টির সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেন না।

সংশোধনের পদ্ধতিঃ

(১) সভায় সকল যোগদানকারীকেই তাঁদের অভিমত যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বিতর্কের প্রশ্নে কোন্‌টা ঠিক,

কোন্‌টা বেঠিক, তা পরিষ্কার করে দিতে হবে, সেখানে কোন আপোষ বা এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছাতে যদি একটি সভায় না পারা যায় তাহলে পরের সভায় আবার তা আলোচনা করতে হবে, অবশ্যই তাতে যদি কাজ ব্যাহত না হয়।

(২) পার্টির অন্যতম শৃঙ্খলা হল সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীনতা মেনে চলবে। সংখ্যালঘুর মতামত যদি বাতিল করা হয়, তাহলে সংখ্যাগুরুর গৃহীত সিদ্ধান্তকে তাঁদের অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরবর্তী সভায় তা আলোচনার জন্য পুনরায় পেশ করা যেতে পারে, এ ছাড়া কার্যকলাপে কোনরকম আপত্তিই প্রকাশ করা উচিত নয়।

(খ) সাংগঠনিক শৃঙ্খলার উপেক্ষামূলক সমালোচনা :

(১) পার্টির ভেতরকার সমালোচনা হচ্ছে পার্টির সংগঠনকে সুদৃঢ় করার ও পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বৃদ্ধি করার একটা হাতিয়ার। কিন্তু লালফৌজের পার্টির ভেতরকার সমালোচনা যে সব সময়েই এই প্রকৃতির হয় তা নয়, কোন কোন সময় তা ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়। তার ফলে, শুধুমাত্র ব্যক্তি-বিশেষেরই নয়, বরং পার্টির সংগঠনেরও সর্বনাশ হয়। এটা হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অভিব্যক্তি। শোধরানোর পদ্ধতি হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের বোঝানো যে, সমালোচনার উদ্দেশ্য হল শ্রেণী-সংগ্রামে জয়লাভের জন্য পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বাড়ানো; আর সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

(২) বহু পার্টি-সদস্য তাঁদের সমালোচনা পার্টির ভেতরে করেন না, করেন পার্টির বাইরে। এর কারণ হচ্ছে যে, সাধারণ পার্টি-সদস্যরা পার্টি-সংগঠনের (পার্টির সভা ইত্যাদির) গুরুত্ব এখনও বোঝেননি, তাঁরা মনে করেন যে, সংগঠনের বাইরে বা ভেতরে সমালোচনা করায় কোন পার্থক্য নেই। শোধরানোর পদ্ধতি হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের শিক্ষা দেওয়া, যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন পার্টি-সংগঠনের গুরুত্ব এবং বুঝতে পারেন যে, পার্টি-কমিটি বা কমরেডদের সমালোচনা পার্টির সভায় করা উচিত।

নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ সম্পর্কে

লালফৌজে নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ এক সময়ে অত্যন্ত গুরুতরভাবে বিকাশলাভ করেছিল। যেমন, আহত সৈনিকদের ভাতা দেবার ব্যাপারে

সামান্য আহত ও গুরুতররূপে আহতদের মধ্যে পার্থক্য করার বিরোধিতা করে সকলের জন্য সমান ভাতা দেবার দাবি উত্থাপন করা হতো। যখন অফিসারেরা ঘোড়ায় চড়ে যেত, তখন সেটাকে তাদের কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে না দেখে তাকে বরং অসাম্যের নিদর্শন হিসেবে দেখা হতো। সকলের মধ্যে একেবারে সমানভাবে দ্রব্য বণ্টন করার দাবি করা হতো। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি জিনিস বণ্টনে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হতো। চাল বহন করার ব্যাপারে দাবি উঠত যে, প্রত্যেককেই সমান ওজনের বোঝা বহন করতে হবে, তা তার বয়স বা শারীরিক সামর্থ্য যাই হোক না কেন। সৈন্যদের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে সমানাধিকার দাবি করা হতো, সদর দপ্তর কিছুটা বড় ঘর নিলে তাকে গালি দেওয়া হতো। সৈন্যদের নিয়মিত কাজ ব্যতীত যে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে দেওয়া হয়, সে কাজ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারেও সমানধিকার দাবি করা হতো এবং অপরের চেয়ে সামান্য বেশি কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হতো। এমনকি, যখন আহত ব্যক্তির সংখ্যা দুই, কিন্তু স্ট্রেচারের সংখ্যা এক, তখন কাউকেই বহন করা যেত না, কারণ, তারা একজনকে নিয়ে যাওয়ার চাইতে দুজনের না যাওয়াটাই পছন্দ করত। এতে প্রমাণিত হয় যে, লালফৌজের আফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে নিরঙ্কুশ সামানাধিকারবাদ এখনো গুরুতররূপে বিরাজমান।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উগ্র-গণতন্ত্রের মতোই, নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদের উৎস হচ্ছে হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির ফল। পার্থক্য শুধু এই যে, একটিকে দেখা যায় রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে, অপরটিকে দেখা যায় বৈষয়িক জীবনের ক্ষেত্রে।

সংশোধনের পদ্ধতিঃ এটা দেখিয়ে দিতে হবে যে, পুঁজিবাদের অবসানের আগে নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ কেবল কৃষক অন্যান্য ছোট ছোট মালিকদের একটি মোহ মাত্র, এমনকি, সমাজতন্ত্রের কালেও তথাকথিত নিরঙ্কুশ সমানাধিকার নিশ্চয়ই থাকবে না। কারণ, তখনও বৈষয়িক জিনিসগুলোর বণ্টন 'প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ, আর কাজ অনুযায়ী পাওনার' নীতি এবং কাজের প্রয়োজন অনুসারে করতে হবে। লালফৌজের লোকজন-দের বৈষয়িক জিনিসগুলোর বণ্টন প্রায় সমানভাবেই হওয়া উচিত—যেমন, অফিসার ও সৈনিকদের সমান বেতন—কারণ, বর্তমান সংগ্রামের অবস্থায় এটা প্রয়োজন। কিন্তু সম্পূর্ণ বিচার-বিবেচনাহীন নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদের

অবশ্যই বিরোধিতা করতে হবে, কারণ, সংগ্রামের জন্য এটার প্রয়োজন নেই, বরং এটা সংগ্রামকে ব্যাহত করে।

আত্মমুখিনতাবাদ সম্পর্কে

আত্মমুখিনতাবাদ কোন কোন পার্টি-সদস্যদের মধ্যে গুরুতরভাবে বিরাজ করছে। এটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের পক্ষে ও কাজের পরিচালনার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির আত্মমুখীন বিশ্লেষণ এবং কাজের আত্মমুখীন পরিচালনার অনিবার্য ফল, হয় সুবিধাবাদ, না হয় অন্ধক্রিয়াবাদ। পার্টির ভেতরে আত্মমুখী সমালোচনা, ভিত্তিহীন আজেবাজে কথাবার্তা বা পরস্পরের প্রতি সন্দেহ প্রায়ই পার্টির ভেতরে নীতিহীন বিরোধের সৃষ্টি করে এবং পার্টি-সংগঠনের ক্ষতি করে।

পার্টির ভেতরকার সমালোচনার সমস্যা সম্পর্কে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন কমরেড সমালোচনা করার সময় বড় বড় বিষয়ের উপর মনোযোগ না দিয়ে কেবলমাত্র ছোটখাট বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেন। তাঁরা বোঝেন না যে, সমালোচনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেওয়া। ব্যক্তিগত ত্রুটির ব্যাপারে, যদি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে তা জড়িত না হয়, তাহলে ছিদ্রানুসন্ধানের কোন দরকার নেই। অন্যথায়, কমরেডরা হতভম্ব হয়ে পড়বেন। অধিকন্তু, এ ধরনের সমালোচনা যদি একবার শুরু হয়, তাহলে পার্টির ভেতরের মনোযোগ শুধু ছোটখাট ত্রুটির উপরেই কেন্দ্রীভূত হবে এবং প্রত্যেকেই ভীরু ও অতি সাবধানী ভদ্রলোক হয়ে পড়বেন, আর ভুলে যাবেন পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য। এটা খুবই বিপজ্জনক।

সংশোধনের পদ্ধতি : প্রধানতঃ পার্টি-সদস্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া, যাতে পার্টি-সদস্যদের চিন্তাধারা ও পার্টির ভেতরকার জীবন রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত হয়। এই উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য আমাদের নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে : (১) আত্মমুখীন বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার বদলে মার্কসবাদ-লেলিনবাদের পদ্ধতি দিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-শক্তির মূল্যায়ন করতে পার্টি-সদস্যদের শিক্ষা দিতে হবে। (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনার দিকে পার্টি-সদস্যদের মনোযোগী করে তুলতে হবে, যাতে তাঁরা এর ভিত্তিতে সংগ্রামের কৌশল ও

কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেন। কমরেডদের বুঝতে দিতে হবে যে বাস্তব অবস্থার অনুসন্ধান ছাড়া তাঁরা কল্পনা ও অন্ধক্রিয়ার গভীর গর্তে পতিত হবেন। (৩) পার্টির ভেতরকার সমালোচনায় আত্মমুখিনতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও সমালোচনার নামে ইতরামির বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে, কথা বলার সময় তথ্যভিত্তিক হতে হবে এবং সমালোচনার রাজনৈতিক দিকের উপর মনোযোগ দিতে হবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে

লালফৌজের পার্টি-সংগঠনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ঝোঁকের বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিম্নরূপ :

(১) প্রতিশোধবাদ। পার্টির ভেতরে কোন সৈনিক কমরেডের দ্বারা সমালোচিত হবার পর, কিছু কিছু লোক পার্টির বাইরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। প্রহার করা বা গালিগালাজ করা তাঁদের প্রতিশোধ নেবার অন্যতম পথ। পার্টির ভেতরেও তাঁরা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। 'এই সভায় তুমি আমার বিরুদ্ধে বলেছ, তাই, পরের সভায় এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি তোমার ছিদ্রানুসন্ধান করবই।' এই ধরনের প্রতিশোধবাদ উদ্ভূত হয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে। এটা শ্রেণীর স্বার্থকে ও সমগ্র পার্টির স্বার্থকে উপেক্ষা করে। এর লক্ষ্য শত্রুশ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজেদের বাহিনীর মধ্যেকার ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে। এটা ক্ষয়কারী, এতে পার্টি-সংগঠন ও সংগ্রামী শক্তি দুর্বল হয়।

(২) 'ক্ষুদে দলবাদ'। কিছু কিছু কমরেড শুধু তাঁদের নিজস্ব ক্ষুদে দলের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ দেন, সামগ্রিক স্বার্থকে উপেক্ষা করেন। ভাসাভাসাভাবে দেখতে গেলে, এটা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের জন্য নয়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এর ভিতরেই নিহিত রয়েছে সংকীর্ণতম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। একইভাবে, এটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও বিকেন্দ্রিক। 'ক্ষুদে দলবাদ' দীর্ঘকাল পর্যন্ত লালফৌজে প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সমালোচনার ফলে তা এখন কিছুটা ভাল হয়েছে, কিন্তু এর অবশেষ এখনো রয়ে গেছে, এবং এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আরও চেষ্টা করা দরকার।

(৩) 'ভাড়াটে লোকের' মনোবৃত্তি। কিছু কিছু কমরেড এটা উপলব্ধি করেন না যে, পার্টি ও লালফৌজ উভয়ই হচ্ছে বিপ্লবের কর্তব্য সাধনের

হাতিয়ার, আর তাঁরা নিজেরা হচ্ছেন তার সদস্য। তাঁরা একথা উপলব্ধি করেন না যে, তাঁরা নিজেরাই হচ্ছেন বিপ্লবের স্রষ্টা। তাঁরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র তাঁদের নিজ নিজ উপরওয়ালাদের প্রতিই তাঁদের দায়িত্ব আছে, বিপ্লবের প্রতি তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই। বিপ্লবের কাজে এই ধরনের নিষ্ক্রিয় ভাড়াটে মনোবৃত্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটা অভিব্যক্তিও বটে। বিপ্লবের জন্য শর্তহীনভাবে প্রচেষ্টা চালাবার মতো সক্রিয় ব্যক্তি কেন বেশি করে পাওয়া যায় না, এই ধরনের মনোবৃত্তি তার একটা কারণ। এ মতাদর্শ যদি নির্মূল না হয়, তাহলে, সক্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা বাড়বে না, বিপ্লবের গুরুভার আগাগোড়াই অল্পসংখ্যক লোকের কাঁধে থেকে যাবে এবং তাতে সংগ্রামের অত্যন্ত ক্ষতি হবে।

(৪) ভোগবাদ। লালফৌজেও বেশ কিছু লোক আছেন যাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ভোগবিলাসের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। তাঁরা সব সময়েই আশা করেন যে, তাঁদের বাহিনী বড় বড় শহরে যাবেন। তাঁরা যে শহরে কাজ করার জন্য যেতে চান তা নয়, বরং ভোগবিলাসের জন্যই যেতে চান। লাল এলাকা—যেখানে জীবনযাত্রা কঠোর, সেখানে কাজ করতে তাঁরা সবচেয়ে বেশি অনিচ্ছুক।

(৫) নিষ্ক্রিয়তা। কোন কিছু যখন তাঁদের ইচ্ছার সঙ্গে খাপ খায় না, তখন কিছু কিছু কমরেড নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং কাজ বন্ধ করে দেন। এটা ঘটে প্রধানতঃ শিক্ষার অভাবে। আবার কখনো কখনো এটা ঘটে সমস্যার সমাধান করার, কাজ বণ্টন করার অথবা শৃঙ্খলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকদের অনুপযুক্ততা থেকে।

(৬) সৈন্যদল ত্যাগ করার মতাদর্শ। সৈন্যদল ত্যাগ করে স্থানীয় কাজে বদলী হয়ে যাবার জন্য আবেদন জানায়, এমন লোকের সংখ্যা লালফৌজে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ যে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত তা নয়, এর কারণ নিহিত রয়েছে অন্যত্র। প্রথমতঃ, লালফৌজের বাস্তব জীবনযাত্রার কষ্ট; দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রামজনিত ক্লান্তি; এবং তৃতীয়তঃ, সমস্যার সমাধান করার, কাজ বণ্টন করার, অথবা শৃঙ্খলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকদের অনুপযুক্ততা, ইত্যাদি।

সংশোধনের পদ্ধতি হল প্রধানতঃ শিক্ষার কাজকে সুদৃঢ় করা, যাতে মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সংশোধন করা যায়। পরে, উপযুক্ত-

ভাবে সমস্যার সমাধান করা, কাজ বণ্টন করা এবং শৃঙ্খলা পালন করা। এর সঙ্গে সঙ্গে লালফৌজের বৈষয়িক জীবনযাত্রার উন্নতি করার পথ খুঁজে বের করা এবং বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির জন্য বিশ্রাম ও পুনর্বাসনের জন্য প্রতিটি সম্ভাব্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। শিক্ষাদানের সময়ে এ কথা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সামাজিক উৎস হল পার্টির অভ্যন্তরে পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতিফলন।

ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ সম্পর্কে

লালফৌজে ভবঘুরে ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশি, এবং সারা দেশে, বিশেষ করে দক্ষিণের বিভিন্ন প্রদেশে, প্রচুর ভবঘুরে রয়েছে বলেই লালফৌজে ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ গজিয়ে উঠেছে। এই ধরনের মতাদর্শের অভিব্যক্তি নিম্নরূপ: (১) কিছু কিছু লোক ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার ও জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ কাজ করতে এবং তার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছুক নন, বরং শুধু ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকলাপের পদ্ধতিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে আগ্রহী। (২) লালফৌজের প্রসারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোক স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনী ও স্থানীয় লালফৌজ বৃদ্ধি করার ভেতর নিয়মিত লালফৌজকে বাড়িয়ে তোলার লাইন অনুসরণ করেন না, বরং, 'সৈন্য ভাড়া করার ও ঘোড়া কেনার' এবং 'দলত্যাগীদের নিয়োগ করার ও বিদ্রোহীদের নিজেদের বাহিনীতে ভর্তি করার'[৩] লাইন অনুসরণ করেন। (৩) কিছু কিছু লোকের জনসাধারণের সঙ্গে থেকে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ধৈর্য নেই, তাঁরা শুধু বেপরোয়া পান-ভোজের জন্য বড় বড় শহরে যেতে চান। এইসব ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শের অভিব্যক্তি সঠিক কর্তব্য পালনে লালফৌজকে প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে। তাই, ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ নির্মূল করাটা বাস্তবিকই লালফৌজের পার্টি-সংগঠনের ভিতরকার সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ কথা বুঝতে হবে, হুয়াং ছাও[৪] অথবা লী চুয়াং[৫] ধরনের ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদ আজকের অবস্থায় চলতে পারে না।

সংশোধনের পদ্ধতি হল নিম্নরূপ:

(১) শিক্ষাদানের কাজ জোরদার করা, বেঠিক মতাদর্শের সমালোচনা করা এবং ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদকে নির্মূল করা।

(২) ভবঘুরে চেতনা প্রতিহত করার জন্য লালফৌজের মূল অংশের মধ্যে এবং নতুন বন্দী সৈন্যদের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ জোরদার করে তোলা।

(৩) লালফৌজের গঠন পরিবর্তন করার জন্য সংগ্রামের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সক্রিয় শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজে টেনে আনা।

(৪) ব্যাপক জঙ্গী শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে থেকে লালফৌজের নতুন ইউনিট গড়ে তোল।

অন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ সম্পর্কে

লালফৌজের পার্টি-সংগঠনে এর আগে অন্ধক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো হলেও এখানো পর্যন্ত তা যথেষ্ট হয়নি। ফলে, অন্ধক্রিয়াবাদের মতাদর্শের অবশেষ এখনো লালফৌজে রয়ে গেছে। তাদের অভিব্যক্তিগুলি নিম্নরূপ: (১) আত্মমুখীন ও বাস্তব অবস্থা বিচার-বিবেচনা না করে অন্ধভাবে কাজ করা; (২) শহরে পার্টির কর্মনীতি অপর্যাপ্তভাবে ও অসংলগ্নভাবে কার্যকরী করা; (৩) সামরিক শৃঙ্খলা ঢিলে করা, বিশেষ করে পরাজয়ের মুহূর্তে; (৪) কোন কোন ইউনিট কর্তৃক ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া; এবং (৫) পলাতক সৈন্যদের গুলি করে হত্যা করা এবং দৈহিক শাস্তি দেওয়া—এগুলিও অন্ধ ক্রিয়াবাদেরই চরিত্রবিশিষ্ট। অন্ধক্রিয়াবাদের সামাজিক উৎস হচ্ছে **ভবঘুরে** সর্বহারা মতাদর্শ এবং পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শের সংমিশ্রণ।

সংশোধনের পদ্ধতি হল:

(১) মতাদর্শগতভাবে অন্ধক্রিয়াবাদকে নির্মূল করা।

(২) নিয়মকানুন ও নীতির মাধ্যমে অন্ধক্রিয়ামূলক আচরণের সংশোধন করা।

টীকা

১। ১৯২৭ সালের বিপ্লবে পরাজয়ের পর স্বল্পকালের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিতে একটি 'বাম' অন্ধক্রিয়াবাদের ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। চীনা বিপ্লবকে 'স্থায়ী বিপ্লব' এবং চীনের বিপ্লবী পরিস্থিতিকে 'স্থায়ী অভ্যুত্থান' হিসেবে চিহ্নিত করে অন্ধক্রিয়াবাদী কমরেডরা সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণকে সংগঠিত করতে অস্বীকার করে, এবং আদেশ দেওয়ার রীতিকে অনুসরণ ও মাত্র অল্প সংখ্যক

পার্টি-সদস্য আর জনগণের একটা ক্ষুদ্র অংশের ওপর আস্থা রেখে সারা দেশে ধারাবাহিক স্থানীয় অভ্যুত্থান ঘটাবার ভ্রান্ত চেষ্টা করে—যার জয়লাভের কোন আশাই ছিল না। ১৯২৭-এর শেষ দিকে এই ধরনের অন্ধক্রিয়াবাদী কার্য-কলাপ ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে, কিন্তু ১৯২৮-এর শুরু থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে, যদিও কিছু কমরেডের মধ্যে তখনো অন্ধক্রিয়াবাদের প্রতি ভাবাবেগ ছিল।

২। গেরিলা সংগঠনরীতিতে কলাম হল নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর একটি ডিভিশনের মতোই, যার সঙ্গে থাকে একটা পরিপূরক যা নিয়মিত ডিভিশনের পরিপূরক থেকে আরও নমনীয় এবং সাধারণভাবে আরও ছোট।

৩। চীনা ইতিহাসে কিছু বিদ্রোহী তাদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল এই দুটি চীনা প্রবাদে তাই বোঝান হচ্ছে।

৪। তাং রাজবংশের শেষ দিকের কৃষক-বিদ্রোহীদের একজন নেতা হলেন হুয়াং চাও। ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিজের জেলা সাওচৌ (এখন সান্তুং-এর হোৎসে কাউন্টি) থেকে আরম্ভ করে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষকদের সফল যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে হুয়াং নিজেকে 'স্বর্গ-কাঁপানো সর্বাধিনায়ক' বলে জাহির করে। দশ বছরের মধ্যে তিনি ইয়েলো, ইয়াংৎসে, হুয়াই ও পার্ল নদী-উপত্যকার অধিকাংশ প্রদেশ দখল করেন এবং কোয়াংসী পর্যন্ত অগ্রসর হন। সবশেষে তিনি তুংকুয়ান গিরিপথ অতিক্রম করে চাংগান-এর (বর্তমান শেনসীর সিয়ন) রাজধানী দখল করেন এবং চি-এর সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হন। আভ্যন্তরীণ বিবাদ এবং তাং শক্তির অ-হান উপজাতি মিত্রদের আক্রমণে হুয়াং চাংগান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, এবং নিজের জেলায় ফিরে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর দশ বছরের যুদ্ধ পরিচালনা চীন দেশের ইতিহাসে কৃষক যুদ্ধসমূহের মধ্যে অন্যতম। রাজবংশীয় ঐতিহাসিকরা বলেন, 'অতিরিক্ত করভার এবং লেভির দ্বারা জর্জরিত সব মানুষই তাঁর পিছনে সমবেত হয়েছিলেন।' কিন্তু যেহেতু তুলনামূলকভাবে সংগঠিত মূল এলাকা সৃষ্টি না করেই মূলতঃ চলমান যুদ্ধনীতি অনুসরণ করেন সেইহেতু তাঁর দলকে বলা হত 'চলমান বিদ্রোহী দল'।

৫। লি ছুয়াং, লি জু-চেং দি কিং ছুয়াং (দি দারে-অল কিং)-এর সংক্ষিপ্ত নাম। উত্তর শেনসীর মিছি এলাকার একজন অধিবাসী ছিলেন লি ছুয়াং। যে কৃষক বিদ্রোহ মিং রাজবংশের পতন ঘটিয়েছিল তিনি তাদের নেতৃত্ব

দিয়েছিলেন। ১৬২৮ সালে উত্তর শেনসীতে বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয়। কাও জিং-সিয়াং-এর পরিচালিত শক্তির সঙ্গে যোগদান করেন এবং হোনান ও আনহুইয়ে অভিযান চালিয়ে আবার শেনসীতে ফিরে যান। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে কাও-এর মৃত্যুর পর লি তার উত্তরাধিকারী হন এবং 'কিং ছুয়াং' নাম ধারণ করে শেনসী, জেছুয়ান, হুনান এবং হুপে প্রদেশগুলির ভিতরে ও বাইরে অভিযান চালন। সর্বশেষে তিনি ১৬৪৪ সালে পিকিংয়ের রাজধানী দখল করেন যেখানে শেষ মিং সম্রাট আত্মহত্যা করেন। তিনি জনগণের কাছে প্রধান যে শ্লোগানটি তুলে ধরেন তা হল, 'রাজা ছুয়াংকে সমর্থন করুন, তাহলে শস্যের জন্য কোন কর দিতে হবে না।' তাঁর লোকজনের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আর একটি শ্লোগান দেন: 'কাউকে খুন করা মানে আমার বাবাকে খুন করা ; কোন বলাৎকার করা মানে আমার মায়ের ওপর বলাৎকার করা'। এইভাবে তিনি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেন এবং তাঁর আন্দোলন সারা দেশে যে কৃষক বিদ্রোহ চলছিল তার সঙ্গে মূলতঃ এক ধারায় বয়ে চলে। তিনি নিজে যেহেতু তুলনামূলকভাবে কোনও সংগঠিত মূল এলাকা সৃষ্টি না করে কেবল ঘুরেই বেড়িয়েছেন সেহেতু ঘটনাচক্রে মিং রাজ-বংশের একজন দেশদ্রোহী সেনাধ্যক্ষ উ সান কুয়েই ছিং আক্রমণকারীদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করে লি-এর ওপর যুক্তভাবে আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করে।

একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে

(জানুয়ারী ৫, ১৯৩০)

বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং আনুষংগিক কার্যকলাপের প্রশ্ন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব আমাদের পার্টির ভেতরে কিছু সংখ্যক কমরেডের মধ্যে এখনো রয়েছে। যদিও তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, অপরিহার্যভাবেই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে, তবু তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে, তা শীঘ্রই আসতে পারে। তাই তাঁরা কিয়াংসী দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন না, শুধুমাত্র ফুকিয়েন, কোয়াংতুং ও কিয়াংসীর ধ্যেকার তিনটি সীমান্ত এলাকায় ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকলাপ চালনার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। একই সময়ে গেরিলা অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে তাঁদের কোন গভীর ধারণা নেই এবং সেজন্যই এই ধরনের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার সুসংবদ্ধতা ও প্রসারের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার দ্রুততর করা সম্পর্কেও কোন গভীর ধারণা তাঁদের নেই। তাঁরা বোধহয় মনে করেন, বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার যখন সুদূরে তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধরনের কঠোর কাজ করাটা পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়। এর পরিবর্তে তাঁরা অপেক্ষাকৃত সহজতর ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকবাপের পদ্ধতিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ইচ্ছুক এবং সমগ্র দেশে জনসাধারণকে স্বপক্ষে আনার কাজ সুসম্পন্ন করার পরে অথবা কোন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সম্পন্ন করার পরে দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান চালাতে চান, লালফৌজের শক্তি সংযোগে তখন যা হয়ে উঠবে দেশজোড়া বিরাট বিপ্লব। সমস্ত অঞ্চলসহ দেশজোড়া জনসাধারণকে প্রথমে নিজেদের পক্ষে টেনে আনা, তারপরে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা—তাঁদের এই তত্ত্ব চীনা বিপ্লবের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিল খায় না। চীন একটা আধা-ঔপনিবেশিক দেশ যা কুক্ষিগত করার জন্য বহু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে—এটাকে স্পষ্টভাবে বোঝার ব্যর্থতা থেকেই প্রধানতঃ তাঁদের এই তত্ত্বের উদ্ভব। এটাকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেই, প্রথমতঃ,

---

এটা কমরেড মাও সে-তুঙের একটি চিঠি। পার্টির মধ্যে সে সময়ে বিরাজমান এক ধরনের হতাশাব্যঞ্জক মনোভাবের বিরুদ্ধে এটি লেখা হয়।

পরিষ্কার হবে যে, সারা দুনিয়ায় কেন কেবলমাত্র চীনেই শাসকশ্রেণীর ভেতরে পারস্পরিক দীর্ঘকালীন জটপাকানো যুদ্ধের অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়, কেন এই জটপাকানো যুদ্ধ দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠছে ও দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে, এবং কেন কখনো কোন ঐক্যবদ্ধ শাসন কায়েম হতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, পরিষ্কার হবে কৃষক সমস্যার গুরুত্ব, আর সে কারণেই পরিষ্কার হবে কেন পল্লী-অভ্যুত্থান আজকের মতো সমগ্র দেশ জুড়ে প্রসারলাভ করেছে। তৃতীয়তঃ, পরিষ্কার হবে শ্রমিক-কৃষকদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার শ্লোগানের নির্ভুলতা। চতুর্থতঃ, পরিষ্কার হবে সারা দুনিয়ায় কেবলমাত্র চীনেই শাসকশ্রেণীর ভেতরে যে পারস্পরিক দীর্ঘকালীন জটপাকানো যুদ্ধ বিদ্যমান—সেই অদ্ভুত ব্যাপার থেকে উদ্ভূত অন্য একটি অদ্ভুত ব্যাপার, অর্থাৎ লালফৌজ ও গেরিলা বাহিনীর অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং সেই সঙ্গে শ্বেত শাসনের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছোট ছোট লাল এলাকার অস্তিত্ব ও বিকাশ (এই ধরনের অদ্ভুত ব্যাপার চীন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না)। পঞ্চমতঃ, এটাও পরিষ্কার হবে যে, লালফৌজ গেরিলা বাহিনী ও লাল এলাকার প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ হচ্ছে আধা-ঔপনিবেশিক চীনে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক-সংগ্রামের উচ্চতম রূপ, আধা-ঔপনিবেশিক কৃষক-সংগ্রামের বিকাশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং নিঃসন্দেহে দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারকে দ্রুততর করার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ষষ্ঠতঃ, এটাও পরিষ্কার হবে যে, নিছক ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকলাপের নীতি দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারকে দ্রুততর করার কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারে না, পক্ষান্তরে চু তে, মাও সে-তুঙ এবং ফ্যাঙ্‌ চি-মিন[১] কর্তৃক গৃহীত নীতি নিঃসন্দেহে সঠিক—অর্থাৎ ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠার, সুপরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার, ভূমি-বিপ্লব গভীরতর করার, থানা লালরক্ষী বাহিনী, মহকুমা লালরক্ষী বাহিনী, পরে জেলা লালরক্ষী বাহিনী, তারপরে স্থানীয় লালফৌজ এবং নিয়মিত লালফৌজ পর্যন্ত গড়ে তোলার পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের সশস্ত্র শক্তিকে সম্প্রসারণ করার, তরঙ্গমালার মতো অগ্রসর হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রসারিত করার ইত্যাদি, ইত্যাদি নীতি। কেবলমাত্র এভাবেই সমগ্র দেশের বিপ্লবী জনসাধারণের আস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন সারা দুনিয়ায় এই আস্থা গড়ে তুলেছে। কেবলমাত্র এভাবেই, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর জন্য প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি করা, তাদের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তোলা

ও তাদের আভ্যন্তরীণ ভাঙনকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এবং কেবলমাত্র এমনি করেই লালফৌজকে প্রকৃতভাবে গঠন করা যায়, যা ভবিষ্যতের মহান বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠবে। এক কথায় বলা যায়, কেবলমাত্র এভাবেই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

বিপ্লবের তাড়াহুড়ার ব্যাধিতে পীড়িত কমরেডরা বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তিকে[২] অযথার্থভাবে বড় করে দেখেন আর প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে দেখেন ছোট করে। এ ধরনের মূল্যায়ন প্রধানতঃ আত্মমুখিনতাবাদ থেকেই আসে। পরিণামে এটা নিঃসন্দেহে অন্ধক্রিয়াবাদের পথে যায়। অপরদিকে, যদি বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তিকে ছোট করে দেখা হয় এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে বড় করে দেখা হয়, তাহলে, এটাও হবে এক ধরনের অযথার্থ মূল্যায়ন এবং নিশ্চিতভাবেই অন্য ধরনের কুফল নিয়ে আসবে। তাই, চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করতে গেলে নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন:

(১) যদিও এখন চীনা বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি দুর্বল, কিন্তু অন্যদিকে চীনের পশ্চাৎপদ ও ভঙ্গুর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে দাঁড়ানো প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর সমস্ত সংগঠনও (রাজনৈতিক ক্ষমতা, সশস্ত্র শক্তি, রাজনৈতিক পার্টি ইত্যাদি) দুর্বল। এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, বর্তমান পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি যদিও বর্তমান চীনা বিপ্লবেরর আত্মমুখীন শক্তির চেয়ে সম্ভবতঃ কিছুটা শক্তিশালী, তবু যেহেতু সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর শক্তি চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর শক্তির চেয়ে আরও অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী, সেহেতু সেখানে এখনই বিপ্লব শুরু হতে পারছে না। বর্তমানে চীনা বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি যদিও দুর্বল, কিন্তু যেহেতু, প্রতিবিপ্লবের শক্তিও অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সেহেতু, চীনা বিপ্লব নিশ্চিতরূপে পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে অধিক দ্রুতগতিতে উত্তাল জোয়ারের দিকে ধাবিত হবে।

(২) ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর, বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি বাস্তবিকই অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবশিষ্ট শক্তিগুলো খুবই নগণ্য এবং যেসব কমরেডরা কেবলমাত্র কিছুটা বাহ্য অভিব্যক্তি দেখেই বিচার করেন, তাঁরা স্বভাবতঃই হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু সারমর্ম দেখে বিচার করলে এটা একেবারেই ভিন্ন। এখানে আমরা একটা পুরানো চীনা প্রবাদ প্রয়োগ

করতে পারি—'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে'। এর অর্থ, বর্তমানে আমাদের শক্তি যদিও অল্প, কিন্তু এটা অতি দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠবে। চীনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই শক্তির বৃদ্ধি শুধু সম্ভবই নয়, এমনকি অবশ্যম্ভাবীও। ৩০শে মে'র আন্দোলন এবং তারপরে যে মহান বিপ্লব ঘটেছে, তা থেকে এটা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যখন আমরা কোন বিষয়কে দেখি, তখন অবশ্যই তার সারমর্মকে দেখতে হবে এবং তার বাহ্য রূপটাকে দেখতে হবে শুধুমাত্র প্রবেশদ্বারের দিশারী হিসেবে, আর প্রবেশদ্বার অতিক্রম করেই সে বিষয়ের সারমর্মকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরতে হবে। এটাই শুধু নিভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি।

(৩) তেমনি, প্রতিবিপ্লবী শক্তির মূল্যায়নেও আমাদের কোনমতেই কেবলমাত্র তার বাহ্যিক রূপটা দেখলে চলবে না, বরং তার সারমর্ম দেখতে হবে। হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে আমাদের স্বাধীন এলাকার প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে কিছু কিছু কমরেড হুনান প্রাদেশিক কমিটির বেঠিক মূল্যায়নকেই সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করতেন এবং শ্রেণীশত্রুকে তাঁরা কানাকড়িরও মূল্য দিতেন না : হুনানের শাসক লু তি-পিং[৩] সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে হুনান প্রাদেশিক কমিটি সে সময় (১৯২৮ সালের মে থেকে জুন পর্যন্ত) 'ভীষণ নড়বড়ে', 'অত্যন্ত আতংকগ্রস্ত'—এই দুটি বর্ণনাত্মক কথা ব্যবহার করেছিল, আজও তা ঠাট্টার বিষয়। এ ধরনের মূল্যায়নে অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্ধক্রিয়াবাদের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু ঐ বছরের নভেম্বর থেকে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চার মাসের মতো সময়ের মধ্যে (চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ[৪] শুরু হবার পূর্বে) যখন শত্রুর তৃতীয় 'মিলিত দমন অভিযান'[৫] চিংকাং পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্ন তুলেছিলেন 'আর কতকাল আমরা এ লাল পতাকা উড়িয়ে রাখতে পারবো ?' আসলে, তখন চীনে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে সংগ্রাম অত্যন্ত নগ্ন পর্যায়ে নেমে এসেছিল এবং চিয়াং কাই-শেক, কোয়াংসি চক্র ও ফেং ইয়ু-সিয়াংয়ের মধ্যে একটি জটপাকানো যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল সেই সময়, যখন প্রতিবিপ্লবী স্রোতে ভাটা পড়তে শুরু হয়েছিল এবং বিপ্লবী স্রোত আবার বাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু সেই সময়ে শুধু যে লাল-ফৌজ ও স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের মধ্যেই হতাশাপূর্ণ চিন্তাধারা বিদ্যমান ছিল তাই নয়, এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটিও ঐ বাহ্যিক রূপ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।

এবং তার মধ্যেও হতাশার সুর ফুটে উঠেছিল। সে সময়ে পার্টিতে যে হতাশা-পূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারীর চিঠিই তার প্রমাণ।

(৪) বাস্তব অবস্থা আজও এমন যে, যেসব কমরেড বর্তমান অবস্থার সারমর্মকে না দেখে কেবল তার বাহ্যিক রূপটাই দেখেন তাঁরা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে, লালফৌজে কর্মরত আমাদের লোক যখন যুদ্ধে পরাজিত হন বা চারিদিক থেকে বেষ্টিত হন অথবা শক্তিশালী শত্রুর দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন প্রায়ই নিজের অজান্তে এই ধরনের সাময়িক, বিশেষ ও সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিকে সার্বিক ও অতিরঞ্জিত করে তোলেন, যেন গোটা চীনের এবং সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতিতে আশার আলো নেই এবং বিপ্লবের জয়ের প্রত্যাশা সুদূরপরাহত। কোন জিনিস পর্য-বেক্ষণে তাঁরা শুধু বাহ্যিক রূপকেই আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং সারবস্তুকে ঝেড়ে ফেলে দেন, কারণ তাঁরা সাধারণ অবস্থার সারবস্তুর কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেননি। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, চীনে বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার শীঘ্রই আসবে কিনা—যেসব দ্বন্দ্ব বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারের উদ্ভব ঘটায় সেই দ্বন্দ্বগুলো প্রকৃতই বিকাশলাভ করছে কিনা, শুধু তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেই এটা স্থির করা যায়। যেহেতু, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশগুলোর মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের নিজেদের দেশের সবহারাশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিকাশলাভ করেছে, সেহেতু, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চীনকে কেড়ে নেবার প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চীনকে কেড়ে নেবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখনই তীব্রতর হয়ে ওঠে তখনই সাম্রাজ্যবাদ ও সমগ্র চীনের দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চীনের মাটিতে একই সঙ্গে বিকাশলাভ করে, ফলে চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিভিন্ন চক্রের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক জটপাকানো যুদ্ধ, যা দিন দিন সম্প্রসারিত ও তীব্রতর হয় এবং তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের হয় ক্রমবিকাশ। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিভিন্ন চক্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের অর্থাৎ যুদ্ধবাজদের জটপাকানো যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আসে আরও বেশি করভার—এই-ভাবে ব্যাপক করদাতা জনগণ ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব দিন দিন বিকাশলাভ করে। সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের জাতীয় শিল্পের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবার ফলে চীনের জাতীয় শিল্প সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সুবিধে আদায় করতে পারে না এবং এটা চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী ও চীনের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার

দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তোলে। চীনা পুঁজিপতিরা মরিয়া হয়ে শ্রমিকদের শোষণ করে বাঁচার পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে, আর শ্রমিকরা তা প্রতিরোধ করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বাণিজ্যিক আক্রমণ, চীনা বণিক-পুঁজিপতির শোষণ, সরকারের মোটা কর ধার্য ইত্যাদি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরও গভীরতর হচ্ছে, অর্থাৎ জমির খাজনা ও অতিরিক্ত সুদের মাধ্যমে শোষণ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বেড়ে উঠছে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঘৃণা। বিদেশী মালের চাপ, ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস এবং সরকারী করের বৃদ্ধি—এ সব কারণে চীনে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবসায়ী ও স্বাধীন উৎপাদকেরা দিন দিন দেউলিয়ার পথে যাচ্ছে। রসদ এবং আর্থিক টানাটানির অবস্থায়ও প্রতিক্রিয়াশীল সরকার সীমাহীনভাবে তার সৈন্যবাহিনী বাড়িয়ে চলেছে এবং এই কারণে দিনের পর দিন যুদ্ধ বেশি হচ্ছে, ফলে সৈনিকসাধারণ সর্বদাই দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়ে থাকে। রাষ্ট্রের কর-বৃদ্ধি, জমিদার কর্তৃক খাজনা ও সুদ-বৃদ্ধির এবং দিনের পর দিন যুদ্ধের বিপর্যয়ের বিস্তৃতির কারণে দেশের সর্বত্রই দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ ও ডাকাতি এবং ব্যাপক কৃষক ও শহরের গরীবরা জীবন ধারণে নিরুপায় হয়ে পড়ে। স্কুল চালনার জন্য কোন টাকা না থাকায় বহু ছাত্র আশঙ্কা করত যে তারা শিক্ষার সুযোগ হারাবে। যেহেতু উৎপাদন পশ্চাৎপদ, সেহেতু বহু স্নাতকের চাকুরীর আশা নেই। যদি আমরা উপরোল্লিখিত দ্বন্দ্ব সমূহ উপলব্ধি করি, তাহলে আমরা জানতে পারব যে, কি রকম শঙ্কাকুল পরিস্থিতি এবং বিশৃংখল অবস্থার মধ্যে চীন রয়েছে। আরও জানতে পারব যে, সাম্রাজ্য-বাদ, যুদ্ধবাজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার অনিবার্য এবং তা আসবে অতি শীঘ্রই। সমগ্র চীন শুকনো জ্বালানি কাঠে ভরা, তা শীঘ্রই আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। একটি স্ফুলিই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে—এই প্রবাদবাক্যটি চীনের বর্তমান পরিস্থিতি কিভাবে বিকাশলাভ করবে তার একটি উপযুক্ত বর্ণনা। বহু জায়গায় শ্রমিকদের ধর্মঘট, কৃষকদের অভ্যুত্থান, সৈনিকদের বিদ্রোহ ও ছাত্র-ধর্মঘট প্রসারলাভ করছে—কেবলমাত্র এগুলোর দিকে তাকালেই আমরা জানতে পারব যে, 'স্ফুলিঙ্গ' থেকে 'দাবানল সৃষ্টির' সময় নিঃসন্দেহে আর বেশি দূরে নেই।

উপরের কথাগুলোর সারাংশ ১৯২৯ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে ফ্রন্ট-কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটিকে যে চিঠি দিয়েছে তাতে ইতিমধ্যেই বর্ণিত হয়েছে।

ঐ চিটিতে বলা হয়েছে :

কেন্দ্রীয় কমিটির এই চিঠিতে (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯) বাস্তব পরিস্থিতি এবং আমাদের আত্মমুখীন শক্তির মূল্যায়ন অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ছিল। চিংকাং পাহাড়ের বিরুদ্ধে কুওমিননাঙের তিনটি 'দমন অভিযান' ছিল প্রতিবিপ্লবের উচ্চতম স্রোতের অভিব্যক্তি। কিন্তু সে স্রোত সেখানেই থেমে গিয়েছিল এবং তারপর থেকে প্রতিবিপ্লবী স্রোতে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ল আর বিপ্লবী স্রোতে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল। পার্টির সংগ্রামী শক্তি ও সাংগঠনিক শক্তি কেন্দ্রীয় কমিটি যেভাবে বর্ণনা করেছে, যদিও সেই মাত্রায় দুর্বল, তবুও প্রতিবিপ্লবী স্রোত ক্রমশঃ কমে যাবার অবস্থায় সেগুলো অবশ্যই দ্রুত পুনরুদ্ধার হবে এবং পার্টির নিষ্ক্রিয়তার মনোভাবও তাড়াতাড়ি দূর হবে। জনসাধারণ অবশ্যই আমাদের পক্ষে আসবেন। কুওমিনতাঙের গণহত্যার নীতি 'মাছকে গভীর জলে তাড়ানো'[৬] এই প্রবাদের মতো কাজ করে এবং সংস্কারবাদও আর জনসাধারণের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। এটা নিশ্চিত যে, কুওমিনতাঙ সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রম শীঘ্রই অপসারিত হবে। আসন্ন পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনার ব্যাপারে কোন পার্টিই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে না। পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের[৭] নির্দেশিত রাজনৈতিক লাইন ও সাংগঠনিক লাইন সঠিক, অর্থাৎ বিপ্লবের বর্তমান পর্যায় হচ্ছে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নয় এবং পার্টির বর্তমান কর্তব্য হল ('বড় বড় শহরে' শব্দ যোগ করে নিতে হবে)[৮] জনসাধারণকে স্বপক্ষে টেনে আনা, অবিলম্বে অভ্যুত্থান ঘটানো নয়। কিন্তু বিপ্লব দ্রুতগতিতে বিকাশলাভ করবে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্ম আমাদের প্রচার ও প্রস্তুতির ব্যাপারে সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে সক্রিয় সংগ্রামী শ্লোগান ও সক্রিয় মনোভাবের দ্বারাই কেবল আমরা জনসাধারণকে পরিচালিত করতে পারি। কেবলমাত্র এ ধরনের সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেই পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।···সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বই হচ্ছে বিপ্লবে বিজয়লাভের একমাত্র চাবিকাঠি। পার্টির সর্বহারা ভিত্তি স্থাপন করা, প্রধান প্রধান শহর ও অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পার্টির শাখা খোলা বর্তমানে পার্টির

সাংগঠনিক ক্ষেত্রের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু একই সময়, গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের বিকাশসাধন, ছোট ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং লালফৌজের সৃষ্টি ও প্রসার—বিশেষ করে এগুলোই হচ্ছে শহরের সংগ্রামকে সাহায্য করার এবং বিপ্লবী স্রোতের জোয়ার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার প্রধান শর্ত। তাই, শহরের সংগ্রামকে পরিত্যাগ করা ভুল হবে। কিন্তু কৃষক শক্তি শ্রমিক শক্তিকে ছাড়িয়ে গিয়ে বিপ্লবের ক্ষতি করবে বলে কৃষক শক্তির বৃদ্ধিকে ভয় করাটাও আমাদের মতে ভুল (অবশ্যই যদি কোন পার্টি-সদস্যদের মধ্যে এরকম মত থেকে থাকে)। কারণ, আধা-ঔপনিবেশিক চীনে বিপ্লব শুধু তখনই ব্যর্থ হয়, যখন কৃষক-সংগ্রাম শ্রমিকদের নেতৃত্ব না পায়, কিন্তু কৃষক-সংগ্রামের বিকাশ যখন শ্রমিকদের শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন বিপ্লব কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

লালফৌজের কার্য কলাপের কৌশলের প্রশ্ন সম্পর্কে এ চিঠিতে নিম্নলিখিত উত্তর ছিল :

লালফৌজকে সংরক্ষণ ও জনসাধারণকে জাগাবার উদ্দেশ্য আমাদের সৈন্যবাহিনীকে খুব ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে এবং সৈন্যবাহিনী থেকে চু তে ও মাও সে-তুঙকে সরিয়ে দিতে কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে করে প্রধান প্রধান লক্ষ্যবস্তু শক্রর অগোচরে থাকে। এটা একটা অবাস্তব অভিমত। ১৯২৭-২৮ সালের শীতকালে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম যে, প্রত্যেকটি কোম্পানি বা ব্যাটেলিয়ন একাকী কাজ করবে, পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে এবং গেরিলা যুদ্ধকৌশলের দ্বারা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবে, যাতে করে লক্ষ্যবস্তু শক্রর অগোচরে থাকে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে আমরা বহুবার চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হয়েছি। তার কারণ হচ্ছে : (১) নিয়মিত লালফৌজের অধিকাংশ সৈন্যই স্থানীয় নন এবং তাঁদের পটভূমি স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনীর পটভূমি থেকে আলাদা। (২) বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে দেবার ফলে নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলার ব্যাপারে অক্ষমতা দেখা দেয়, এতে সহজেই পরাজয় ঘটে। (৩) ইউনিটগুলো শক্রর আঘাতে একটা একটা করে সহজেই ভেঙে পড়তে পারে। (৪) অবস্থা যত প্রতিকূল আমাদের সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করাবার ও সংগ্রামে

নেতাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবার প্রয়োজনীয়তা তত বেশি, কেবলমাত্র এইভাবেই, আভ্যন্তরীণ ঐক্য গড়ে তুলে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি। শুধুমাত্র অনুকূল অবস্থাতেই গেরিলা তৎপরতার জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করা বিধেয়, আর সেই সময়ে, প্রতিকূল অবস্থার মতো প্রতিমুহূর্তেই নেতাদেরকে বাহিনীর সঙ্গে থাকার দরকার নেই।

উপরোক্ত অংশের ত্রুটি হচ্ছে এই যে, সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখানো হয়েছিল তা সবই নেতিবাচক ধরনের—এটা মোটেই যথেষ্ট নয়। আমাদের সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার ইতিবাচক যুক্তি হচ্ছে যে, শুধুমাত্র কেন্দ্রীভূত করেই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শত্রু-ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হব, শহর-নগর দখল করতে সক্ষম হব। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শত্রু-ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে শহর-নগর দখল করে নিয়েই কেবল আমরা ব্যাপকভাবে জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলতে পারব এবং সংলগ্ন কয়েকটি জেলা জুড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারব। কেবলমাত্র এইভাবেই সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারব (যাকে আমরা 'রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা' বলে থাকি) এবং বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে বাস্তব ফললাভ করতে পারব। উদাহরণস্বরূপ, গত বছরের আগের বছরে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে এবং গত বছরে পশ্চিম ফুকিয়েনে[৯] যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আমরা স্থাপন করেছিলাম, তা সবই হচ্ছে আমাদের সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার নীতির ফল। এটা হচ্ছে একটা সাধারণ মূলনীতি কিন্তু এমন সময় কি নেই যখন আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করতেই হয়? হ্যাঁ, এমন সময়ও আছে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা ফ্রন্ট-কমিটির চিঠিতে বলা হয়েছে লালফৌজের গেরিলা যুদ্ধকৌশলের কথা—তাতে সৈন্যবাহিনীকে স্বল্প দূরত্বের মধ্যে বিভক্ত করার কথাও রয়েছে:

গত তিন বছরের সংগ্রাম থেকে যে যুদ্ধকৌশল আমরা অর্জন করেছি, তা অন্য যে-কোন যুদ্ধকৌশল—প্রাচীন বা আধুনিক, চীনা বা বিদেশী যুদ্ধকৌশল থেকে সত্যি সত্যি ভিন্ন। আমাদের যুদ্ধকৌশল দিয়ে জনসাধারণকে সংগ্রামের জন্য দিনের পর দিন ব্যাপকতর আকারে জাগ্রত করা যায় এবং কোন শত্রুই, সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। আমাদের যুদ্ধকৌশল হল গেরিলা যুদ্ধকৌশল। এতে মূলতঃ থাকে:

'জনসাধারণকে জাগাবার জন্ম আমাদের সৈন্যশক্তিকে বিভক্ত করা, শত্রুর সাথে মোকাবিলার জন্ম আমাদের সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা।'

'শত্রু এগোয়, আমরা পিছোই ; শত্রু শিবির ফেলে, আমরা হয়রান করি ; শত্রু ক্লান্ত হয়, আমরা আক্রমণ করি ; শত্রু পালায়, আমরা পিছনে ধাওয়া করি।'

'দৃঢ় ঘাঁটি এলাকা[১০] বিস্তারের কাজে ঢেউয়ের কায়দায় এগিয়ে যাবার নীতি প্রয়োগ করা ; যখন শক্তিশালী শত্রু তাড়া করবে, তখন বৃত্তাকারে চলার নীতি প্রয়োগ করা।'

'অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে খুব ভাল পদ্ধতিতে ব্যাপকতর জনসাধারণকে জাগ্রত করা।'

এই ধরনের যুদ্ধকৌশল ঠিক জাল ফেলার মতন। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জাল ফেলতে হয় এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জাল গুটিয়ে নিতে হয়। আমরা জাল ফেলি জনসাধারণকে আমাদের পক্ষে আনার জন্ম এবং গুটিয়ে নিই শত্রুর মোকাবিলা করার জন্ম। বিগত তিন বছর ধরে আমরা এই যুদ্ধ-কৌশলই প্রয়োগ করেছি।

এখনে 'জাল ফেলার' অর্থ হচ্ছে সৈন্যবাহিনীকে স্বল্প দূরত্বের মধ্যে বিভক্ত করা। যেমন, হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার জেলা শহর ইউংসিনকে যখন প্রথমবার দখল করলাম, তখন ইউংসিন জেলার সীমানার মধ্যে আমরা আমাদের ২৯তম ও ৩১তম রেজিমেণ্টকে বিভক্ত করেছিলাম, আবার আমরা যখন তৃতীয়বার ইউংসিন দখল করলাম তখন আর একবার আমরা সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করলাম—২৮তম রেজিমেণ্টকে আনফু জেলার সীমান্তে, ২৯তম রেজিমেণ্টকে লিয়েনহুয়াতে এবং ৩১তম রেজিমেণ্টকে কিয়ান জেলার সীমান্তে পাঠালাম। আবার, গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে দক্ষিণ কিয়াংসীর জেলা-গুলোতে, জুলাই মাসে পশ্চিম ফুকিয়েনের জেলাগুলোতে আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করেছিলাম। সুদূর ব্যবধানের মধ্যে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে দেওয়া শুধু দুই শর্তেই সম্ভব—অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশ ও অপেক্ষাকৃত সবল নেতৃস্থানীয় সংস্থা। কারণ, আমাদের সৈন্য-বাহিনীকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষে আনার জন্ম, ভূমি-বিপ্লবকে গভীরতর করার জন্ম, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার

জন্য এবং লালফৌজ ও স্থানীয় সশস্ত্র শক্তিকে সম্প্রসারিত করার জন্য নিজেদেরকে আরও বেশি সক্ষম করে তোলা। যদি এই উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে অক্ষম হই অথবা যদি আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করার ফলে পরাজয় ঘটে, লালফৌজের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে—যেমন দু'বছর আগে আগষ্ট মাসে ছেনচৌর উপর আক্রমণ চালাবার জন্য হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করা হয়েছিল—তাহলে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত না করাই ভাল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, উপরোল্লিখিত শর্ত দুটি মিটলে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করা উচিত। কারণ, তখন বিভক্ত করাটাই কেন্দ্রীভূত করার চেয়ে সুবিধাজনক।

কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারী মাসের চিঠির মর্ম ভাল নয় এবং চতুর্থ বাহিনীর পার্টি-সংগঠনের কিছু সংখ্যক কমরেডের উপরে তা খারাপ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এই বলে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারী করেছিল যে, চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধা অবশ্যম্ভাবী নয়। কিন্তু তার পর থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল্যায়ন ও নির্দেশগুলি মোটা-মুটিভাবে ঠিকই হয়েছে। অযথার্থ মূল্যায়ন-সম্বলিত বিজ্ঞপ্তিটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যে আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করেছে। যদিও লালফৌজের নিকট কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেরিত চিঠির কোন সংশোধন করা হয়নি, তবু তার পরবর্তী নির্দেশগুলোতে সে রকমের হতাশার সুর আর নেই এবং লালফৌজের কার্যকলাপ সম্পর্কে এর অভিমত এখন আমাদের অভিমতের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু এ চিঠি কিছু কিছু কমরেডের মধ্যে যে খারাপ প্রভাব বিস্তার করেছে তা এখনো টিঁকে আছে। তাই, আমি মনে করি যে, এ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন এখনো রয়েছে।

কিয়াংসী প্রদেশকে এক বছরের মধ্যে দখল করে নেবার পরিকল্পনাটাও গত বছরের এপ্রিল মাসে ফ্রন্ট-কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করেছিল, পরে ইউতুতে একটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা চিঠিতে সে সময়ে দেখানো যুক্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনী ও কোয়াংসি যুদ্ধবাজদের সৈন্যবাহিনী কিউকিয়াঙের নিকটবর্তী অঞ্চলে পরস্পরের নিকটতর হচ্ছে—একটি বিরাট যুদ্ধ আসন্ন। গণ-সংগ্রামের পুনরারম্ভ আর প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের ভেতরকার দ্বন্দ্বের প্রসার এমনি সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে যে, শীঘ্রই বিপ্লবী

উত্তাল জোয়ার আসবে। এই অবস্থায়, আমাদের কাজকর্মের বন্দোবস্ত করতে গেলে, আমরা মনে করি যে, দক্ষিণের প্রদেশগুলির মধ্যে কোয়াংতুং এবং হুনান প্রদেশ দুটিতে মুৎসুদ্দি বর্জোয়া ও জমিদারদের সশস্ত্র শক্তি অতিশয় সবল, অধিকন্তু হুনানে পার্টির অন্ধক্রিয়াবাদী ভুলের জন্যই পার্টি-সংগঠন ও গণভিত্তি দুই-ই বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু ফুকিয়েন, কিয়াংসী এবং চেকিয়াং এই তিনটি প্রদেশে পরিস্থিতি অন্য রকম। প্রথমতঃ, এই তিনটি প্রদেশে শত্রুদের সৈন্যশক্তি সবচেয়ে দুর্বল। চেকিয়াঙে কেবলমাত্র চিয়াং পো-ছেঙের [11] অধীনে অল্প সংখ্যক প্রাদেশিক রক্ষীবাহিনী রয়েছে। ফুকিয়েনে যদিও শত্রুবাহিনীর পাঁচটি দলের সব মিলিয়ে মোট ১৪টি রেজিমেণ্ট আছে, কিন্তু কুয়ো ফেঙ-মিঙের রেজিমেণ্টকে ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত করা হয়েছে। ছেন কুয়ো-হুই আর লু শিঙ-পাঙের [12] অধীনে যে দুটি সৈন্যদল রয়েছে তারা সবই দস্যুবাহিনী, তাদের যুদ্ধক্ষমতা অল্প। উপকূলে অবস্থিত দুই ব্রিগেড নৌসৈন্য কখনো যুদ্ধ করেনি এবং তাদের যুদ্ধক্ষমতা নিশ্চয়ই বেশি নয়। একমাত্র চ্যাং চেনই [13] তুলনামূলকভাবে যুদ্ধ করতে সক্ষম, কিন্তু ফুকিয়েন প্রাদেশিক কমিটির বিশ্লেষণ অনুসারে, তারও শুধু দুটি রেজিমেণ্ট অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। অধিকন্তু, ফুকিয়েনে এখন পরিপূর্ণ বিশৃংখলা এবং অনৈক্য বিরাজ করেছে। কিয়াংসীতে চু পেই-তে [14] ও সিউং সি-হুইয়ের [15] অধীনস্থ দুই সৈন্যদলের মোট ১৬টি রেজিমেণ্ট রয়েছে, ফুকিয়েন অথবা চেকিয়াঙের সৈন্যশক্তির চেয়ে এরা বেশি শক্তিশালী, কিন্তু হুনানের সৈন্যশক্তির থেকে অনেক নিকৃষ্টতর। দ্বিতীয়তঃ, এই তিনটি প্রদেশে অন্ধক্রিয়াবাদী ভুল তুলনাগতভাবে কম করা হয়েছে। চেকিয়াঙের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়; কিন্তু হুনানের চেয়ে কিয়াংসী ও ফুকিয়েন প্রদেশ দুটিতে পার্টি-সংগঠন ও গণভিত্তি কিছুটা ভাল। দৃষ্টান্ত হিসাবে কিয়াংসীর কথা ধরা যাক। উত্তর কিয়াংসীতে তেহান, সিউশুই এবং থুঙকুতে আমাদের এখনো বেশ কিছুটা ভিত্তি রয়েছে। পশ্চিম কিয়াংসীতে নিংকাঙ, ইউংশিন, লিয়েনহুয়া ও সুইচুয়ানে পার্টি এবং লালরক্ষী বাহিনীর শক্তি এখনো আছে। দক্ষিণ কিয়াংসীতে আরও বড় আশা রয়েছে। কিয়ান, ইউঙফেং ও সিংকুয়ো প্রভৃতি জেলাগুলিতে লালফৌজের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রেজিমেণ্ট ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হতে চলেছে। ফ্যাঙ চি-মিনের লালফৌজ যে ধ্বংস হয়েছে তা নয়।

এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে চারদিক থেকে নানছাঙকে ঘিরে ধরার অবস্থা। আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সুপারিশ করছি যে, কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজদের মধ্যে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সময়ে কিয়াংসী প্রদেশকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ফুকিয়েন ও পশ্চিম চেকিয়াঙ দখল করে নেবার জন্য চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসী চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করা উচিত। এই তিনটি প্রদেশে আমাদের উচিত লালফৌজকে বাড়ানো এবং জনসাধারণের স্বাধীন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা। এই পরিকল্পনাকে এক বছরের মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

কিয়াংসীকে দখল করার এই প্রস্তাবের মধ্যে ভুল হচ্ছে এক বছরের মেয়াদ ধার্য করা। কিয়াংসীকে দখল করার কথা বলতে গেলে, আমরা শুধু যে কিয়াংসী প্রদেশের নিজস্ব অবস্থার কথা বিবেচনা করছি তা নয়, পরন্তু শীঘ্রই যে দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে সে কথাটাও বিবেচনা করছি। শীঘ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে—এ বিষয়ে আমরা যদি বিশ্বাস না করতাম, তাহলে এক বছরের মধ্যে আমরা কিয়াংসী দখল করতে পারব, এই সিদ্ধান্তে কোনমতেই উপনীত হতে পারতাম না। ঐ প্রস্তাবের ত্রুটি ছিল এক বছরের একটা মেয়াদ ধার্য করা, যা করা উচিত ছিল না। সুতরাং 'শীঘ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে' এই বাক্যটির মধ্যে 'শীঘ্রই' শব্দটিতে এমনি করেই দেওয়া হয়েছিল সহিষ্ণুতার গন্ধ। কিয়াংসীর আত্মমুত্থান ও বাস্তব অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া খুবই প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা চিঠিতে বর্ণিত আত্মমুখীন অবস্থা ছাড়াও, বাস্তব অবস্থার তিনটি কথা এখন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, কিয়াংসীর অর্থনীতি প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক, এখানে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিশ্রেণীর শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং অন্য যে-কোন দক্ষিণ প্রদেশের চাইতে এখানকার জমিদারদের সশস্ত্র শক্তি দুর্বল। দ্বিতীয়তঃ, কিয়াংসীর নিজস্ব কোন প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনী নেই, এখানে সচরাচর অন্যান্য প্রদেশের সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকে। এইসব সৈন্যদের এখানে পাঠানো হয় 'কমিউনিস্টদের দমন করবার জন্য' অথবা 'ডাকাতদের দমন করবার জন্য'। তারা কিন্তু স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে অপরিচিত, প্রদেশের স্থানীয় সৈন্যবাহিনী যেভাবে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ত, তার চেয়ে অনেক কমই তারা এখানে জড়িয়ে পড়ছে; প্রায়শঃই এই ব্যাপারে তারা তত আগ্রহী নয়। তৃতীয়তঃ, কিয়াংসী প্রদেশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে

অপেক্ষাকৃত দূরে, হংকংয়ের নিকটবর্তী ও প্রায় সর্বতোভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন কোয়াংতুঙের মতো নয়। এ তিনটি কথা বুঝলেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পল্লী অভ্যুত্থান কেন কিয়াংসীতে বেশি ব্যাপকতর, লালফৌজ ও গেরিলাবাহিনীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের থেকে কেনই-বা কিয়াংসীতে বেশি।

'শীঘ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে'—এই বক্তব্যের মধ্যে 'শীঘ্রই' শব্দটিকে আমরা তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করব ? কমরেডদের মধ্যে অনেকের জন্যই এটা একটা সাধারণ প্রশ্ন। মার্কসবাদীরা গণক নন, ভবিষ্যতের বিকাশ ও পরিবর্তনের সাধারণ গতি কোন্ দিকে তা-ই শুধু তাঁদের বলা উচিত এবং কেবলমাত্র এটাই তাঁরা করতে পারেন, যান্ত্রিকভাবে দিনক্ষণ ধার্য করা তাঁদের উচিত নয় এবং তা করাও অসম্ভব। কিন্তু আমি যখন বলি যে, চীনে শীঘ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে, তখন আমি কোনমতেই এমন কোন কিছু বলি না, যা কিছু কিছু লোকের ভাষায় 'আসার সম্ভাবনা রয়েছে', যা কাজের পক্ষে তাৎপর্যহীন যা অলীক এবং যা লাভ করা যায় না। এ যেন সমুদ্রের সুদূরে একটি জাহাজের মতো, তীর থেকে যার মাস্তলের মাথাটা ইতিমধ্যেই দেখা যায়, এ যেন পূর্ব দিগন্তের উদয়োন্মুখ প্রভাত সূর্যের মতো, যার ঝলোমলো রশ্মি দেখা যায় উঁচু পাহাড়ের শিখর থেকে, এ যেন মাতৃগর্ভে অস্থিরভাবে সঞ্চরণরত জন্মোন্মুখ শিশুর মতো।

টীকা

১। কমরেড ফ্যাঙ চি-মিন ছিলেন কিয়াংসী প্রদেশের ই-ইয়াঙের অধিবাসী, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, উত্তর-পূর্ব কিয়াংসীর লাল এলাকার এবং লালফৌজের দশম আর্মির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৪ সালে লালফৌজের জাপানবিরোধী অগ্রগামী বাহিনীকে উত্তরমুখী অভিযানে তিনি পরিচালনা করেছিলেন। প্রতিবিপ্লবী কুওমিনতাঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ধরা পড়েন এবং জুলাই মাসে তিনি বীরত্বপূর্ণভাবে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন কিয়াংসীর নানছাঙে।

২। 'বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি' বলতে কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে বিপ্লবের সংগঠিত শক্তিকে বুঝিয়েছেন।

৩। লু তি-সিং ছিলেন একজন কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ, ১৯২৮ সালে তিনি হুনান প্রদেশের কুওমিনতাঙ সরকারের গভর্ণর ছিলেন।

৪। চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ, অর্থাৎ নানকিং-এর কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ চিয়াং কাই-শেক এবং কোয়াংসি প্রদেশের যুদ্ধবাজ লি চোং-জেন ও পাই ছুং-শি'র মধ্যে ১৯২৯ সালের মার্চ-এপ্রিলের যুদ্ধ।

৫। হুনান ও কিয়াংসীর কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজরা লালফৌজের ঘাঁটি এলাকা চিংকাং পার্বত্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে তৃতীয়বার যে আক্রমণ চালিয়েছিল, এখানে সেই অভিযানের কথাই বলা হয়েছে। ১৯২৮ সালের শেষের দিক থেকে ১৯২৯ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত এই অভিযান চলেছিল।

৬। এটি মেনসিয়াস থেকে উদ্ধৃতি। যে অত্যাচারী রাজা জনগণকে ভাল শাসক খুঁজতে বাধ্য করে, তাকে সে তুলনা করছিল 'মাছকে গভীর জলে তাড়ানো' উদবিড়ালের সঙ্গে।

৭। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগ্রেস দেখিয়েছিল যে, ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পরেও চীনের বিপ্লব প্রকৃতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবই ছিল। আরও দেখিয়েছিল যে, নতুন বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার অনিবার্য, কিন্তু যেহেতু সেই উত্তাল জোয়ার তখন দেখা দেয়নি, সেহেতু, তখনকার বিপ্লবের সাধারণ লাইন ছিল জনসাধারণকে স্বপক্ষে টেনে আনা। ষষ্ঠ কংগ্রেসে ১৯২৭ সালের ছেন তু-সিউ'র দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণ-বাদকে বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর, অর্থাৎ ১৯২৭ সালের শেষের দিকে এবং ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে পার্টিতে যে 'বামপন্থী' অন্ধক্রিয়াবাদ দেখা দিয়েছিল এই কংগ্রেসে তারও সমালোচনা ও নিন্দা করা হয়।

৮। ব্র্যাকেটের মধ্যের অংশটি গ্রন্থকার নিজেই যোগ করেছেন।

৯। ১৯২৯ সালে চিংকাং পার্বত্য অঞ্চল থেকে লালফৌজ নতুন বিপ্লবী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্বদিকস্থ ফুকিয়েনে অভিযান চালায় এবং পশ্চিম ফুকিয়েনের লুঙইয়েন, ইউংতিং ও নাংহাঙ জেলায় জনগণের বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে।

১০। দৃঢ় ঘাঁটি এলাকা বলতে শ্রমিক-কৃষকদের লালফৌজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা বোঝায়।

১১। চিয়াঙ পো-ছেঙ সেই সময়ে চেকিয়াং প্রদেশে কুওমিনতাঙ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক ছিল।

১২। ছেন কুয়ো-হুই আর লু শিঙ-পাঙ ছিল ফুকিয়েনের দু'জন কুখ্যাত ডাকাত। এদের বাহিনীকে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল।

১৩। চ্যাং চেন ছিল কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর একজন ডিভিশন-কম্যাণ্ডার।

১৪। কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ চু পেই-তে তখন কিয়াংসী প্রদেশের কুওমিন-তাঙ সরকারের গভর্ণর ছিল।

১৫। সে সময়ে সিউং সি-হুই ছিল কিয়াংসী প্রদেশস্থ কুওমিনতাঙ সৈন্য বাহিনীর একজন ডিভিশন-কম্যাণ্ডার।

অর্থনৈতিক কাজে মনোযোগ দিন

(আগস্ট ২০, ১৯৩৩)

বিপ্লবী যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা আমাদের কাছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি এক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এবং অর্থনৈতিক গঠনকার্যের সমস্ত সাম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ব্যাপক জনতাকে সমবেত করার কাজকে বিশেষ জরুরী করে তুলেছে। কেন ? কারণ, আমাদের সমস্ত বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টাকে এখন পরিচালিত করতে হবে বিপ্লবী যুদ্ধে বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, এবং সর্বপ্রথমে ও সর্বাগ্রে, শত্রুদের পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে [১] ধ্বংস করার সংগ্রামে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে। এই প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করতে হবে এমন এক বাস্তব অবস্থা গড়ে তোলার দিকে, যা লালফৌজের জন্য খাদ্য-ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহের নিশ্চিতি এনে দেবে ; জনগণের জীবনযাত্রাকে উন্নত করে তোলার দিকে, যাতে বিপ্লবী যুদ্ধে তাদের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায় ; জনগণকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তোলার দিকে, যাতে যুদ্ধের জন্য নতুন জনবল গড়ে তোলা যায় ; শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এবং শ্রমিক ও কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সুসংহত করে তোলার দিকে ; এবং অর্থনীতিকে গড়ে তুলে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে তোলার দিকে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে হলে এ ধরনের অর্থনৈতিক গঠনকার্য হচ্ছে অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেককেই এ কথাটা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। কোন কোন কমরেডের মতে, এখন অর্থ-নৈতিক গঠনকার্যের জন্য সময় দেওয়া অসম্ভব, কেননা বিপ্লবী যুদ্ধে সবাই ব্যস্ত হয়ে আছে। এজন্য যাঁরা এই গঠন কার্যের পক্ষে কথা বলেন, তাঁদেরকেই এরা 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি'র জন্য অভিযুক্ত করেন। এদের মতে, বিপ্লবী যুদ্ধ চলাকালে অর্থনৈতিক গঠনকার্য চালনো সম্ভব নয়, কেবল চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর শান্তিপূর্ণ সুস্থির অবস্থাতেই নাকি তা সম্ভব। কমরেডগণ,

---

১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে দক্ষিণ কিয়াংসীর ১৭টি কাউন্টির অর্থনৈতিক গঠনকার্য সম্পর্কিত সম্মেলনে এই বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়েছিল।

এ ধরণের চিন্তা মোটেই ঠিক নয়। এ ধরনের মতাবলম্বীরা এটাই বুঝতে পারছেন না যে, অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করে না তুলতে পারলে বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ সম্ভব হবে না, এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জনগণ ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। একবার ভেবে দেখুন! শত্রু একটি অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করছে, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসাদাররা ও প্রতিক্রিয়াপন্থীরা আমাদের অর্থনীতি ও বাণিজ্যে ভাঙন ধরাচ্ছে, বাইরের সঙ্গে লাল এলাকার বাণিজ্য গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এই প্রতিবন্ধকগুলো দূর করতে না পারলে বিপ্লবী যুদ্ধ কি গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? নুনের দাম খুব বেশি এবং অনেক সময়ে তা একেবারে পাওয়াই যায় না! শরৎ ও শীতকালে ধান সস্তা থাকলেও গ্রীষ্ম ও বসন্তে এর দাম খুবই বেড়ে যায়। এ সবই প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনে প্রভাব ফেলে এবং উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। এবং আমাদের মূল নীতি শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ওপর কি এটা আঘাত হানে না? জীবন নির্বাহের এইসব অসুবিধার জন্য যদি শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ থাকে, তবে লালফৌজের সম্প্রসারণ এবং বিপ্লবী যুদ্ধের গণসমাবেশে কি অসুবিধার সৃষ্টি হবে না? সুতরাং বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্যে কোনরকম অর্থ নৈতিক সংগঠনের কাজ চলবে না—এ চিন্তা একেবারেই ঠিক নয়, যাঁরা এরকম ভাবেন, তাঁদের মতে সব কিছুকেই যুদ্ধ-প্রচেষ্টার তুলনায় অপ্রধান বলে গণ্য করতে হবে। কিন্তু তাঁরা এটাই ধরতে পারছেন না, যে; অর্থনৈতিক সংগঠনকে বরবাদ করে দিলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টাই দুর্বল হয়ে পড়বে, অপ্রধান করে রাখা তো পরের কথা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে এবং লাল এলাকার অর্থনীতিকে গড়ে তুলেই কেবল বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনায় বাস্তব ভিত্তি রচনা করতে পারি এবং তার মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারি, ঠিকভাবে আমাদের সামরিক অভিযানে এগিয়ে যেতে পারি, এবং সত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে কার্যকরী আঘাত হানতে পারি। এইভাবেই সম্পদসম্ভার বৃদ্ধি করে আমরা হাজার হাজার লী ব্যাপী আমাদের সীমান্ত বাইরের দিকে সম্প্রসারণ করতে পারি, যাতে অনুকূলে এলে লালফৌজ নানচাং ও কিউকিয়াং আক্রমণ ও মুক্ত করে সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাতে পারে এবং এইভাবে নিজেরাই নিজেদের খাদ্য সরবরাহের অনেকখানি সুরাহা করে যুদ্ধ বিষয়ে সমস্ত মনোযোগ দিতে পারে। এবং কেবলমাত্র এইভাবেই আমরা জনসাধারণের

জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় জিনিসের কিছুটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যাতে তারা লালফৌজে যোগ দিতে কিংবা অন্যান্য বিপ্লবী কর্তব্যকর্মের আরও বেশি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। এই হচ্ছে যুদ্ধ প্রচেষ্টার অধীনে সবকিছু টেনে নামানোর অর্থ। বিভিন্ন জায়গায় যাঁরা বিপ্লবী কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের অনেকের কাছেই এখনও বিপ্লবী যুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগঠনের তাৎপর্য পরিষ্কার নয় এবং বহু স্থানীয় সরকার অর্থনৈতিক সংগঠনের সমস্যাবলী সম্পর্কে খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকে। স্থানীয় সরকারগুলির অর্থনৈতিক বিভাগ এখানো খুব সংগঠিত নয় এবং অনেকগুলিরই পরিচালক নেই। কোথাও কোথাও অনুপযুক্ত ব্যক্তি দিয়ে এই পদটি পূরণ করে রাখা হয়েছে মাত্র। সমবায়-সংস্থা তৈরীর ব্যাপারটিও একেবারেই প্রথমিক স্তরে রয়েছে, এবং কোন কোন জায়গায় খাদ্য সরবরাহের নিয়মিত ব্যবস্থা চালু হয়েছে মাত্র। জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে কোন প্রচারই করা হয় না (যদিও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ), এবং এর পেছনে জনগণের উৎসাহ জাগিয়ে তোলা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বোঝার অক্ষমতা। আলোচনার মধ্য দিয়ে, এবং আপনারা কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দেবেন তারই মধ্য দিয়ে সরকারী কর্মচারী এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে গণ-উৎসাহ সৃষ্টি আপনাদের করতেই হবে। প্রত্যেকের কাছে বিপ্লবী যুদ্ধের অর্থনৈতিক সংগঠনের গুরুত্ব অত্যন্ত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে নিজেরাই তারা অর্থনৈতিক সংগঠনের বণ্ড বিক্রি বাড়াবার ব্যবস্থা করে, সমবায় আন্দোলনের প্রচারে নেমে পড়ে এবং সব জায়গায় দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য সাধারণ ধর্মগোলা ও শস্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করে। খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক কাউন্টিতে একটি ছোট বিভাগ থাকবে এবং তার শাখা থাকবে জেলা এবং বাণিজ্যকেন্দ্রেগুলিতে। একদিকে, আমাদের লাল এলাকার মধ্যে যেসব অঞ্চলে শস্যের প্রাচুর্য আছে, সেখান থেকে ঘাটতি অঞ্চলে আমরা শস্য পাঠাব, যাতে এক জায়গায় শস্য জমা হয়ে অন্য জায়গায় দুষ্প্রাপ্য না হয়, এবং তার দামও এক জায়গায় খুব চড়া এবং অন্য জায়গায় খুব কম না হয়। অন্যদিকে, পরিকল্পনা অনুযায়ী (অর্থাৎ সীমাহীন পরিমাণে নয়) লাল এলাকার শস্যের বাড়তি অংশ বাইরে পাঠিয়ে তার বদলে শ্বেত এলাকা থেকে আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আনব দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসাদারদের শোষণ এড়িয়ে।

আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব কৃষি ও হস্তশিল্পের বিকাশসাধন করতে এবং কৃষি উপকরণ ও সারের বৃদ্ধি ঘটাতে, যাতে আগামী বছরের ফলনের বৃদ্ধি ঘটে আরও বিপুলাকারে। আমরা স্থানীয় পণ্য, যেমন ওলফ্রাম, সেগুন, কর্পূর, কাগজ, তামাক, বস্ত্র, শুকনো ছত্রাক, পিপুলনির্যাস আগের মতো উৎপাদন করাব এবং সেগুলো শ্বেত এলাকায় পাইকারীভাবে বিক্রি করব।

বহিরাঞ্চলের সঙ্গে আমাদের ব্যবসার আয়তন অনুসারে প্রেরিত পণ্যের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে থাকে শস্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বদলে প্রতি বছর প্রায় তিরিশ লক্ষ পিকুল ধান পাঠানো হয়, অর্থাৎ গড়ে তিরিশ লক্ষ লোকের জনপ্রতি এক পিকুল ধান। এর কমে হবেই না। কিন্তু এই ব্যবসা কে পরিচালনা করছে? এই ব্যবসার সম্পূর্ণটাই ব্যবসাদারদের হাতে, যারা আমাদের সাংঘাতিকভাবে শোষণ করছে। গত বছর এরা ওয়ানান ও তাইহে কাউন্টিতে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনেছিল প্রতি পিকুল ৫০ সেন্ট দামে আর কাঞ্চৌতে বিক্রি করেছিল ৪ য়ুয়ানে—অর্থাৎ সাতগুণ মুনাফায়। আর একটি উদাহরণ: প্রতি বছর আমাদের তিরিশ লক্ষ জনসাধারণের প্রয়োজন নব্বই লক্ষ য়ুয়ান দামের নুন এবং ষাট লক্ষ য়ুয়ান দামের কার্পাস বস্ত্র। নুন ও কার্পাসবস্ত্রে এই দেড়কোটি য়ুয়ান দামের ব্যবসা পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের কবলে। এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই করিনি এই ব্যবসাদারদের শোষণ সত্যিই সাংঘাতিক। যেমন, এরা মেইসিয়েনে গিয়ে সাত ক্যাটি নুন কেনে এক য়ুয়ান দামে, আর আমাদের এলাকায় এনে ১২ আউন্স নুন বিক্রি করে এক য়ুয়ানে। কী সাংঘাতিক মুনাফা! এই জাতীয় ব্যাপার আমরা আর চলতে দিতে পারি না, এখন থেকে এই ব্যবসা আমরা নিজেরাই পরিচালনা করব। আমাদের বহিরাঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত বাণিজ্য-বিভাগ এ বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশেষ প্রচেষ্টা চালাবেন।

আমরা কীভাবে তিরিশ লক্ষ য়ুয়ান মুদ্রামূল্যের অর্থনৈতিক সংগঠনের বণ্ড ব্যবহার করব? আমাদের পরিকল্পনা—এরকম দশ লক্ষ বরাদ্দ থাকবে লালফৌজের যুদ্ধ ব্যয় বাবদ। বাকী কুড়ি লক্ষ মূলধন হিসেবে ঋণ দেওয়া হবে সমবায় সংস্থা, খাদ্যসরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং বহির্বাণিজ্য বিভাগকে। বাকী টাকার বড় অংশটাই ব্যবহৃত হবে বাহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণের খাতে এবং অবশিষ্টটা হবে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, আমাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য দরে বিক্রির ব্যবস্থাও আমরা করব শ্বেত

এলাকায়, এবং সস্তা দামে নুন ও কার্পাসবস্ত্র কিনব আমাদের জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনের জন্য যাতে শত্রুর অবরোধ আমরা ভেঙে দিতে পারি, রুখে দিতে পারি ব্যবসায়ীদের শোষণ। জনগণের অর্থনীতির অবিরাম বিকাশসাধন আমরা করব, তাদের জীবনযাত্রার বহুল উন্নতি ঘটাব এবং সরকারী আয় বৃদ্ধি করাব প্রচুর পরিমাণে, এবং এইভাবে বিপ্লবী যুদ্ধের এবং অর্থ নৈতিক সংগঠনের দৃঢ় বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করব।

বিরাট কাজ এটা, বিরাট এক শ্রেণী-সংগ্রাম। কিন্তু নিজেদেরকে আমাদের প্রশ্ন করে দেখতে হবে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে কি এই কাজ করা সম্ভব? আমি মনে করি, সম্ভব। লুংইয়েন পর্যন্ত রেলপথ বসানোর কথা আমরা বলছি না, এখনকার মতো কানচৌ পর্যন্ত মোটরপথ তৈরীর কথাও বলছি না। শস্য বিক্রির একচেটিয়া অধিকারের কথা বলছি না, এমন কথাও বলছি না যে দেড় কোটি য়ুয়ান মুদ্রামূল্যের নুন ও বস্ত্রের সমস্ত ব্যবসাটাই ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে সরকার পরিচালনা করবে। এটি আমাদের বক্তব্য নয়, বা এরকম চেষ্টাও আমরা করছি না। আমরা আলোচনা করছি এবং চেষ্টা করছি কৃষি ও হস্ত-শিল্প বিকাশের সম্পর্কে, এবং নুন ও বস্ত্রের বদলে শস্য ও ওলফ্রাম বাইরে পাঠানো সম্পর্কে, ২০ লক্ষ য়ুয়ান মূলধন ও তৎসহ জনগণের বিনিয়োজিত অর্থ দিয়ে সাময়িকভাবে শুরু করার বিষয় নিয়ে। এখানে কি এমন কোন বিষয় আছে যা আমাদের শুরু করা উচিত নয়, কিংবা করতে পারি না ও ফল পাওয়া যাবে না? এ কাজ আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি এবং কিছু সুফলও পেয়েছি। এ বছরের শরৎকালীন শস্যোৎপাদন গত বছরের তুলনায় শতকরা ২০।২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের শত করা ২০ ভাগ বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে। হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে কৃষিযন্ত্র ও সার উৎপাদনের পরিমাণ আবার আগের মতোই করা গেছে এবং আমরা ওলফ্রাম উৎপাদনও শুরু করেছি। তামাক, কাগজ ও সেগুনের উৎপাদন পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। খাদ্য সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এ বৎসর অনেক কিছু করা হয়েছে। নুন আমদানীর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। এইসব সাফল্যকে ভিত্তি করেই আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা গড়ে উঠেছে। অর্থ নৈতিক গঠনকার্য সম্ভব নয় এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—এ কথা কি তাহলে স্পষ্টতঃই ভুল নয়?

এটা এখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বর্তমান পর্যায়ে অর্থ নৈতিক গঠনকার্য

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী বিপ্লবী যুদ্ধকে ঘিরেই গড়ে উঠবে। বর্তমানে আমাদের প্রধান কাজ বিপ্লবী যুদ্ধ। অর্থনৈতিক সাংগঠনিক পরিকল্পনা তাকে সাহায্য করবে, তাকে কেন্দ্র করে চলবে এবং তার অধীনে থাকবে। আবার, বিপ্লবী যুদ্ধকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক সংগঠনকে আমাদের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু ভাবা কিংবা বিপ্লবী যুদ্ধকে বাদ দিয়ে চলার কথা চিন্তা করা হবে একই রকম ভ্রান্তি। গৃহযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থনৈতিক গঠনকার্যকে আমাদের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু ভাবা সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। গৃহযুদ্ধের মধ্যে শান্তির সময়ের উপযোগী অর্থনৈতিক গঠনকার্য পরিচালনা, যা বর্তমানের নয় ভবিষ্যতের, নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। বর্তমানের কাজ হচ্ছে সেগুলিই, যেগুলি যুদ্ধের আশু প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাদের প্রত্যেকটিই যুদ্ধের প্রয়োজনভিত্তিক, তার একটিও যুদ্ধ থেকে আলাদা শান্তির সময়ের উপযোগী কোন কাজ নয়। যদি কোন কমরেড অর্থনৈতিক গঠনকার্যকে যুদ্ধ থেকে আলাদা কিছু ভেবে থাকেন তবে তাঁর ভুল অচিরেই শুধরে নেওয়া উচিত।

সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং নেতৃত্বের সঠিক রীতি ছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত অভিযান সম্ভব নয়। এই সভায় এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিও সমাধানের জন্য উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ নিজেদের কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই কমরেডদের বহুকিছু করতে হবে। তাঁদের নেতৃত্ব দিতে হবে অগণিত জনসাধারণকে, যারা তাঁদের সঙ্গে কাজে নামবে। বিশেষ করে শহর-নগরে এবং সমবায় সংস্থায়, খাদ্যবিভাগ, বাণিজ্যবিভাগ ও ক্রয় অফিসে যেসব কমরেড কাজ করেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে হাতে-কলমে কাজ করেন, সমবায় সংস্থা গড়ে তোলার কাজে জনগণকে সমাবেশ করান, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিবহনের ব্যবস্থা করেন এবং বহিরাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। যদি তাঁদের নেতৃত্বের রীতি ভুল হয়, যদি তাঁরা সঠিক ও কুশলী কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ না করেন তবে সঙ্গে সঙ্গেই কাজ ব্যাহত হবে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে গণ-সমাবেশ ঘটাতে আমরা অক্ষম হব, এবং আগামী শরৎ ও শীতকালে এবং বসন্ত ও গ্রীষ্মে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক গঠনকার্যের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারব না। এই কারণে আমি নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি কমরেডদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমতঃ, বিভিন্ন সাংগঠনিক পদ্ধতিতে গণ-সমাবেশ ঘটান। প্রাথমিকভাবে, সভাপতিমণ্ডলীর কমরেডরা, এবং সরকারী অর্থনীতি ও অর্থ বিভাগের

সর্বস্তরের কমরেডরা নিয়মিতভাবে আলোচ্য বিষয় ঠিক করে আলোচনা করবেন, তদারক করবেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন বণ্ড বিক্রী কীভাবে চলছে, সমবায় সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ কীভাবে হচ্ছে, খাদ্য সরবরাহ ও তার নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি কীভাবে হচ্ছে। তারপর, গণসংগঠনসমূহকে, প্রধানতঃ ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং গরীব কৃষকদের সমিতিগুলিকে, কাজে নামাতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন তাদের সব সভ্যদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সমাবেশ করাবে। গরীব কৃষকদের সমিতি সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও বণ্ড বিক্রি করার কাজে গণ-সমাবেশ ঘটাবার কাজে একটি শক্তিশালী ভিত্তি। তাদেরকে উদ্দীপনাময় নেতৃত্ব দেওয়া উচিত জেলা ও শহর সরকারের। তাছাড়া, আমাদের গ্রামে ও বাড়ী-বাড়ী ঘুরে অনুষ্ঠিত সভায় অর্থনৈতিক গঠনকার্যের প্রচার চালিয়ে যেতে হবে, ব্যাখ্যা করে অত্যন্ত কার্যকরী ভাষায় বুঝিয়ে বলতে হবে কীভাবে জনগণের জীবনমানের বিকাশ ঘটানো যায় এবং আমাদের সংগ্রামের শক্তি বাড়িয়ে তোলা যায়। জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান জানাব বণ্ড কিনিবার জন্য, সমবায় সংস্থা গড়ে তোলার জন্য, খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, অর্থব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য। তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাব এই শ্লোগানের ভিত্তিতে সংগ্রাম করতে এবং তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে। আমরা যদি উপরিলিখিত পদ্ধতিতে আমাদের বিভিন্ন সাংগঠনিক উপায়ে গণ-সমাবেশ ঘটাতে না পারি, তাদের মধ্যে প্রচার না চালাতে পারি অর্থাৎ যদি সভাপতিমণ্ডলী ও সরকারী অর্থনৈতিক ও অর্থবিভাগের সর্বস্তরের সংস্থাগুলি অত্যন্ত কার্যকরীভাবে অর্থ-নৈতিক গঠনকার্যের বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, যদি তারা গণসংগঠনসমূহকে উৎসাহের জোয়ারে কাজের মধ্যে নামিয়ে দিতে না পারে ও গণ-প্রচার সভা অনুষ্ঠিত করতে না পারে—তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণ-সমাবেশ আমরা কিছুতেই করব না। বিপ্লবী কাজে যেমন কোনমতেই আমরা আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব সহ্য করি না, ঠিক সেইরকম অর্থনৈতিক গঠনকার্যেও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব সহ্য করব না। আমলাতন্ত্রের কুৎসিত রূপকে, কোন কমরেডই যা পছন্দ করেন না, আবর্জনাকুপে নিক্ষেপ করতে হবে। আর এজন্য এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যা জনসাধারণের মনে সাড়া তোলে, অর্থাৎ যা সব কমরেডই চান এবং যা

সব শ্রমিক ও কৃষকরাই সমর্থন করে। আমলাতন্ত্রের একটি লক্ষণ হল অসাবধানতা বা তাচ্ছিল্যের দরুণ কাজে শৈথিল্য। এই লক্ষণের বিরুদ্ধে আমাদের অত্যন্ত কঠোর সংগ্রাম চালাতেই হবে। আরেকটি লক্ষণ হল হুকুম জারি। হুকুম জারি যারা করে, তারা কিন্তু কাজে শৈথিল্য দেখায় না। তারা যে দৃঢ় কর্মঠ ব্যক্তি, এই ভাব তারা হাবভাবে ফুটিয়ে রাখে। কিন্তু ঘটনাটি হল এই যে, হুকুম জারির ওপর প্রতিষ্ঠিত সমবায় টিঁকতে পারে না। এমনকি কিছু সময়ের জন্য বেশ চালু আছে মনে হলেও তা দৃঢ়বদ্ধ হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের আস্থা তার থেকে যায় হারিয়ে এবং বিকাশও হয়ে পড়ে ব্যাহত। বণ্ড বস্তুটি যে কী এবং তা বিক্রি করার ক্ষমতা কতখানি আছে, তা বিচার না করেই হুকুম জারির পদ্ধতিতে বণ্ড বিক্রি এবং খুশীমত বিক্রি-কোটা বেঁধে দেওয়া শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করবে এবং বিক্রিও ভাল হবে না। হুকুম জারির পদ্ধতি আমরা অবশ্যই অনুসরণ করব না। আমরা চাই জনসাধারণকে বোঝাবার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক প্রচার অভিযান। বাস্তবানুগ অবস্থা ও সত্যিকারের গণ অনুভূতির ভিত্তিতে আমরা বিকাশ করব সমবায় সংস্থাসমূহকে, বণ্ড বিক্রির পরিমাণ বাড়াব এবং অর্থ-নৈতিক সমাবেশ ঘটানোর জন্য সমস্ত ধরনের কাজ করব।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক গঠনকার্যের সম্প্রসারণের কাজে বহু সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। কয়েক কুড়ি বা কয়েকশ' লোকের কথা নয়, সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ লোককে সংগঠিত করতে হবে, তাদের শিক্ষিত করতে হবে এবং তাদের পাঠাতে হবে অর্থনৈতিক গঠনকার্যের ফ্রণ্টে। তারাই হবে অর্থনৈতিক ফ্রণ্টের নায়ক, আর বিপুল জনগণ হবে সৈন্যসাধারণ। কর্মীর অভাবের জন্য অনেকে হা-পিত্যেশ করে। কমরেড, সত্যিসত্যিই কি কর্মীর অভাব আছে? অগুনতি অসংখ্য কর্মী জনসাধারণের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসেছেন, যাঁরা কৃষি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পোড় খেয়ে এসেছেন, পোড় খেয়েছেন অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লবী যুদ্ধে। কী করে আমরা বলব যে কর্মীর অভাব রয়েছে? এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করলেই দেখবেন যে, আপনার চারিদিকেই রয়েছেন অসংখ্য কর্মী।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক গঠনকার্য আজ যুদ্ধের সাধারণ কর্মসূচী ও অন্যান্য কর্মসূচী থেকে কিছু আলাদা নয়। জমি বিতরণের[২] ওপর প্রখর নজর রাখলেই জমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা সম্পূর্ণ-ভাবেই বিলুপ্ত করে দেওয়া যায়, উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে কৃষকের উৎসাহকে বৃদ্ধি

করা যায় এবং অর্থনৈতিক গঠনকার্যে অতি দ্রুত কৃষকসাধারণকে টেনে আনা যায়। শ্রম-আইনগুলি যদি অত্যন্ত কঠোরভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে শ্রমিকদের জীবন নির্বাহের অবস্থা সুষ্ঠু করা যায় এবং অতি দ্রুত অর্থ নৈতিক গঠনকার্যে তাদের নামানো যায় এবং কৃষকদের ওপর তাদের নেতৃত্ব শক্তিশালী করা যায়। নির্বাচনে যদি সঠিক নেতৃত্ব থাকে, তবে জমি বিতরণের হিসাবসহ চরিত্র উদ্ঘাটনের প্রচার[৩] মারফৎ আমাদের সরকারী সংস্থাসমূহকে আরও শক্তিশালী করা যায়, এবং তখন বিপ্লবী যুদ্ধে এবং অর্থ নৈতিক কর্মকাণ্ড-সহ অন্যান্য কর্তব্যকর্মে তাঁরা আরও উৎসাহী নেতৃত্ব দিতে পারেন। অর্থনৈতিক বিকাশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে জনগণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজ করা। আর এ কথা না বললেও চলে যে, লালফৌজ সম্প্রসারণের কাজটি আর এক মুহূর্তও ফেলে রাখা যায় না। লালফৌজের বিজয় না হলে অবরোধ যে আরও দৃঢ় হবে, এটা প্রত্যেকেই বোঝে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং জনগণের উন্নততর জীবন লালফৌজের সম্প্রসারণের কাজে নিঃসন্দেহে সাহায্য করবে এবং জনগণকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন অর্থনৈতিক গঠনকার্য-সহ উপরিলিখিত সব কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারি এবং তাদের সবাইকে বিপ্লবী যুদ্ধের কাজে লাগিয়ে দিতে পারে, তবে বিপ্লবী যুদ্ধে বিজয় অতি অবশ্যই চলে আসবে আমাদের দিকে।

টীকা

১। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে চিয়াং কাই-শেক পাঁচটি ব্যাপক সামরিক অভিযান চালিয়েছিল জুইচিন ও কিয়াংসীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লাল এলাকার বিরুদ্ধে। এগুলোকেই বলা হতো 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান। পঞ্চম অভিযানটি ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তার আগের গ্রীষ্মকাল থেকে চিয়াং কাই-শেক এই অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেছিল।

২। লাল এলাকায় ভূমি-সংস্কারের পর সঠিকভাবে জমি বণ্টন হয়েছে কিনা পরীক্ষার জন্য একটি অভিযান পরিচালিত হয়।

৩। চরিত্র-উদ্ঘাটন করার অভিযানগুলি ছিল গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মকর্তাদের বাজে কাজকর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন করবার উদ্দেশ্যে জনগণকে উৎসাহিত করে তুলবার জন্য পরিচালিত গণতান্ত্রিক অভিযান।

কীভাবে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়

(অক্টোবর, ১৯৩৩)

১। জমিদার

জমিদার হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে জমির মালিক, যে নিজে শ্রম করে না বা করলেও খুবই অল্প পরিমাণে করে, এবং যে কৃষকদের শোষণ করে বেঁচে থাকে। জমির খাজনা আদায় করাটাই তার শোষণের প্রধান রূপ। এ ছাড়া সে টাকাও ধার দেয়, শ্রমিক নিয়োগও করে যা শিল্প-বাণিজ্যেও নিযুক্ত থাকে। তবে কৃষকদের কাছ থেকে জমির খাজনা আদায় করাটাই তার শোষণের প্রধান রূপ। বারোয়ারী জমির তত্বাবধান করা এবং বিদ্যালয়ের জমি থেকে খাজনা[১] আদায়টাও জমির খাজনা আদায়ের মাধ্যমে শোষণের পর্যায়েই পড়ে।

একজন দেউলিয়া জমিদারকেও জমিদার হিসাবেই শ্রেণীভুক্ত করা হবে, যদি সে নিজে শ্রম না করে অন্যদের ঠকিয়ে বা লুট করে, অথবা তার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে বেঁচে থাকে, এবং যদি সে গড়পড়তা মধ্য-কৃষকদের থেকে ভাল অবস্থায় থাকে।

যুদ্ধবাজ, আমলা, স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকদের দল হচ্ছে জমিদারশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি, জমিদারশ্রেণীরই অন্তভুক্ত এবং অতি মাত্রায় নির্দয়। ধনী কৃষকদের মধ্যেও ছোটখাট স্থানীয় অত্যাচারীদের এবং ছোটখাট অসৎ ভদ্রলোকদের হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়।

যেসব লোক খাজনা আদায় করা এবং সম্পত্তি দেখাশুনা করার ব্যাপারে জমিদারদের সহায়তা করে, যেসব লোক নিজেদের আয়ের প্রধান পথ হিসেবে জমিদার কর্তৃক কৃষকদের শোষণের উপরই নির্ভরশীল এবং গড়পড়তা মধ্য-কৃষকদের চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে, তাদের জমিদারদের সমপর্যায়ে ফেলা হবে।

ভূমি-সংস্কারের কাজে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছিল সেগুলো সংশোধন করার জন্য এবং ভূমি সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে এই দলিলটি লিখেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-অবস্থান নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে দলিলটি সেই সময়কার শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

সুদখোর হচ্ছে সেইসব লোক, যারা নিজেদের আয়ের প্রধান পথ হিসেবে নির্ভর করে সুদের মাধ্যমে শোষণ করার উপর এবং গড়পড়তা মধ্য কৃষকের চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে এবং তাদের জমিদারদের সমপর্যায়ে ফেলা হবে।

২। ধনী কৃষক

ধনী কৃষক জমির মালিক হয়, সেটাই নিয়ম। তবে কোন কোন ধনী কৃষক নিজেদের জমির মাত্র অংশবিশেষের মালিক, বাকী অংশটা খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত নিয়ে থাকে। অন্যদের আবার নিজের বলতে কোন জমিই নেই, সব জমিটুকুই খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া। সাধারণতঃ ধনী কৃষকের গড়পড়তার তুলনায় বেশি এবং উন্নততর উৎপাদনের যন্ত্রপাতি থাকে, বেশি পরিমাণে কাঁচা টাকার মূলধন থাকে এবং সে নিজে শ্রম করে, তবে নিজের আয়ের অংশ-বিশেষের জন্য, এমনকি আয়ের মোটা অংশটার জন্যও নির্ভর করে থাকে শোষণের উপর। তার শোষণের প্রধান রূপ হচ্ছে শ্রমিক নিয়োগ করা (দীর্ঘ মেয়াদের শ্রমিক)। এ ছাড়াও সে তার জমির অংশবিশেষ ভাড়াও দিয়ে থাকে এবং জমির খাজনার মাধ্যমে শোষণ চালিয়ে থাকে, বা টাকা ধার দেয়, বা শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকে। অধিকাংশ ধনী কৃষক বারোয়ারী জমির তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত থাকে। যে লোক বেশ খানিকটা ভাল জমির মালিক, কিছুটা জমি শ্রমিক নিয়োগ না করে নিজেই চাষবাস করে, কিন্তু জমির খাজনার দ্বারা, ধার দেওয়া টাকার উপর সুদ নিয়ে বা অন্য ধরনে অন্যান্য কৃষকদের উপর শোষণ চালায়, তাকেও ধনী কৃষক হিসেবে গণ্য করা হবে। ধনী কৃষকরা নিয়মিত শোষণ চালায় এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই আয়ের অধিকাংশটাই এসে থাকে এইখান থেকে।

৩। মধ্য কৃষক

অনেক মধ্য কৃষকই জমির মালিক। কেউ কেউ জমির মাত্র অংশ-বিশেষের মালিক, বাকী অংশটা খাজনায় বন্দোবস্ত নিয়ে থাকে। অন্যদের নিজের বলতে কোন জমিই নেই, সব জমিটুকুই খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া। সব মধ্য কৃষকেরই বেশ কিছু সংখ্যক চাষের যন্ত্রপাতি থাকে। একজন মধ্য কৃষকের আয়ের সবটাই বা প্রধান অংশটাই আসে তার নিজের শ্রম থেকে। সে অন্যকে শোষণ করে না, সেটাই নিয়ম, এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই নিজেই

অন্যদের দ্বারা শোষিত হয়, কেননা, জমির খাজনা বাবদ এবং টাকা ধার নেওয়ার জন্য সুদ বাবদ অল্প কিছু টাকা লোককে দিতে হয়। তবে সাধারণতঃ সে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে না। কোন কোন মধ্য কৃষক (স্বচ্ছল মধ্য কৃষকরা) অবশ্য অল্প পরিমাণে শোষণ চালায়, তবে তাদের আয়টা নিয়মিত-ভাবে কিংবা প্রধানতঃ ওখান থেকে আসে না।

৪। গরীব কৃষক

গরীব কৃষকদের মধ্যে কেউ কেউ জমির অংশবিশেষের মালিক এবং তাদের অল্প কিছু এটা-সেটা চাষের যন্ত্রপাতি থাকে। অন্যদের নিজের বলতে কোন জমিই নেই, আছে শুধু অল্প কিছু এটা-সেটা চাষের যন্ত্রপাতি। গরীব কৃষকেরা যে জমিতে কাজ করে, সেটা খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত নেওয়া জমি, সেটাই নিয়ম এবং তারা শোষণের শিকার হয়ে থাকে, কেননা তাদের জমির খাজনা ও টাকা ধার নেওয়ার দরুণ সুদ দিতে হয় এবং কিছু পরিমাণে মজুর হিসেবে খাটতেও হয়।

সাধারণতঃ, একজন মধ্য-কৃষকের পক্ষে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু গরীব কৃষককে নিজের শ্রমশক্তির কিছুটা অংশ বিক্রয় করতেই হয়। একজন মধ্য-কৃষকের সঙ্গে একজন গরীব কৃষকের পার্থক্য করার ব্যাপারে এটাই হচ্ছে প্রধান মাপকাঠি।

৫। শ্রমিক

শ্রমিকের (কৃষি-শ্রমিকও এর অন্তর্ভুক্ত) নিজের বলতে কোন জমি নেই বা চাষের যন্ত্রপাতি থাকে না, যদিও কেউ কেউ খুব সামান্য পরিমাণ জমির মালিক এবং তাদের অতি অল্পপরিমাণ চাষের যন্ত্রপাতিও থাকে। শ্রমিকরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে সম্পূর্ণতঃ বা প্রধানতঃ নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে।

টীকা

১। চীনের গ্রামাঞ্চলে সর্বসাধারণের জমি ছিল নানান ধরনের—কোন জমির মালিক ছিল শহর বা জেলার সরকার, কোনটির মালিক গোষ্ঠিবিশেষের

পূর্বপুরুষকৃত মন্দির, কোনটির মালিক বৌদ্ধদের বা তাও-পন্থীদের মন্দির, ক্যাথলিকদের কোন গির্জা বা কোন মসজিদ, বা এমন জমি যার আয়টা দুর্ভিক্ষ ত্রাণ, বা রাস্তাঘাট ও পুল তৈরী ও মেরামত প্রভৃতি জনহিতকর কাজে বা শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হতো। কার্যক্ষেত্রে এই ধরনের অধিকাংশ জমিই নিয়ন্ত্রণ করত জমিদাররা ও ধনী কৃষকরা, সেগুলির তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে নগণ্য কিছু কৃষকেরই মাত্র কথা বলার অধিকার ছিল।

আমাদের অর্থনৈতিক নীতি

(জানুয়ারী ২৩, ১৯৩৪)

যারা নিজেদের শাসিত অঞ্চলকে চরম-দেউলিয়া অবস্থায় এনে ফেলেছে, সেই কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজরাই কেবল চরম বেহায়ার মতো দিনের পর, দিন এই গুজব রটিয়ে যাচ্ছে যে, লাল এলাকাগুলি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে বসেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ও কুওমিনতাঙরা উঠে-পড়ে লেগেছে, যাতে লাল এলাকাগুলিকে, সেখানে এগিয়ে চলা অর্থনৈতিক গঠনকার্যকে, এবং সেখানকার মুক্তিপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষকদের কল্যাণকে ধ্বংস করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তারা 'পরিবেষ্টন ও দমন'-এর সামরিক অভিযানের জন্য শক্তি সংগঠিত তো করছেই, তার ওপর আবার অনুসরণ করে চলেছে অর্থনৈতিক অবরোধের এক হিংস্র নীতি। কিন্তু ব্যাপক জনতা ও লালফৌজকে নেতৃত্ব দিয়ে আমরা যে শুধু একের পর এক শত্রুদের 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে বিধ্বস্ত করেছি তাই নয়, এই হিংস্র অবরোধকেও ব্যর্থ করে দেবার জন্য আমরা সাধ্যমতো অর্থনৈতিক গঠনকার্যের মূল কর্তব্যগুলিও পালন করে চলেছি। এই ক্ষেত্রেও আমরা একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের নির্ধারক নীতি হচ্ছে এই যে, আমাদের ক্ষমতানুযায়ী অর্থনৈতিক গঠনকার্যের সমস্ত মূল কর্তব্যগুলি পালন করে যেতে হবে এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ওপর সমস্ত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে, এবং একই সঙ্গে সাধ্যমতো জনগণের জীবনযাত্রাকে উন্নত করে তুলতে হবে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে সুসংহত করে তুলতে হবে, কৃষক সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং অর্থনীতিতে ব্যক্তি-মালিকানাধীন সেক্টরের ওপর রাষ্ট্রীয় সেক্টরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এবং এইভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা তৈরী করতে হবে।

অর্থনৈতিক গঠনকার্যের ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে

কিয়াংসী প্রদেশের জুইচিনে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্ট পেশ করেন।

যাতে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, বাইরের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করা যায়, এবং সমবায় সংস্থাগুলিকে বিকশিত করে তোলা যায়।

লাল এলাকায় কৃষিব্যবস্থা স্পষ্টত:ই এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণ কিয়াংসী ও পশ্চিম ফুকিয়েনে ১৯৩২-এর তুলনায় ১৯৩৩-এর কৃষি-উৎপাদন ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী সীমান্তাঞ্চলে। সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত এলাকায় ভাল ফসল হয়েছে। লাল এলাকা প্রতিষ্ঠা হলে প্রথমদিকে দু'-এক বছর প্রায়ই কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়ে থাকে।[১] কিন্তু জমি পুনর্বণ্টন ও মালিকানা নির্ধারণ এবং চাষের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার পরে পরেই কৃষকরা অত্যন্ত উদ্দীপনার মধ্যে চাষ শুরু করে, এবং উৎপাদন তখন অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে কৃষি-উৎপাদন কয়েকটি জায়গায় প্রাক বিপ্লব যুগের পরিমাণে পৌঁছে গেছে বা এমনকি ছাড়িয়ে গেছে। অন্যান্য জায়গায় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় যেসব জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকত, আজ সেগুলোতেই যে শুধু আবার চাষ হচ্ছে তাই নয়, নতুন জমিতেও চাষ হচ্ছে। বহু জায়গায় গ্রামাঞ্চলে শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য পরস্পর-সহায়ক দল ও চাষ করার দল[২] সংগঠিত হয়েছে এবং বলদের অভাব দূর করার জন্য সমবায় সংগঠিত করা হয়েছে। তা ছাড়া, উৎপাদনে মেয়েরা অনেক বেশি সংখ্যায় যোগ দিচ্ছে কুওমিনতাঙ শাসনকালে এসবের কোনটাই হতো না। জমিদারদের হাতে জমি থাকায় কৃষকদের ইচ্ছেও হতো না উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণের, এবং তা করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ করে, তাদের উৎসাহ দেবার এবং উৎপাদনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করার পরেই কেবল কৃষকদের মধ্যে কাজের উৎসাহ বিকশিত হয়েছে এবং তার ফলে উৎপাদনে বিরাট সাফল্য অর্জিত হচ্ছে। এটাও বলা দরকার যে, আমাদের বর্তমান অবস্থার অর্থনৈতিক গঠনকার্যের কর্মসূচীতে কৃষিব্যবস্থা মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। এই কৃষির মাধ্যমেই আমরা যেমন আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সমস্যার সমাধান করে থাকি, তেমনি তুলো, শন, আঁখ, বাঁশ প্রভৃতি দিয়ে আমাদের বস্ত্র, চিনি, কাগজ প্রভৃতি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদিত হয়, এবং কাঁচামালের সমস্যার সমাধানও হয়ে থাকে। বন-সম্পদ সংরক্ষণ ও পশুসংখ্যা বৃদ্ধিও কৃষিব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্ষুদ্রায়তন কৃষি অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত পরি-

কল্পনা গ্রহণ করা এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কৃষকদেরকে সংগঠিত করা সম্ভব ও প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শ্রমশক্তি, চাষের বলদ, জমির সার, বীজ ও জলের সমস্যা সমাধানের কাজে কৃষকদেরকে আমাদের সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের মূল কর্তব্য হবে সংগঠিতভাবে শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা এবং কৃষিকাজে মেয়েদের যোগ দেওয়ার বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া। শ্রমশক্তি সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয় পন্থা হচ্ছে পরস্পর-সাহায্য দল সংগঠিত করা, চাষ করার দল গড়া, এবং অত্যন্ত কর্মমুখর চাষের সময় বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সমস্ত গ্রামের জনগণকে কাজে নামিয়ে দেবার জন্য উৎসাহ দেওয়া। আরেকটি বিরাট সমস্যা এই যে, কৃষকদের একটি বড় অংশেরই (প্রায় ২৫ শতাংশ) চাষের বলদ নেই। চাষের বলদের জন্য আমাদের সমবায় গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে, যেসব কৃষকের বলদ নেই তাদের উৎসাহ দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় সর্বসাধারণ্যে ব্যবহারের সমবায়ের 'শেয়ার' কেনে। কৃষিব্যবস্থার যা প্রাণ সেই জল সরবরাহের দিকেও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। অবশ্য আমরা এখনও যৌথ কিংবা রাষ্ট্রীয় খামারের প্রশ্নটি আনতে পারছি না, তবে কৃষি উন্নয়নে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ছোট ছোট খামার, কৃষি গবেষণা ইস্কুল এবং বিভিন্ন স্থানে কৃষি পণ্যের প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার কাজ বিশেষ জরুরী।

শত্রুর অবরোধ বহিরাঞ্চলে আমাদের পণ্য বিক্রির বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। লাল এলাকায় বহু হস্তশিল্পের পণ্যোৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে তামাক ও কাগজের। কিন্তু বহিরাঞ্চলে পণ্য প্রেরণের বাধা দূর করা অসম্ভব নয়। আমাদের নিজেদের অঞ্চলেই সর্বসাধারণের চাহিদার কারণে পণ্যবাজারও সুবিস্তৃত। সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের হস্তশিল্পোৎপাদন ও অন্যান্য কিছু পণ্যোৎপাদনের বিকাশসাধন করাতে হবে, প্রথমতঃ আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য, এবং দ্বিতীয়তঃ, বহিরাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসার জন্য। আমরা তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করার এবং জনগণের সাহায্যে পণ্যোৎপাদকদের সমবায় সংস্থা গড়ে ওঠার পর থেকে গত দু'বছরে, বিশেষ করে ১৯৩৩এর প্রথমার্ধে বহু হস্তশিল্প ও কিছু কিছু শিল্প-কারখানা আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে তামাক, কাগজ, ওলফ্রাম, কর্পূর, চাষ-যন্ত্র ও জমির সার (যেমন চুন)। তা ছাড়া, বর্তমান অবস্থায়

আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র, ওষুধ এবং চিনির উৎপাদনে অবহেলা করা উচিত নয়। ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে কাগজ তৈরী, বস্ত্র তৈরী, চিনি পরিশোধন প্রভৃতি এমন কতকগুলি শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে, যেগুলি আগে ছিল না। সেগুলি ভালভাবেই চলছে। নুনের ঘাটতি পূরণের জন্য জন-সাধারণ নাইটার থেকেই নুন তৈরী করা শুরু করেছে। শিল্পকে চালিয়ে যেতে হলে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রয়োজন। হস্তশিল্পগুলি বিক্ষিপ্ত থাকলে বিস্তারিত ও সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা করা অবশ্যই অসম্ভব। কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জন্য মোটামুটি বিস্তারিত পরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রয়োজন, বিশেষ করে প্রথমে ও সর্বাগ্রে রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থার জন্য। রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থার প্রতিটি লোককে অবশ্যই প্রথম থেকেই কাঁচামাল উৎপাদনের পরিমাণের এবং শত্রু অঞ্চলে ও আমাদের অঞ্চলে তার বিক্রির সম্ভাবনার নিখুঁত ও নির্ভুল হিসেবের দিকে নজর রাখতে হবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে জরুরী কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত কারবারীদের বহির্বাণিজ্য সংগঠিত করা এবং কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ করা। যেমন নুন এবং বস্ত্রাদির আমদানী, শস্যাদি ও উলফ্রাম রপ্তানী এবং আমাদের এলাকার মধ্যে শস্যের জোগানের সামঞ্জস্য বিধান করা। এই কাজগুলির পরিকল্পনা প্রথমে ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী অঞ্চলে নেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৩৩-এর বসন্ত কালে কেন্দ্রীয় অঞ্চলেও নেওয়া হয়েছে। বহির্বাণিজ্যের পর্ষদ এবং অন্যান্য এজেন্সি গঠিত হওয়ার পরে প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

আমাদের অর্থনীতির তিনটি সেক্টর আছে: রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সমবায় সংস্থা এবং ব্যক্তিমালিকানার সংস্থা।

বর্তমানে যেগুলি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলি করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যেই রাষ্ট্রীয় সংস্থা সীমাবদ্ধ আছে। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিল্প এবং বাণিজ্যের বিকাশ শুরু হয়েছে এবং এগুলির ভবিষ্যৎও অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ।

ব্যক্তিগত অর্থনীতির সেক্টরগুলির কোন ক্ষতিসাধন আমরা করব না। বস্তুতঃপক্ষে যতদিন পর্যন্ত এগুলি আমাদের সরকার কর্তৃক নির্দেশিত আইন-সীমা লঙ্ঘন না করবে ততদিন পর্যন্ত আমরা এগুলির বিকাশসাধনে প্রেরণা জোগাব। কারণ, বর্তমান স্তরে রাষ্ট্রের ও জনগণের স্বার্থেই ব্যক্তিমালিকানার সংস্থাগুলির বিকাশসাধন একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ। এ কথা বলাই বাহুল্য

যে, বর্তমানে ব্যক্তিমালিকানার সংস্থাগুলিরই বিপুল সংখ্যাধিক্য এবং বেশ কিছুকাল এগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করে থাকবে। বর্তমানে লাল এলাকায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-সংস্থাগুলিই ব্যক্তিমালিকানার সংস্থা।

সমবায় সংস্থাগুলিও দ্রুত বাড়ছে। নানাধরনের সমবায় সংস্থার মোট সংখ্যা এখন ১,৪২৩। ১৯৩৩এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী, কিয়াংসী ও ফুকিয়েনের ১৭টি কাউন্টির এই সমবায়গুলির মোট মূলধন ৩০০,০০০ য়ুয়ানেরও ওপরে। ক্রেতা-সমবায় এবং শস্য-সমবায়গুলোই সংখ্যায় বেশি আর তারপরেই উৎপাদক সমবায়গুলি। ঋণদান সমবায় সমিতি সবেমাত্র কাজ শুরু করেছে। যখন এই সমিতিগুলি এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি সমন্বিত হয়ে দীর্ঘদিন এই কাজের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠবে, তখন আমাদের অর্থনীতিতে সেগুলিই হয়ে উঠবে এক প্রচণ্ড শক্তি, এবং ক্রমশঃই এগুলি প্রধান স্থান অধিকার করবে এবং ব্যক্তিমালিকানার সেক্টরের নেতৃত্বও গ্রহণ করবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সংস্থার সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি বিকাশ এবং সমবায় সংস্থার ব্যাপক বিকাশকে অবশ্যই চলতে হবে ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থাগুলির বিকাশের প্রতি উৎসাহ প্রদানের সঙ্গে পাশাপাশিভাবে।

রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং সমবায় সংস্থার বিকাশসাধনের জন্য আমরা জনগণের সমর্থন নিয়ে ৩০ লক্ষ য়ুয়ান মূল্যের অর্থনৈতিক গঠনকার্যের বণ্ড বিলি করেছি। জনগণের শক্তির ওপর এরকম আস্থা স্থাপন করাই হচ্ছে একমাত্র সম্ভাব্য পথ, যে-পথে বর্তমান অর্থনৈতিক গঠনকার্যের জন্য অর্থ সমস্যার সমাধান করা যায়।

আমাদের অর্থনীতির বিকাশসাধন করে রাজস্ব বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমাদের রাজস্ব নীতির একটি মূলনীতি। ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে এর ফলে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে, এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলেও তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আমাদের রাজস্ব ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির কর্তব্য হচ্ছে এই নীতিকে সুসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা। এ প্রসঙ্গে আমাদের সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক নোট প্রচলন যেন মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনানুসারেই হয় এবং আর্থিক কারণে নোট প্রচলন যেন গৌণ স্থান গ্রহণ করে।

আমাদের সরকারী ব্যয়ের পরিচালিকা নীতি হওয়া উচিত মিতব্যয়িতা। সমস্ত সরকারী কর্মচারীদেরকে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, দুর্নীতি এবং অপচয় হচ্ছে মারাত্মক অপরাধ। দুর্নীতি এবং অপচয়ের বিরুদ্ধে

আমাদের আন্দোলন বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু এ বিষয়ে আরও প্রচেষ্টা চালানো দরকার। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য, বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষার জন্ত এবং আমাদের অর্থনৈতিক গঠনকার্যের জন্ত প্রতিটি পয়সা সঞ্চয় করা—আমাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষার ব্যবস্থার এটাই হওয়া উচিত মূল নীতি। কুওমিনতাঙ যে পদ্ধতিতে রাজস্ব ব্যয় করে, আমাদের ব্যয়ের পদ্ধতি নিশ্চিতভাবেই হতে হবে তার চাইতে ভিন্ন ধরনের।

যে-সময়ে সমগ্র দেশ এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ডুবে আছে, যখন কোটি কোটি লোক ক্ষুধায় এবং শীতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে, তখন আমাদের এলাকার জনগণের সরকার বিপ্লবী যুদ্ধের স্বার্থে, সমগ্র জাতির স্বার্থে, সমস্ত অসুবিধা উপেক্ষা করে অর্থ নৈতিক গঠনকার্য দৃঢ় পদক্ষেপে চালিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাটি খুবই পরিষ্কার,—কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও কুওমিনতাঙকে পরাজিত করেই এবং সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে হাত লাগিয়েই আমরা সমগ্র চীনের জনগণকে এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের কবল থেকে মুক্ত করতে পারি।

টীকা

১। লাল এলাকা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাধারণতঃ প্রথম দু-এক বছর কৃষি-উৎপাদন কমে যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, জমির পুনর্বণ্টনের সময়ে জমির মালিকানা তখনও নির্ধারিত হয় না, এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর ফলে কৃষকরা পুরো মন দিয়ে উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যেতে পারেনি।

২। শ্রমশক্তিকে আরও ভালভাবে সংগঠিত করে উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে লাল এলাকায় ব্যক্তিগত কৃষির ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছিল পারস্পরিক সহায়ক দল ও চাষের কাজের দল। স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ ও পারস্পরিক সুবিধের নীতির ভিত্তিতে সদস্যরা প্রত্যেকে একে একে অন্যের জন্য সমান পরিমাণ কাজ করত; কিংবা একজন যে পরিমাণ কাজ পেত, সে অন্যের জন্য তার সমান পরিমাণ কাজ না করতে পারলে নগদ টাকায় এই ব্যবধান পুষিয়ে দিত। পরস্পরকে সাহায্য করা ছাড়াও এই দলগুলি লালফৌজের সৈন্যদেরকে বিশেষ সুবিধে দিত, এবং যাদের সন্তান মারা গেছে এমন বৃদ্ধদের কাজ

বিনা পারিশ্রমিকে শুধু খাবারের বিনিময়ে করে দিত। পারস্পরিক সাহায্যের এইসব বিধি উৎপাদনে বিশেষ সাহায্য করত এবং যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে কার্যকরী হতো। একারণে এগুলি ব্যাপক জনগনের আন্তরিক সমর্থন পেয়েছিল।

জনসাধারণের জীবনযাত্রায় যত্ন নিন
কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন

(জানুয়ারী ২৭, ১৯৩৪)

কমরেডরা আলোচনার সময়ে গুরুত্ব আরোপ করতে পারেননি এমন দু'টি সমস্যা আছে, আমি তা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রথম সমস্যা হল জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত সমস্যা।

বর্তমানে আমাদের প্রধান কর্তব্য হল বিপ্লবী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাপক জনসাধারণকে সমাবেশ করা, এই বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে ও কুওমিনতাঙকে নিপাত করা, বিপ্লবকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদকে চীন থেকে বিতাড়িত করা। যিনি এই প্রধান কর্তব্যকে ছোট করে দেখেন তিনি খুব ভাল বিপ্লবী কর্মী হতে পারেন না। আমাদের কমরেডরা যদি এই প্রধান কর্তব্যকে প্রকৃতভাবেই স্পষ্ট করে দেখে থাকেন এবং বুঝে থাকেন যে, যে-কোনভাবেই হোক, বিপ্লবকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতেই হবে, তাহলে ব্যাপক জনসাধারণের প্রত্যক্ষ স্বার্থের সমস্যাকে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার সমস্যাকে লেশমাত্রও অবহেলা করা উচিত নয় এবং কিছুতেই ছোট করে দেখাও উচিত নয়। কারণ, বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ, কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাঁদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

যদি আমরা যুদ্ধ চালাবার জন্য কেবলমাত্র জনগণকে সমাবেশ করি এবং তা ছাড়া আর কোন কিছুই না করি, তাহলে আমরা কি শত্রুকে পরাজিত করার লক্ষ্যে পৌছাতে পারব? অবশ্যই না। যদি আমরা বিজয়লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই আরও অনেক কাজ করতে হবে। ভূমি-সংগ্রামে কৃষকদের পরিচালনা করতে হবে, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করে দিতে হবে, কৃষকদের শ্রম-উৎসাহ বাড়াতে হবে, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, শ্রমিকদের

এই রচনাটি ১৯৩৪ সালের ২৭শে জানুয়ারী কিয়াংসী প্রদেশের জুইচিনে অনুষ্ঠিত নিখিল চীন শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণের একটি অংশ।

স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বাইরের এলাকার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে হবে, জনসাধারণের যে সমস্যা, অর্থাৎ বস্ত্র, খাদ্য, বাসস্থান, জ্বালানি, চাল, রান্নার তেল, লবণ, রোগ, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং বিবাহের সমস্যা সমাধান করতে হবে। এক কথায়, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত বাস্তব সমস্যার প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। যদি আমরা এইসব সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিই, এগুলোর সমাধান করি এবং জনসাধারণের চাহিদা মেটাই, তাহলেই আমরা জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রকৃত সংগঠক হয়ে উঠব, এবং জনসাধারণ সত্যিকারভাবে আমাদের চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ হবেন ও আমাদেরকে তাঁদের আন্তরিক সমর্থন দেবেন। কমরেডগণ, আমরা কি সেই সময়ে জনসাধারণকে বিপ্লবী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারব? পারব, নিশ্চয়ই পারব।

আমাদের কর্মীদের মধ্যে এই ধরনের ব্যাপার দেখা গিয়েছিল যে, তাঁরা শুধু লালফৌজের সম্প্রসারণ, পরিবহন-ইউনিটের সম্প্রসারণ, জমির খাজনা আদায় এবং বণ্ড বিক্রয় সম্বন্ধেই কেবল কথা বলেন, অন্য কাজ সম্পর্কে তাঁরা কিছু বলেন না এবং মনোযোগ দেন না, এমনকি একেবারেই মনোযোগ দেন না। উদাহরণস্বরূপ, এক সময়ে থিংচৌ পৌর-সরকার শুধুমাত্র লালফৌজের সম্প্রসারণ ও পরিবহন-ইউনিটের সমাবেশ সম্পর্কে মনোযোগ দিয়েছে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার সমস্যার ব্যাপারে কোন মনোযোগই দেয়নি। থিংচৌ শহরের জনসাধারণের সমস্যা হল তাঁদের জ্বালানি কাঠ ছিল না, পুঁজিপতিদের মজুতের ফলে তাঁরা লবণ কিনতে পারেননি, জনসাধারণের মধ্যে কারো-কারো বাড়ী-ঘর ছিল না এবং সেখানে চালের অভাব ছিল, আর চালের দামও ছিল চড়া। এগুলোই ছিল থিংচৌ শহরের জনসাধারণের বাস্তব সমস্যা এবং সেগুলো সমাধানের সাহায্যের জন্য তাঁরা খুবই আগ্রহে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু থিংচৌ পৌর-সরকার এসব কোন কিছুই আলোচনা করেনি। তাই, তখন থিংচৌ শহরে শ্রমিক-কৃষকদের প্রতিনিধি-পরিষদ পুনর্নির্বাচনের পর এক শতাধিক প্রতিনিধি পরবর্তী সভায় যোগদানে অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ, প্রথম কয়েকটি সভায় শুধুমাত্র লালফৌজ সম্প্রসারণ ও পরিবহন ইউনিটের সমাবেশ সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছিল এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রতি মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তার ফলে, পরবর্তীকালে সভা ডাকাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সুতরাং লালফৌজ সম্প্রসারণ

এবং পরিবহন-ইউনিটের সমাবেশ সম্পর্কে, অতি অল্প সাফল্যই অর্জিত হয়েছিল। তা ছিল এক রকমের অবস্থা।

কমরেডগণ, দুটি আদর্শ-থানা সম্পর্কে যে পুস্তিকা আপনাদের দেওয়া হয়েছে আপনারা সম্ভবতঃ তা পড়েছেন। ওখানকার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কিয়াংসীর ছাংকাং থানায়[১] এবং ফুকিয়েনের ছাইসি থানায়[২] লালফৌজ সম্প্রসারণের সংখ্যা কি বিরাট ছিল! ছাংকাং থানায় শতকরা ৮০ ভাগ যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী লালফৌজে যোগদান করেছিল এবং ছাইসি থানায় জনসাধারণের শতকরা ৮৮ ভাগ লালফৌজে যোগদান করেছিল। বণ্ডের বিক্রিও হয়েছিল প্রচুর, দেড় হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত ছাংকাং থানায় ৪ হাজার ৫ শত য়ুয়ান মূল্যের বণ্ড বিক্রি করা হয়েছে। অন্যান্য কাজেও খুব বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর কারণ কি? কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ছাংকাং থানার একজন গরীব কৃষকের ঘরে যখন একটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে দেড়টি কামরা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন থানা-সরকার তাঁকে সাহয্যে করার জন্য জনসাধারণের কাছে অর্থদানের আবেদন করেছিল। তিনটি লোক না খেয়ে ছিল, থানা-সরকার এবং পারস্পরিক সাহায্য-কমিটি অবিলম্বে চাল সরবরাহ করে তাঁদের সাহায্য করেছিল। গত গ্রীষ্মে খাদ্য ঘাটতির সময়ে থানা-সরকার জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য দুইশত লী-রও বেশি দূরবর্তী কুংলিও জেলা[৩] থেকে চাল এনেছিল। ছাইসি থানায়ও এই ধরনের কাজ খুব ভালই চলেছিল। এইরকম থানা-সরকারই প্রকৃত আদর্শ থানা-সরকার। থিংচৌ পৌর-সরকারের আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব-পদ্ধতি থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ আলাদা। ছাংকাং থানা ও ছাইসি থানা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং থিংচৌ শহরের নেতাদের মতো আমলাতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা করা উচিত।

আমি আন্তরিকভাবে এই কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব করছি যে, ভূমি ও শ্রম সমস্যা থেকে শুরু করে জ্বালানি, চাল, রান্নার তেল ও লবণের সমস্যা পর্যন্ত জনসাধারণের জীবনের প্রতিটি সমস্যার প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে। নারীরা লাঙল ও মই চালনা শিখতে চায়, তাদের শেখাবার জন্য আমরা কাকে খুঁজতে পারি? শিশুরা পড়াশোনা করতে চায়, প্রাথমিক স্কুল কি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? ওখানকার কাঠের পুল খুবই সরু, মানুষ পড়ে যেতে পারে, সেটা কি মেরামত করা উচিত নয়? অনেক মানুষ ফোড়া

এবং অন্যান্য রোগে ভুগছে, এই সম্বন্ধে আমরা কি করতে যাচ্ছি? জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এ ধরনের সমস্ত সমস্যাকেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে স্থান দিতে হবে। সেগুলোকে আলোচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, কার্যকারী করতে এবং তার ফলাফলের উপর পরীক্ষা করতে হবে। ব্যাপক জনসাধারণকে আমাদের বোঝানো উচিত যে, আমরা তাঁদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করি এবং তাঁদের সঙ্গে আমরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সমস্ত বিষয় থেকে আমাদের উত্থাপিত উচ্চতর কর্তব্যকে অর্থাৎ বিপ্লবী যুদ্ধের কর্তব্যকে যেন তাঁদের বোঝানো হয়, যাতে করে তাঁরা বিপ্লবকে সমর্থন করেন এবং সারা দেশে ছড়িয়ে দেন, আমাদের রাজনৈতিক আবেদনে সাড়া দেন এবং বিপ্লবের জয়লাভের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করেন। ছাংকাং থানার জনসাধারণ বলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি সত্যিই ভাল, আমাদের জন্য তা সব কিছু চিন্তা করছে'। ছাংকাং থানার কর্মিগণই আদর্শ। কী প্রশংসনীয় লোক! তাঁরা ব্যাপক জনসাধারণের আন্তরিক ও অকপট ভালবাসা অর্জন করেছেন। যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাঁদের আহ্বান ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেছে। আমরা কি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে চাই? আমরা কি চাই যে, জনসাধারণ তাঁদের সমস্ত শক্তি যুদ্ধ-ফ্রন্টে নিয়োজিত করুক? যদি তাই হয়, তবে আমাদের অবশ্যই জনসাধারণের সঙ্গে থাকতে হবে, তাঁদের সক্রিয়তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তাঁদের সুখ-দুঃখের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, তাঁদের স্বার্থের জন্য আন্তরিকভাবে ও অকপটভাবে কাজ করতে হবে এবং তাঁদের উৎপাদন ও দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যা, অর্থাৎ লবণ, চাল, বাসগৃহ, কাপড়, শিশুজন্ম সমস্যার সমাধান করতে হবে, অন্য কথায়, জনসাধারণের সমস্ত সমস্যারই সমাধান করতে হবে। আমরা যদি এইভাবে কাজ করি তাহলে ব্যাপক জনসাধারণ নিশ্চয়ই আমাদের সমর্থন করবেন, এবং বিপ্লবকে তাঁদের জীবন বলে মনে করবেন, বিপ্লবকে তাঁদের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় পতাকা বলে মনে করবেন। কুওমিনতাঙ যদি লাল এলাকা আক্রমণ করতে চেষ্টা করে, তাহলে ব্যাপক জনসাধারণ যে নিজেদের জীবন দিয়ে কুওমিনতাঙের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে সংগ্রাম করবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আমরা কি শত্রুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে বাস্তবিক ভাবেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিইনি?

কুওমিনতাঙ এখন তাদের দুর্গ-নীতি[৪] অনুসরণ করছে, প্রচণ্ডভাবে তাদের

"কচ্ছপের খোল' নির্মাণ করে যাচ্ছে। তারা মনে করে সেগুলোই তাদের লৌহপ্রকার। কমরেডগণ, সেগুলো কি প্রকৃতই লৌহপ্রকার? মোটেই না। আপনারা দেখুন, হাজার হাজার বছর ধরে সামন্ত-সম্রাটদের প্রাচীর-পরিখা ও প্রাসাদগুলো কি শক্তিশালী ছিল না? তবুও যখনই জনসাধারণ জেগে উঠেছেন, তখনই সেগুলো একের পর এক ধ্বসে গিয়েছে। রাশিয়ার জার ছিল পৃথিবীর অন্যতম নিষ্ঠুরতম শাসক, তবু যখন সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষকদের বিপ্লবের অভ্যুদয় ঘটল, তখন কি এই জারের অস্তিত্ব ছিল? না, কিছুই ছিল না। আর লৌহপ্রাকার? সব ধ্বসে গেছে। কমরেডগণ, সত্যিকারের লৌহ-প্রাকার কি? তা হচ্ছে জনসাধারণ, কোটি কোটি জনসাধারণ, যাঁরা বিপ্লবকে অকৃত্রিমভাবে ও আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত লৌহ-প্রাকার, এটাকে বিনাশ করা যে-কোন শক্তির পক্ষেই অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। প্রতিবিপ্লবী শক্তি আমাদের বিনাশ করতে পারে না, আমরাই বরং তাকে বিনাশ করব। বিপ্লবী সরকারের চারিপাশে কোটি কোটি জন-সাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং আমাদের বিপ্লবী লালফৌজকে প্রসারিত করে আমরা সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করতে পারব এবং সমগ্র চীন অধিকার করতে পারব।

দ্বিতীয় সমস্যা হল কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত সমস্যা।

আমরা বিপ্লবী যুদ্ধের পরিচালক ও সংগঠক, আবার জনসাধারণের জীবন-যাত্রার পরিচালক এবং সংগঠকও বটে। বিপ্লবী যুদ্ধকে সংগঠিত করা এবং জন-সাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা আমাদের দুটি মহান কর্তব্য। এখানে, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত সমস্যা একটা গুরুতর সমস্যা হিসেবে আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের শুধু যে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে তাই নয়, বরং কর্তব্য সম্পন্ন করার পদ্ধতির সমস্যারও সমাধান করতে হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নদী পার হওয়া, কিন্তু সেতু কিংবা নৌকা ছাড়া তা তো পার হওয়া যায় না। সেতু বা নৌকা-সমস্যার সমাধান না হলে নদী পার হওয়ার কথাটা একটা ফাঁকা বুলি মাত্র। পদ্ধতির সমস্যার সমাধান না হলে কর্তব্য সম্পন্ন করার কথাও বাজে কথা মাত্র। যদি লালফৌজের সম্প্রসারণের কাজে নেতৃত্ব দেবার জন্য মনোযোগ দেওয়া না হয় এবং লালফৌজের সম্প্রসারণের কর্মপদ্ধতিতে যত্ন নেওয়া না হয়, তাহলে হাজার বার লালফৌজের সম্প্রসারণের কথা আওড়ালেও তা কখনো সফল হবে না। অন্য কোন কাজে, উদাহরণস্বরূপ, জমি বণ্টন

সম্পর্কে যাচাই করার কাজে, অর্থনীতি গঠনের কাজে, সংস্কৃতি ও শিক্ষার কাজে এবং নতুন এলাকার ও সীমান্ত এলাকার কাজে—এ সকল কাজে যদি আমরা শুধু কর্তব্য নির্ধারণ করি, কিন্তু সেগুলো কার্যকরী করার সময়ে কর্মপদ্ধতিতে মনোযোগ না দিই আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করি এবং কার্যকরী ও বাস্তব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ না করি, হুকুমবাদী পরিত্যাগ না করি এবং ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে বলার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ না করি, তাহলে কোন কর্তব্য সম্পন্ন করাই সম্ভব নয়।

সিংকুয়োর কমরেডরা সৃজনশীলভাবে প্রথমশ্রেণীর কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাই আদর্শ কর্মী হিসেবে আমাদের প্রশংসার যোগ্য। অনুরূপভাবে উত্তর-পূর্ব কিয়াংসীর কমরেডগণও সৃজনশীলভাবে খুব ভাল কাজ করেছেন। তাঁরাও আদর্শ কর্মী। সিংকুয়োর ও উত্তর-পূর্ব কিয়াংসীর কমরেডগণ জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে বিপ্লবী যুদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন এবং বিপ্লবী কর্মপদ্ধতির সমস্যাকে ও বিপ্লবী কাজের কর্তব্যের সমস্যাকে যুগপৎ সমাধান করেছেন। ওখানে তাঁরা মন দিয়ে কাজ করেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্যার সমাধান করেছেন এবং বিপ্লবের দায়িত্বকে প্রকৃতভাবেই বহন করছেন। তাঁরা বিপ্লবী যুদ্ধের উত্তম সংগঠক ও পরিচালক আবার জনসাধারণের জীবনযাত্রার উত্তম সংগঠক এবং পরিচালকও বটে। অন্যান্য অঞ্চলে, যেমন ফুকিয়েন প্রদেশের সাংহাং, ছাংথিং ও ইউংতিং প্রভৃতি জেলার কোন কোন জায়গায়, দক্ষিণ কিয়াংসীর সিকিয়াং প্রভৃতি স্থানে, হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার ছালিং, ইউংশিন ও কিয়ান প্রভৃতি জেলার কোন কোন জায়গায়, হুনান-হুপে-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার ইয়াংসিন জেলার কোন কোন স্থানে এবং কিয়াংসী প্রদেশের আরও অনেক জেলার মমকুমা ও থানাগুলিতে, আর আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি অধীন জুইচিন জেলার কমরেডগণ সবাই তাঁদের কাজের অগ্রগতি অর্জন করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁরাও আমাদের সকলের প্রশংসার যোগ্য।

আমাদের নেতৃত্বাধীন সমস্ত স্থানেই নিঃসন্দেহে জনসাধারণ থেকে উদ্ভূত অনেক সক্রিয় কর্মী এবং চমৎকার কমরেড-কর্মী রয়েছেন। এইসব কমরেডদের একটি দায়িত্ব হচ্ছে, যেসব স্থানে কাজ দুর্বল সেসব স্থানে সাহায্য করা এবং যে কমরেডগণ এখনো ভালভাবে কাজ করতে নিপুণ হননি তাঁদেরকে সাহায্য করা। আমরা একটি মহান বিপ্লবী যুদ্ধের সম্মুখীন শত্রুর বিরাটাকারের 'পরি-

বেষ্টন ও দমন' অভিযানকে আমাদের ভেঙে দিতে হবে এবং সারা দেশে বিপ্লবকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সকল বিপ্লবী কর্মীরই এক মহান দায়িত্ব রয়েছে। এই কংগ্রেসের পর আমাদের কাজের উন্নতির জন্য আমাদের অবশ্যই কার্যকরী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অগ্রগামী এলাকাকে আরও উন্নত করতে হবে এবং পশ্চাৎপদ এলাকাকে অগ্রগামী এলাকার কাছাকাছি আসতে হবে। ছাংকাংয়ের মতো হাজার হাজার থানা এবং সিংকুয়োর মতো ডজন ডজন জেলার সৃষ্টি করতে হবে। সেগুলোই হবে আমাদের দৃঢ় অবস্থান। এই অবস্থানগুলো দখল করেই আমরা এই অবস্থানগুলো থেকে শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চূর্ণ করার জন্য এগিয়ে যেতে পারব এবং সমগ্র দেশে সাম্রাজ্যবাদী ও কুওমিনতাঙের শাসনকে উচ্ছেদ করতে অগ্রসর হতে পারব।

টীকা

১। ছাংকাং হল কিয়াংসী প্রদেশের সিংকুয়ো জেলার একটি থানা।

২। ছাইসি হল ফুকিয়েন প্রদেশের সাংহাং জেলার একটি থানা।

৩। কুংলিও হল তৎকালীন কিয়াংসী লাল এলাকার একটি জেলা, তার কেন্দ্র হল কিয়ান জেলার দক্ষিণ-পূর্বের তুংকু। লালফৌজের তৃতীয় আর্মির কম্যাণ্ডার কমরেড হুয়াং কুং-লিও ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে এখানে শহীদ হন, তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর নামানুসারেই এই জেলার নামকরণ করা হয়েছে।

৪। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে কিয়াংসীর লুসানে সামরিক সম্মেলনে চিয়াং কাই-শেক পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের নতুন সামরিক কৌশল হিসেবে লাল এলাকার চারিপাশে দুর্গ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এক হিসাবানুযায়ী ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে কিয়াংসী প্রদেশে ২,৯০০ দুর্গ তৈরী করা হয়। পরবর্তীকালে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার কালে জাপানী আক্রমণকারীরাও চিয়াং কাই-শেকের এই নীতি প্রয়োগ করেছিল। ঐতিহাসিক ধারার মধ্য দিয়ে এটা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কমরেড মাও সে-তুঙের গণযুদ্ধের রণনীতি অনুসারে এই ধরনের প্রতিবিপ্লবী দুর্গ-নীতিকে চূর্ণবিচূর্ণ ও পরাজিত করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে

(ডিসেম্বর ২৭, ১৯৩৫)

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য

কমরেডগণ! বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার পটভূমিতে পার্টি আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

এই বর্তমান অবস্থাটি কীরকম?

এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করবার চেষ্টা করছে।

আমরা সবাই জানি, প্রায় একশো বছর ধরে চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ হয়ে আছে, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এক সঙ্গে তার ওপর আধিপত্য করছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ির ফলে চীন তার আধা-স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পেরেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে কিছু সময়ের জন্য চীনের ওপর এককভাবে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু জাপানের কাছে চীনের আত্মসমর্পণের চুক্তি, তখনকার জঘন্য বিশ্বাসঘাতক যুয়ান শি-কাই[1] কর্তৃক স্বাক্ষরিত একুশ দফা দাবি[2] জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রাম এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের ফলে নিঃসন্দেহেই নাকচ হয়ে গিয়েছিল। ১৯২২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানে

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তর শেনসীর ওয়াওপাওতে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর এক সভার পর সেখানেই অনুষ্ঠিত পার্টি-কর্মীদের এক সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্টটি পেশ করেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলির অন্যতম এই সভায় এই ভুল ধারণাকে সমালোচনা করা হয়েছিল যে, জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধে চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিক-কৃষকের মিত্র হতে পারে না। এই সভায় জাতীয় যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক ব্যুরোর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমরেড মাও সে তুঙ এই সভায় জাপানকে প্রতিরোধ করার শর্তে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের চূড়ান্ত

ওয়াশিংটনে নয়শক্তি সম্মেলনে একটি চুক্তি[৩] স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলে চীনদেশ আবার একই সঙ্গে বহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনস্থ হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাই[৪] হচ্ছে চীনকে জাপানের উপনিবেশে পরিণত করার বর্তমান স্তরের রাজনীতির শুরু। যেহেতু জাপানী আক্রমণ সাময়িকভাবে চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের[৫] মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই কিছু কিছু ব্যক্তি মনে করেছিল যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা সম্ভবতঃ আর অগ্রসর হবে না। আজ কিন্তু অবস্থাটা অন্যরকম। চীনের মহাপ্রাচীরের দক্ষিণে অনুপ্রবেশ করবার এবং সমগ্র চীনকে গ্রাস করবার মতলব ইতিমধ্যেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকাশ করেছে। বর্তমানে আধা-ঔপনিবেশিক চীনকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভাগাভাগি করে ভোগ করছে। জাপান এখন সেই আধা-ঔপনিবেশিক চীনকে একচেটিয়া উপনিবেশে পরিণত করতে চাইছে। সাম্প্রতিক পূর্ব-হুপেইর ঘটনা[৬] এবং কূটনৈতিক শলা-পরামর্শ[৭] ঘটনার গতির ইঙ্গিত যে এই দিকেই, তা দেখিয়ে দিচ্ছে, এবং তার ফলে সমগ্র চীনা জনগণের বেঁচে থাকার প্রশ্নটিই বিপন্ন হয়ে

গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি চীন বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রের কথা বলেন এবং দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় পার্টি এবং লালফৌজের বিপর্যয়ের মূল কারণ সংকীর্ণ রুদ্ধদ্বার নীতি ও বিপ্লব সম্পর্কে পার্টির মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী অতি দ্রুত কিছু করে ফেলার সমস্যাটির সমালোচনা করেন। একই সময়ে তিনি চেন তু-সিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের ফলে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের ঐতিহাসিক শিক্ষার প্রতি পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং দেখান যে চিয়াং কাই-শেক অবধারিতভাবে বিপ্লবের শক্তিকে হতমান করতে চেষ্টা করবে। চিয়াং কাই-শেকের চক্রান্ত ও অসংখ্য সশস্ত্র আক্রমণ সত্ত্বেও এইভাবেই তিনি নতুন পরিস্থিতিতে পার্টিকে মাথা পরিষ্কার রাখতে এবং বিপ্লবী শক্তিকে ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে কুইচৌ প্রদেশের সুনিতে আহূত কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর এক বর্ধিত সভায় আগেকার পুরানো 'বাম' সুবিধাবাদী নেতৃত্বের পরিবর্তে কমরেড মাও সে-তুঙকে নেতা করে এক নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। যেহেতু লালফৌজের লং মার্চ চলাকালে ঐ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেহেতু একান্ত জরুরী সামরিক সমস্যা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সামরিক কমিশন এবং সেক্রেটারিয়েটের সংগঠন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের মধ্যেই ঐ সভার কাজকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। লং মার্চের পরে লালফৌজ যখন উত্তর শেনসীতে পৌঁছায় কেবল তখনই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল রাজনীতিক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যার রণকৌশল প্রসঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই রিপোর্টে কমরেড মাও সে-তুঙ অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে এইসব সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

উঠেছে। এর ফলে চীনের সমস্ত শ্রেণী এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল আজ একটিই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে: কি করা যায়? প্রতিরোধ? আত্মসমর্পণ? কিংবা এই দুইটির মাঝখানে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকা?

চীনের বিভিন্ন শ্রেণী এই প্রশ্নটির উত্তর কিভাবে দিচ্ছে, সেটা এবার দেখা যাক।

শ্রমিক ও কৃষকের সকলেই প্রতিরোধ দাবি করছে। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব, ১৯২৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লব এবং ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে জাপ-বিরোধী জোয়ার—এসব কিছুই প্রমাণ করছে যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকরা হচ্ছে চীনের বিপ্লবের সবচাইতে দৃঢ় শক্তি।

পেটি-বুর্জোয়ারাও প্রতিরোধের দাবি করছে। যুবছাত্ররা এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়ারা কি ইতিমধ্যেই ব্যাপক জাপ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেনি?[৮] চীনা পেটি-বুর্জোয়াদের এই অংশ ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবেও অংশগ্রহণ করেছে। কৃষকদের মতোই এদের অর্থনৈতিক অবস্থাতে এরা ক্ষুদে-উৎপাদক, এবং এদের স্বার্থের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের কোন সামঞ্জস্য নেই। সাম্রাজ্যবাদ এবং চীনা প্রতিবিপ্লবী শক্তি এদের অনেক ক্ষতি করেছে, বহু লোককে বেকার করেছে, সর্বস্বান্ত বা আধা-সর্বস্বান্ত করেছে। বর্তমানে বিদেশী জাতির ক্রীতদাস হওয়ার আসন্ন বিপদের প্রতিরোধ করা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর নেই।

কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ারা, মুৎসুদ্দিরা ও জমিদারশ্রেণী এবং কুওমিনতাঙ কিভাবে এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হচ্ছে?

স্থানীয় বড় বড় জুলুমবাজেরা এবং অসৎ ভদ্রলোকেরা, বড় বড় যুদ্ধবাজরা ও আমলারা এবং মুৎসুদ্দিরা অনেক দিন আগেই মনস্থির করে ফেলেছে। তারা সব সময়ই এই ধারণা পোষণ করে এসেছে এবং আজও পোষণ করছে যে, যে-কোন ধরনের বিপ্লবই সাম্রাজ্যবাদের চাইতে খারাপ। তারা সবাই মিলে বিশ্বাসঘাতকদের একটি শিবির তৈরী করেছে। বিদেশী জাতির ক্রীতদাস তারা হবে কি হবে না, এ প্রশ্ন আজ আর তাদের কাছে নেই, কারণ তারা সমস্ত জাতীয়তাবোধ হারিয়ে বসেছে এবং তাদের স্বার্থকে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। তাদের পাণ্ডা হচ্ছে চিয়াং কাই-শেক[৯]। এই বিশ্বাসঘাতকদের শিবির চীনা জনগণের ঘোর শত্রু। এই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ তাদের আগ্রাসনে এতটা উদ্ধত হতে পেরেছে। এরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুর।

জাতীয় বুর্জোয়ারা একটি জটিল সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শ্রেণীটি ১৯২৪-২৭ সালে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু বিপ্লবের আগুন দেখে এরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জনগণের শত্রু চিয়াং কাই-শেক চক্রের সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। আমরা মনে করি, আছে। কারণ, জাতীয় বুর্জোয়ারা জমিদার বা মুৎসুদ্দিশ্রেণীর মতো নয়, এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। জমিদারশ্রেণীর তুলনায় জাতীয় বুর্জোয়ারা অপেক্ষাকৃত কম সামন্ততান্ত্রিক এবং মুৎসুদ্দিশ্রেণীর মতো মুৎসুদ্দি নয়। বিদেশী মূলধন আর চীনা জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে যে অংশ অধিকতর জড়িত, তারাই হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াদের দক্ষিণপন্থী অংশ, এবং এদের পরিবর্তন হবে কি হবে না, এই মুহূর্তে আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বিদেশী মূলধন এবং চীনা জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে যে অংশের খুব সামান্যই বন্ধন আছে বা একেবারেই নেই, সমস্যা হচ্ছে তাদের নিয়েই। আমরা বিশ্বাস করি, এই নতুন অবস্থায়, যে অবস্থায় চীনদেশের একটা উপনিবেশে পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, এই অংশগুলি হয়তো তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতেও পারে। এই পরিবর্তনের মধ্যে দোদুল্যমানতা থাকবে। একদিকে তারা সাম্রাজ্যবাদকে অপছন্দ করে, আর অন্যদিকে তারা ব্যাপক বিপ্লবকেও ভয় করে, এবং তারা এ দু'য়ের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলতে থাকে। এই কারণেই তারা ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং পরিশেষে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিল। চিয়াং কাই-শেক যখন ১৯২৭ সালে বিপ্লবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তখন থেকে বর্তমান অবস্থা কোন্ দিক থেকে স্বতন্ত্র? চীন সে-সময়ে ছিল একটি আধা-উপনিবেশ, কিন্তু বর্তমানে সে একটি উপনিবেশে পরিণত হওয়ার পথে। গত নয় বছর ধরে জাতীয় বুর্জোয়ারা তার মিত্র শ্রমিকশ্রেণীকে পরিত্যাগ করেছে এবং জমিদার ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। কিন্তু এতে তারা লাভবান হয়েছে কি? শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের দেউলিয়া বা আধা-দেউলিয়া অবস্থায় পরিণত হওয়া ছাড়া তাদের আর কিছুই লাভ হয়নি। তাই আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের মনোভাব পরিবর্তিত হতে পারে। এই পরিবর্তনের পরিধি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে? জাতীয় বুর্জোয়াদের সাধারণ চরিত্র হচ্ছে দোদুল্যমান, কিন্তু সংগ্রামের একটা স্তর পর্যন্ত একটি অংশের (বামপন্থী) বিপ্লবে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে,

আর অন্য অংশটির নিরপেক্ষতার দিকে ইতস্ততঃ করবার সম্ভাবনা আছে।

সাই তিং-কাই[10] এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বাধীন উনিশ নং রুট বাহিনী কোন্ শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে? জাতীয় বুর্জোয়া, উচ্চ পেটি-বুর্জো এবং ধনী কৃষক ও গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট জমিদারদের স্বার্থ। সাই তিং-কা এবং তার সহযোগীরা কি একবার লালফৌজের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ করেনি? হ্যাঁ, করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা লালফৌজের সঙ্গে জাপ-বিরোধী এবং চিয়াং-বিরোধী মৈত্রীচুক্তি করেছে। কিয়াংসীতে তারা লালফৌজকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু পরে শাংহাইতে তারা জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে। আরও পরে তারা ফুকিয়েনে লালফৌজের সঙ্গে এক চুক্তি করে এবং চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরে। ভবিষ্যতে সাই তিং-কাই এবং তার সহযোগীরা যে-কোন পথ গ্রহণ করলেও, এবং তাদের ফুকিয়েন গণ-সরকার সংগ্রামের জন্য জনগণকে জাগিয়ে তোলার বদলে পুরানো কায়দা আঁকড়ে থাকা সত্ত্বেও এ কথা আমাদের ভেবে দেখতেই হবে যে, যে-বন্দুক লালফৌজের সৈন্যদের বিরুদ্ধে চালানোর জন্য তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, সে-বন্দুক তারা আজ জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই শেকের বিরুদ্ধেই তুলে ধরেছে। এর মধ্য দিয়ে কুওমিনতাঙ শিবিরের ভাঙনই প্রকাশ পেয়েছে। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরবর্তী অবস্থা যদি এই গ্রুপের ভাঙনের কারণ হতে পারে, তবে বর্তমানে অবস্থা কেন কুওমিনতাঙে আরও ভাঙনের সৃষ্টি করবে না? যে সব পার্টি-সদস্য মনে করেন যে, সমগ্র জমিদার এবং বুর্জোয়া শিবিরটি একটি ঐক্যবদ্ধ ও স্থায়ী শিবির এবং কোন অবস্থাতেই তার পরিবর্তন ঘটবে না, তাঁরা ভুল করছেন। তাঁরা যে শুধু বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্বই উপলব্ধি করতে পারছেন না তাই নয়, এমনকি তাঁরা ইতিহাসও ভুলে যাচ্ছেন।

বিগত দিনগুলি সম্বন্ধে আমি আরও কিছু বলছি। ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সালে যখন বিপ্লবী সেনাবাহিনী উহানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, উহান দখল করে হোনানে এগিয়ে গিয়েছিল, তখন তাং সেং-চি এবং ফেং ইউ-সিয়াং[11] বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৩৩ সালে ফেং ইউ-সিয়াং কিছু দিনের জন্য চাহার প্রদেশে জাপ-বিরোধী মিত্র বাহিনী গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতাও করেছিল।

আর একটি চমৎকার উদাহরণের কথা বলা যেতে পারে। ছাব্বিশ নং রুট

বাহিনী উনিশ নং রুট বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কিয়াংসীতে লালফৌজকে কি আক্রমণ করেনি? তারই কি আবার ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে নিংতু অভ্যুত্থান[12] ঘটায়নি এবং লালফৌজের অংশ হয়ে যায়নি? নিংতু অভ্যুত্থানের নেতৃবর্গ চাও পো-সেং, তুং চেন-তাং এবং অন্যান্যরা আজ বিপ্লবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমরেড হয়ে গেছেন।

উত্তর-পূর্বের তিনটি প্রদেশে মা চান-শানের[13] জাপ-বিরোধী কার্যকলাপ শাসকশ্রেণীর শিবিরে আর একটি ভাঙনের দৃষ্টান্ত।

এ সমস্ত উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে, যখন সমগ্র চীনদেশ জাপানী বোমার পাল্লার মধ্যে আসবে এবং যখন সংগ্রাম তার স্বাভাবিক গতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে যাবে, তখন শত্রু-শিবিরে ভাঙন ধরবে।

কমরেডগণ, আসুন, এবার আমার প্রশ্নটির আর-একটি দিক আলোচনা করি।

যেহেতু চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তাই নতুন পরিস্থিতি সত্ত্বেও তাদের মনোভাব পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই—এই যুক্তির ভিত্তিতে কি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অগ্রাহ্য করা ঠিক? আমি মনে করি, ঠিক নয়। যদি দুর্বলতাই তাদের মনোভাব পরিবর্তন না করার কারণ হবে, তবে কেন জাতীয় বুর্জোয়ারা ১৯২৪-২৭ সালে অন্যরকম আচরণ করেছিল? তখন তারা বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাদের দোদুল্যমানতা প্রকাশ করেনি, তারা বিপ্লবেও যোগ দিয়েছিল। এ কথা কি কেউ বলে যে, দুর্বলতাটা জাতীয় বুর্জোয়াদের একটা নতুন রোগ? এই রোগ নিয়েই কি তারা জন্মগ্রহণ করেনি? এ কথা কি কেউ বলে যে, জাতীয় বুর্জোয়ারা আজকেই দুর্বল হয়েছে, ১৯২৪-২৭ সালে তারা দুর্বল ছিল না? আধা-ঔপনিবেশিক দেশের একটি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াদের দুর্বলতা। ঠিক এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদ তাদের চোখ রাঙাতে সাহস করে, এবং আবার ঠিক এই কারণেই এই জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে অপছন্দ করা। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের দুর্বলতা আছে বলেই সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে জমিদার এবং মুৎসুদ্দিদের খানিক আপাতঃ সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়। এই জন্যই বিপ্লবের শেষ পর্যন্ত তারা যেতে পারে না। তা সত্ত্বেও এ কথা বলা চলে না যে, বর্তমান

অবস্থায় জাতীয় বুর্জোয়া আর জমিদার ও মুৎসুদ্দিশ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

সুতরাং আমরা জোর দিয়েই এ কথা বলছি যে, যখন জাতীয় সংকট একটা চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছাবে, তখন কুওমিনতাঙ শিবিরে ভাঙন ধরবেই। এ রকম ভাঙন জাতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়ে এবং ফেং ইউ-সিয়াং, সাই তিং-কাই ও মা চান-শানের মতো হাল আমলের জাপ-বিরোধী জনপ্রিয় নেতাদের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এই ভাঙ্গন মূলতঃ প্রতিবিপ্লবের প্রতিকূলে এবং বিপ্লবের অনুকূলে কাজ করছে। চীনের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, এবং তারই ফলশ্রুতিতে বিপ্লবেরও অসমান বিকাশ এ ভাঙ্গনের সম্ভাবনাকেই আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

কমরেডগণ, প্রশ্নটির ইতিবাচক দিক সম্বন্ধে এই হচ্ছে বক্তব্য। এখন আমি নেতিবাচক দিকটি আলোচনা করব, অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে কিছু কিছু লোক যে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত, সেই ব্যাপারটি আলোচনা করব। কেন? কারণ, জনগণের বিপ্লবী স্বার্থের প্রতি আন্তরিক সমর্থক ছাড়াও এই শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যাদের সাময়িকভাবে বিপ্লবী বা আধাবিপ্লবী বলে মনে হয়, যারা এভাবে এমন একটা সুনাম অর্জন করেছে যা জনগণকে ধোঁকা দিতে সাহায্য করে, এবং তারা যে প্রকৃত বিপ্লবী নয়, তাদের এ মিথ্যা মোহজাল জনগণ ধরতে পারে না। এর ফলেই মিত্রদের সমালোচনা করবার, ভুয়া বিপ্লবীদের মুখোস খুলে দেবার এবং নেতৃত্ব অর্জন করবার দায়িত্ব কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বেশি করে এসে পড়ে। জাতীয় বুর্জোয়ারা যে দোদুল্যমান থাকে এবং বিরাট উত্থান-পতনের সময় যে তারা বিপ্লবে যোগ দিতে পারে, এ সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার অর্থ আমাদের পার্টির নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার দায়িত্ব পরিত্যাগ করা, বা অন্ততঃ এই দায়িত্বকে ছোট করে দেখা। কারণ, জাতীয় বুর্জোয়ারা যদি অবিকল জমিদার এবং মুৎসুদ্দিদের মতোই হতো, যদি তারা অবিকল একই রকম নোংরা বিশ্বাসঘাতক হতো, তবে তাদের নেতৃত্বের জন্য প্রতিযোগিতা করবার সমস্যা একেবারেই থাকত না, বা থাকলেও খুব সামান্যই থাকত।

বিরাট উত্থান-পতনের সময় চীনা জমিদার ও বুর্জোয়াদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, এবং তা হচ্ছে এই ঘটনাটি যে, জমিদার ও মুৎসুদ্দিদের শিবিরও

ঐক্যবদ্ধ নয়। এর কারণ চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, এরজন্য বহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রতিযোগিতা করছে। যখন জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বিটেনের তাঁবেদার গোষ্ঠী তাদের প্রভুদের বিভিন্ন নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বা গোপন সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। কুকুরের মতো এই ধরনের খেয়োখেয়ির অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমরা সেগুলি আলোচনা করব না। আমরা কেবল হু হান-মিনের[১৪] ঘটনাটি উল্লেখ করব। হু হান-মিন ছিলেন একজন কুওমিনতাঙ রাজনীতিবিদ, চিয়াং কাই-শেক একবার তাঁকে বন্দী করেছিল। জাপানকে প্রতিরোধ করা এবং জাতিকে রক্ষা করবার[১৫] যে ছয় দফা কর্মসূচী আমরা রেখেছি, তাতে তিনি স্বাক্ষর দিয়েছেন। কোয়াংতুং এবং কোয়াংসী চক্রের[১৬] যুদ্ধবাজরা, যারা হু হান-মিনকে সমর্থন করে, তারা 'আমাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা' এবং 'জাপানকে প্রতিরোধ কর ও দস্যুদের অবদমন কর'[১৭] এই প্রতারণা-মূলক শ্লোগানের মাধ্যমে চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা করছে ('প্রথমে দস্যুদের অবদমন, পরে জাপানকে প্রতিরোধ'—চিয়াং কাই-শেকের এই শ্লোগানের বিরুদ্ধে)। এটা কি খুব অদ্ভুত ব্যাপার নয়? না, এটা মোটেই অদ্ভুত ব্যাপার নয়। বরং এ হচ্ছে একটা বড় ও ছোট কুকুরের, খেতে-পাওয়া আর অভুক্ত কুকুরের কামড়া-কামড়ির একটা চমৎকার উদাহরণ। এটা একটা বড় ভাঙন নয়, কিন্তু তাই বলে খুব ছোটও নয়; এটা একই সময়ে একটা বিরক্তিকর এবং বেদনাদায়ক দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই লড়াই, এই ভাঙন, এই দ্বন্দ্ব বিপ্লবী জনগণের কাজে লাগতে পারে। শত্রু-শিবিরের এইসব লড়াই, ভাঙন আর দ্বন্দ্বকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং বর্তমানের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে হবে।

শ্রেণীগুলির সম্পর্কের প্রশ্নটির সার-সংকলন করে আমরা বলতে পারি যে, পরিস্থিতিতে মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে জাপ-আক্রমণ চীনের বিভিন্ন শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, জাতীয় বিপ্লবের শিবিরকে শক্তিশালী করেছে এবং প্রতিবিপ্লবের শিবিরকে দুর্বল করেছে।

এবার জাতীয় বিপ্লবের শিবিরের অবস্থা পর্যালোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ, লালফৌজ। কমরেডগণ, আপনারা জানেন যে, প্রায় দেড় বছর ধরে চীনা লালফৌজের তিনটি প্রধান বাহিনী তাদের অবস্থানের বিরাট

পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ইয়েন পি-শী[18] ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বে ষষ্ঠ সেনাবাহিনী গত বছরের আগস্ট মাস থেকে কমরেড হো লুং-এর[19] অঞ্চলে যাওয়া শুরু করেছে এবং অক্টোবর মাস থেকে আমরাও অন্য জায়গায়[20] যাওয়া শুরু করেছি। এই বছরের মার্চ মাসে সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত অঞ্চলের[21] লালফৌজ স্থান পরিবর্তন শুরু করেছে। লালফৌজের তিনটি বাহিনীই তাদের পুরানো স্থান ছেড়ে এসেছে এবং নতুন অঞ্চলে সরে গিয়েছে। এই স্থান থেকে ব্যাপকভাবে সরে যাওয়ার ফলে পুরানো অঞ্চলগুলি গেরিলা অঞ্চলে পর্যবসিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লালফৌজ উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এইদিক থেকে সামগ্রিকভাবে অবস্থার বিচার করলে দেখা যায় যে, শত্রুপক্ষ সাময়িক এবং আংশিকভাবে জয়লাভ করেছে এবং আমরা সাময়িক ও আংশিকভাবে পরাজিত হয়েছি। এই বক্তব্য কি ঠিক? আমি মনে করি, ঠিক। কারণ, এই বক্তব্যই হচ্ছে ঘটনার প্রকৃত বিবরণ। কিন্তু কিছু কিছু লোক (উদাহরণস্বরূপ, চাং কুও-তাও[22]), বলেন যে, কেন্দ্রীয় লালফৌজ[23] ব্যর্থ হয়েছে। এ কথা কি ঠিক? না। কারণ এটা ঘটনার প্রকৃত বিবরণ নয়। কোন একটি সমস্যার বিচার করতে গিয়ে একজন মার্কসবাদী যেমন সমগ্র জিনিসটির বিচার-বিবেচনা করেন, ঠিক তেমনি অংশের বিচার-বিবেচনা করেন। একটি কুয়োর ব্যাঙ বলেছিল, 'কুয়োর মুখের চাইতে আকাশ মোটেই বড় নয়।' এ কথা ঠিক নয়, কারণ আকাশের আয়তন আর কুয়োর মুখের আয়তন এক নয়। যদি সে বলতো, 'আকাশের একটা অংশের আয়তন কুয়োর মুখের আয়তনের সমান', তবে তার বক্তব্য প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। আমরা যা বলি তা হচ্ছে, একদিক থেকে লালফৌজ ব্যর্থ হয়েছে (অর্থাৎ মূল ঘাঁটিগুলি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে), কিন্তু অন্যদিক থেকে লালফৌজ জয়ী হয়েছে (অর্থাৎ লং মার্চের পরিকল্পনা) কার্যকরী করে)। একদিক থেকে শত্রুপক্ষের জয় হয়েছে (আমাদের আগের ঘাঁটিগুলি দখল করে), কিন্তু অন্যদিক থেকে সে ব্যর্থ হয়েছে (অর্থাৎ তার 'পরিবেষ্টন ও দমন' এবং 'পশ্চাদ্ধাবন ও অবদমন' পরিকল্পনা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে)। এই হচ্ছে একমাত্র সঠিক সূত্রায়ন, কারণ আমরা লং মার্চ সম্পূর্ণ করেছি।

লং মার্চ সম্বন্ধে কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন 'এর গুরুত্ব কি?' আমরা বলি ইতিহাসে লং মার্চই হচ্ছে এ ধরনের প্রথম ঘটনা। এ একটি ইস্তাহার, একটি শক্তিশালী প্রচার, একটা বীজ-বোনার যন্ত্র। যেদিন থেকে পান

কু স্বর্গ আর মর্তকে ভাগ করে দিয়েছে এবং তিনটি সার্বভৌম রাজত্ব ও পাঁচজন সম্রাট[২৪] রাজত্ব করে আসছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস কি আমাদের লং মার্চের মতো কোন অভিযান দেখেছে? বারোটি মাসের প্রত্যেক দিন আকাশ থেকে আমাদের তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, এবং শত শত বোমারু বিমান থেকে আমাদের ওপর বোমা বর্ষিত হয়েছে। আর স্থলপথে লক্ষ লক্ষ লোকের সেনাবাহিনী আমাদের পেছনে ধাওয়া করেছে, ঘিরে ফেলেছে, বাধা দিয়েছে, পথে অবরোধ স্থাপন করেছে, এবং আমাদের অগ্রগতির পথে আমরা অগণিত ও অকথ্য বিপদ ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছি। তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের দুটি পা ব্যবহার করে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এগারোটি প্রদেশ এবং বিশ হাজার লীরও বেশি পথ অতিক্রম করে এসেছি। আমরা জানতে চাই, আমাদের লং মার্চের মতো এ রকম অভিযান কি ইতিহাস আর কোনদিন কোনকালে দেখেছে? না, কখনও না। লং মার্চ হচ্ছে একখানা ইস্তাহার। দুনিয়ার কাছে এ ইস্তাহার ঘোষণা করেছে যে, লালফৌজ হচ্ছে এক বীর সেনাবাহিনী, আর সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেক ও তার মতো পা-চাটা কুকুররা হচ্ছে নপুংসকের দল। আমাদের অবরোধ করা, পিছনে ধাওয়া করা, বাধা দেওয়া এবং ফাটল ধরানোর ব্যাপারে এই লং মার্চ তাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা ঘোষণা করেছে। এগারোটি প্রদেশের প্রায় ২০ কোটি লোকের কাছে এই লং মার্চ প্রচার করেছে যে, লালফৌজের পথই হচ্ছে তাদের মুক্তির একমাত্র পথ। লালফৌজ যে মহান সত্য বহন করছে, এই লং মার্চ ছাড়া এই বিপুল জনতা এত দ্রুত তা জানতে পারত কি? লং মার্চ আবার বীজ-বোনার যন্ত্রও বটে। এগারোটি প্রদেশে এ অসংখ্য বীজ বপন করেছে, যা মাটি-ফুঁড়ে উঠবে, যার পাতা গজাবে, প্রস্ফুটিত হবে ও ফল ধরবে এবং ভবিষ্যতে যার ফসলও তোলা হবে। এক কথায়, আমাদের বিজয়ে ও শত্রুর পরাজয়ে লং মার্চ শেষ হয়েছে। কে লং মার্চকে বিজয়ী করে তুলেছে? কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া এ ধরনের লং মার্চ কল্পনা করাও যেত না। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এর নেতৃত্বে, এর কর্মী এবং সদস্যরা কোন অসুবিধা বা কঠোর পরিশ্রমকেই ভয় করে না। বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্বের ব্যাপারে যারা আমাদের সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহ করে, তারা অতি অবশ্যই সুবিধাবাদের গাড্ডায় গিয়ে পড়বে। যে মুহূর্তে লং মার্চ শেষ হয়েছে, তখনই একটি নতুন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। চিহ্‌লোচেনের যুদ্ধে কেন্দ্রীয় লালফৌজ এবং উত্তর-

পশ্চিমের লালফৌজ ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শেনসী-কানসু সীমান্ত অঞ্চলে[২৫] বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের 'পরিবেষ্টন এবং দমন' অভিযানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, এবং এইভাবেই তা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম চীনে বিপ্লবের জাতীয় সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করবার সীদ্ধান্তের ভিত্তি রচনা করেছে।

এই যখন লালফৌজের প্রধান বাহিনীর অবস্থা, তখন দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলির গেরিলা যুদ্ধের অবস্থা কি? সেখানে আমাদের গেরিলা বাহিনীগুলির কিছু কিছু বিপর্যয় ঘটেছে, কিন্তু তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। অনেক জায়গায় তারা তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, বেড়ে উঠেছে, এবং সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে।[২৬]

কুওমিনতাঙ শাসিত অঞ্চলে শ্রমিকদের সংগ্রাম কারখানার চার দেওয়ালের বাইরে চলে আসছে, এবং অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ নিচ্ছে। জাপানীদের এবং বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বর্তমানে তীব্র হয়ে উঠেছে, এবং অবস্থা বিচার করে বলা যায় যে, খুব শিঘ্রই এগুলির বিস্ফোরণ ঘটবে।

কৃষকদের সংগ্রাম কখনও বন্ধ হয়নি। বাইরের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে, দেশের আভ্যন্তরীণ অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হয়ে এবং প্রকৃতির বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কৃষকরা গেরিলা যুদ্ধ, ব্যাপক অভ্যুত্থান এবং দুর্ভিক্ষজনিত দাঙ্গাহাঙ্গামা ব্যাপকভাবে শুরু করে দিয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে এবং পূর্ব-হোপেইতে[২৭] এখন যেসব গেরিলা যুদ্ধ চলছে, তা হচ্ছে জাপসাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রত্যুত্তর।

ছাত্র আন্দোলন ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে বিকাশলাভ করছে, এবং সুনিশ্চিতভাবেই এর বিস্তার ঘটতে থাকবে। কিন্তু কেবলমাত্র তখনই এই আন্দোলনকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, এবং তা বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা চাপানো সামরিক আইন এবং পুলিশ, গুপ্তচর, শিক্ষাজগতের বদমায়েস ও ফ্যাসিষ্টদের বিভেদ সৃষ্টি ও ব্যাপক হত্যার বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে অসতে পারবে, যখন ছাত্রদের এই সংগ্রাম শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যদের সংগ্রামের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে উঠবে।

আমরা আগেই জাতীয় বুর্জোয়াদের, ধনী কৃষকদের এবং ছোট জমিদারদের দোদুল্যমানতা, এবং তাদের জাপ-বিরোধী সংগ্রামের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

সংখ্যালঘু জাতীসমূহ এবং বিশেষ করে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শিকার অন্তর্মঙ্গোলিয়ার জনগণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সময় যতই যেতে থাকবে, তাদের সংগ্রাম ততই উত্তর চীনের জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে এবং উত্তর-পশ্চিমের লালফৌজের সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে মিশে যাবে।

এই সব থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিপ্লবী অবস্থা এখন স্থানীয় থেকে সমস্ত দেশব্যাপী সামগ্রিক চরিত্র গ্রহণ করছে এবং ক্রমশঃই অসম ব্যবস্থা থেকে কিছু পরিমাণে সম অবস্থায় এসে পড়েছে। আমরা এক বিরাট পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি। এখন পার্টির কর্তব্য হচ্ছে লালফৌজের কার্যকলাপের সঙ্গে দেশব্যাপী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াদের সমস্ত কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করে একটি বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন করা।

জাতীয় যুক্তফ্রন্ট

প্রতিবিপ্লব এবং বিপ্লব এই উভয় অবস্থা পর্যালোচনা করার পর পার্টির রণকৌশলগত কর্তব্য নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

পার্টির মূল রণকৌশলগত কাজ কি? ব্যাপক জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিপ্লবী অবস্থার যখন পরিবর্তন হয়, তখন বিপ্লবী রণকৌশল এবং নেতৃত্বের কর্মপদ্ধতিরও সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। জাপানী সাম্রাজ্য-বাদীদের এবং তার সহযোগী ও বিশ্বাসঘাতকদের কাজ হচ্ছে চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করা, আর আমাদের কাজ হচ্ছে পরিপূর্ণ ভূখণ্ডগত সংহতির ভিত্তিতে চীনকে একটি স্বাধীন ও মুক্ত দেশে পরিণত করা।

চীনের স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করা হচ্ছে একটি মহান কর্তব্য। এরজন্য আমাদের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হবে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনের গভীর অভ্যন্তরে তারা থাবা বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর। এখন পর্যন্ত বড় জমিদার এবং মুৎসুদ্দিশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী শক্তি জনগণের বিপ্লবী শক্তির চাইতে বেশি শক্তিশালী। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে এক দিনেই উৎখাত করা যাবে না, দীর্ঘকাল ব্যাপী এই কাজে নিযুক্ত থাকবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, তাই আমাদের বিরাট শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। চীনে এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্বে, প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ

আগের চাইতে এখন অনেক দুর্বল এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহ আগের চাইতে অনেক শক্তিশালী। এ হিসেব নির্ভুল, এবং এটা এ ব্যাপারটার একটি দিক। একই সময়ে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, চীন এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্বে প্রতিবিপ্লবী শক্তি সাময়িকভাবে বিপ্লবী শক্তির তুলনায় বেশি শক্তিশালী। অন্য আর একদিক থেকে বিচার করলে এ হিসাবটাও নির্ভুল। চীনের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ফলে বিপ্লবেরও অসম বিকাশ হয়েছে। যেসব জায়গায় প্রতিবিপ্লবী শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সাধারণতঃ বিপ্লব সেখানেই প্রথম শুরু হয়, তার বৃদ্ধি ঘটে এবং বিজয়লাভ হয়। আর যেসব জায়গায় প্রতিবিপ্লবী শক্তি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, সেখানে বিপ্লব প্রথমে অরম্ভ হয় না বা আরম্ভ হলেও অতি ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি ঘটে। অনেক দিন ধরেই চীনা বিপ্লবের এই অবস্থা চলে আসছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, ভবিষ্যতে একটা পর্যায়ে সাধারণ বিপ্লবী অবস্থা আরও বিকশিত হবে বটে, কিন্তু অসম বিকাশের অবস্থা থেকেই যাবে। এই অসম অবস্থা থেকে সাধারণভাবে সম অবস্থায় রূপান্তর ঘটতে প্রয়োজন সুদীর্ঘ সময়ের, বিরাট প্রচেষ্টার আর পার্টি কর্তৃক নির্ভুল লাইন প্রয়োগের। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির[২৮] নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে তিন বছর লেগেছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, তাতে দেশী ও বিদেশী প্রতিবিপ্লবাদের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য যে আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এর আগে যে ধরনের ধৈর্যহীনতা দেখানো হয়েছে, তা করলে কখনই চলবে না। উপরন্তু নির্ভুল বিপ্লবী রণকৌশল বের করতে হবে। আমরা যদি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আমাদের আবদ্ধ রাখি তাহলে কোনদিনই আমরা বড় কিছু করতে পারব না। এর অর্থ এই নয় যে, চীনে ধীরে ধীরে কাজ করতে হবে। না, কাজ করতে হবে বলিষ্ঠ সাহসের সঙ্গেই, কেননা জাতীয় পরাধীনতার বিপদ এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের শৈথিল্য প্রকাশ করতে দেবে না। এখন থেকে সুনিশ্চিতভাবেই আগের চাইতে অনেক দ্রুত বিপ্লবের বিকাশ ঘটবে, কারণ চীন এবং সমগ্র দুনিয়া যুদ্ধ ও বিপ্লবের এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। এসব কারণেই চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। সাম্রাজ্যবাদের শক্তি এবং বিপ্লবের অসম বিকাশই এর কারণ। আমরা বলি, বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে

এমন যে, জাতীয় বিপ্লবের এক নতুন ও বিরাট জোয়ার আসন্ন এবং সেই জোয়ারের মধ্যে চীনও দেশব্যাপী এক নতুন বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতির এটি একটি বৈশিষ্ট্য। এটি একটি ঘটনা, এবং ঘটনার একটি দিককে এ প্রতিফলিত করছে। কিন্তু আমাদের একথাও বলতে হবে যে, আজও সাম্রাজ্যবাদ এমন একটি শক্তি আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়েই যার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। বিপ্লবী শক্তিসমূহের মধ্যে অসম বিকাশ আমাদের একটি সাংঘাতিক দুর্বলতা, এবং শত্রুকে পরাজিত করতে হলে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে: বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতির এটি হচ্ছে আর একটি বৈশিষ্ট্য। এটিও একটি ঘটনা এবং অন্য একটি দিককে প্রতিফলিত করছে। এই উভয় বৈশিষ্ট্য ও উভয় ঘটনা আমাদের রণকৌশল, শক্তি-সমাবেশ ও শক্তি নিয়োগের পদ্ধতি এবং অবস্থানুযায়ী সংগ্রাম পরিচালনা করার পদ্ধতি পরিবর্তনের শিক্ষা দেয় ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বলে। বর্তমান পরিস্থিতি দাবি করছে যে, আমাদের সাহসের সঙ্গে সমস্ত রুদ্ধদ্বার নীতি পরিত্যাগ করতে হবে, ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে এবং হঠকারিতার বিরুদ্ধে সতর্ক প্রহরা দিতে হবে। সময় যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপক্ক না হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় শক্তি সংগৃহীত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা চূড়ান্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব না।

হঠকারিতার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার নীতির সম্পর্ক, অথবা বৃহত্তর পরিসরে ঘটনার বিকাশের সঙ্গে হঠকারিতার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কিত আলোচনা আমি এখানে করছি না, তা ভবিষ্যতে করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল এবং রুদ্ধদ্বার নীতির কৌশল যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী, তার বিশ্লেষণের মধ্যেই আমি আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব।

প্রথমটির জন্য প্রয়োজন শত্রুকে পরিবেষ্টন ও ধ্বংস করার জন্য এক বিরাট শক্তিকে সংগ্রহ করা

পরেরটির অর্থ হচ্ছে দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে একা একা বেপরোয়া যুদ্ধ করা।

যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলের সমর্থকদের মতে, যদি ব্যাপক বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক মূল্যায়ন করতে হয়, তবে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করবার প্রচেষ্টার ফলে চীনের বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিন্যাসে যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তারও সঠিক মূল্যায়ন অবশ্যই করতে হবে। জাপানী ও চীনা

প্রতিবিপ্লবী শক্তি এবং চীনা বিপ্লবী শক্তির দুর্বল ও সবল দিকগুলির সঠিক মূল্যায়ন ছাড়া আমরা ব্যাপক জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি বুঝতে পারব না, কিংবা রুদ্ধদ্বার নীতি ভাঙার জন্য শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব না, বা আমাদের মূল লক্ষ্য জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পোষা কুকুর চীনা বিশ্বাসঘাতকদের ওপর আঘাত হানবার জন্য বিপ্লবের প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাবসম্পন্ন সেনাবাহিনী এবং কোটি কোটি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার হাতিয়ার হিসেবে যুক্তফ্রণ্টকে কাজে লাগাতে পারব না, বা আমাদের সামনের প্রধান লক্ষ্যকে আঘাত হানার জন্য আমাদের রণকৌশলগত এই হাতিয়ারকে আমরা ব্যবহারও করতে পারব না। তার বদলে বিভিন্ন লক্ষ্যে আমরা আঘাত হানতে শুরু করব, এবং আমাদের বুলেট প্রধান শত্রুকে আঘাত না করে আমাদের ছোটখাট শত্রু, এমনকি আমাদের মিত্রকে পর্যন্ত আঘাত করে বসবে। এর অর্থ হবে প্রধান শত্রুকে আলাদা করে ফেলবার ব্যর্থতা এবং গোলাবারুদের অপচয়। এর অর্থ হবে তাকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করবার এবং সমস্ত শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যর্থতা। এর অর্থ হবে যারা শত্রু শিবির এবং শত্রু ফ্রণ্টে নেহাৎই বাধ্য হয়ে চলে গিয়েছে, এবং যারা কাল আমাদের শত্রু ছিল এবং যাদের আজ আমাদের বন্ধু হবার সম্ভাবনা আছে, তাদের আমাদের দিকে টেনে আনার ব্যর্থতা। আসলে এর অর্থ হবে শত্রুকে সাহায্য করা, বিপ্লবকে পিছিয়ে দেওয়া, বিচ্ছিন্ন করা ও সঙ্কুচিত করা, এবং বিপ্লবের জোয়ারকে স্তিমিত করা এবং এমনকি, বিপ্লবকে পরাজিত করা।

রুদ্ধদ্বার কৌশলের প্রবক্তারা উপরোক্ত সমস্ত যুক্তিকেই ভুল মনে করেন। বিপ্লবের শক্তিকে বিশুদ্ধ হতে হবে, পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এবং বিপ্লবের রাস্তাকে হতে হবে সোজা-সরল, পরিপূর্ণভাবে সোজা-সরল। পবিত্র গ্রন্থে আক্ষরিকভাবে যা লেখা আছে, তা ছাড়া আর কোন কিছুই সঠিক নয়। জাতীয় বুর্জোয়ারা সম্পূর্ণভাবে এবং চিরকালের জন্য প্রতিবিপ্লবী। ধনী কৃষককে এক ইঞ্চিও সুবিধা দেওয়া হবে না। প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার লড়াই করতে হবে। কেউ সাই তিং-কাইয়ের সঙ্গে করমর্দন করলে তক্ষুণি তাকে প্রতিবিপ্লবী বলে চিহ্নিত করতে হবে। এমন বিড়াল কি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে যে মাছ ভালবাসে না, এবং এমন যুদ্ধবাজ কি আছে যে প্রতিবিপ্লবী নয়? বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে তিন দিনের বিপ্লবী, এদের দলে নেওয়াটাই হবে মারাত্মক। সুতরাং এ থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে,

একমাত্র রুদ্ধদ্বার নীতিই হচ্ছে একটি আলাদিনের প্রদীপ, আর যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে একটি সুবিধাবাদী রণকৌশল।

কমরেডগণ, কোন্‌টি সঠিক? যুক্তফ্রন্ট নীতি, না রুদ্ধদ্বার নীতি? বাস্তবে কোন্‌টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত? নির্দ্বিধায় আমি বলছি—রুদ্ধদ্বার নীতি নয়, যুক্তফ্রন্টই হচ্ছে সঠিক এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত নীতি। তিন বছর বয়সের শিশুদের অনেক চিন্তাভাবনা সঠিক হয়, কিন্তু তাই বলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আন্তর্জাতিক ব্যাপারের দায়িত্ব দেওয়া যায় না। কারণ তারা তখনও সেগুলি জানে না। মার্কসবাদ-লেলিনবাদ বিপ্লবীদের মধ্যেকার 'শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলার' বিরোধী। এই শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলার পক্ষেই ওকালতি করেছেন রুদ্ধদ্বার নীতির কট্টর প্রবক্তারা। দুনিয়ার আর সমস্ত কাজের মতোই বিপ্লবও সবসময় আঁকাবাঁকা পথেই অগ্রসর হয়, সহজ-সরল পথে নয়। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবী শিবিরের বিন্যাসের পরিবর্তন হয়, ঠিক দুনিয়ার অন্য সব জিনিষেরই মতো। পার্টির ব্যাপক যুক্তফ্রন্টের নতুন রণকৌশল দুটি মূল ঘটনা থেকে উদ্ভূত; জাপ-সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং চীনের বিপ্লবী শক্তিসমূহ সাংঘাতিকভাবে দুর্বল। প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে আক্রমণের জন্য আজকের দিনে বিপ্লবী শক্তির যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে কোটি কোটি জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং এক বিরাট শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো। সহজ সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র এই ধরনের বিপুল শক্তিবাহিনীই পারে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্বাসঘাতক ও সহযোগীদের ধ্বংস করতে। তার যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলই একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রণকৌশল। অন্যদিকে, রুদ্ধদ্বার নীতির রণকৌশল হচ্ছে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের রণকৌশল। রুদ্ধদ্বার নীতি 'মাছকে গভীর জলে তাড়িয়ে নেয় এবং পাখীদের গভীর জঙ্গলে নিয়ে' যায়, এই নীতি কোটি কোটি জনগণের বিশাল বাহিনীকে শত্রুপক্ষের দিকে নিয়ে যাবে এবং তার ফলে সুনিশ্চিতভাবেই এই নীতি শত্রুপক্ষের প্রশংসা অর্জন করবে। বাস্তবে রুদ্ধদ্বার নীতি হচ্ছে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক, এবং দালালদের বিশ্বস্ত অনুচর। এই নীতির প্রবক্তাদের 'বিশুদ্ধ' এবং 'সোজা' রাস্তার কথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দ্বারা ধিকৃত এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রশংসিত হবেই। অবশ্যই আমরা কোন রুদ্ধদ্বার নীতি চাই না। আমরা যা চাই তা হচ্ছে বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট, যা

জাপ-সাম্রাজ্যবাদী এবং বিশ্বাসঘাতক ও তার সহযোগীদের মৃত্যু ডেকে আনবে।

গণ-প্রজাতন্ত্র[২৯]

এতদিন পর্যন্ত আমাদের সরকারের ভিত্তি ছিল শ্রমিক-কৃষক ও শহরের মধ্যবিত্ত, এবং এখন থেকে তাকে অবশ্যই পরিবর্তিত করে এই জাতীয় বিপ্লবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদেরও এই সরকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বর্তমানে এরকম একটি সরকারের মূল কাজ হবে চীনকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ করার বিরোধিতা করা। এই সরকারের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব থাকবে, যারা কেবলমাত্র জাতীয় বিপ্লব চায় অথচ কৃষি-বিপ্লব চায় না, এমনকি যারা জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরোধিতা করে, কিন্তু ইউরোপীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তাদের বিরোধিতা করতে রাজী নয়, তাদেরও এই সরকারে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং নীতির দিক থেকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে যে মূল সংগ্রাম, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই সরকারের কর্মসূচী তৈরী হওয়া প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ীই আমাদের আগের নীতির সংশোধন করতে হবে।

বর্তমানে বিপ্লবীদের দিকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইস্পাত-দৃঢ় কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের অস্তিত্ব। এটি একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যদি এ সবের অস্তিত্ব না থাকত, তবে সাংঘাতিক অসুবিধার সৃষ্টি হতো। কেন? কারণ চীনে বিশ্বাসঘাতক ও সাম্রাজ্যবাদের অসংখ্য সহযোগী রয়েছে, ত‍ারা বেশ শক্তিশালী ও তারা নিশ্চিতভাবেই যুক্তফ্রন্টকে বানচাল করে দেবার জন্য সর্বপ্রকার পন্থাই গ্রহণ করবে। তারা ভয় দেখিয়ে ও ঘুষ দিয়ে, এবং বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে দহরম-মহরম করে বিরোধের বীজ বপন করবে।

যারা তাদের চাইতে দুর্বল এবং তাদের দল ভেঙে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, সামরিকবাহিনীর সাহায্যে তারা তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে এবং একটি একটি করে তাদের ধ্বংস করে দেবে। যদি জাপ-বিরোধী সরকার ও সেনাবাহিনীর হাতে কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের মতো গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার না থাকত তবে এসব এড়িয়ে যাওয়া রীতিমতো কষ্টকর হতো। ১৯২৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তখন সুবিধাবাদী লাইনের প্রাধান্য থাকায়

ফলে আমাদের নিজস্ব বাহিনীর (কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলন এবং সশস্ত্র বাহিনী) ব্যাপক বিস্তৃতির কোন চেষ্টাই করা হয়নি এবং আমাদের সাময়িক মিত্র কুওমিনতাঙের ওপরই সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখা হয়েছিল। ফলে যখন সাম্রাজ্যবাদ তার পদলেহী জমিদার ও মুৎসুদ্দিশ্রেণীকে হুকুম করল তাদের অসংখ্য প্রতিবন্ধকের জাল ছড়িয়ে দিয়ে প্রথমে চিয়াং কাই-শেক ও পরে ওয়াং চিং-ওয়েইকে দলে টানতে, তখনই বিপ্লবী পরাজয় বরণ করল। সে সময়ে বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্টের নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার মতো কোন শক্ত ভিত্তি ছিল না, ছিল না কোন শক্তিশালী সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনী, এবং তাই দ্রুত ও ব্যাপক দলত্যাগ আরম্ভ হতেই কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে সংগ্রাম করতে বাধ্য হল, এবং সাম্রাজ্যবাদী ও চীনা প্রতিবিপ্লবীরা তাদের বিরোধীদের একে একে ধ্বংস করার যে কৌশল গ্রহণ করেছিল, তা ব্যর্থ করতেও অক্ষম হল। এ কথা ঠিক যে, হো লুং এবং ইয়ে তিং-এর অধীনে আমাদের সৈন্যবাহিনী ছিল, কিন্তু তখনও তারা রাজনৈতিকভাবে সুসংবদ্ধ ছিল না এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গুণও পার্টির ছিল না, তাই শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়েছিল। আমাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে, বিপ্লবী শক্তির একটি ইস্পাতদৃঢ় কেন্দ্র না থাকলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়। আজকের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এখন আমাদের একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি ও একটি শক্তিশালী লালফৌজ আছে, তাছাড়াও আছে লালফৌজের ঘাঁটি অঞ্চল। আজ কমিউনিস্ট পার্টি এবং লালফৌজ শুধু জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের উদ্যোক্তাই নয়, ভবিষ্যতে তারাই হবে জাপ-বিরোধী সরকার ও সেনাবাহিনীর শক্তিশালী প্রধান ভিত্তি, এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেকএর যুক্তফ্রণ্ট ভাঙার নীতিকে সার্থকভাবে ব্যর্থ করতে সক্ষম। যাই হোক, আমাদের অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতে হবে, কারণ চিয়াং কাই-শেক ও সাম্রাজ্যবাদীরা নিঃসন্দেহে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে ভয় দেখাবে ও ঘুষের প্রলোভন দেখাবে এবং বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করবে।

স্বভাবতঃই আমরা এ আশা করি না যে, জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের প্রত্যেকটি অংশই কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের মতো দৃঢ়-সংকল্পের লোক হবে। তাদের কার্যকলাপের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শত্রুদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কিছু কিছু বদ লোকও যুক্তফ্রণ্ট থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের লোকেরা চলে গেলে আমাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ

নেই। বদ লোকেরা যেমন শত্রুর প্রভাবে পড়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, তেমনি ভাল লোকেরাও আবার আমাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের সঙ্গেই আসবে। যতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজ টিঁকে থাকবে এবং শক্তিশালী হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত জাতীয় যুক্তফ্রন্টও টিঁকে থাকবে এবং শক্তিশালী হতে থাকবে। এই-ই হচ্ছে জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের নেতৃত্বকারী ভূমিকা। কমিউনিস্টরা আজ আর রাজনৈতিক দিক থেকে শিশু নয়, তারা যেমন নিজেদের পরিচর্যা নিজেরাই করতে পারে, ঠিক তেমনি তারা মিত্রদের সঙ্গে কিভাবে চলতে হবে, তাও পরিচালনা করতে পারে। চিয়াং কাই-শেক ও জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন বিপ্লবী শক্তির ব্যাপারে চাল চালতে পারে, কমিউনিস্ট পার্টিও ঠিক তেমনি প্রতিবিপ্লবী শক্তির ব্যাপারে চাল চালতে পারে। তারা যেমন আমাদের দল থেকে বদ লোকদের তাদের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, আমরাও তেমনি তাদের দল থেকে তাদের 'খারাপ লোকদের' (আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাল লোক) আমাদের দিকে টেনে আনতে পারি। আমরা যদি ব্যাপক সংখ্যায় আমাদের দিকে লোক টেনে আনতে পারি, তবে তার ফলে শত্রুর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং আমরা শক্তিশালী হব। সংক্ষেপে, দুটি মূল শক্তি আজ সংগ্রামে লিপ্ত, এবং এই দুই শক্তির মাঝখানে যেসব শক্তি আছে, অবস্থার গতিতে আজ তাদের একদিকে না একদিকে যোগ দিতেই হবে। চীনকে পরাধীন করবার জাপ-সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং চীনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার চিয়াং কাই-শেকের নীতির ফলে জনগণ অবশ্যই আমাদের দিকে আসবে। তারা হয় সোজাসুজি কমিউনিস্ট পার্টি এবং লালফৌজে যোগ দেবে, কিংবা আমাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টে যোগ দেবে। যদি আমরা রুদ্ধদ্বার কৌশল ত্যাগ করি, তবেই এ অবস্থা আসবে।

'শ্রমিক-কৃষকের প্রজাতন্ত্র'-কে কেন 'গণ-প্রজাতন্ত্রে' পরিবর্তিত করা হবে?

আমাদের সরকার কেবল শ্রমিক-কৃষকেরই প্রতিনিধিত্ব করে না, প্রতিনিধিত্ব করে সমগ্র জাতির। আমাদের শ্রমিক-কৃষক-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লোগানের মধ্যেই এই ধারণা নিহিত রয়েছে, কারণ শ্রমিক-কৃষকরাই হচ্ছে দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। আমাদের পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত দশটি বিষয় সম্বলিত কর্মসূচীতে[30] সমগ্র জাতির স্বার্থের কথাই বলা হয়েছে, কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের কথা বলা হয়নি।

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের শ্লোগানের পরিবর্তন প্রয়োজন, একে গণ-প্রজাতন্ত্রে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। কারণ জাপানী আক্রমণ চীনের শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এখন কেবল পেটি-বুর্জোয়ারাই নয়, এমনকি জাতীয় বুর্জোয়ারাও জাপ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দেবে।

গণ-প্রজাতন্ত্র অবশ্যই শত্রু শ্রেণীগুলির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে না। আমাদের সরকার বরং সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার জমিদার এই মুৎসুদ্দিশ্রেণীর সরাসরি বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে এবং তাদের জনগণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করবে না। একইভাবে, চিয়াং কাই-শেকের 'চীন প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সরকার' একমাত্র ধনীদেরই প্রতিনিধিত্ব করে, সাধারণ লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং এই সরকার সাধারণ লোককে জাতির একটা অংশ হিসেবেও গণ্য করে না। যেহেতু চীনের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ থেকে ৯০ জনই হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক, তাই গণ-প্রজাতন্ত্রের উচিত হবে সর্বাগ্রে এবং সবচাইতে বেশি করে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা। কিন্তু চীনকে স্বাধীন এবং মুক্ত করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নকে হটিয়ে দেওয়ার পর এবং চীনকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে মুক্ত করবার জন্য জমিদারদের নিপীড়ন উৎখাত করার পর গণ-প্রজাতন্ত্র কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষকেরই স্বার্থ দেখবে না, জনগণের অন্যান্য অংশেরও স্বার্থ দেখবে। শ্রমিক-কৃষক এবং অন্যান্য জনগণের মোট স্বার্থই হচ্ছে সমগ্র চীনা জাতির স্বার্থ। জমিদার এবং মুৎসুদ্দিশ্রেণীও চীন-ভূমিতে বসবাস করে, কিন্তু যেহেতু জাতীয় স্বার্থের দিকে তারা কোন নজর দেয় না; তাই তাদের স্বার্থের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের সংঘাত ঘটে। এই মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গেই শুধু আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করি, সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হই, এবং তাই আমরা সমগ্র জাতির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখি।

অবশ্য শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের বিরোধ আছে। যদি জাতীয় বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া না হয় এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুর ও বিশ্বাস-ঘাতকদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তিকে নিয়োজিত করতে দেওয়া না হয়, তবে আমরা সার্থকভাবে বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করতে পারব না। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ারা যদি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টে যোগ দেয়, তবে শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে একটা সমস্বার্থ গড়ে উঠবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া আর অন্য কোন

ব্যক্তি-মালিকানার সম্পত্তি গণ-প্রজাতন্ত্র বাজেয়াপ্ত করবে না, এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা বাজেয়াপ্ত করা তো দূরের কথা, এইসব সংস্থার বিকাশে এই সরকার উৎসাহ দেবে। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের বা চীনা বিশ্বাসঘাতকদের সমর্থন করে না, এরকম প্রত্যেকটি জাতীয় পুঁজিপতিকে আমরা রক্ষা করব। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই স্তরে শ্রম ও পুঁজির সংগ্রামের একটা সীমা আছে। গণ-প্রজাতন্ত্রের শ্রম-আইনগুলি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবে, কিন্তু তাই বলে জাতীয় বুর্জোয়াদের মুনাফা অর্জনে বা তাদের শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার বিকাশে বাধা দেবে না, কারণ এ ধরনের বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে খারাপ হলেও চীনা জনগণের কাছে ভাল। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশক্তির বিরোধী সমস্ত স্তরের স্বার্থকেই গণ-প্রজাতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব করবে। গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি হবে প্রথমতঃ শ্রমিক-কৃষক, কিন্তু অন্যান্য যেসব শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশক্তির বিরোধী, গণ-প্রজাতন্ত্র তাদের স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্ব করবে।

কিন্তু এসব শ্রেণীর প্রতিনিধিদের গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকারে যোগ দিতে দেওয়া কি বিপজ্জনক নয়? না। শ্রমিক এবং কৃষকরাই হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের মূল জনগণ। শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের অন্যান্য যেসব অংশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কর্মসূচী সমর্থন করে, গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকার তাদের মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার দেবে, সরকারের মধ্যে কাজ করবার অধিকার দেবে, ভোটের অধিকার দেবে এবং নির্বাচিত হবার অধিকার দেবে। তবে আমরা অবশ্যই মূল জনগণ, শ্রমিক এবং কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের কাজ করতে দেব না। আমাদের কর্মসূচীর মর্মবস্তু হবে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ রক্ষা। তাদের প্রতিনিধিরাই সরকারে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে, কমিউনিস্ট পার্টি এই সরকারের মধ্যে কাজ করবে ও নেতৃত্ব দেবে এবং তার ফলে এই নিশ্চয়তা অবশ্যই থাকছে যে, অন্যান্য শ্রেণী অংশগ্রহণ করলেও কোন বিপদ আসবে না। এটা খুবই সুস্পষ্ট যে, বর্তমান স্তরে চীনা বিপ্লব এখনও প্রকৃতিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। কেবলমাত্র প্রতিবিপ্লবী ট্রট্স্কিপন্থীরাই[৩১] এইসব আজেবাজে কথা বলে যে, চীনে ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং এখন যে-কোন বিপ্লব সেখানে হবে, তা হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কিন্তু তা শেষ অবধি যেতে পারেনি, ব্যর্থ

হয়েছে। ১৯২৭ সাল থেকে আমরা যে কৃষি-বিপ্লব পরিচালনা করেছি, তাও ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কারণ এ বিপ্লব ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে না, পরিচালিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। আমাদের বিপ্লব সম্বন্ধে এ কথা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সত্য হয়ে থাকবে।

মূলতঃ, শ্রমিক, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়ারাই এখনও বিপ্লবের চালিকাশক্তি, কিন্তু এখন তার মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াদেরও যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বিপ্লবে পরিবর্তন আসবে আরও পরে। ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবীরূপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে। কখন এই রূপান্তর হবে, তা নির্ভর করবে প্রয়োজনীয় অবস্থার উপস্থিতির ওপর এবং তার জন্য হয় তো দীর্ঘদিন লেগে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব না হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা সমগ্র চীনের বিপুল সংখ্যাধিক্যের স্বার্থের প্রতিকূলে না গিয়ে অনুকূলে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই রূপান্তর নিয়ে মাথা ঘামাব না। এ ব্যাপারে কোনরকম সংশয় রাখা এবং খুব তাড়াতাড়ি এই রূপান্তর আশা করা ভুল হবে। আমাদের কিছু কিছু কমরেডের এরকম ধারণা ছিল যে, যে-মুহূর্তে বড় বড় প্রদেশগুলিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়লাভ করতে শুরু করবে, সেই মুহূর্তেই এই রূপান্তর শুরু হবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে চীন কি ধরনের দেশ, এ কথা তারা বুঝতে পারেন না, এবং রাশিয়ার তুলনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করতে হলে চীনের পক্ষে যে আরও বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, আরও অনেক বেশি সময় ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, এটাও তাঁরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং এ কারণেই তাঁরা এরকম ভুল ধারণা পোষণ করেন।

আন্তর্জাতিক সমর্থন

পরিশেষে, চীন-বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্ব-বিপ্লবের সম্পর্ক কি, সে বিষয়ে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

সাম্রাজ্যবাদ নামক দৈত্যটির আবির্ভাবের পর থেকেই বিশ্বের কার্যকলাপ এত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, তাকে আর আলাদা করা সম্ভব নয়। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মনোবল,

আমাদের নিজস্ব চেষ্টায় হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের দৃঢ় সংকল্প, এবং বিশ্বের জাতিসমূহের পরিবারে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য আমাদের চীনাদের আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়াই চলতে পারি ; না, আজকের দিকে প্রতিটি দেশের বা জাতিরই বিপ্লবী সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রয়োজন। 'বসন্ত আর শরৎকালের যুগে কোন ন্যায় যুদ্ধ ছিল না'[৩২] বলে একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে। আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে এ কথা আরও সত্য, কারণ কেবলমাত্র নিপীড়িত জাতি আর নিপীড়িত শ্রেণীই ন্যায় যুদ্ধ করতে পারে, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জনগণ যে সংগ্রাম করে, তাই হচ্ছে ন্যায় সংগ্রাম। রাশিয়ার ফেব্রুয়ারী আর অক্টোবর বিপ্লব ছিল ন্যায় যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলির জনগণের বিপ্লব ছিল ন্যায় যুদ্ধ। চীনে আফিং বিরোধী যুদ্ধ,[৩৩] তেইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের যুদ্ধ,[৩৪] ই হো তুয়ান যুদ্ধ,[৩৫] ১৯১১ সালের বিপ্লবী যুদ্ধ,[৩৬] ১৯২৬-২৭ সালের উত্তরাভিযান, ১৯২৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ এবং জাপানের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্যকলাপ—এ সবগুলিই ন্যায় যুদ্ধ। বর্তমানে জাপানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান জোয়ারের সময় এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যাপী সংগ্রামের সময় সমগ্র চীনে ও সমগ্র বিশ্বে ন্যায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। সমস্ত ন্যায় যুদ্ধ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করবে, এবং সমস্ত অন্যায় যুদ্ধকে ন্যায় যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে হবে—এই হচ্ছে লেনিনীয় লাইন[৩৭]। জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের জনগণের, বিশেষ করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের সমর্থন প্রয়োজন, যা তাঁরা অবশ্যই আমাদের দেবেন। কারণ তাঁরা আর আমরা একই আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ। অতীতে চীনের বিপ্লবী শক্তিকে চিয়াং কাই-শেক বিশ্বের বিপ্লবী শক্তিসমূহ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং এই অর্থে আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং এই পরিবর্তন আমাদের অনুকূলেই হয়েছে। এখন থেকে অবস্থা আমাদের অনুকূলেই পরিবর্তিত হতে থাকবে। আমরা আর বিচ্ছিন্ন হব না। এটাই হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জয়ের এবং চীন বিপ্লবের বিজয়ের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত।

টীকা

১। চিং বংশের রাজত্বের শেষ ক'বছরে য়ুয়ান শি-কাই ছিল উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের প্রধান পাণ্ডা। ১৯১১ সালের বিপ্লবের ফলে চিং বংশ যখন উৎখাত হয়, তখন সে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ দখল করে এবং উত্তরের যুদ্ধবাজদের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই সরকার বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিদের প্রতিনিধিত্ব করত। সে এ কাজটি করেছিল প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর নির্ভর করে, এবং বিপ্লবের তৎকালীন নেতা বুর্জোয়াদের আপোষকামী চরিত্রের সুযোগ নিয়ে। ১৯১৫ সালে সে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করতে চেয়েছিল এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন পাবার জন্য তাদের একুশ দফা দাবি মেনে নিয়েছিল। এই একুশ দফা দাবির সাহায্যে জাপান চীনে একাধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিল। সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে তার সিংহাসন দখল করার বিরুদ্ধে য়ুনান প্রদেশে এক অভ্যুত্থান ঘটে, এবং সমগ্র দেশে সেই অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়ে ও সমর্থনলাভ করে। ১৯১৬ সালের জুন মাসে য়ুয়ান শি কাই পিকিং-এ মারা যায়।

২। ১৯১৫ সালের ১৮ই জানুয়ারী জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা য়ুয়ান শি-কাই সরকারের কাছে ২১ দফা দাবি পেশ করে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দাবি করে ৭ই মে তারা একটা চরমপত্র পাঠায়। এই দাবিগুলি পাঁচ অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম চারটি ছিল: শানতুঙে জার্মানীরা যে অধিকার কায়েম করেছিল, সেই অধিকার এবং ওই প্রদেশে আরও কিছু অধিকার জাপানকে দেওয়া; দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব মঙ্গোলিয়ায় জমি লিজ দেওয়ার বা মালিকানা প্রতিষ্ঠার অধিকার, সেখানে বাসস্থান প্রতিষ্ঠার বা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হবার অধিকার, এবং রেলপথ নির্মাণ ও খনির ওপর একচেটিয়া অধিকার জাপানীদের দেওয়া; হান-ইয়ে-পিং লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় চীন-জাপান যৌথ সংস্থা হিসেবে পুনঃসংগঠিত করা; চীনের সমুদ্র উপকূলবর্তী কোন বন্দর বা দ্বীপকে অন্য কোন তৃতীয় শক্তির কাছে হস্তান্তর না করার বা লিজ না দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। পঞ্চম অংশে ছিল এইসব দাবি যে, জাপানকে চীনের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামরিক ও পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে দিতে হবে এবং হুপে, কিয়াংসী ও কোয়াংতুং প্রদেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলি তৈরী করতে দিতে হবে। এই পঞ্চম অংশটি ছাড়া

বাকী চারটি অংশই য়ুয়ান শি-কাই মেনে নিয়েছিল, এবং এই পঞ্চম অংশটি সম্পর্কে 'আরও আলাপ-আলোচনার' আবেদন জানিয়েছিল। ধন্যবাদ যে, চীনা জনগণের সর্বসম্মত বিরোধিতার ফলে জাপান শেষ পর্যন্ত তার দাবিগুলি আদায় করতে পারেনি।

৩। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওয়াশিংটনে ন'টি শক্তির সম্মেলন আহ্বান করে। চীন, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, পর্তুগাল ও জাপান এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়। এটা ছিল সুদূর প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে সংঘাত। ১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে 'মুক্ত দ্বার' বা 'চীনদেশে সকল জাতির সমান সুযোগ' নীতির ভিত্তিতে একটি নয়শক্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ চীনের ওপর যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কার্যতঃ জাপানের একক নিয়ন্ত্রণের চক্রান্তকে বানচাল করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের পথকেই এতে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

৪। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্ব চীনের জাপানী 'কোয়াংতুং বাহিনী' সেনইয়াং দখল করে। 'কোন প্রতিরোধ নয়'—চিয়াং কাই-শেকের এই নির্দেশের ফলে সেনইয়াং এবং উত্তর-পূর্ব চীনের অন্যান্য স্থানের (উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনী) চীনাবাহিনী সানহাইকুয়ানের দক্ষিণে সরে যায়। ফলে জাপানী বাহিনী অতি দ্রুত লিয়াওনিং, কিরিন এবং হেইলুংকিয়াং-এর প্রদেশগুলি দখল করে। জাপানী আক্রমণের এই কার্যকলাপই '১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা' বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

৫। তৎকালীন 'চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশ' ছিল লিয়াওনিং, কিরিন, হেইলুংকিয়াং এবং জেহোল। এগুলি বর্তমানে হচ্ছে লিয়াওনিং, কিরিন, হেইলুংকিয়াং প্রদেশ, এবং চীনের প্রাচীরের উত্তরে হোপেই প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ ও অন্তর্মঙ্গোলীয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের পূর্বাংশ। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর জাপানী আক্রমণকারীরা লিয়াওনিং, কিরিন এবং হেইলুংকিয়াং দখল করে এবং পরে ১৯৩৩ সালে জেহোল দখল করে।

৬। জাপানীদের প্ররোচনায় পশ্চিম হোপেইর বাইশটি কাউন্টি নিয়ে কুওমিনতাঙ বিশ্বাসঘাতক য়িন জু কেং ১৯৩৫ সালের ২৫শে নভেম্বর একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র স্থাপন করে, যার নাম দেওয়া হয় 'পূর্ব-হোপেই কমিউনিস্ট-

বিরোধী স্বায়ত্তশাসিত শাসনব্যবস্থা'। পূর্ব হোপেই ঘটনা নামে এটি পরিচিতি লাভ করে।

৭। চিয়াং কাই-শেক সরকার এবং জাপানী সরকারের মধ্যে যে কূট-নৈতিক কথাবার্তা চলে, সেখানে তথাকথিত 'হিরোটার তিন নীতি' আলোচিত হয়েছিল। অর্থাৎ জাপানী পররাষ্ট্র সচিব হিরোটা চীনের সঙ্গে আলাপের যে তিন নীতি উপস্থাপিত করেছিল, তা ছিল: (১) চীন কর্তৃক সমস্ত জাপ-বিরোধী আন্দোলনের দমন, (২) চীন, জাপান এবং 'মাঞ্চুকুয়ো'-র মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা এবং (৩) চীন এবং জাপান কর্তৃক যৌথভাবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা। ১৯৩৬ সালের ২১শে জানুয়ারী হিরোটা ডায়েটে বলে যে, চীনা সরকার 'সম্রাট কর্তৃক প্রস্তাবিত তিন নীতি মেনে নিয়েছে'।

৮। ১৯৩৫ সালে চীনে দেশব্যাপী এক জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক আন্দোলনের নতুন জোয়ার দেখা দেয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পিকিঙের ছাত্ররা ৯ই ডিসেম্বর এক দেশপ্রেমিক বিক্ষোভ-মিছিল করে। তাঁদের শ্লোগান ছিল 'গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর এবং বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও' এবং 'জাপ-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'। জাপ-আক্রমণকারীদের যোগসাজসে কুওমিনতাঙ সরকার দীর্ঘদিন ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল, এই আন্দোলন সেই প্রতিবন্ধক ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং অতি দ্রুত দেশব্যাপী সমস্ত জনগণের সমর্থন লাভ করে। এইটিই '৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন' নামে খ্যাত। এর ফলেই সমস্ত দেশের মধ্যেকার বিভিন্ন শ্রেণীগুলির সম্পর্কের মধ্যে নতুন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট হয়ে ওঠে দেশপ্রেমিক জনগণের খোলাখুলি প্রচারের নীতি। চিয়াং কাই-শেক তার বিশ্বাসঘাতক নীতির ফলে ভীষণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

৯। এই রিপোর্টের সময় চিয়াং কাই-শেক জাপানের নিকট উত্তর-পূর্ব চীনকে বিক্রয় করার পর উত্তর চীনকেও বিক্রয় করছিল এবং সেই সঙ্গে লাল-ফৌজের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে তার মুখোস খুলে ধরতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হয়, এবং স্বভাবতঃই পার্টির প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে তাকে ধরা হয়নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে চীনা জমিদার ও মুৎসুদ্দিশ্রেণীগুলির মধ্যে যে ভাঙনের সম্ভাবনা আছে, এই রিপোর্টে কমরেড

মাও সে-তুঙ তা বলেছেন। উত্তর চীনে জাপানী আক্রমনের ফলে পরবর্তীকালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের ভীষণ সংঘাত শুরু হয়েছিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই ধারণা পোষণ করত যে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ চিয়াং কাই-শেক চক্র তার প্রভুদের নির্দেশে জাপানের প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে এবং তাই পার্টি জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য চিয়াং কাই-শেককে বাধ্য করবার নীতি গ্রহণ করেছিল। শানসী থেকে উত্তর শেনসীতে ফিরে এসে ১৯৩৬ সালের মে মাসে লালফৌজ সরাসরি নানকিং-এর কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আবেদন জানায় ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কাছে এক চিঠিতে জাপানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক যুক্তফ্রন্ট এবং উভয় পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার আহ্বান জানায়। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। জাপানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট-দের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর অফিসাররা যখন ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সিয়ানে চিয়াং কাই-শেককে বন্দী করেন কেবল তখনই চিয়াং গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব মেনে নেয়।

১০। সাই তিং-কাই ছিল কুওমিনতাঙের উনিশ নং রুট বাহিনীর ডেপুটি অধিনায়ক এবং এর একটি অংশের অধিনায়ক। এই অংশের অপর দু'জন নেতা ছিল চেন মিং-সু এবং চিয়াং কুয়াং-নাই। এই বাহিনী কিয়াংসী ও লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর সাংহাইতে এই বাহিনীকে বদলী করা হয়। সাংহাই নগরী তখন ছিল সমগ্র দেশের জাপ-বিরোধী জনগণের কেন্দ্র। জাপ-বিরোধী ক্রমবর্ধমান জোয়ার উনিশ নং রুট বাহিনীর ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করছিল। ১৯৩২-এর ২৮শে জানুয়ারীর রাত্রিতে যখন জাপানী যুদ্ধ জাহাজ সাংহাই আক্রমণ করে তখন সাংহাইয়ের সেনাবাহিনী ও জনগণ মিলিতভাবে তার প্রতিরোধ করে, কিন্তু চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়েং চি-ওয়েইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তারা পরাজয় বরণ করে। পরে, চিয়াং-এর হুকুমে উনিশ নং রুট বাহিনীকে আবার লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ফুকিয়েনে পাঠানো হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গ এ-ধরনের যুদ্ধের অসারতা ক্রমশঃই উপলব্ধি করতে

থাকে। ১৯৩০ সালের নভেম্বরে লি চি-সেন এবং অন্যান্যদের অধীনস্থ কুওমিনতাঙ বাহিনীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তারা ফুকিয়েনে 'চীন প্রজাতন্ত্রের গণবিপ্লবী সরকার' প্রতিষ্ঠা করে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করা ও চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা করার শর্তে লালফৌজের সঙ্গে এক চুক্তি করে। চিয়াং সেনাবাহিনীর আক্রমণে উনিশ নং রুট বাহিনী ও জনগণের সরকারের পতন ঘটে। তখন থেকে সাই তিং-কাই এবং অন্যান্যরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সহযোগিতা করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

১১। ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন উত্তরমুখী অভিযানকারী বিপ্লবী বাহিনী উহানে পৌঁছায়, তখন ফেং ইয়ু-সিয়াং স্থইয়ান প্রদেশে তার অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে উত্তরের যুদ্ধবাজদের চক্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করবার কথা ঘোষণা করে এবং বিপ্লবে যোগদান করে। ১৯২৭ সালের প্রথম দিকে তার সেনাবাহিনী উত্তরমুখী অভিযানকারী বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে হোনান প্রদেশ আক্রমণ করবার জন্য শেনসী থেকে রওনা হয়। যদিও ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়াং চিং-ওয়েই কর্তৃক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরে ফেং কমিউনিস্ট বিরোধী আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল, তা সত্ত্বেও তার এবং চিয়াং কাই-শেক চক্রের মধ্যে সর্বদাই একটা স্বার্থের সংঘাত ছিল। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হওয়ার পরে ফেং প্রতিরোধের পক্ষে ছিল। ১৯৩৩ সালের মে মাসে চ্যাংচিয়াকৌতে জাপ-বিরোধী মিত্রবাহিনী গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সে সহযেগিতা করেছিল। চিয়াং কাই-শেক বাহিনীর এবং জাপানী আক্রমনকারীদের চাপে আগস্ট মাসে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে ফেং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করে।

১২। কিয়াংসীর নিংতুতে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুওমিনতাঙের ছাব্বিশ নং রুট বাহিনীর মধ্যে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। এই বাহিনীকে চিয়াং কাই-শেক কিয়াংসী প্রদেশের লালফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়েছিল। জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে কমরেড চাও পো-সেং এবং তুং চেং-তাঙের নেতৃত্বে দশ হাজারেরও বেশি অফিসার এবং সেনানী বিদ্রোহ করে এবং লালফৌজে যোগ দেয়।

১৩। মা চা-শান ছিলেন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব বাহিনীর একজন অফিসার। তাঁর সেনাবাহিনী হেইলুংকিয়াঙে অবস্থিত ছিল। ১৮ই

সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর লিয়াওনিং হয়ে হেইলুংকিয়াঙের দিকে যে জাপ-বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল, মা চাঁ-শান ও তাঁর বাহিনী তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিলেন।

১৪। হু হান-মিন ছিলেন একজন নামজাদা কুওমিনতাঙ রাজনীতিবিদ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার যে নীতি ডঃ সান ইয়াৎ-সেন গ্রহণ করেছিলেন, এই লোকটি ছিলেন তার বিরোধী এবং ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক সংঘটিত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সহযোগী। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে হু হান-মিন চিয়াং-বিরোধী হয়ে যান এবং চিয়াং তাঁকে বন্দী করে। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তিনি নানকিং ত্যাগ করে ক্যান্টনে চলে যান এবং সেখানে কোয়াংতুং এবং কোয়াংসীর যুদ্ধবাজদের দীর্ঘদিন ধরে প্ররোচনা দেন চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা করার জন্য।

১৫। জাপানকে প্রতিরোধ করা এবং জাতিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছয় পয়েন্টের কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছিলেন যা 'জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চীনা জনগণের মূল কর্মসূচী' নামে পরিচিত, এবং সুং চিং-লিং (শ্রীযুক্তা সান ইয়াৎ-সেন) এবং অন্যান্যদের স্বাক্ষর-সহ এই কর্মসূচীটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছিল : (১) সমস্ত স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য সমাবিষ্ট কর ; (২) সমগ্র দেশব্যাপী জনগণকে সমাবিষ্ট কর ; (৩) সমগ্র জনগণকে সশস্ত্র কর ; (৪) যুদ্ধজনিত খরচ-খরচার জন্য জাপানী সাম্রাজ্যবাদের চীনস্থ এবং বিশ্বাসঘাতকদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর ; (৫) জাতীয় সশস্ত্র প্রতিরক্ষার জন্য শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, ছাত্র এবং ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত একটি নিখিল চীন কমিটি স্থাপন কর ; এবং (৬) জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধী সমস্ত শক্তির সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা কর ও সহৃদয় নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।

১৬। এই যুদ্ধবাজরা ছিল কোয়াংতুঙের চেন চি-তাং এবং কোয়াংসীর লিন সাং-জেন ও পাই চুং-সি।

১৭। চিয়াং কাই-শেকের দস্যুদল বিপ্লবী জনগণকে 'দস্যু' বলে অভিহিত করত এবং বিপ্লবী জনগনের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র আক্রমণ ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডকে বলত 'দস্যু' অবদমন'।

১৮। কমরেড ইয়েন পি-শী ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন

প্রবীণ সভ্য এবং এই পার্টির অন্যতম প্রথম সংগঠক। ১৯২৭ সালের পঞ্চম কংগ্রেস থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৩১-এ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ বর্ধিত অধিবেশনে তিনি পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার প্রাদেশিক পার্টি কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন এবং একই সঙ্গে লালফৌজের ষষ্ঠ সেনা গ্রুপের রাজনৈতিক কমিশার হিসেবেও কাজ করেন। ষষ্ঠ এবং দ্বিতীয় সেনা গ্রুপ এক হয়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনী গঠিত হলে তিনি তার রাজনৈতিক কমিশার নিযুক্ত হন। প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম বছরগুলিতে তিনি অষ্টম রুট বাহিনীর সাধারণ রাজনৈতিক বিভাগের পরিচালক ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতে শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বর্ধিত অধিবেশনে তিনি পুনর্বার পলিটব্যুরো ও সেক্রেটারিয়েটে নির্বাচিত হন। কমরেড ইয়েন পি-শী ১৯৫০ সালের ২৭শে অক্টোবর পিকিঙে মারা যান।

১৯। চীনা শ্রমিক-কৃষকের লালফৌজের ষষ্ঠ সেনা গ্রুপ প্রথমে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে ছিল। এখান থেকে তারা শত্রুদের অবরোধ ভেঙে ১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে অন্য স্থানে চলে যায়। অক্টোবর মাসে পূর্ব কুইচৌয়ে কমরেড হো লুঙের নেতৃত্বে দ্বিতীয় সেনা গ্রুপের সঙ্গে এরা যোগ দেয়, উভয়ে মিলে লালফৌজের দ্বিতীয় ফ্রন্ট সেনা-বাহিনী গঠন করে, এবং হুনান-হুপে-সেচুয়ান-কুইচৌ বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল সৃষ্টি করে।

২০। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে চীনা শ্রমিক এবং কৃষকের লাল-ফৌজের (অর্থাৎ লালফৌজের প্রথম বাহিনী যা কেন্দ্রীয় লালফৌজ নামেও পরিচিত ছিল) প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেনা গ্রুপ পশ্চিম ফুকিয়েনের চ্যাংতিং এবং নিংহুয়া থেকে ও দক্ষিণ কিয়াংসীর জুইচিন, ইয়ুতু এবং অন্যান্য জায়গা থেকে রণনীতিগতভাবে সরে যেতে আরম্ভ করে। ফুকিয়েন, কিয়াংসী, কোয়াংতুং, হুনান, কোয়াংসী, কুইচৌ, সেচুয়ান, য়ুনান, সিকাং, কানসু এবং শেনসী—এই এগারোটি প্রদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার সময় লালফৌজকে প্রায়শঃই বরফাবৃত পাহাড়-পর্বত এবং পথহীন গভীর অরণ্যানী পার হতে হয়েছে। এভাবে শত্রুর অবরোধ, পশ্চাদ্ধাবন, আক্রমণ সবকিছুকেই ব্যর্থ করে দিয়ে অকথ্য কষ্ট এবং বিঘ্ন উপেক্ষা করে লালফৌজ এই অভিযানে ২৫,০০০ লী

পথ অতিক্রম করে এবং অবশেষে বিজয়ী হয়ে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর শেনসীর বিপ্লবী ঘাঁটিতে উপনীত হয়।

২১। সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত অঞ্চলের লালফৌজ ছিল চীনা শ্রামক-কৃষকের লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনী। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত অঞ্চলের ঘাঁটি থেকে তা সেচুয়ান সীমান্ত ও সিকাং প্রদেশে সরে যায়। জুন মাসে পশ্চিম সেচুয়ানের মাওকাঙের প্রথম ফ্রন্ট বাহিনী এই বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় এবং একটি বাঁদিকে ও অপরটি দক্ষিণ দিকে এই দুই পথ ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে সাঙ্‌পুনের নিকটবর্তী মাওয়েরাইতে পৌঁছানোর পর চ্যাং কুও-তাও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ উপেক্ষা করে তার সেনাবাহিনীকে বাঁ দিকের পথে দক্ষিণ দিকে পরিচালিত করে এবং এভাবে লালফৌজের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনী শত্রুর অবরোধ-ভেঙে হুনান-হুপে-সেচুয়ান-কুইচৌ সীমান্ত অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৩৬ সালের জুন মাসে হুনান, কুইচৌ এবং য়ুনানের মধ্য দিয়ে সিকাং প্রদেশের কানজেতে উপস্থিত হয়, এবং এখানেই চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হয়। অক্টোবর মাসে সমগ্র দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনী এবং চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর একাংশ উত্তর শেনসীতে পৌঁছায় এবং প্রথম ফ্রন্ট সেনাবাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হয়।

২২। চ্যাং কুও-তাও চীন বিপ্লবের একজন দলত্যাগী ব্যক্তি। বিপ্লবের বিজয় হবে এই ভরসায় সে তার যুবা বয়সে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। পার্টির মধ্যে সে অসংখ্য ভুল করে, যার পরিসমাপ্তি ঘটে মারাত্মক অপরাধে। বদমায়েশী করে সে ১৯৩৫ সালে লালফৌজের উত্তরমুখী অভিযানের বিরোধিতা করে, লালফৌজকে সেচুয়ান-সিকাং সীমান্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ওকালতি করে নিজের ধ্বংসকামী ও পরাজয়বাদী মনোভাবের পরিচয় দেয়, পার্টি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে এবং তার নিজস্ব ভুয়া কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে এবং এভাবে পার্টি ও লালফৌজের ঐক্য ভেঙে দেয় ও তার নিজের চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর বিরাট ক্ষতিসাধন করে। কমরেড মাও সে-তুঙ এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ধৈর্যসহকারে শিক্ষাদানের ফলে চতুর্থ ফ্রন্টবাহিনী ও তার অসংখ্য কর্মী স্বল্পকালের মধ্যেই কেন্দ্রীয় কমিটির নির্ভুল নেতৃত্বাধীনে চলে আসে এবং পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে। চ্যাং

কুও-তাও সংশোধনের অতীত বলে প্রমাণিত হয়, এবং শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল থেকে ১৯৩৮ সালের বসন্তকালে পালিয়ে গিয়ে সে কুওমিনতাঙের গুপ্ত পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে।

২৩। কেন্দ্রীয় লালফৌজ বা প্রথম ফ্রন্ট বাহিনী বলতে বোঝায় সেই লালফৌজকে, যা প্রত্যক্ষভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বাধীনে কিয়াংসী-ফুকিয়েন অঞ্চল গড়ে ওঠে।

২৪। চীনা পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী পান কু ছিলেন এই জগতের স্রষ্টা এবং মানবজাতির প্রথম শাসক। তিন সার্বভৌম ও পাঁচ সম্রাট ছিলেন প্রাচীন চীনের পৌরাণিক শাসক।

২৫। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে কুওমিনতাঙ বাহিনী শেনসী-কানসু বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলের বিরুদ্ধে তাদের তৃতীয় 'অবরোধ ও দমন' অভিযান শুরু করে। উত্তর শেনসী লালফৌজের ২৬ নং সেনাবাহিনী পূর্ব রণাঙ্গণে দুটি শত্রু ব্রিগেডকে পরাজিত করে এবং শত্রুদের ইয়েলো নদীর পূর্ব প্রান্তে তাড়িয়ে দেয়। সেপ্টেম্বর মাসে লালফৌজের ২৫ নং সেনাদল, হুপে-হোনান-আনহুই ঘাঁটি অঞ্চলে যারা যুদ্ধ করছিল, দক্ষিণ শেনসী এবং পূর্ব কানসুর মধ্য দিয়ে উত্তর শেনসীতে গিয়ে পৌঁছায় এবং উত্তর শেনসীর লালফৌজের সঙ্গে একত্রিত হয়ে লালফৌজের ২৫ নং সেনাগ্রুপ তৈরী করে। কানচুয়ান-লাওসার্ন অভিযানে এই সেনাগ্রুপ শত্রুর ১১০ নং ডিভিশনের অধিকাংশ সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে এবং ডিভিশনাল অধিনায়ককে হত্যা করে। পরবর্তী আর একটি যুদ্ধে কানচুয়ান কাউন্টির উলিসচিয়াওয়ে শত্রুর ১০৭ নং ডিভিশনের চারটি ব্যাটেলিয়নকে তারা ধ্বংস করে। শত্রুরা আবার নতুনভাবে আক্রমণ করে এবং তুং ইং-পিন (উত্তর-পূর্ব বাহিনীর একজন কোর কম্যাণ্ডার) ৫টি ডিভিশনের অধিনায়ক হয়। এই বাহিনী দুদিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে, পূর্বদিকের ডিভিশন লো-চুয়ান এবং ফুসিয়েনের মধ্য দিয়ে উত্তরদিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং পশ্চিমদিকের বাকী চার ডিভিশন হুলু নদীর পথ ধরে কানসুর চিংইয়েং এবং হোসুই-এর মধ্য দিয়ে উত্তর শেনসীতে ফুসিয়েনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় লালফৌজ উত্তর শেনসীতে পৌঁছায়। পরবর্তী মাসগুলিতে কেন্দ্রীয় লালফৌজ এবং ১৫ নং সেনাগ্রুপ একযোগে শত্রুর ১০৯ নং ডিভিশনকে ফুসিয়েনের দক্ষিণ-পশ্চিমে চিলোচেন নামক জায়গায় একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং পশ্চাদ্ধাবনকালে শত্রুর ১০৬ নং ডিভিশনের একটি

রেজিমেণ্টকে হেইসুইজেতে নিশ্চিহ্ন করে। এভাবেই শেনসী-কানসু সীমান্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে শত্রুর তৃতীয় 'অবরোধ ও দমন' অভিযান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

২৬। ১৯৩৪-৩৫ সালে দক্ষিণ চীনের লালফৌজের প্রধান বাহিনী স্থান পরিবর্তন করার সময় গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকটি ইউনিট রেখে আসে। এই গেরিলা ইউনিটগুলিই আটটি প্রদেশে নিম্নলিখিত ১৪টি ঘাঁটি অঞ্চল রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল: দক্ষিণ চেকিয়াং, উত্তর ফুকিয়েন, পূর্ব ফুকিয়েন, দক্ষিণ ফুকিয়েন, পশ্চিম ফুকিয়েন, উত্তর-পূর্ব কিয়াংসী, ফুকিয়েন-কিয়াংসী সীমান্ত, হুনান-হুপে-কিয়াংসী সীমান্ত, হুপে-হুনান-আনহুই সীমান্ত, দক্ষিণ হুনানের তুং পাই পাহাড় এবং কোয়াংতুং সমুদ্র উপকূলে অদূরস্থিত হাইনান দ্বীপ।

২৭। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯৩১ সালে উত্তর-পূর্ব চীন দখল করার পরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য জনগণকে আহ্বান জানায়। পার্টি জাপ-বিরোধী গেরিলা ইউনিট সংগঠিত করে, উত্তর পূর্ব জনগণের বিপ্লবী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে সেই স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটগুলিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ১৯৩৪ সালে পার্টির নেতৃত্বে এই সমস্ত শক্তিগুলিকে একটিমাত্র উত্তর-পূর্ব জাপ-বিরোধী যুক্ত বাহিনী নামে পুনর্গঠিত করা হয়, এবং এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন বিখ্যাত কমিউনিস্ট ইয়াং চিং-ইউ। উত্তর-পূর্বে এই বাহিনী দীর্ঘকালব্যাপী জাপ-বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ টিঁকিয়ে রেখেছিল। ১৯৩৫ সালের জাপ-বিরোধী কৃষক অভ্যুত্থানকেই এখানে পূর্ব হুপের জাপ-বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ বলা হয়েছে।

২৮। ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সালের যুদ্ধে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যপুষ্ট রুশ শ্বেতবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেয়। এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯। প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় জনগণের মুক্তাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গণ-প্রজাতন্ত্রের যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক নীতি বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছিল, কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে তাই বিশ্লেষণ করেছেন। এই নীতিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য জাপ-আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে

শত্রু-লাইনের পেছনে পার্টি যুদ্ধ করতে পেরেছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন সমগ্র চীনে জনগণের মুক্তাঞ্চলের পরিধিও বিস্তৃত হয়ে চলছিল, এবং এভাবেই ঐক্যবদ্ধ চীনা গণ-প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়। এভাবেই কমরেড মাও সে-তুঙের গণ-প্রজাতন্ত্রের আদর্শ দেশব্যাপী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।

৩০। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে। এই কংগ্রেসে নিম্নলিখিত দশ পয়েন্টের এক কর্মসূচী গৃহীত হয়: (১) সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাত কর; (২) বিদেশী পুঁজিপতিদের কল-কারখানা ও ব্যাঙ্কসমূহ বাজেয়াপ্ত কর, (৩) চীনকে ঐক্যবদ্ধ কর এবং বিভিন্ন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার কর; (৪) কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজদের সরকার উৎখাত কর; (৫) শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত কর; (৬) দৈনিক আটঘণ্টা কাজ, মজুরী বৃদ্ধি, বেকার ভাতা এবং সামাজিক বীমার প্রবর্তন কর; (৭) সমস্ত জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা বিতরণ কর; (৮) সৈনিকদের জীবন-ধারণের মান উন্নয়ন কর, প্রাক্তন সৈনিকদের জমি ও কাজ দাও; (৯) সমস্ত রকম উঁচুহার বিশিষ্ট ট্যাক্স ও নানাপ্রকারের অতিরিক্ত কর বাতিল কর এবং একটি সুসংবদ্ধ প্রগতিশীল ট্যাক্স-ব্যবস্থা প্রবর্তন কর; এবং (১০) বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও।

৩১। রুশ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে গোড়ায় একটি লেনিন-বিরোধী চক্র হিসেবে শুরু করে পরবর্তীকালে ট্রট্স্কিপন্থী এই গ্রুপটি দস্যুর মতো একটি প্রতিবিপ্লবী গ্রুপে অধঃপতিত হয়। ১৯৩৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্টে কমরেড স্তালিন এই দলত্যাগী গ্রুপটি কোন্ পথে এগিয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন:

> একথা ঠিক যে, সাত-আট বছর আগে ট্রট্স্কিবাদ ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক ঝোঁক, একটি লেনিনবাদ-বিরোধী ঝোঁক, এবং তাই এটা ছিল মারাত্মক ভ্রান্ত পথ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ছিল একটা রাজনৈতিক ঝোঁক।...বর্তমানের ট্রট্স্কিবাদ কিন্তু আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক ঝোঁক হিসেবে নেই, বরং কোনরকম মতাদর্শ, কোন ভাবধারা ছাড়াই এটি একটি বিপথে নিয়ে যাওয়ার, সবকিছু তছনছ করে দেওয়ার

দলে পরিণত হয়েছে। এরা গুপ্তচর বিভাগের লোক হিসেবে কাজ করে, গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণ করে, এরা হত্যাকারী এবং শ্রমিকশ্রেণীর ঘৃণিত শত্রুর দল। বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগ দ্বারা এরা ক্রীত এবং তাদের স্বার্থে নিয়োজিত।

১৯২৭ সালে চীন বিপ্লবের ব্যর্থতার পর চীনেও ট্রট্স্কিপন্থীদের একটি ক্ষুদ্র দলের আবির্ভাব হয়। দলত্যাগী চেন তু-সিউ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে মিলেমিশে তারা ১৯২৯ সালে একটি প্রতিবিপ্লবী দল তৈরী করে, এবং এরকম প্রতিবিপ্লবী প্রচার চালাতে থাকে যে, কুওমিনতাঙরা ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে ফেলেছে। তারা জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের ও কুওমিনতাঙের ঘৃণিত দালালে পরিণত হয়। চীনা ট্রট্স্কিপন্থীরা নির্লজ্জভাবে কুওমিনতাঙ গুপ্তচর বিভাগে যোগ দেয়। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে 'জাপ-সম্রাট কর্তৃক চীন দখলে কোন বাধা সৃষ্টি কর না'—দলত্যাগী বদমায়েস ট্রট্স্কিপন্থীদের এই নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য তারা জাপানী গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করা শুরু করে, তাদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেয় এবং জাপানী আক্রমণের যাতে সুবিধা হয় তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে থাকে।

৩২। এই উদ্ধৃতিটি **মেনসিয়াস** থেকে নেওয়া হয়েছে। যে সময়টি বসন্ত ও শরতের যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৭২২-৪৮১) বলে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছিল, সে সময়ে চীনের সামন্ত রাজারা ক্ষমতার জন্য একে অন্যের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ করেছিল বলেই মেনসিয়াস এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

৩৩। বৃটেনের আফিং ব্যবসায়ে চীনা জনগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে বৃটেন তার ব্যবসা রক্ষা করার নামে ১৯৪০-৪২ সালে কোয়াংতুং এবং অন্যান্য সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি আক্রমণ করে। লিন সে-জুর নেতৃত্বে কোয়াংতুং সেনাবাহিনী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। ক্যান্টনের জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'বৃটিশ সৈন্য দমনকারী' নামে একটি গণবাহিনী গড়ে তোলে এবং তারাও আক্রমণকারীদের ওপর নিদারুণ আঘাত হানে।

৩৪। তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের যুদ্ধ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ। চিং বংশের জাতীয় নিপীড়ন ও সামন্ত শাসকদের বিরুদ্ধেই ছিল এই যুদ্ধ। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে হুং সিউ-চুয়ান, ইয়াং সিউ-চিং এবং এই বিপ্লবের অন্যান্য নেতৃবর্গ কোয়াংসীর কুইপিং

তালুকের চিনতিয়েন গ্রামে এক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। ১৮৫২ সালে এই কৃষক সেনাবাহিনী কোয়াংসী থেকে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে হুনান, হুপে, কিয়াংসী এবং আনহুইয়ের মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে ১৮৫৩ সালে ইয়াংসির নিম্নভাগের প্রধান শহর নানকিং দখল করে। এই সৈন্যবাহিনীর একাংশ আরও উত্তরে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তিয়েনসিনের কাছাকাছি যায়। কিন্তু অধিকৃত অঞ্চলে তাইপিং বাহিনী সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় এবং নানকিঙে তাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেও সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ অসংখ্য সামরিক ও রাজনৈতিক ভুল করে। তাই তারা প্রতিবিপ্লবী চিং সরকারের এবং বৃটিশ, আমেরিকা ও ফরাসী আক্রমণকারীদের সেনাবাহিনীর যৌথ আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারেনি এবং অবশেষে ১৮৬৪ সালে এরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।

৩৫। ১৯০০ সালের ই হো তুয়ান যুদ্ধ ছিল উত্তর চীনের কৃষক এবং হস্তশিল্পীদের এক ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। রহস্যময় গুপ্ত সমিতি তৈরী করে এই কৃষক এবং হস্তশিল্পীরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ চালায়। কিন্তু অকথ্য বর্বরতা সহকারে এই আন্দোলনকে দমন করা হয় এবং আটটি সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির যৌথবাহিনী পিকিং এবং তিয়েনসিন দখল করে।

৩৬। ১৯১১ সালের বিপ্লব সম্পর্কে এই খণ্ডের 'হুনানে কৃষক-আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট, ৩নং টীকা, পৃঃ ৭২ দ্রষ্টব্য।

৩৭। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিনের 'সর্বহারা বিপ্লবের যুদ্ধ কর্মসূচী', **সংকলিত রচনাবলী**, রুশ সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫০, খণ্ড ২৩। তাছাড়া 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা

প্রথম অধ্যায়

কীভাবে যুদ্ধের পর্যালোচনা করা যায়

১। যুদ্ধের নিয়ম বিকাশশীল

যুদ্ধের নিয়মগুলি হচ্ছে এমন একটা সমস্যা, যে কেউ যুদ্ধ পরিচালনা করুক, তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান করতেই হবে।

বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়মগুলি হচ্ছে এমন একটা সমস্যা, যে কেউ বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করুক তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান করতেই হবে।

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়মগুলি হচ্ছে এমন একটা সমস্যা, যে কেউ চীনা বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করুক, তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান করতেই হবে।

আমরা এখন যুদ্ধে লিপ্ত আছি। আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ। আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধ চলছে আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন

দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার সার-সংকলনের উদ্দেশ্যে কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন এবং তখন উত্তর শেনসীর লালফৌজ কলেজে বক্তৃতা দেবার সময় একে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধটির শুধু পাঁচটি অধ্যায় লেখা হয়েছিল। সীআন ঘটনার জন্য ভীষণ ব্যস্ত থাকায় রণনীতিগত আক্রমণ, রাজনৈতিক কাজকর্ম ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে লিখবার সময় তিনি আর পাননি। এই প্রবন্ধটি হল দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের কালে পার্টির ভেতরে সামরিক সমস্যা নিয়ে একটি বিরাট বিতর্কের ফল। এতে ব্যক্ত হয়েছে সামরিক বিষয়ে একটি লাইনের বিরুদ্ধে অন্য একটি লাইনের অভিমত। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চুনই অধিবেশনে এই দুই লাইনের বিতর্ক সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে কমরেড মাও সে-তুঙের অভিমতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং ভুল লাইনের অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উত্তর শেনসীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, ডিসেম্বর মাসেই কমরেড মাও সে-তুঙ। 'জাপান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি সম্পর্কে' বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতায় দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের কালে পার্টির রাজনৈতিক লাইনের সমস্যা সুব্যবস্থিতভাবে সমাধান করা হয়। পরের বছরে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সুব্যবস্থিত ব্যাখ্যা করে এই বইটি লিখেছিলেন।

দেশে। সুতরাং, আমাদের শুধু যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম পর্যালোচনা করলেই চলবে না, বরং বিপ্লবী যুদ্ধের বিশেষ নিয়মও পর্যালোচনা করতে হবে, এমনকি, চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিয়মও পর্যালোচনা করতে হবে।

এটা সুবিদিত যে, যে-কোন কাজই করি না কেন, যদি তার অবস্থা, প্রকৃতি ও অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে তার সম্পর্কাদি না বুঝি, তাহলে সে কাজের নিয়ম বুঝতে পারব না, কেমন করে তা সম্পন্ন করতে হয়, তা বুঝতে পারব না, তাকে ভাল করে সম্পন্ন করতেও পারব না।

শ্রেণী, জাতি, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন সে দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসার জন্য সংগ্রামের উচ্চতম রূপই হচ্ছে **যুদ্ধ**—যা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীর উদ্ভব থেকেই আরম্ভ হয়েছে। যদি তার অবস্থা, প্রকৃতি ও অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে তার সম্পর্কাদি না বুঝি, তাহলে যুদ্ধের নিয়ম বুঝতে পারব না, কেমন করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়, তা বুঝতে পারব না এবং যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব না।

বিপ্লবী যুদ্ধ অর্থাৎ বিপ্লবী শ্রেণীযুদ্ধ ও বিপ্লবী জাতীয় যুদ্ধ, সাধারণ যুদ্ধের অবস্থা এবং প্রকৃতি ছাড়াও এর নিজস্ব বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি রয়েছে। তাই, যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ছাড়াও এর কতকগুলো বিশেষ নিয়ম আছে। যদি এই বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি না বুঝি এবং তার বিশেষ নিয়মগুলো না বুঝি, তাহলে বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারব না এবং তাতে জয়লাভও করতে পারব না।

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ, তা সে গৃহযুদ্ধই হোক কিংবা জাতীয় যুদ্ধই হোক, তা চীনের বিশেষ পরিবেশে চালানো হয় এবং সাধারণ যুদ্ধ ও সাধারণ বিপ্লবী যুদ্ধের তুলনায় তার আবার নিজস্ব বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি রয়েছে। তাই, যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ও বিপ্লবী যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ছাড়াও, তার নিজস্ব কতকগুলো বিশেষ নিয়ম আছে। এগুলো যদি না বুঝি, তাহলে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব না।

তাই, আমাদের অবশ্যই সাধারণ যুদ্ধের নিয়মগুলোকে পর্যালোচনা করতে হবে, বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়মগুলোকেও পর্যালোচনা করতে হবে, এবং পরিশেষে আমাদের চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়মগুলোকেও পর্যালোচনা করতে হবে।

কিছু লোকের ভ্রান্ত মত রয়েছে, যা আমরা বহু পূর্বেই খণ্ডন করেছি। তাদের মতে, কেবলমাত্র যুদ্ধের সাধারণ নিয়মগুলো পর্যালোচনা করাটাই

যথেষ্ট, অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, শুধু প্রতিক্রিয়াশীল চীনা সরকার বা প্রতিক্রিয়াশীল চীনা সামরিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সামরিক পত্র-পত্রিকা অধ্যয়নই যথেষ্ট। তারা জানে না যে, এইসব পত্র-পত্রিকার শুধুমাত্র যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম মেলে, এবং তাও পুরোপুরি বিদেশ থেকে নকল করা। আমরা যদি তার আকৃতি ও বিষয়বস্তু কিঞ্চিৎ মাত্রও পরিবর্তন না করে হুবহু সেগুলোকে নকল করে প্রয়োগ করি, তাহলে আমরা 'জুতোর উপযোগী করার জন্য পা'টাকেই কেটে ফেলব এবং পরাজিত হব। তাদের যুক্তি হচ্ছে: অতীতে রক্তের বিনিময়ে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে, কেন তাকে কাজে লাগানো হবে না? তারা জানে না যে, এইভাবে অর্জিত পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে আমাদের অবশ্যই মর্যাদা দেওয়া উচিত, কিন্তু নিজেদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাকেও আমাদের মর্যাদা দেওয়া উচিত।

আরও এক ধরনের লোকের মতও ভ্রান্ত, তা আমরা বহু পূর্বেই খণ্ডন করেছি। তাদের মতে, কেবলমাত্র রাশিয়ার বিপ্লবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করলেই যথেষ্ট। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল শুধু সেগুলোকে এবং সোভিয়েত সামরিক সংস্থাগুলো কর্তৃক প্রকাশিত সামরিক পত্র-পত্রিকা অনুসরণই যথেষ্ট। তারা জানে না যে, এইসব নিয়ম ও পত্র-পত্রিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ ও লালফৌজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিফলিত করে। আমরা যদি কোনরকম রদবদল না করে হুবহু নকল করে প্রয়োগ করি, তাহলে একইভাবে আমরা 'জুতোর উপযোগী করার জন্য পা'টাকেই কেটে ফেলব' এবং পরাজিত হব। এদের যুক্তি হচ্ছে: সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ বিপ্লবী যুদ্ধ, আমাদের যুদ্ধটাও যেহেতু বিপ্লবী যুদ্ধ, এবং যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়ী হয়েছে, সেহেতু তার নজির অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প কেমন করে থাকতে পারে? তারা জানে না যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে আমাদের নিশ্চয়ই বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে, কারণ এই যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিককালের বিপ্লবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, আর সে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে। কিন্তু চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকেও অবশ্যই আমাদের অনুরূপভাবে মর্যাদা দিতে হবে, কারণ চীনা বিপ্লব ও চীনা লালফৌজের অবস্থায় আরও অনেক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

তৃতীয় আর এক ধরনের লোকের মতও ভ্রান্ত, সেটাও আমরা বহু পূর্বেই

খণ্ডন করেছি। তারা বলে যে, শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা হচ্ছে ১৯২৬-২৭ সালের উত্তর অভিযানের[১] অভিজ্ঞতা, আর তা আমাদের শেখা উচিত অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, সামনে এগিয়ে গিয়ে বড় বড় শহর দখল করে নেবার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই উত্তর অভিযানের অনুকরণ করা উচিত। তারা জানে না যে, উত্তর অভিযানের অভিজ্ঞতাকে শিক্ষা করা আমাদের উচিত হলেও যান্ত্রিকভাবে তাকে নকল করে প্রয়োগ করা উচিত নয়, কারণ আমাদের বর্তমান যুদ্ধের অবস্থার ইতিমধ্যেই পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান অবস্থায় যা কাজে লাগে শুধুমাত্র সেটাই উত্তর অভিযান থেকে আমাদের নেওয়া উচিত, আর বর্তমান অবস্থা অনুসারে আমাদের নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করা উচিত।

কাজেই, বিভিন্ন যুদ্ধের পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নিয়ম ঠিক হয় ঐসব যুদ্ধের অবস্থার বিভিন্নতার দ্বারা—তাদের কাল, স্থান ও প্রকৃতির পার্থক্যের দ্বারা। কাল সম্পর্কে বলতে গেলে, যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরিচালনার নিয়ম উভয়ই বিকাশলাভ করে, প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক পর্যায়েরই আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে, আর তাই, প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে যুদ্ধের নিয়মগুলোরও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেগুলোকে যান্ত্রিকভাবে অন্য পর্যায়ে প্রয়োগ করতে পারা যায় না। যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে, বিপ্লবী যুদ্ধ ও প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ উভয়েরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। তাই যুদ্ধের নিয়মগুলোরও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং একের উপরে যা প্রযোজ্য, অপরের উপর তা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করতে পারা যায় না। স্থান সম্পর্কে দেখতে গেলে, প্রত্যেকটি দেশ বা জাতির, বিশেষ করে, বড দেশ বা জাতির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে, তাই প্রত্যেকটি দেশ বা জাতির যুদ্ধের নিয়মগুলোর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং এখানেও একের উপরে যা প্রযোজ্য, তা অপরের উপরে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ের, বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ-পরিচালনার নিয়মগুলোকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের দিকে অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, এবং যুদ্ধ-সমস্যার প্রতি যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করতে হবে।

এটাই সব নয়। শুরুতে ছোট একটা সৈন্যবাহিনীর পরিচালনায় সমর্থ কোন কম্যাণ্ডার যদি পরে বড় সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়ে ওঠেন, তাহলে এটা তাঁর অগ্রগতি ও উন্নতি। একটিমাত্র স্থানে লড়াই চালানো ও

বহু স্থানে লড়াই চালানোর মধ্যেও পার্থক্য আছে। একজন কম্যাণ্ডার প্রথমে কোন একটি পরিচিত স্থানে লড়াই চালনা করতে সক্ষম, পরে অনেকগুলো স্থানে লড়াই চালনা করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন, এটাও তাঁর অগ্রগতি ও উন্নতি। শত্রুদের ও আমাদের উভয় পক্ষের টেকনিক্, রণকৌশল ও রণনীতির উন্নতির কারণে একই যুদ্ধের মধ্যেও প্রত্যেক পর্যায়ের অবস্থা ভিন্নতর হয়। যুদ্ধের নিম্নপর্যায়ে পরিচালনা করতে সক্ষম কম্যাণ্ডার যদি যুদ্ধের উচ্চপর্যায়ে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন, তাহলে এটা তাঁর পক্ষে আরও অগ্রগতি ও উন্নতির নিদর্শন। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বাহিনীতে, নির্দিষ্ট স্থানে ও যুদ্ধ-বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে থেকে যাওয়া মানে তাঁর অগ্রগতি ও উন্নতি হয়নি। এমন কিছু লোক আছে, যারা শুধুমাত্র একটি দক্ষতা বা সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়েই তুষ্ট থাকে। তারা আর অগ্রসর হয় না। কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে তারা যদিও বিপ্লবে কোন একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের এমন যুদ্ধ-পরিচালকের দরকার যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ইতিহাসের এবং যুদ্ধের বিকাশ অনুযায়ী যুদ্ধ-পরিচালনার সমস্ত নিয়মও বিকাশলাভ করে। কিছুই পরিবর্তনহীন নয়।

২। যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের বিলোপসাধন

মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক হত্যায় এই দানব যুদ্ধকে মানবসমাজের অগ্রগতি শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করবে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তা করবে। কিন্তু তাকে ধ্বংস করার কেবল একটিমাত্র পদ্ধতি আছে এবং তা হচ্ছে যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধের বিরোধিতা করা, বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা, জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা জাতীয় প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং শ্রেণীর বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা শ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা। ইতিহাসে শুধুমাত্র দু'ধরনের যুদ্ধ রয়েছে—ন্যায় যুদ্ধ আর অন্যায় যুদ্ধ। আমরা ন্যায় যুদ্ধের সমর্থন করি আর অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করি। সমস্ত প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ, আর সমস্ত বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে ন্যায় যুদ্ধ। আমাদের হাতেই মানবজাতির যুদ্ধ-যুগের অবসান ঘটবে, এবং আমরা যে যুদ্ধ করি সেটা নিঃসন্দেহে সর্বশেষ যুদ্ধেরই অংশ। কিন্তু আমরা সে যুদ্ধের সম্মুখীন হই, নিঃসন্দেহে সেটা বৃহত্তম ও নির্মমতম যুদ্ধের অংশও বটে।

বৃহত্তম ও নির্মমতম অন্যায় প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ এখন আমাদের মাথার উপরে ঝুলছে। আমরা যদি ন্যায় যুদ্ধের পতাকাটি ঊর্ধ্বে তুলে না ধরি, তাহলে মানবজাতির অধিকাংশই গুরুতরভাবে বিপদগ্রস্ত হবে। মানবজাতির ন্যায় যুদ্ধের পতাকা হচ্ছে তার মুক্তির পতাকা। চীনের ন্যায় যুদ্ধের পতাকা হচ্ছে চীনের মুক্তির পতাকা। মানবজাতির ও চীনা জনগণের অধিকাংশের চালিত যুদ্ধ নিঃসন্দেহে ন্যায় যুদ্ধ—মানবজাতির ও চীনের মুক্তির এক অত্যন্ত মহিমান্বিত ও গৌরবোজ্জ্বল কাজ এবং সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের নব যুগে পৌঁছানোর এক সংযোগ-সেতু। মানবসমাজ যখন এমন একটা স্তরে এগিয়ে যাবে যেখানে শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের লোপ পাবে, তখন আর কোন যুদ্ধ থাকবে না, প্রতিবিপ্লবী বা বিপ্লবী, অন্যায় বা ন্যায়, কোন যুদ্ধেই থাকবে না। মানবজাতির পক্ষে সেটা হবে চিরস্থায়ী শান্তির যুগ। বিপ্লবী যুদ্ধর নিয়ম সম্পর্কে আমাদের গবেষণার প্রেরণা এসেছে সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ইচ্ছা থেকে। এখানেই আমাদের কমিউনিস্টদের সঙ্গে সমস্ত শোষকশ্রেণীর পার্থক্য।

৩। রণনীতি হচ্ছে যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির নিয়মের পর্যালোচনা

যুদ্ধ থাকলেই তার সামগ্রিক পরিস্থিতি থাকবে। সারা দুনিয়াটাই যুদ্ধের একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি হতে পারে, একটা দেশ যুদ্ধের একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি হতে পারে, একটা স্বতন্ত্র গেরিলা অঞ্চল বা একটা বৃহৎ স্বতন্ত্র যুদ্ধরত এলাকাওযুদ্ধের একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি হতে পারে। যে-কোন যুদ্ধ-পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক ও পর্যায়ের ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হলে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি।

রণনীতি-বিজ্ঞানের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার সেইসব নিয়মগুলো পর্যালোচনা করা, যেগুলি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যুদ্ধাভিযান বিজ্ঞানের ও রণকৌশল বিজ্ঞানের[২] কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার সেইসব নিয়মগুলোকে পর্যালোচনা করা যেগুলি আংশিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কেন যুদ্ধাভিযানের এবং রণকৌশলের কম্যাণ্ডারের পক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণে রণনীতিগত নিয়মগুলোকে জানা দরকার? কারণ সমগ্রের উপলব্ধিই অংশের পরিচালনাকে সহজতর করে, কারণ অংশটা সমগ্রের অধীন। শুধুমাত্র রণকৌশলগত বিজয়ের দ্বারাই রণনীতিগত বিজয় নির্ধারিত হয়—এ ধরনের

মত ভুল, কারণ যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন যে সামগ্রিক পরিস্থিতির এবং প্রত্যেক পর্যায়ের ভালভাবে বিচার-বিবেচনা, এধরনের অভিমত তা বুঝতে পারে না। সামগ্রিক পরিস্থিতি ও প্রত্যেক পর্যায়ের বিচার-বিবেচনায় গুরুতর ত্রুটি বা ভুল থাকলে সেই যুদ্ধে নিশ্চয়ই হার হবে। 'একটা অসতর্ক চালে গোটা খেলাটাই নষ্ট হয়ে যায়।' এখানে যে চাল সামগ্রিক প্রকৃতি-সম্পন্ন অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতির পক্ষে প্রভাবশালী, তারই কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যে চাল আংশিক প্রকৃতি-সম্পন্ন অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতির পক্ষে প্রভাবশালী নয় তার কথা বলা হয়নি। দাবা খেলায় যেমনি, যুদ্ধেও এমনি।

কিন্তু অংশ থেকে সমগ্র বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন নয়, কারণ সমগ্র তার সমস্ত অংশের দ্বারাই গঠিত হয়। কোন কোন সময়ে কোন কোন আংশিক পরিস্থিতি নষ্ট ব্যর্থ হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কারণ এই আংশিক পরিস্থিতিগুলো সামগ্রিক পরিস্থিতির নয়। যুদ্ধের মধ্যে রণকৌশলগত কার্যকলাপে বা যুদ্ধভিযানে কিছু ব্যর্থতা বা বিফলতা প্রায়শঃই যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কোন অবনতি ঘটায় না, কারণ সেইসব ব্যর্থতা নির্ধারক নয়। কিন্তু যেসব যুদ্ধাভিযানের দ্বারা যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি গঠিত হয়, সেসব যুদ্ধাভিযানের অধিকাংশ যদি ব্যর্থ হয় অথবা নির্ধারক দু-একটি যুদ্ধভিযান যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তক্ষুণি যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এখানে 'সেসব যুদ্ধাভিযানের অধিকাংশ' ও 'দু-একটি যুদ্ধাভিযান' হচ্ছে নির্ধারক। যুদ্ধের ইতিহাসে এমন উদাহরণ রয়েছে, যেখানে একটানা বহু বিজয় অর্জনের পরে একটিমাত্র লড়াইয়ের পরাজয়ই পূর্ববর্তী সেই সমস্ত জয়লাভকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আবার এমন নজিরও রয়েছে যেখানে বহু পরাজয়ের পরে একটিমাত্র লড়াইয়ে বিজয়ের ফলেই নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে 'একটানা বহু বিজয়' এবং 'বহু পরাজয়' সবই ছিল আংশিক প্রকৃতির, সামগ্রিক পরিস্থিতির পক্ষে নির্ধারক ছিল না। পক্ষান্তরে, 'একটিমাত্র লড়াইয়ের পরাজয়' ও 'একটিমাত্র লড়াইয়ের বিজয়' সবই হচ্ছে নির্ধারক। এই সবগুলোই সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বিচার-বিবেচনা করার গুরুত্ব প্রমাণ করে। যিনি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে পরিচালনা করেন তাঁর পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনার উপরে নিজের দৃষ্টি রাখা। প্রধানতঃ,

অবস্থা অনুযায়ী সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলো ও সৈন্যসংস্থানগুলোর গঠনের প্রশ্ন, দুটি যুদ্ধাভিযানের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন, যুদ্ধ চালনার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন, আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের ও শত্রুদের সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন বিচার-বিবেচনা করা—এই প্রশ্নগুলো সবচেয়ে কঠিন। এগুলোর দিকে নজর না দিয়ে অপ্রধান সমস্যা নিয়ে মেতে উঠলে বিপর্যয় এড়ানো কঠিন।

সামগ্রিক পরিস্থিতি ও আংশিক পরিস্থিতির মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, তা শুধু রণনীতি ও যুদ্ধাভিযানের সম্পর্ক সম্বন্ধেই নয়, পরন্তু যুদ্ধাভিযান ও রণকৌশলের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়েও প্রযোজ্য। একটা ডিভিশনের সামরিক কার্যকলাপাদি এবং তার রেজিমেণ্ট ও ব্যাটেলিয়নের সামরিক কার্যকলাপাদির মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে, একটা কোম্পানীর কার্যকলাপ এবং তার প্ল্যাটুন ও সেকশনের কার্যকলাপের মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে এর উদাহরণ দেখা যায়। যে-কোন স্তরের পরিচালককে তাঁর দ্বারা পরিচালিত গোটা পরিস্থিতির পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে নির্ধারক সমস্যার বা কার্যকলাপের উপরে তাঁর নিজের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে হবে, অন্য কোন সমস্যা বা কার্যকলাপের উপর নয়।

কোন্‌টা গুরুত্বপূর্ণ বা নির্ধারক, তার নির্ধারণ সাধারণ বা বিমূর্ত অবস্থানুসারে করা চলবে না, বাস্তব অবস্থানুসারে তার নির্ধারণ করতে হবে। যুদ্ধ করার সময়ে সেই মুহূর্তে শত্রুর প্রকৃত অবস্থা, ভোগোলিক পরিবেশ এবং নিজেদের সৈন্যবাহিনীর শক্তির অবস্থানুসারে আক্রমণের গতিমুখ ও লক্ষ্যবিন্দু বাছাই করতে হবে। যেখানে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ আছে, সেখানে নজর দিতে হবে, যাতে সৈন্যরা যেন অতিভোজন না করে। যেখানে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ অল্প, সেখানে নজর দিতে হবে, যাতে সৈন্যদের ক্ষুধার্ত হয়ে দিন কাটাতে না হয়। শ্বেত এলাকায় একটিমাত্র খবর ফাঁস হবার কারণে পরবর্তী লড়াইয়ে পরাজয় ঘটতে পারে। কিন্তু লাল এলাকায় খবর ফাঁস হওয়া প্রায়শঃই সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার নয়। উচ্চস্তরের কম্যাণ্ডারের পক্ষে কোন কোন যুদ্ধাভিযানে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন, কিন্তু অন্যগুলিতে তার দরকার নেই। একটা সামরিক স্কুলের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে স্কুলের পরিচালক ও শিক্ষক বাছাই করা এবং একটা শিক্ষা নীতি নির্ধারণ করা। একটি জনসভার আয়োজন করতে হলে প্রধানতঃ নজর দিতে

হবে জনসভায় যোগ দেবার জন্ত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং যথাযোগ্য শ্লোগান তোলার দিকে। এমনি ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায়, মূলনীতি হচ্ছে সামগ্রিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রগুলোর প্রতি আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।

শুধুমাত্র গভীরভাবে চিন্তা করেই যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিচালনার নিয়মগুলো অধ্যয়ন করা যায়। কারণ এই ধরনের জিনিস যা সামগ্রিক পরিস্থিতির চরিত্রবিশিষ্ট, তা চোখে পড়ে না, শুধুমাত্র গভীরভাবে চিন্তা করার ভেতর দিয়েই তা আমরা বুঝতে পারি, গভীরভাবে চিন্তা না করলে তা বুঝতে পারি না। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি অংশের দ্বারা গঠিত হয় বলে অংশের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধাভিযান ও রণকৌশলের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তেমন ব্যক্তিরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে তাঁরা আরও উচ্চ পর্যায়ের জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন। রণনীতির সমস্তায় নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো অন্তর্ভুক্ত :

শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের মধ্যেকার বা যুদ্ধ করার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

সামগ্রিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত (নির্ধারক) কোন কোন অংশের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

গোটা পরিস্থিতিতে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলির প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

ফ্রণ্ট ও পশ্চাদ্ভাগের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

ক্ষয়ক্ষতি ও পূরণের মধ্যেকার, লড়াই করা ও বিশ্রাম করার মধ্যেকার, কেন্দ্রীভূত করা ও ছড়িয়ে দেবার মধ্যেকার, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার মধ্যেকার, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের মধ্যেকার, আড়ালে থাকা ও উন্মুক্ত অবস্থায় থাকার মধ্যেকার, মুখ্য আক্রমণ ও সহায়ক আক্রমণের মধ্যেকার, হানা দেওয়া ও আটকে রাখার মধ্যেকার, কেন্দ্রীভূত পরিচালনা ও বিক্ষিপ্ত পরিচালনার মধ্যেকার, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের মধ্যেকার, অবস্থানগত যুদ্ধ ও চলমান যুদ্ধের মধ্যেকার, আমাদের নিজেদের বাহিনী ও মিত্রবাহিনীর মধ্যেকার, সৈন্যবাহিনীর ভেতরে এক বাহিনী ও অন্ত বাহিনীর মধ্যেকার, উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের মধ্যেকার, কর্মী ও সৈনিকের

মধ্যেকার, প্রবীণ সৈন্য ও নবীন সৈন্যের মধ্যেকার, উচ্চতর ও নিম্নস্তর কর্মীর মধ্যেকার, প্রবীণ কর্মী ও নবীন কর্মীর মধ্যেকার, লাল এলাকা ও শ্বেত এলাকার মধ্যেকার, পুরানো লাল এলাকা ও নতুন লাল এলাকার মধ্যেকার, কেন্দ্র-অঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যেকার, গরম দিন ও ঠাণ্ডা দিনের মধ্যেকার, জয় ও পরাজয়ের মধ্যেকার, বৃহদাকার বাহিনী ও ক্ষুদ্রাকার বাহিনীর মধ্যেকার, নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর মধ্যেকার শত্রুকে ধ্বংস করা ও জনসাধারণকে স্বপক্ষে টেনে আনার মধ্যেকার, লালফৌজকে সম্প্রসারিত করা ও লালফৌজকে সুসংবদ্ধ করার মধ্যেকার, সামরিক কাজ ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যেকার, অতীত কর্তব্য ও বর্তমান কর্তব্যের মধ্যেকার, বর্তমান কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ কর্তব্যের মধ্যেকার, এক রকমের অবস্থা থেকে উদ্ভূত কর্তব্য ও অন্য রকমের অবস্থা থেকে উদ্ভূত কর্তব্যের মধ্যেকার স্থায়ী যুদ্ধফ্রণ্ট ও অস্থায়ী যুদ্ধফ্রণ্টের মধ্যেকার, গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় যুদ্ধের মধ্যেকার, একটি ঐতিহাসিক পর্যায় ও অন্য একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যেকার, প্রভৃতি পার্থক্য ও যোগসূত্রের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

রণনীতির এইসব সমস্যার কোনটাকেই চোখে দেখা যায় না, তবু আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে এ সবকিছুকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, ধরতে পারি, নিপুণভাবে আয়ত্ত করতে পারি। অর্থাৎ যুদ্ধ বা অভিযান চালাবার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে নীতির উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে সেগুলির সমাধান করতে পারি। রণনীতির সমস্যাগুলোর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জন করা।

৪। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ

আমাদের লালফৌজ গঠনের উদ্দেশ্য কি? তার দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করা। যুদ্ধের নিয়মগুলো আমরা শিখি কেন? যুদ্ধে সেগুলোকে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে

শেখাটা সহজ ব্যাপার নয়, শিক্ষাকে প্রয়োগ করাটা আরও কঠিন। ক্লাসরুমে বা পুস্তকে রণ-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার সময়ে অনেক লোককেই বেশ সমঝদার বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত লড়াইয়ে নেমে কেউ জেতে, কেউ-বা হেরে যায়। যুদ্ধের ইতিহাস এবং যুদ্ধে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা—উভয়ই এই বিষয়টাকে প্রমাণ করেছে।

তাহলে সমস্যার মূলটি কোথায়?

বাস্তব জীবনে আমরা 'সদাবিজয়ী সেনাপতি' দাবি করতে পারি না, ইতিহাসে এমন সেনাপতি খুব কম দেখা যায়। আমরা এমন সেনাপতি চাই, যাঁরা সাহসী ও বিচক্ষণ, যুদ্ধে সাধারণতঃ যারা জয়লাভ করে—যাঁদের বিচক্ষণতা ও সাহস দুইই আছে। সাহসী ও বিচক্ষণ হতে গেলে অবশ্যই একটি পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। শেখার সময়ে এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োগের সময়েও তা করতে হবে।

পদ্ধতিটা কি? সেটা হচ্ছে শত্রু ও আমাদের উভয় পক্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে সুপরিচিত করা, উভয় পক্ষের কার্যকলাপের নিয়মগুলো খুঁজে বের করা এবং আমাদের নিজেদের কার্যকলাপে সেই নিয়মগুলোকে ব্যবহার করা।

বহু দেশের প্রকাশিত বিভিন্ন সামরিক গ্রন্থাদি 'অবস্থানুসারে নীতির নমনীয় প্রয়োগের' প্রয়োজনীয়তা এবং পরাজয় ঘটলে কি উপায় অবলম্বন করা হবে—এ উভয় দিক নির্দেশ করে। প্রথমটির উল্লেখ তারা করে কম্যাণ্ডারদেরকে সতর্ক করার জন্য যাতে কম্যাণ্ডাররা নীতির যান্ত্রিক প্রয়োগের কারণে বিষয়ীগত ভুল না করে বসে, এবং দ্বিতীয়টিতে বিষয়ীগত ভুল করার পরে, অথবা বিষয়গত অবস্থায় অপ্রত্যাশিত ও দুর্নিবার পরিবর্তন ঘটার পরে কম্যাণ্ডারদের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, তা নির্দেশ করে।

বিষয়ীগত ভুল কেন ঘটে? কারণ, কোন যুদ্ধ বা লড়াইয়ে সৈন্যবাহিনীকে যেভাবে বিন্যস্ত ও পরিচালিত করা হয়, সেটা নির্দিষ্ট স্থান ও কালের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না, কারণ বিষয়ীগত নির্দেশ প্রকৃত বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না বা ভিন্ন ভিন্ন হয়, অথবা বলা যায়, বিষয়ীগত ও বিষয়গত অবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সমাধান করা হয়নি। মানুষ যাই করুক না কেন, এ ধরনের অবস্থা এড়িয়ে চলা কঠিন। কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক সক্ষম বলে প্রমাণ করতে পারেন। কাজকর্মে আমরা যেমন অপেক্ষাকৃত সক্ষমতার দাবি করি, তেমনি সামরিক ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত অধিক জয় দাবি করি, অথবা অন্য কথায়, যাতে পরাজয় অপেক্ষাকৃত কম হয় তার দাবি করি। এ ব্যাপারের মূল বিষয় হচ্ছে বিষয়ীগত ও বিষয়গতের মধ্যে যথাযথ সংগতি সাধন।

রণকৌশলগত একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। শত্রুবাহিনীর একটি পার্শ্বভাগ যদি আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, আর সে স্থানটি যদি শত্রুর

ঠিক দুর্বল অংশ হয় এবং সে কারণে আক্রমণ সফল হয়, তাহলে বলা যায় যে, বিষয়ীগত ও বিষয়গতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, অর্থাৎ কম্যাণ্ডারের পর্যবেক্ষণ, বিচার ও সংকল্প শত্রুর বাস্তব অবস্থা ও তার বাস্তব বিন্যাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। যদি শত্রুবাহিনীর অন্য একটি পার্শ্বভাগ বা কেন্দ্রভাগ আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয় এবং ফলে অপ্রত্যাশিত বাধার মুখে পড়ে আক্রমণ বিফল হয়, তাহলে বলতে হবে, এটা সংগতিপূর্ণ ছিল না। আক্রমণ যদি যথাযথ সময়ে হয়, সংরক্ষিত বাহিনীকে বেশি দেরীতে কিংবা বেশি আগে ব্যবহার না করা হয় এবং লড়াইয়ে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা ও সামরিক কার্যকলাপ যদি আমাদের অনুকূল হয় ও শত্রুর বিপক্ষে যায়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় আগাগোড়া লড়াইয়ে বিষয়ীগত পরিচালনা বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংগতিপূর্ণ। যুদ্ধে বা লড়াইয়ে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ ব্যাপার অত্যন্ত বিরল, কারণ যুদ্ধে বা লড়াইয়ে উভয়পক্ষের যুদ্ধরতরা হচ্ছে সশস্ত্র জীবন্ত মানুষের দল এবং পরস্পরে আবার নিজের গোপনীয়তা বজায় রাখছে। এটা নিষ্প্রাণ বস্তু অথবা গতানুগতিক কাজকর্ম থেকে অনেক ভিন্ন। যদি কম্যাণ্ডারের পরিচালনা মোটামুটি অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়, অর্থাৎ পরিচালনার নির্ধারক উপাদানগুলি যদি অবস্থার সঙ্গে 'সংগতিপূর্ণ হয়, তাহলে জয়ের একটা ভিত্তি গড়ে ওঠে।

কম্যাণ্ডারের নির্ভুল বিন্যাস ব্যবস্থা আসে তাঁর নির্ভুল সংকল্প থেকে, তাঁর নির্ভুল সংকল্প আসে তাঁর নির্ভুল বিচার থেকে, তাঁর নির্ভুল বিচার আসে পুংখানুপুংখ ও প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ থেকে এবং বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে সংগৃহীত তথ্যগুলোকে একসূত্রে গেঁথে চিন্তা করা থেকে। কম্যাণ্ডার সমস্ত সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, পর্যবেক্ষণে অর্জিত শত্রুর অবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যগুলোর উপর চিন্তা করেন—বাজে জিনিস ছেড়ে সার জিনিস বেছে, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে সত্যকে রেখে, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে গিয়ে, বাইরে থেকে ভেতরে গিয়ে, তারপর তিনি তাঁর নিজের পক্ষের অবস্থাকে বিবেচনা করেন এবং উভয়পক্ষের তুলনা ও পারস্পরিক সম্পর্কের পর্যালোচনা করেন। এমনি করেই তিনি বিচার-বিবেচনা গড়ে তোলেন, নিজের মনস্থির করেন এবং পরিকল্পনা রচনা করেন। এই হচ্ছে রণনীতিগত পরিকল্পনা, যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা বা লড়াইয়ের পরিকল্পনা রচনা করার পূর্বে রণবিশারদের পক্ষে অবস্থাকে জানার সামগ্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এমন না করে অসতর্ক রণবিশারদ নিজের মনগড়া ভিত্তির সামরিক

পরিকল্পনা রচনা করে, তাই এ ধরনের পরিকল্পনাগুলো হচ্ছে কাল্পনিক এবং বাস্তবের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। নিছক উৎসাহের উপর নির্ভরশীল বেপরোয়া রণবিশারদ শত্রুর দ্বারা প্রতারিত হতে বাধ্য, শত্রুর বাহ্য আকৃতি বা শত্রুর অবস্থার একতরফা উপলব্ধির দ্বারা প্রলুব্ধ হতে বাধ্য, অধীনস্থ কর্মচারীর দায়িত্ব-জ্ঞানহীন পরামর্শ, যা বাস্তব জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন পরামর্শের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। আর তাই তার মাথা দেওয়ালে না ঠেকে পারে না। কারণ, সে জানে না অথবা জানতেও চায় না যে, যে-কোন সামরিক পরিকল্পনাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ, শত্রু নিজের অবস্থার এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়।

অবস্থাকে জানার প্রক্রিয়া শুধুমাত্র যে সামরিক পরিকল্পনা রচিত হবার আগেই চলে তা নয়, উপরন্তু তার পরেও চলে। কোন একটি পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে শুরু করার মুহূর্ত থেকে লড়াইয়ের সমাপ্তি পর্যন্ত চলতে থাকে অবস্থাকে জানার আরও একটি প্রক্রিয়া, অর্থাৎ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া। এই সময়ে, প্রথম প্রক্রিয়ায় রচিত পরিকল্পনাটি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না, তা নতুন করে পরীক্ষা করা দরকার। যদি সে পরিকল্পনা অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হয়, অথবা পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ না হয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই নতুন জ্ঞান অনুসারে নতুন বিচার গড়ে তোলা, নতুন সংকল্প স্থির করা এবং পূর্বে নির্ধারিত পরিকল্পনার পরিবর্তন করা উচিত, যাতে তা নতুন অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আংশিক পরিবর্তন প্রায় প্রতিটি লড়াইয়েই করা হয়, এবং কখনো কখনো তাকে সম্পূর্ণভাবেও বদলাতে হয়। বেপরোয়া ব্যক্তি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে বোঝে না অথবা পরিবর্তন সাধনে অনিচ্ছুক, শুধু অন্ধভাবেই সে কাজ করে থাকে, তাই অনিবার্যভাবেই তার মাথা দেওয়ালে ঠুকবে।

উপরের কথাটি রণনীতিগত কার্যকলাপ, অথবা একটি যুদ্ধাভিযান বা লড়াই সম্পর্কে বলা হয়েছে। অভিজ্ঞ সামরিক ব্যক্তি যদি শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হন, নিজের বাহিনীর (কমাণ্ডারের, যোদ্ধার, অস্ত্রশস্ত্রের, রসদাদি-সরবরাহ, ইত্যাদির এবং তাদের মোট সমষ্টির) প্রকৃতির সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে থাকেন, শত্রুবাহিনীর (অনুরূপভাবে, কম্যাণ্ডারের, যোদ্ধার, অস্ত্রশস্ত্রের, রসদাদি-সরবরাহ, ইত্যাদির এবং তাদের সবকিছুর) প্রকৃতির এবং যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত

অন্যান্য সমস্ত অবস্থার—যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থা ও আবহাওয়ার প্রকৃতি ইত্যাদির সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে থাকেন, তাহলে এই ধরনের সামরিক ব্যক্তির যুদ্ধ বা লড়াই পরিচালনার সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত বেশি থাকবে এবং তাঁর বিজয় অর্জন করার সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি থাকবে। এটা হচ্ছে দীর্ঘকালের মধ্যে শত্রুপক্ষের ও নিজেদের পক্ষের অবস্থা জেনে নেবার, কার্যকলাপের নিয়মগুলো খুঁজে বের করার এবং বিষয়ীগত ও বিষয়গতের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সমাধান করার পরিণতি। জানার এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ব্যতীত গোটা যুদ্ধের নিয়মগুলোকে বোঝা ও আয়ত্ত করা কঠিন। সামরিক ব্যাপারে যারা নবীব তারা, অথবা যারা শুধু কাগজে-কলমেই লড়াই করে তারা প্রকৃত নিপুণ উচ্চস্তরের কম্যাণ্ডার হতে পারে না। যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যারা শিক্ষালাভ করে, শুধু তারাই এমন কম্যাণ্ডার হতে পারে।

নীতিগত প্রকৃতি-সম্পন্ন সমস্ত সামরিক নিয়ম বা সামরিক তত্ত্ব হচ্ছে আগের দিনের বা আজকের দিনের মানুষের দ্বারা অতীত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার সার-সংকলন। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিগত যুদ্ধের শিক্ষাকে আমাদের অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে শেখা উচিত। এটা একটা ব্যাপার। কিন্তু আর একটা ব্যাপারও আছে, অর্থাৎ এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করে যা প্রয়োজনীয় তা গ্রহণ করতে হবে, যা অপ্রয়োজনীয় তা বর্জন করতে হবে এবং যা বিশেষভাবে আমাদের নিজস্ব, তা যোগ করতে হবে। পরের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা না করলে আমরা যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারব না।

বই পড়া অবশ্যই শিক্ষা, কিন্তু প্রয়োগ করাও শিক্ষা, আর এটাই হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেখা—এটাই আমাদের প্রধান পদ্ধতি। যার স্কুলে যাবার সুযোগ হয়নি, সেও যুদ্ধ শিখতে পারে, এটাই হচ্ছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে শেখা। বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের কাজ, এটা প্রায়শঃই প্রথমে শিখে পরে কাজ করা নয়, বরং কাজ করেই শেখা, কাজ করার মানেই শেখা। সাধারণ জনগণ ও সৈন্যের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে, কিন্তু এটা মহাপ্রাচীর নয়, এই ব্যবধানটাকে দ্রুত দূর করা যায়, আর এটা দূর করার পদ্ধতি হচ্ছে বিপ্লব করা ও যুদ্ধ করা। যখন আমরা বলি, শেখা ও প্রয়োগ করা সহজ নয়, তখন এর অর্থ হল সম্পূর্ণরূপে শিখে নেওয়া ও দক্ষতার

সঙ্গে প্রয়োগ করা কঠিন। যখন আমরা বলি সাধারণ জনগণ দ্রুত সৈন্যে পরিবর্তিত হতে পারেন, তখন এর অর্থ হল প্রবেশদ্বার অতিক্রম করা কঠিন নয়। এ দুটি বিষয়কে একত্রে বলতে গিয়ে আমরা একটা পুরানো চীন প্রবাদ-বাক্যের উল্লেখ করতে পারি—'কার্য সাধনে যারা দৃঢ়সংকল্প, তাদের পক্ষে দুনিয়ায় কঠিন বলে কিছুই নেই।' প্রবেশদ্বার অতিক্রম করা কঠিন নয়, নৈপুণ্য অর্জনও সম্ভব, কেবলমাত্র দৃঢ়সংকল্পের প্রয়োজন এবং নিপুণভাবে শিক্ষার প্রয়োজন।

অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের নিয়মের মতোই যুদ্ধের নিয়মগুলোও আমাদের মনে বিষয়মুখী বাস্তবতার (objective reality) প্রতিফলন। আমাদের মনের বাইরের সমস্ত বিষয়ই হচ্ছে বিষয়মুখী বাস্তবতা। অতএব, আমাদের যা শিখতে ও জানতে হবে, তার মধ্যে আছে শত্রুপক্ষের ও আমাদের নিজেদের পক্ষের অবস্থা। এ দুটোকেই পর্যালোচনার বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত, আর শুধুমাত্র আমাদের মনই (চিন্তাশক্তি) হচ্ছে পর্যালোচনাকে সম্পন্ন করার কর্তা। কোন কোন লোক নিজেদের জানতে পটু, কিন্তু শত্রু সম্পর্কে জানার ব্যাপারে অপটু। আর এক ধরনের লোক রয়েছে, যারা শত্রু সম্পর্কে জানার ব্যাপারে পটু, কিন্তু নিজেদের জানার ব্যাপারে অপটু। তাদের কেউই যুদ্ধের নিয়মগুলো শিক্ষা করার ও প্রয়োগ করার সমস্যার সমাধান করতে পারে না। প্রাচীন চীনের প্রখ্যাত সমরতত্ত্ববিদ স্থন উ জু'র[৩] রচিত গ্রন্থের একটা বাক্য আছে—'শত্রুকে জানুন, নিজেকে জানুন, তাহলে একশবার যুদ্ধ করলেও পরাজিত হবেন না'। এতে শিক্ষা করার ও প্রয়োগ করার—এই উভয় পর্যায়ের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বিষয়মুখী বাস্তবতার বিকাশের নিয়মগুলোকে জানার এবং আমরা যে শত্রুর সম্মুখীন হচ্ছি সেই শত্রুকে পরাভূত করার জন্য এইসব নিয়মানুসারে আমাদের নিজেদের কার্যকলাপ নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রবাদবাক্যকে আমাদের হাল্কাভাবে দেখা উচিত নয়।

যুদ্ধ হচ্ছে জাতি, রাষ্ট্র, শ্রেণী বা রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রামের উচ্চতম রূপ। আর নিজেদের বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত জাতি, রাষ্ট্র, শ্রেণী অথবা রাজনৈতিক দল যুদ্ধের সমস্ত নিয়মই ব্যবহার করে। যুদ্ধের জয়-পরাজয় যে প্রধানতঃ যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারাই নির্ধারিত হয়, এতে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু, শুধুমাত্র এগুলোর দ্বারাই নয়, যুদ্ধরত উভয় পক্ষের বিষয়ীগত পরিচালনার

সামর্থ্যের দ্বারাও এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বস্তুগত অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত সীমা লংঘন করে কোন রণবিশারদ যুদ্ধে বিজয় অর্জনের আশা করতে পারেন না। কিন্তু এই সীমার মধ্যেই তিনি বিজয়লাভের চেষ্টা করতে পারেন এবং এটা তাঁর অবশ্যই করা প্রয়োজন। রণবিশারদের কার্যমঞ্চ গড়ে ওঠে বিষয়মুখী বস্তুগত অবস্থার ভিত্তিতে, কিন্তু এই মঞ্চের উপর শব্দ, বর্ণ, শক্তি ও আড়ম্বরময় অনেক প্রাণবান নাট্যানুষ্ঠানই তিনি পরিচালনা করতে পারেন। তাই নিশ্চিত বিষয়মুখী বস্তুগত ভিত্তি অর্থাৎ সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থাতে, আমাদের লালফৌজের পরিচালকদের অবশ্যই নিজেদের পরাক্রমকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র সৈন্যবাহিনিকে পরিচালিত করে জাতীয় ও শ্রেণীশত্রুকে ধ্বংস করে এই খারাপ দুনিয়াকে রূপান্তরিত করতে হবে। এখানে আমাদের বিষয়ীগত পরিচালনার সামর্থকে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং তা অবশ্যই করা উচিত। লালফৌজের কোন কম্যাণ্ডারকেই আমরা গোঁয়ার-গোবিন্দের মতো বেপরোয়া ব্যক্তি হতে দেব না। আমাদের অবশ্যই লালফৌজের প্রত্যেকটি কম্যাণ্ডারকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে তাঁরা সাহসী ও বিচক্ষণ বীর হয়ে ওঠেন। তাঁদের যে শুধু অসীম সাহসই থাকবে তা নয়, পরন্তু সমগ্র যুদ্ধের পরিবর্তন ও বিকাশকে পরিচালনার সমর্থ্যও তাঁদের থাকতে হবে। যুদ্ধের মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে কম্যাণ্ডারের হাবুডুবু খাওয়া উচিত নয়, বরং দৃঢ়চিত্তে পরিমাপ মতো জল কেটে কেটে ওপরে পৌঁছানো উচিত। যুদ্ধ পরিচালনার নিয়মগুলো হচ্ছে যুদ্ধের সাগরে সাঁতার কাটার কৌশল।

এটাই হচ্ছে আমাদের পদ্ধতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ, যা ১৯২৪ সালে শুরু হয়েছিল, তা ইতিমধ্যেই দুটি পর্যায় অতিক্রম করেছে। প্রথম পর্যায়টি ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ও দ্বিতীয় পর্যায়টি ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। এখন থেকে শুরু হবে জাপানবিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পর্যায়। এই তিনটি পর্যায়ের বিপ্লবী যুদ্ধ সবই চীনের সর্বহারাশ্রেণী এবং তার রাজনৈতিক পার্টি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্য-

বাদ ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তি। কোন কোন ঐতিহাসিক মুহূর্তে চীনের বুর্জোয়া-শ্রেণী বিপ্লবী যুদ্ধে যদিও-বা অংশগ্রহণ করতে পারে, তবুও নিজেদের স্বার্থ-পরতার কারণে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবের কারণে তারা চীনের বিপ্লবী যুদ্ধকে পূর্ণ বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যেতে অনিচ্ছুক ও অক্ষম। চীনের ব্যাপক কৃষকসাধারণ ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়া সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী যুদ্ধে যোগদান করতে এবং সে যুদ্ধকে পূর্ণ বিজয় পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। তাঁরাই হচ্ছেন বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান শক্তি। কিন্তু ক্ষুদে-উৎপাদকে বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টি গণ্ডিবদ্ধ (আবার কিছু সংখ্যক বেকার জনসাধারণের নৈরাজ্যবাদী ভাবধারা আছে), তাই তাঁরা যুদ্ধের নির্ভুল পরিচালক হতে পারেন না। এই কারণে, যে যুগে সর্বহারাশ্রেণী রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে, সে যুগে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বটি অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাঁধে। এই সময়ে যে-কোন বিপ্লবা যুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অভাব ঘটলে অথবা সেই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গেলে সে যুদ্ধ অনিবার্য-রূপেই ব্যর্থ হবে। কারণ আধা-ঔপনিবেশিক চীন দেশের সমাজের সমস্ত স্তর ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুধুমাত্র সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিই হচ্ছে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, রাজনীতিগতভাবে তারাই হচ্ছে সবশেষে বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সবচেয়ে বেশি সংগঠিত আর দুনিয়ার অগ্রগামী সর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টিগুলির অভিজ্ঞতাকে তারা সবচেয়ে বেশি খোলা মনে গ্রহণ করতে এবং সেই অভিজ্ঞাকে নিজেদের কাজে প্রয়োগ করতে পারে। তাই কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিই কৃষক, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্ব নিতে পারে, কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্কীর্ণতাকে, বেকার সাধারণের ধ্বংসাত্মক মানসিকতাকে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর দোটানা মনোভাবকে ও শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার মনোবলের অভাবকেও কাটিয়ে উঠতে পারে (অবশ্য যদি কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতে ভুল না হয়), এবং বিপ্লব ও যুদ্ধকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিতে পারে।

মূলতঃ বলতে গেলে, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুদ্ধ এমন অবস্থার ভেতর দিয়ে চালানো হয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী এবং চীনা সর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টি রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির উপরে, এবং তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক

সহযোগিতাও করেছিল। কিন্তু বিপ্লব ও যুদ্ধের সঙ্কট মহূর্তে, প্রথমতঃ, বড় বড় বুর্জোয়ারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী বাহিনীর ভেতরকার সুবিধাবাদীরাও স্বেচ্ছায় বিপ্লবের নেতৃত্ব ত্যাগ করেছিল, এবং তার ফলে এই বিপ্লবী যুদ্ধটি ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯২৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ চলেছে নতুন অবস্থায়। এ যুদ্ধের শত্রু শুধু সাম্রাজ্যবাদই নয়, পরন্তু বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারদের মৈত্রীও। আর জাতীয় বুর্জোয়ারাও বৃহৎ বুর্জোয়াদের লেজুড় হয়ে পড়েছে। এই বিপ্লবী যুদ্ধের নেতৃত্ব করছে। কমিউনিস্ট পার্টি একা এবং বিপ্লবী যুদ্ধে নিরঙ্কুশ নেতৃত্বও সে প্রতিষ্ঠা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির এই নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধকে দৃঢ়ভাবে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার সবচেয়ে প্রধান শর্ত। কমিউনিস্ট পার্টির এই ধরনের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব ছাড়া, এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, বিপ্লবী যুদ্ধ এমন অধ্যবসায়ের সঙ্গে চালানো যায়।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বীরত্বপূর্ণভাবে ও দৃঢ়ভাবে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের নেতৃত্ব করেছে এবং দীর্ঘ পনের বছর ধরে[৪] সারা দেশের জনগণের কাছে প্রমাণ করেছে যে, সে হচ্ছে জনগণের বন্ধু, জনগণের স্বার্থ রক্ষায় জন্য, তাঁদের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সে সব সময়েই বিপ্লবী যুদ্ধের সবচেয়ে অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে আছে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তার নিজের কঠোর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এবং তার কয়েক লাখ শহীদ বীর পার্টি-সদস্যের আর হাজার হাজার বীর কর্মীদের আত্ম-বলিদানের ভেতর দিয়ে গোটা জাতির কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একটা মহান শিক্ষাপ্রদ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিপ্লবী সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মহান ঐতিহাসিক সাফল্যই জাতীয় শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার সংকট মুহূর্তে আজ মৃত্যুর কবল থেকে চীনের উদ্ধারের এবং বেঁচে থাকার শর্তকে জুগিয়েছে। এই শর্ত হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অস্তিত্ব, যা বিরাট সংখ্যক জনগণের আস্থাভাজন এবং দীর্ঘকালের পরীক্ষার পরে জনগণ যা বাছাই করে নিয়েছেন। আজ অন্য যে-কোন রাজনৈতিক পার্টির কথার চেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কথাই জনগণ সহজে গ্রহণ করেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির গত পনের বছরের কঠোর সংগ্রাম না থাকলে দেশের সামনে ধ্বংসের তে নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে, তার হাত থেকে দেশকে বাঁচানো অসম্ভব হতো।

ছেন তু-সিউর[৫] দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও লি লি-সানের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের[৬] তুল ছাড়', বিপ্লবী যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আরও দুটি ভুল করেছে। প্রথম ভুলটি ছিল ১৯৩১-২৪ সালের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ[৭]। এই ভুলের ফলে ভূমি-বিপ্লবের যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতি হয় এবং তাতে করে আমরা শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে পরাজিত করতে তো পারলামই না, উপরন্তু আমরাই আমাদের ঘাঁটি এলাকা হারালাম আর লালফৌজ দুর্বল হয়ে পড়ল। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে চুনইতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত অধিবেশনে এ ভুলটি সংশোধন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়টী ছিল ১৯৩৫-৩৬ সালের চাং কুও-থাওয়ের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ[৮]। এ ভুলটি এমনই বেড়ে উঠেছিল যে, তা পার্টি ও লালফৌজের শৃংখলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং লালফৌজের প্রধান শক্তির এক অংশের গুরুতর ক্ষতি করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্বের ফলে এবং লালফৌজের অন্তর্ভুক্ত পার্টি-সদস্য, কম্যাণ্ডার ও যোদ্ধারা সচেতন থাকার ফলে এই ভুলটিও শেষ পর্যন্ত সংশোধন করে নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এ সমস্ত ভুলই আমাদের পার্টি, আমাদের বিপ্লব ও যুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে আমরা পরাভূত করেছিলাম এবং তা করতে গিয়ে আমাদের পার্টি ও লালফৌজ নিজেরা পোড় খেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রচণ্ড, গৌরবোজ্জল ও বিজয়াত্মক বিপ্লবী যুদ্ধের নেতৃত্ব করেছে এবং এখনো করছে। এ যুদ্ধ যে শুধু চীনের মুক্তি পতাকা তা-ই নয়, পরন্তু এর আন্তর্জাতিক বিপ্লবী তাৎপর্যও আছে। বিশ্বের বিপ্লবী জনগণের দৃষ্টি আমাদের উপরে নিবদ্ধ। নতুন পর্যায়ে—জাপানবিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পর্যায়ে চীনা বিপ্লবকে আমরা নেতৃত্ব দিয়ে তার সমাপ্তি অবধি নিয়ে যাব আর প্রাচ্যের ও দুনিয়ার বিপ্লবের উপরে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করব। বিগত বিপ্লবী যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আমাদের যে শুধু একটা সঠিক মার্কসবাদী রাজনৈতিক লাইন দরকার তা নয়, উপরন্তু একটা সঠিক মার্কসবাদী সামরিক লাইনও দরকার। পনের বছরের বিপ্লবে ও যুদ্ধে এ ধরনের একটি রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস যে, আজ থেকে যুদ্ধের নতুন পর্যায়ে এই ধরনের লাইন নতুন অবস্থানুসারে আরও বিকশিত, পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবে, যাতে করে আমরা জাতীয় শত্রুকে পরাজিত

করার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, সঠিক রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে জন্ম ও বিকাশলাভ করে না, পরন্তু তা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জন্ম ও বিকাশলাভ করে। একদিকে তাকে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের সঙ্গে লড়তে হবে, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের সঙ্গেও লড়তে হবে। এইসব ক্ষতিকর ঝোঁকগুলো বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধের ক্ষতিসাধন করে। এই ঝোঁকগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করলে এবং তাদের নিঃশেষে দূর না করলে সঠিক লাইন স্থাপন করা ও বিপ্লবী যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আমি এই পুস্তিকায় বার বার ভুল মতগুলোর উল্লেখ করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

১। বিষয়টির গুরুত্ব

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন না, জানেন না বা জানতে চান না, তাঁরা কুওমিনতাঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে লাল-ফৌজের যুদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধের অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধের সমান বলে মনে করেন। লেনিন ও স্তালিনের দ্বারা পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার একটা বিশ্বজোড়া তাৎপর্য রয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সমেত সব কমিউনিস্ট পার্টিই এই অভিজ্ঞতাকে এবং লেনিন ও স্তালিন কর্তৃক কৃত সেই অভিজ্ঞতার তত্ত্বগত সার-সংক্ষেপকে তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করে থাকে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের নিজেদের অবস্থায় সেই অভিজ্ঞতাকে আমাদের যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা উচিত। বহু দিক থেকেই চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ থেকে পৃথক। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা না করা বা তাকে অস্বীকার করা অবশ্যই ভুল। আমাদের দশ বছরের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের শত্রুরাও অনুরূপ ভুল করেছিল। তারা মানতো না যে অন্যান্য সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে যেসব রণনীতি ও রণকৌশল ব্যবহার করা হয়, লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়তে তার থেকে ভিন্ন রণনীতি ও রণকৌশলের প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি-শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করে তারা আমাদের

উপেক্ষা করেছিল আর যুদ্ধের পুরানো পদ্ধতিই আঁকড়ে ছিল। এ ছিল ১৯৩৩ সালের শত্রুর চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ের ও তার আগের অবস্থা। এর ফলে তাদের পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটেছে। কুওমিনতাঙ বাহিনীতে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সেনাপতি লিউ ওয়েই-ইউয়ান এ সমস্যার প্রতি একটা নতুন মত প্রথমে পেশ করেছিল এবং তারপর পেশ করেছিল তাই ইয়ুয়ে। শেষ অবধি চিয়াং কাই-শেক তাদের এই মত গ্রহণ করেছিল। এমনি করেই চিয়াং কাই-শেকের লুশানস্থ অফিসার ট্রেনিং দল[9] গঠিত হয়েছিল এবং তার পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়াশীল নয়া সামরিক নীতি[10] উদ্ভূত হয়েছিল।

লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অবস্থার সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য শত্রু যখন তার সামরিক নীতিগুলো বদলে নিল, তখন আমাদের বাহিনীতে এমন এক দল লোক দেখা দিল, যারা 'পুরানো পদ্ধতিতে' ফিরে গেল। সাধারণ অবস্থার পদ্ধতিতে ফিরে যাবার জিদ তারা ধরল, প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশেষ অবস্থার অনুধাবন করতে তারা অস্বীকার করল, লালফৌজের রক্তরাঙা লড়াইয়ের ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে তারা অগ্রাহ্য করল, সাম্রাজ্যবাদ ও কুওমিনতাঙের শক্তিকে এবং কুওমিনতাঙ বাহিনীর শক্তিকে ছোট করে দেখল, আর শত্রুর দ্বারা গৃহীত প্রতিক্রিয়াশীল নয়া নীতির দিকে চোখ বুজে রইল। ফলে, শেনসী-কানসু সীমান্ত এলাকা ছাড়া সমস্ত বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাই আমাদের হারাতে হয়েছিল, লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা তিন লাখ থেকে কমে কয়েক অযুতে দাঁড়িয়েছিল, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা তিন লাখ থেকে কয়েক অযুতে নেমে এসেছিল, আর কুওমিনতাঙ শাসিত এলাকায় পার্টি-সংগঠনগুলি প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এক কথায়, একটা নিদারুণ ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এই দলের লোকজন নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলত, কিন্তু বাস্তবে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অ-আ-ক-খও শেখেনি। লেনিন বলেছিলেন যে, মার্কসবাদের একান্ত সারবস্তু এবং মার্কসবাদের জীবন্ত মর্ম হচ্ছে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ[11]। ঠিক এ কথাটিই আমাদের এসব কমরেডরা ভুলে গিয়েছিল।

এর থেকে বোঝা যায় যে, চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলোকে না বুঝলে সে যুদ্ধকে পরিচালনা করা বা তাকে বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

২। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

তাহলে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

আমি মনে করি চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমটি হচ্ছে যে, চীন একটি বিরাট আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সে গেছে।

এই বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দিয়েছে যে, চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বিকাশ ও বিজয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯২৭ সালের শেষের দিক থেকে ১৯২৮ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত অর্থাৎ চীনের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরে, হুনান কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার অর্থাৎ চিংকাং পর্বতের কমরেডদের মধ্যে কেউ কেউ যখন প্রশ্ন তুলেছিল, 'কত দিন লাল পতাকা উর্ধ্বে তুলে রাখতে পারব ?' তখনই আমরা (হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার প্রথম পার্টি-কংগ্রেসে[১২]) সেই সম্ভাবনাটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ, এটা ছিল একটা সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন। চীনের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলি ও চীনা লালফৌজের অস্তিত্ব ও বিকাশ হতে পারে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক পা-ও আমরা এগোতে পারতাম না। ১৯২৮ সালের চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে আর একবার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে চীনের বিপ্লবী আন্দোলন একটা সঠিক তাত্ত্বিক ভিত্তি পেয়ে গেছে।

এই প্রশ্নটিকে এখন পৃথক পৃথক করে আলোচনা করা যাক।

চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়—দুর্বল পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও গুরুতর আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি সহ-অবস্থান করছে ; আধুনিক কয়েকটি শিল্প ও বাণিজ্য শহর এবং বিশাল নিশ্চল গ্রামাঞ্চল সহ-অবস্থান করছে ; লক্ষ লক্ষ শিল্পশ্রমিক ও পুরানো ব্যবস্থাধীনে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও হস্তশিল্পী সহ-অবস্থান করছে ; কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণকারী বড় বড় যুদ্ধবাজ ও বিভিন্ন প্রদেশকে নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদে যুদ্ধবাজরা সহ-অবস্থান করছে ; দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যবাহিনী—চিয়াং কাই-শেকের অধীনে তথাকথিত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিভিন্ন প্রদেশের যুদ্ধবাজদের অধীনে 'পাঁচমিশালী বাহিনী'—সহ-অবস্থান করছে ; কয়েকটি রেললাইন, জাহাজ চলাচলের পথ ও মোটরগাড়ী যাতায়াতের রাস্তা, সর্বত্র একচাকার গাড়ী চলার মতো সরু পথ ও

পায়ে হাঁটা পথ, আর এমন অনেক পথ যার মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াও মুস্কিল—এ সকল পথও সহ-অবস্থান করছে।

চীন হচ্ছে একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ—সাম্রাজ্যবাদীদের অনৈক্য চীনের শাসনচক্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে বলে চীনের শাসকচক্রগুলির মধ্যেও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। কতকগুলি দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ আর একটিমাত্র দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত উপনিবেশের মধ্যে পার্থক্য আছে।

চীন হচ্ছে একটি বিরাট দেশ—'পূর্বে যখন অন্ধকার, পশ্চিমে তখন রোদের মেলা ; দক্ষিণে যখন আঁধার কালো, উত্তরে তখনও আলো ঝল্‌মল্‌'। অতএব যুদ্ধ চালনার জন্য পরিক্রমণের জায়গার অভাবের কোন চিন্তা নেই।

চীন একটা বিরাট বিপ্লবের ভেতর দিয়ে গেছে—এই বিপ্লবই যুগিয়েছে সেই বীজ যার থেকে জন্মলাভ করেছে লালফৌজ, এই বিপ্লবই সৃষ্টি করেছে লালফৌজের নেতা অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে, আর প্রস্তুত করেছে এমন জনসাধারণকে যাঁরা একবার বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তাই আমরা বলি, চীন হচ্ছে একটি বিরাট আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, যা একটি বিপ্লব পার হয়ে এসেছে এবং যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়—এটাই হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য শুধু যে মৌলিকভাবে আমাদের রাজনীতিগত রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করে তা-ই নয়, উপরন্তু আমাদের সামরিক রণনীতি এবং রণকৌশলও মৌলিকভাবে নির্ধারণ করে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—আমাদের শত্রু বৃহৎ ও শক্তিশালী।

লালফৌজের শত্রু কুওমিনতাঙের অবস্থা কেমন? এটা হচ্ছে এমন একটি পার্টি, যে পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে এবং তাকে কম-বেশি দৃঢ় করেছে। সারা দুনিয়ার প্রধান প্রধান প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন তারা লাভ করেছে। তারা তাদের সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করছে। ফলে এই সৈন্যবাহিনী চীনের যে-কোন ঐতিহাসিক যুগের সৈন্যবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে উঠেছে এবং মোটামুটিভাবে দুনিয়ার আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সৈন্যবাহিনীর অনুরূপ হয়ে উঠেছে। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক দ্রব্য সরবরাহের অবস্থা লালফৌজের তুলনায় এই সৈন্যবাহিনীর অনেক ভাল ও প্রচুর, এবং তাদের সৈন্যসংখ্যা চীনের যে-কোন ঐতিহাসিক যুগের সৈন্যবাহিনীর থেকে বেশি,

দুনিয়ার যে-কোন দেশের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর থেকেও বেশি। কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ও লালফৌজের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সমগ্র চীনের রাজনীতি, অর্থনীতি, যোগাযোগব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সংযোগস্থল বা প্রাণসূত্র নিয়ন্ত্রণ করে কুওমিনতাঙ ; তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশজোড়া।

চীনা লালফৌজ তাই এক বৃহৎ ও শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হয়ে রয়েছে। এটাই হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে সাধারণ যুদ্ধ বা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ কিংবা উত্তর অভিযানের যুদ্ধ থেকে লালফৌজের পরিচালিত যুদ্ধ বহু দিক থেকেই পার্থক্যযুক্ত না হয়ে পারে না।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, লালফৌজ দুর্বল।

প্রথম মহাবিপ্লবের পরাজয়ের পরে চীনা লালফৌজ জন্মলাভ করে। তার শুরু হয়েছিল গেরিলা বাহিনী হিসেবে। যখন এটা ঘটেছিল, তখন কেবল যে চীনে প্রতিক্রিয়াশীল যুগ চলছিল তা নয়, অধিকন্তু বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার যুগ বিদ্যমান ছিল।

আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে বা সুদূরবর্তী অঞ্চলে, আর তা বাইরে থেকে কোনরকমের সাহায্যই পায় না। কুওমিনতাঙ অঞ্চলগুলির তুলনায় বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা পশ্চাৎপদ। বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র পল্লী অঞ্চল আর ছোট ছোট নগর। গোড়াতে এই অঞ্চলগুলি ছিল অত্যন্ত ছোট এবং পরেও খুব বেশি বড় হয়ে উঠেনি। উপরন্তু সেগুলি হচ্ছে সচল কিন্তু স্থায়ী নয়। লালফৌজের কোন প্রকৃত সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকা ছিল না।

সংখ্যাগতভাবে লালফৌজ ছোট, তার অস্ত্রশস্ত্র ও নিকৃষ্ট মানের খাদ্য, বিছানাপত্তর ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি জিনিসের সরবরাহ জোগাড় করাও তার পক্ষে খুবই কষ্টকর।

তুলনামূলকভাবে পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যের তীব্র বৈপরীত্য রয়েছে। এই তীব্র বৈপরীত্যের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছে লালফৌজের রণনীতি ও রণকৌশল।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও ভূমি-বিপ্লব।

এই বৈশিষ্ট্যটি হল প্রথম বৈশিষ্ট্যটির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এই বৈশিষ্ট্যটি

থেকে দুটি দিকের অবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। একদিকে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ যদিও চীনের ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল যুগে চলেছে, তবুও তার বিজয় সম্ভব, কারণ এই বিপ্লবী যুদ্ধটি চলছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং এতে রয়েছে কৃষকের সমর্থন। আর এই সমর্থন লাভ করেছে বলেই আমাদের ঘাঁটি এলাকাগুলি ছোট হলেও রাজনীতিগতভাবে খুবই শক্তিশালী, এবং অতীব বিপুলাকার কুওমিনতাঙ শাসনের বিরুদ্ধে অটলভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে, সামরিক ক্ষেত্রে কুওমিনতাঙের আক্রমণের প্রতি প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করেছে। লালফৌজ ছোট হলেও তার সংগ্রামী শক্তি খুবই প্রবল, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত লালফৌজের সৈন্যরা ভূমি-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, আর তাঁরা লড়াই করছেন আপন স্বার্থে এবং এই ফৌজের কম্যাণ্ডার ও যোদ্ধারা রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ।

অপরদিকে, আমাদের সঙ্গে কুওমিনতাঙের একটা তীব্র বৈপরীত্য দেখা যায়। কুওমিনতাঙ ভূমি-বিপ্লবের বিরোধিতা করে, তাই তারা কৃষকদের সমর্থন পায় না। তার সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি হলেও সৈনিকসাধারন ও ক্ষুদে উৎপাদক পরিবার থেকে উদ্ভূত নিম্নপদস্থ বহু অফিসারদের দিয়ে কুওমিনতাঙ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তার জন্য মরণপণ করে লড়াই করাতে পারে না। তার অফিসার ও সৈনিকরা রাজনীতিগতভাবে বিভক্ত, ফলে তার সংগ্রামী শক্তি হ্রাস পেয়েছে।

৩। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত আমাদের রণনীতি ও রণকৌশল

একটি বিরাট আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, যা একটা বিরাট বিপ্লব পার হয়ে গেছে এবং যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়, একটি বৃহৎ শক্তিশালী শত্রু, একটি ছোট ও দুর্বল লালফৌজ, এবং ভূমি-বিপ্লব—এগুলো হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলো চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের পরিচালনা-লাইন এবং তার বহু রণনীতিগত ও রণকৌশলগত নীতি নির্ধারণ করেছে। প্রথম ও চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এটা নির্ধারণ করেছে যে, চীনা লালফৌজের পক্ষে বৃদ্ধি পাওয়া ও শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে যে, চীনা লালফৌজের পক্ষে খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাওয়া ও শত্রুকে অবিলম্বে পরাজিত করা অসম্ভব, অর্থাৎ,

নির্ধারণ করেছে যে, যুদ্ধটা হবে দীর্ঘস্থায়ী, এবং সঠিকভাবে না চালালে যুদ্ধে হার পর্যন্ত হতে পারে।

এই হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের দুটি দিক। এ দুটি দিক যুগপৎ বিদ্যমান, অর্থাৎ অনুকূল অবস্থাও আছে আবার অসুবিধাজনক অবস্থাও আছে। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের মৌলিক নিয়ম এটাই, আর এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে অন্য বহু নিয়ম। আমাদের দশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস এ নিয়মের সঠিকতা প্রমাণ করে দিয়েছে। চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও যে লোক এই মৌলিক নিয়মকে দেখতে পায় না, সে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধকে পরিচালনা করতে পারে না এবং লালফৌজকেও বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

এটা স্পষ্ট যে, মূলনীতি সম্পর্কিত নিম্নলিখিত যাবতীয় বিষয়গুলির মীমাংসা আমাদের অবশ্যই সঠিকভাবে করতে হবে :

রণনীতিগত দিকনির্দেশ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা, আক্রমণ করার সময়ে হঠকারিতার বিরোধিতা করা, প্রতিরক্ষা করার সময়ে রক্ষণশীলতার বিরোধিতা করা, আর স্থানান্তরিত হওয়ার সময়ে পলায়নবাদের বিরোধিতা করা।

লালফৌজে গেরিলাবাদের বিরোধিতা করা, কিন্তু সামরিক কার্যকলাপে লালফৌজের গেরিলা চরিত্রকে স্বীকার করা।

যুদ্ধাভিযানের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালনার বিরোধিতা করা এবং রণনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের বিরোধিতা করা, রণনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে স্বীকার করা এবং যুদ্ধাভিযানের ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইকে স্বীকার করা।

স্থায়ী যুদ্ধরেখার ও অবস্থানগত যুদ্ধের বিরোধিতা করা, অস্থায়ী যুদ্ধরেখার ও চলমান যুদ্ধকে স্বীকার করা।

শত্রুকে শুধুই ছত্রভঙ্গ করার লড়াই চালনার বিরোধিতা করা, আর নির্মূলীকরণের লড়াইকে স্বীকার করা।

দুই 'মুষ্টি' দিয়ে একই সময়ে দুই দিকে আঘাত হানার রণনীতির বিরোধিতা করা, আর এক সময়ে এক 'মুষ্টি' দিয়ে এক দিকে আঘাত হানার রণনীতিকে স্বীকার করা।

বিরাটাকারের পশ্চাদ্ভাগ-ব্যবস্থার বিরোধিতা করা, আর ছোট আকারের পশ্চাদ্ভাগ-ব্যবস্থা রাখাটা স্বীকার করা।[১৩]

নিরঙ্কুশ কেন্দ্রীভূত পরিচালনার বিরোধিতা করা, আর অপেক্ষিক কেন্দ্রীভূত পরিচালনাকে স্বীকার করা।

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ ও ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীপনার[১৪] বিরোধিতা করা, আর স্বীকার করা যে, লালফৌজ হচ্ছে চীনা বিপ্লবের প্রচারক ও সংগঠক।

দস্যু-বৃত্তিম[১৫] বিরোধিতা করা, আর কঠোর রাজনৈতিক শৃংখলাকে স্বীকার করা।

যুদ্ধবাজ-রীতির বিরোধিতা করা, আর ফৌজে সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রের জীবনকে ও প্রামাণিক সামরিক শৃংখলাকে স্বীকার করা।

ভ্রান্ত সঙ্কীর্ণতাবাদী কর্মীসংক্রান্ত নীতির বিরোধিতা করা, আর নিভুল কর্মী-নীতিকে স্বীকার করা।

বিচ্ছিন্নতার নীতির বিরোধিতা করা, আর সমস্ত সম্ভাব্য মিত্রদের স্বপক্ষে টেনে আনার নীতিকে স্বীকার করা।

লালফৌজকে তার পুরানো স্তরে ফেলে রাখার বিরোধিতা করা, আর তাকে একটা নতুন স্তরে বিকশিত করে তোলার চেষ্টা করা।

রণনীতিগত সমস্যা সম্পর্কে আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে চীনের দশ বছরের রক্তক্ষয়ী বিপ্লবী যুদ্ধের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে উপরোল্লিখিত সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করা।

চতুর্থ অধ্যায়

'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ও এর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ—চীনের গৃহযুদ্ধের প্রধান রূপ

বিগত দশ বছরে, আমাদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবার প্রথম দিন থেকেই প্রতিটি স্বাধীন লাল গেরিলাবাহিনী বা লালফৌজকে অথবা প্রতিটি বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাকে প্রায়শঃই শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। লালফৌজকে শত্রু একটা দৈত্য বলে মনে করে, আর যখনই তার দেখা মেলে তখনই তাকে ধরতে চায়। শত্রু সর্বদাই লালফৌজের পিছু ধাওয়া করে চলেছে আর নিয়তই তাকে ঘেরাও করবার জন্য চেষ্টা করছে। যুদ্ধের এই রূপ গত দশ বছরে বদল হয়নি। যদি জাতীয় যুদ্ধ গৃহযুদ্ধের স্থান না নেয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না শত্রু দুর্বল হয় আর লালফৌজ শক্তিশালী হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত এই রূপের পরিবর্তন ঘটবে না।

লালফৌজের ক্রিয়াকলাপ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। আমাদের পক্ষে বিজয়ের অর্থ হচ্ছে মুখ্যতঃ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিজয়, অর্থাৎ রণনীতিগত বিজয় ও যুদ্ধাভিযানের বিজয়। প্রতিটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে এক-একটা যুদ্ধাভিযান, যা প্রায়ই গঠিত হয় ছোট-বড় কতকগুলি বা এমনকি কয়েক ডজন লড়াইয়ের দ্বারা। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে মূলগতভাবে ভেঙে চুরমার করে দেবার আগে, এমনকি বহু লড়াইয়ে জয়লাভ করলেও, রণনীতিগত বিজয় বা গোটা যুদ্ধাভিযানে জয় হয়েছে এ কথা বলা যায় না। লালফৌজের দশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস।

শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে এবং তার বিরুদ্ধে লালফৌজের সংগ্রামে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ের এই দুই ধরনের রূপই ব্যবহার করা হয়। এবং অন্য কোন যুদ্ধ—প্রাচীন বা আধুনিক, চীনের বা বিদেশের যুদ্ধ থেকে এর কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু চীনের গৃহযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে লড়াইয়ের এই দুই রূপের পুনরাবৃত্তি। প্রতিটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে শত্রু আক্রমণ চালিয়ে লালফৌজের প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করে, আর লালফৌজ প্রতিরক্ষার মাধ্যমে শত্রুর আক্রমণের বিরোধিতা করে। এটা হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রথম পর্যায়। তারপরে শত্রু প্রতিরক্ষার মাধ্যমে লালফৌজের আক্রমণের বিরোধিতা করে, আর লালফৌজ আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করে। এটা হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়। যে-কোন 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে এই দুটি পর্যায় থাকে, এবং দীর্ঘকাল ধরে এগুলোর পুনরাবৃত্তি হয়।

দীর্ঘকাল ধরে পুনরাবৃত্তি বলতে আমরা যুদ্ধ ও লড়াইয়ের রূপের পুনরাবৃত্তিই বুঝাই। এটা একটা তথ্য, এটাকে যে-কোন লোক প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে যুদ্ধ-রূপেরই পুনরাবৃত্তি। আমাদের প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ, আর শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরক্ষা, এটা প্রথম পর্যায়। আমাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে শত্রুর প্রতিরক্ষা, আর শত্রুর প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণ, এটা দ্বিতীয় পর্যায়। এ দুই পর্যায় হচ্ছে প্রত্যেক 'পরিবেষ্টন ও

দমন' অভিযানের মধ্যে লড়াইয়ের রূপের পুনরাবৃত্তি।

যুদ্ধের ও লড়াইয়ের বিষয়বস্তুর কিন্তু নিছক পুনরাবৃত্তি হয় না, বরং প্রত্যেকবারই তা ভিন্ন হয়। এটাও একটা তথ্য এবং যে-কোন লোক তা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে। এখানে এটা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিবারই 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আকার হয়ে ওঠে আরও বৃহত্তর, পরিস্থিতিটি হয়ে ওঠে জটিলতর, আর লড়াই হয়ে ওঠে আরও তীব্রতর।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, উত্থান-পতন থাকবে না। কারণ শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের পরে লালফৌজ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল, দক্ষিণের ঘাঁটি এলাকাগুলো সব খোয়া গিয়েছিল, লালফৌজ উত্তর-পশ্চিমে সরে এসেছিল, দক্ষিণে দেশী শত্রুকে সন্ত্রস্ত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তার আর ছিল না। ফলে, 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের আকার ক্ষুদ্রতর হয়েছে, পরিস্থিতি সহজতর হয়েছে এবং লড়াইয়ের তীব্রতা কমেছে।

লালফৌজের পরাজয়ের অর্থ কি? রণনীতিগতভাবে বলতে গেলে, পরাজয় শুধু তখনই বলা যায় যখন 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়, এবং তখনও সেটাকে আংশিক ও সাময়িক পরাজয় মাত্র বলা যায়। কারণ, গৃহযুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের অথ হচ্ছে গোটা লালফৌজের ধ্বংস। কিন্তু এটা বাস্তবক্ষেত্রে ঘটেনি। বিস্তীর্ণ ঘাঁটি এলাকা হস্তচ্যুত হওয়া ও লালফৌজের সরে যাওয়াটা সাময়িক ও আংশিক পরাজয়, চিরকালীন ও পূর্ণ পরাজয় নয়, যদিও এই আংশিক পরাজয়ের ফলে পার্টি-সদস্যসংখ্যার, সৈন্যবাহিনীর ও ঘাঁটি এলাকার শতকরা ৯০ ভাগ হারাতে হয়েছিল। এই স্থানান্তরকে আমরা বলি আমাদের প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক রূপ, আর আমাদের প্রতি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকে বলি তার আক্রমণের ধারাবাহিক রূপ। অর্থাৎ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা প্রতিরক্ষার বদলে আক্রমণ করতে পারিনি, বরং শত্রুদের আক্রমণ আমাদের প্রতিরক্ষাকে ভেঙে দিয়েছিল, যার ফলে আমাদের প্রতিরক্ষা পরিবর্তিত হয়েছে পশ্চাদপসরণে, আর শত্রুর আক্রমণ পরিবর্তিত হয়েছে পশ্চাদ্ধাবনে। কিন্তু লালফৌজ যখন একটা নতুন এলাকায় পৌঁছে গেল, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা যখন কিয়াংসী প্রদেশ ও অন্যান্য স্থান থেকে সরে শেনসী প্রদেশে এলাম, তখন আবার নতুন করে দেখা দিল 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের

পুনরাবৃত্তি। সেই কারণেই আমরা বলি যে, লালফৌজের রণনীতিগত *পশ্চাদপসরণ (দীর্ঘ অভিযান) ছিল তার রণনীতিগত প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক* রূপ, শত্রুর রণনীতিগত পশ্চাদ্ধাবনটা ছিল তার রণনীতিগত আক্রমণের ধারাবাহিক রূপ।

প্রাচীন বা আধুনিক, চীনের বা বিদেশের যে-কোন যুদ্ধের মতো চীনের গৃহযুদ্ধেরও লড়াই করার দুটিমাত্র মৌলিক রূপ রয়েছে—আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা। চীনের গৃহযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হল 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের দীর্ঘমেয়াদী পুনরাবৃত্তি এবং আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা – লড়াই করবার এই দুটি রূপের দীর্ঘমেয়াদী পুনরাবৃত্তি, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দশ হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের মহান রণনীতিগত স্থানান্তরের (দীর্ঘ অভিযান বা Long March)[১৬] ঘটনা।

শত্রুর পরাজয়ও একই রকমের। শত্রুর রণনীতিগত পরাজয়ের অর্থ এই যে, তার 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান আমাদের আঘাতে ভেঙে পড়ে, আমাদের প্রতিরক্ষা আক্রমণে পরিণত হয় ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিরক্ষায় পরিণত হয় এবং আর একটা 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান শুরু করবার জন্যে তাকে পুনর্বার সৈন্যশক্তি সংগঠিত করে নিতে হয়। আমাদের মতো শত্রুকে তেমন দশ হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের রণনীতিগত স্থানান্তরের পথ নিতে হয়নি, কারণ সে গোটা দেশেরই শাসক এবং আমাদের থেকে সে অনেক বেশি শক্তিশালী। তবু তার সৈন্যবাহিনীর আংশিক অপসরণ ঘটেছে। কোন কোন ঘাঁটি এলাকায় লালফৌজের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শত্রু নিজের শ্বেত ঘাঁটি থেকে আমাদের পরিবেষ্টন ভেঙে বেরিয়ে শ্বেত এলাকায় অপসরণ করেছে নতুন আক্রমণ সংগঠিত করবার জন্য, এ রকম ঘটনাও ঘটেছিল। গৃহযুদ্ধের মেয়াদ যদি বর্ধিত হয় এবং লালফৌজের বিজয়গুলি যদি অধিকতর ব্যাপক হয়ে ওঠে, তাহলে এ ধরনের ঘটনা আরও বেশি ঘটবে। কিন্তু লালফৌজ যে ফললাভ করতে পারে, শত্রু সেই রকমের ফললাভ করতে পারে না, কারণ জনগণের সমর্থন সে পায় না, আর তার অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ঐক্য নেই। তারা যদি লালফৌজের দীর্ঘ দূরত্বের স্থানান্তরকে অনুকরণ করে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

১৯৩০ সালে লি লি-সান লাইনের যুগে, কমরেড লি লি-সান চীনের গৃহযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতিটি বুঝতে পারেননি, আর সেই কারণে তিনি এই

নিয়মটিকে দেখতে পাননি যে, এই যুদ্ধের গতিধারায় দীর্ঘকাল ধরে চলছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলি ও সেগুলির পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি (সে সময় পর্যন্ত হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকায় তিনটি এবং ফুচিয়ানে দুটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ঘটে গেছে)। তাই দেশব্যাপী বিপ্লবে দ্রুত বিজয়লাভের প্রয়াসে লালফৌজের শৈশবাবস্থাতেই তিনি লালফৌজকে উহান শহর আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন এবং আদেশ দিলেন দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করার। তাই তিনি করে বসলেন 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের ভুল।

একইভাবে, ১৯৩১-৩৪ সালের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদীরাও 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তির নিয়মে বিশ্বাস করত না হুপে-হোনান-আনহুই সীমান্ত ঘাঁটি এলাকায় তথাকথিত 'সহায়ক বাহিনী'[১৭] তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। সেখানকার কোন কোন নেতৃস্থানীয় কমরেড মনে করতেন যে, তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের পরাজয়ের পরে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী একটা নিছক সহায়ক বাহিনী হয়ে পড়েছে এবং লালফৌজের উপরে আরও আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে প্রধান বাহিনী হিসেবে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদেরই যুদ্ধে নামতে হবে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে রচিত রণনীতিই হচ্ছে যে, লালফৌজকে উহান শহর আক্রমণ করতে হবে। এটা কিয়াংসীর কোন কোন কমরেডদের অভিমতের সঙ্গে নীতিগতভাবে মেলে—এইসব কমরেড নানছাংয়ের ওপরে আক্রমণ করবার জন্য লালফৌজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, আলাদা আলাদা ঘাঁটি এলাকার সংযোগ সাধনের তাঁরা বিরোধিতা করতেন, শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনবার রণকৌশলের তাঁরা বিরোধিতা করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, কোন প্রদেশে বিজয়লাভ করাটা নির্ভর করে প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান প্রধান শহরগুলিকে দখল করার উপরে। তাঁরা আরও মনে করতেন যে 'পঞ্চম "পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযান-বিরোধী সংগ্রামটি হবে উপনিবেশের পথের সঙ্গে বিপ্লবের পথের নির্ধারক লড়াই' ইত্যাদি ইত্যাদি। হুপে-হোনান-আনহুই সীমান্ত এলাকায় চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান-বিরোধী সংগ্রামে এবং কিয়াংসীর কেন্দ্রীয় এলাকায় পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান-বিরোধী সংগ্রামে অবলম্বিত ভুল লাইনের উৎস ছিল এই বামপন্থী' সুবিধাবাদ। আর এই 'বাম' সুবিধাবাদ শত্রুর গুরুতর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মুখে লাল-ফৌজকে অক্ষম করে ফেলেছিল এবং চীনা বিপ্লবের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল।

প্রতিরক্ষাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করা লালফৌজের কোনমতেই উচিত নয়—এই অভিমতটিও সম্পূর্ণ ভুল, এবং যে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তিকে অস্বীকার করে, তার সঙ্গে এই অভিমতটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে আক্রমণাত্মক—এই কথাটা একদিকে অবশ্য ঠিক। বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধকে এর জন্ম থেকে বৃদ্ধিতে, ছোট থেকে বড় হওয়াতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুপস্থিতি থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেওয়াতে, লালফৌজের অনুপস্থিতি থেকে লালফৌজের সৃষ্টিতে, আর বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার অনুপস্থিতি থেকে সেগুলোর সংস্থাপনে অবশ্যই আক্রমণাত্মক থাকতে হবে এবং রক্ষণশীল হতে পারবে না, রক্ষণশীলতাবাদের ঝোঁকগুলোর বিরোধিতা অবশ্যই করতে হবে।

বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে আক্রমণাত্মক, কিন্তু তার প্রতিরক্ষা ও পিছু হটাও রয়েছে—এইভাবে বললেই শুধু সম্পূর্ণ ঠিক হবে। আক্রমণ করবার জন্যই প্রতিরক্ষা করা, এগিয়ে যাবার জন্যই পিছু হটা, সম্মুখ-ফ্রন্টে এগিয়ে যাবার জন্য পার্শ্বভাগে যাওয়া, সোজা পথে যাবার জন্যই বাঁকা পথ ধরা—বহু ব্যাপারের বিকাশলাভের প্রক্রিয়ায় এগুলো অনিবার্য, সামরিক ব্যাপারে তো নিশ্চয়ই এমনি হবে।

উপরোল্লিখিত মন্তব্য দুটির প্রথমটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে, কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে এলে তা ঠিক হবে না। উপরন্তু রাজনীতিগতভাবেও এটা মাত্র একটি পরিস্থিতিতেই (বিপ্লব যখন এগিয়ে চলছে) ঠিক, কিন্তু অন্য পরিস্থিতিতে নিয়ে এলে (বিপ্লব যখন পিছু হটতে থাকে: ১৯০৬ সালের রাশিয়ার মতো[১৮] এবং ১৯২৭ সালের চীনের মতো বিপ্লবে যখন সামগ্রিক পিছু হটা ঘটে; অথবা ১৯১৮-সালের ব্রেষ্ট-লিতভস্ক সন্ধির[১৯] সময়কার রাশিয়ার মতো বিপ্লব যখন আংশিকভাবে পিছু হটে তখন) তা ঠিক হবে না। শুধু দ্বিতীয় মন্তব্যটিই হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্ভুল সত্য। ১৯৩১-৩৪ সালের যে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ যান্ত্রিকভাবে সামরিক প্রতিরক্ষাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগের বিরোধিতা করেছিল তা নিছক শিশুসুলভ চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছুই নয়।

'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের পুনরাবৃত্তি কবে শেষ হবে? আমার মতে গৃহযুদ্ধের মেয়াদকাল যদি বর্ধিত হয়, তাহলে এই পুনরাবৃত্তি তখনই শেষ হবে যখন আমাদের ও শত্রুর শক্তির তুলনায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে।

লালফৌজ যখন শত্রুর থেকে বেশি শক্তিশালী হবে, তখনই এই পুনরাবৃত্তিটা শেষ হবে। তখন আমরাই শত্রুর বিরুদ্ধে পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান চালাব, আর সে তখন এই অভিযানের বিরোধিতা করার চেষ্টা করবে, কিন্তু লালফৌজ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, সে রকমের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে শত্রুকে রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা সুযোগ দেবে না। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তখন 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তি একেবারে শেষ না হলেও মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

রণনীতিগত প্রতিরক্ষা

এই শিরোনামায় আমি নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির আলোচনা করতে চাই: (১) সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষা; (২) 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি, (৩) রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ; (৪) রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ; (৫) পাল্টা আক্রমণ শুরু করার সমস্যা; (৬) সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করার সমস্যা; (৭) চলমান যুদ্ধ; (৮) দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ; এবং (৯) নির্মূলীকরণের যুদ্ধ।

১। সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষা

প্রতিরক্ষার বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি কেন? ১৯২৪-২৭ সালের চীনের প্রথম জাতীয় যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার পরে, বিপ্লব খুবই তীব্র ও নিষ্ঠুর শ্রেণী-যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। শত্রু গোটা দেশই শাসন করত আর আমাদের ছিল কেবল কিছু ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনী। তাই গোড়া থেকেই শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলোকে ভেঙে দেওয়ার সাথে নিবিড়-ভাবে সংযুক্ত রয়েছে আমাদের আক্রমণ। আর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান-গুলোকে আমরা ভেঙে দিতে সমর্থ হব কিনা, এর উপরই পুরোপুরি নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যতের বিকাশ। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলোকে ভেঙে দেবার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে প্রায়শঃই আঁকাবাঁকা, এবং যেমন সোজা ও সরাসরি বলে আশা করা যায় তেমন সোজা ও সরাসরি নয়। প্রথম ও গুরুতর

সমস্যা হচ্ছে, কি করে আমাদের শক্তিকে সংরক্ষণ করা যায় এবং শত্রুকে পরাস্ত করবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করা যায়। অতএব, লালফৌজের সামরিক কার্যকলাপে রণনীতিগত প্রতিরক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে জটিল ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

আমাদের গত দশ বছরের যুদ্ধের মধ্যে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার সমস্যায় প্রায়শঃই দুটি বিচ্যুতি ঘটতো: একটি ছিল শত্রুকে ছোট করে দেখা, আর অন্যটি ছিল তার ভয়ে সন্ত্রস্ত হওয়া।

শত্রুকে ছোট করে দেখার ফলে বহু গেরিলা বাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং লালফৌজ কয়েকবার শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলোকে ভেঙে দতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী যখন সবেমাত্র সৃষ্ট হল, তখন সেই বাহিনীর নেতারা শত্রুর ও আমাদের নিজেদের পবিস্থিতির প্রায়ই সঠিকভাবে মূল্য নির্ধারণ করতে পারত না। কোন একটা স্থানে আকস্মিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে নিজেদের জয়লাভ হয়েছিল বলে অথবা শ্বেত বাহিনীতে বিদ্রোহ সংগঠিত করতে সফল হয়েছিল বলে তারা শুধু ক্ষণস্থায়ী অনুকূল পরিস্থিতিটাই দেখতে পেয়েছিল, অথবা যদিও পরিস্থিতি গুরুতর কিন্তু তারা তা দেখতে পায়নি। তাই এইভাবে প্রায়শঃই তারা শত্রুকে ছোট করে দেখত। অপরদিকে, নিজেদের দুর্বলতার (অভিজ্ঞতার অভাব, শক্তির স্বল্পতা) উপলব্ধিও তাদের ছিল না। শত্রু যে শক্তিশালী এবং আমরা যে দুর্বল—এটা ছিল একটা বাস্তব ঘটনা, তবুও কেউ কেউ এ নিয়ে ভাবতে চাইত না, শুধু আক্রমণের বুলিই আওড়াতো, কিন্তু প্রতিরক্ষা ও পশ্চাদপসরণের কথা মুখেও আনত না। এইভাবে নিজেদের তারা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে নিরস্ত্র করে ফেলে তাদের কার্যকলাপকে ভুল পথে চালিত করেছিল। এই কারণেই বহু গেরিলা বাহিনী পরাজিত হয়।

একই কারণে যেসব ক্ষেত্রে লালফৌজ শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান-গুলিকে ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত হল কোয়াংতুং প্রদেশের হাইফেং-লুফেং এলাকায় ১৯২৮ সালে লালফৌজের পরাজয়[20], আর কুওমিনতাঙ বাহিনী যে নিছক সহায়ক বাহিনী—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সামরিক কার্যকলাপ পরিচালনার ফলে শত্রুর চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে ১৯৩২ সালের হুপে-হোনান-আনহুই সীমান্ত এলাকার লালফৌজের স্বচ্ছন্দভাবে

কার্যকলাক চালনার ক্ষমতা হারানো।

শত্রুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হবার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত বহু আছে।

শত্রুকে যারা ছোট করে দেখত, তাদের বিপরীতে কেউ কেউ আবার শত্রুকে খুব বড় করে দেখত আর নিজেদের শক্তিকে দেখত খুব ছোট করে। সুতরাং তারা অপ্রয়োজনীয় পশ্চাদপসরণের নীতি অবলম্বন করেছিল এবং অনুরূপভাবেই প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে নিজেদেরকে নিরস্ত্র করে ফেলেছিল। এর ফলে গেরিলা বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল বা লালফৌজের কোন কোন যুদ্ধাভিযান ব্যর্থ হয়েছিল অথবা ঘাঁটি এলাকা হারাতে হয়েছিল।

ঘাঁটি এলাকা হারানোর সবচেয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে কিয়াংসীতে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এলাকা হারাতে হয়েছিল। দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ভুলের উৎপত্তি। নেতারা শত্রুকে বাঘের মতো ভয় করেছিল, সর্বত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খাড়া করেছিল, প্রতি পদে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ চালাতে তারা সাহস করল না, অথচ সেটা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনকই হতো। এমনকি শত্রুবাহিনীকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে এনে ঘেরাও করে নিশ্চিহ্ন করার সাহসও তারা করল না। ফলে গোটা ঘাঁটি এলাকা হাতছাড়া হয়ে গেল আর লালফৌজকে বারো হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথে দীর্ঘ অভিযান চালাতে হল। তবু এই ধরনের ভুল ঘটার আগে সাধারণতঃ শত্রুকে ছোট করে দেখার 'বাম' ভুল ঘটে থাকত। ১৯৩২ সালে প্রধান প্রধান শহরগুলিকে আক্রমণ করার সামরিক হঠকারিতাটা ছিল পরে শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মোকাবিলা করার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষার লাইন অবলম্বনের মূল উৎস।

শত্রুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হবার চরমতম দৃষ্টান্ত ছিল পশ্চাদপসরণবাদের 'চাং কুও-থাও লাইন'। হুয়াংহো নদীর পশ্চিমে লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট-আর্মির পশ্চিম রুট বাহিনীর পরাজয়ই[২১] হচ্ছে এই লাইনের চূড়ান্ত দেউলিয়াপনা।

সক্রিয় প্রতিরক্ষার অন্য নাম হচ্ছে আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা বা নির্ধারক লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা। নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষাকে নির্ভেজাল প্রতিরক্ষাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বা নিছক প্রতিরক্ষা বলা যায়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষা হচ্ছে বস্তুতঃ একটা মেকি প্রতিরক্ষা, আর কেবল সক্রিয় প্রতিরক্ষাই হচ্ছে প্রকৃত প্রতিরক্ষা—পাল্টা আক্রমণ ও আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যজনিত

প্রতিরক্ষা যতদূর আমি জানি. প্রাচীন বা আধুনিক যুগে, চীনে বা বিদেশে এমন কোন মূল্যবান সামরিক গ্রন্থ বা এমন কোন অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান রণবিশারদ নেই, যা বা যিনি রণনীতিতে ও রণকৌশলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করেন না। শুধু নিরেট নির্বোধ বা উন্মাদ ব্যক্তিই নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষাকে মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ হিসেবে বক্ষে ধাণ করে থাকে। তবু দুনিয়ায় এমন লোকও আছে, যারা এই ধরণের কাজও করে। এটা হচ্ছে যুদ্ধ চালনার মধ্যে একটা ভুল, এটা সামরিক ব্যাপারে রক্ষণশীলতার অভিব্যক্তি। আমাদের দৃঢ়ভাবে তার বিরোধিতা করা উচিত।

নবীন ও দ্রুত উন্নয়নশীল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর, অর্থাৎ জার্মানী ও জাপানের রণবিশারদরা প্রচণ্ডভাবে রণনীতিগত আক্রমণের সুবিধের পক্ষে ঢাক পেটায়, আর রণনীতিগত প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করে। এ ধরনের চিন্তা চীনা বিপ্লবী যুদ্ধের ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপযোগী। জার্মানী ও জাপনী সাম্রাজ্যবাদী রণবিশারদদের মতে, প্রতিরক্ষার একটা গুরুতর দুর্বলতা হচ্ছে—লোকজনের মনোবলকে অনুপ্রাণিত করার বদলে এটা লোকজনের মনোবলকে কাঁপিয়ে দেয়। যেসব দেশে শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র এবং যুদ্ধ যেখানে শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর, এমনকি শুধু প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীরই উপকার সাধন করে, সেইসব দেশের ক্ষেত্রে এটা খাটে। কিন্তু আমাদের অবস্থা ভিন্ন। বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলোকে রক্ষা করার ও চীনকে রক্ষা করার শ্লোগান দিয়ে আমরা জনগণের ব্যাপকতম সংখ্যাধিক্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি একমন একপ্রাণ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য, কারণ আমরা হচ্ছি উৎপীড়িত ও আক্রমণের শিকার। গৃহযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজও প্রতিরক্ষার পন্থা ব্যবহার করে শত্রুদেরকে পরাজিত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যখন আক্রমণের জন্য শ্বেত রক্ষীদের সংগঠিত করেছিল, শুধু যে তখনই সোভিয়েতকে রক্ষা করার শ্লোগান দিয়ে তারা যুদ্ধ চালিয়েছিল তাই নয়, এমনকি অক্টোবর অভ্যুত্থানের জন্য যখন প্রস্তুতি চলছিল তখনও সামরিক সমাবেশ করা হয়েছিল রাজধানী রক্ষা করার শ্লোগান দিয়ে। সমস্ত ন্যায় যুদ্ধে প্রতিরক্ষা রাজনীতিগত শত্রুদের ওপরে একটা আচ্ছন্নতাই শুধু সৃষ্টি করে না, অধিকন্তু যুদ্ধে যোগদান করবার জন্য জনসাধারণের পশ্চাৎপদ অংশকেও জাগিয়ে তুলতে পারে।

মার্কস বলেছিলেন, একবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হলে আক্রমণে এক

মুহূর্তের জন্যও বিরতি দেওয়া চলবে না[২২]। এর অর্থ হল, শত্রুর অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগে হঠাৎ অভ্যুত্থান করবার পরে জনসাধারণ অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে বা পুনরুদ্ধার করতে সুযোগ দেবেন না, এই মুহূর্তটিকে ব্যবহার করেই দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশক্তি যখন প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় থাকে তখন তাকে আঘাত করা উচিত। আর যে বিজয় অর্জিত হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, শত্রুকে ছোট করে দেখা উচিত নয়, শত্রুর ওপর আক্রমণ চালনায় ঢিলে দেওয়া অথবা এগিয়ে যেতে ইতস্ততঃ করা উচিত নয়, এবং শত্রুকে ধ্বংস করবার সুযোগ ফস্কে যেতে দেওয়া উচিত নয়, তাহলে বিপ্লব পরাজিত হবে। এটা ঠিক। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, যখন শত্রুপক্ষ ও আমাদের পক্ষ উভয়েই সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত, এবং শত্রু উৎকৃষ্ট অবস্থায় থেকে আমাদের উপর চাপ দিচ্ছে, তখনও আমাদের বিপ্লবীদের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। আস্ত বোকাই কেবল এমন ধারণা পোষণ করে।

সামগ্রিকভাবে দেখলে, এ পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধটি হল কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে আক্রমণ। কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে এ যুদ্ধ শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেবার রূপ নিয়েছে।

সামরিকভাবে বলতে গেলে, আমাদের এ যুদ্ধ হচ্ছে পর্যায়ক্রমে প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ। আমাদের পক্ষে আক্রমণ প্রতিরক্ষার আগেই ঘটুক বা পরেই ঘটুক, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ মূল কথাটা হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেওয়া। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেবার আগে পর্যন্ত প্রতিরক্ষা চলতে থাকে আর তার পরেই শুরু হয় আক্রমণ—এটা হচ্ছে একই বিষয়ের দুটি পর্যায়। আর শত্রুর একটা 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে তার অন্য একটা 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে। এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে আক্রমণের পর্যায়ের চেয়ে প্রতিরক্ষা পর্যায়ই অধিকতর জটিল ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেমন করে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেওয়া যায়, তার বহু সমস্যাই এতে জড়িত। এখানকার মৌলিক নীতি হচ্ছে সক্রিয় প্রতিরক্ষাকে স্বীকার করা আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করা।

আমাদের গৃহযুদ্ধের কথা বলতে গেলে, লালফৌজের শক্তি যখন শত্রুর

শক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে, সাধারণভাবে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার তখন আমাদের দরকার হবে না। তখন আমাদের নীতি হবে কেবল রণনীতিগত আক্রমণ। এই ধরনের পরিবর্তন নির্ভর করবে শত্রুর ও আমাদের শক্তিস্থিতির সামগ্রিক পরিবর্তনের ওপর। সেই সময়ে অবশিষ্ট প্রতিরক্ষা হবে শুধু আংশিক চরিত্রের।

২। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি

শত্রুর একটি পরিকল্পিত 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি না থাকলে আমরা নিশ্চয়ই একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় গিয়ে পড়তে বাধ্য হব। প্রস্তুত না হয়ে তাড়াহুড়ো করে কোন লড়াইয়ে লেগে গেলে জয়লাভের নিশ্চয়তা থাকবে না। তাই, শত্রু যখন 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে, তখন আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিহার্য হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি করা। আমাদের বাহিনীর মধ্যে এ ধরনের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠেছিল, তা শিশুসুলভ ও হাস্যকর।

এখানে একটা কঠিন সমস্যা আছে, যা নিয়ে সহজেই তর্কবিতর্ক ঘটতে পারে। সেটা হল—আমরা কখন আমাদের আক্রমণ শেষ করব এবং শত্রুর নতুন 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি-পর্যায়ে যাব? যখন আমরা বিজয়-সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ চালাই, আর শত্রু যখন প্রতিরক্ষায় লিপ্ত থাকে, তখন শত্রু তার পরবর্তী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের জন্য গোপনে গোপনে প্রস্তুতি চালায়, আর তাই আর কখন তার আক্রমণ শুরু হবে আমাদের পক্ষে তা জানা কঠিন। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের প্রস্তুতির কাজ যদি খুবই আগে আগে শুরু করা হয়, তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী আক্রমণের থেকে পাওয়া সুবিধা ও লাভ কমে যেতে বাধ্য। আবার তাতে কখনো কখনো লালফৌজ ও জনগণের উপরও কিছু অনিষ্টকর প্রভাব দেখা দিতে পারে। কারণ প্রস্তুতি পর্যায়ের মুখ্য কর্মব্যবস্থা হচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতি আর তারজন্য রাজনৈতিক সক্রিয়করণ। কোন কোন সময়ে যদি খুবই আগে প্রস্তুতি শুরু হয় তাহলে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পরেও

শত্রুর দেখা না পেয়ে আমাদের আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করতে বাধ্য হতে হবে। কখনো কখনো আবার আমরা যখন নতুন আক্রমণ শুরু করছি, ঠিক সেই সময়ে শত্রু তার আক্রমণ শুরু করে দেবে, ফলে আমরা একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ব। তাই প্রস্তুতি শুরু করবার উপযুক্ত মুহূর্তটি বেছে নেওয়া হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শত্রুর ও আমাদের নিজেদের অবস্থার দিকে এবং উভয়ের সম্পর্কের দিকে যথাযোগ্য দৃষ্টি রেখে এই মুহূর্তটিকে স্থির করতে হবে। শত্রুর অবস্থা জানাবার জন্য আমাদের তার রাজনৈতিক, সামরিক ও আর্থিক অবস্থা এবং শত্রু এলাকার জনমত সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এইসব তথ্যের বিশ্লেষণ করার সময়ে আমাদের অবশ্যই শত্রুর গোটা শক্তিকে পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা করতে হবে। তার অতীতের পরাজয়ের ব্যাপ্তিকে অতিরঞ্জিত করে দেখা চলবে না, কিন্তু আবার তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, তার আর্থিক অসুবিধা ও অতীতের পরাজয়ের প্রভাব ইত্যাদিকে হিসেবে ধরতে না পারাও আমাদের অবশ্যই চলবে না। আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে, অতীতের জয়ের ব্যাপ্তিকে অতিরঞ্জিত করা চলবে না, এবং আমাদের অতীতের জয়ের প্রভাবকে পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা না করাও অবশ্যই চলবে না।

তবুও, প্রস্তুতি শুরু করার উপযুক্ত মুহূর্ত সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে, খুব দেরী করে শুরু করার চেয়ে বরং খুব আগে শুরু করাটাই ভাল। কারণ খুব দেরী করে শুরু করার চাইতে খুব আগে শুরু করাটাই ক্ষতি কম, আর তার সুবিধা হচ্ছে এই যে, আগে থাকতে প্রস্তুত হতে পারলে সম্ভাব্য বিপদকে এড়ানো যায় এবং মৌলিকভাবে আমরা অপরাজেয় অবস্থায় দাঁড়াতে পারি।

প্রস্তুতি পর্যায়ের প্রধান প্রধান সমস্যা হচ্ছে লালফৌজের পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতি, রাজনৈতিক সক্রিয়করণ, নতুন সৈন্য ভর্তি করা, আর্থিক ও খাদ্য-প্রস্তুতি এবং রাজনৈতিক শত্রুদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তার সমস্যা ইত্যাদি।

লালফৌজের পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতির অর্থ হল, যাতে লালফৌজ নিজের পশ্চাদপসরণের পক্ষে অসুবিধাজনক এমন দিকে চলে না যায়, আক্রমণ করতে অতি বেশি দূর অগ্রসর না হয় এবং খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। শত্রুর বিরাটাকার আক্রমণের পূর্বক্ষণে লালফৌজের প্রধান শক্তিকে অবশ্যই এই সবের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই সময় লালফৌজের প্রধানতঃ নজর দিতে হবে যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করার[১৩], সরবরাহাদি সংগ্রহ করার, নিজেদের শক্তি বাড়ানোর

ও নিজেদের সৈন্যদের ট্রেনিং দেবার পরিকল্পনাগুলোর উপার।

রাজনৈতিক সক্রিয়করণ হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অর্থাৎ লালফৌজের লোকজনকে এবং ঘাঁটি এলাকার জনগণকে আমাদের এটা স্পষ্টভাবে, দৃঢ়ভাবে ও পুরোপুরিভাবে বলে দিতে হবে যে, শত্রুর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন, আর সে আক্রমণে জনগণের গুরুতর ক্ষতি হবে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর দুর্বলতা, লালফৌজের অনুকূল অবস্থা জয়লাভে আমাদের অদাম্য সংকল্প এবং আমাদের কাজকর্মের দিকনির্দেশ ইত্যাদি তাদেরকে জানাতে হবে। শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরোধিতা ও ঘাঁটি এলাকাকে রক্ষা করার জন্যে সংগ্রাম করতে লালফৌজ ও সমস্ত জনগণকে আমাদের আহ্বান জানাতে হবে। সামরিক দিক থেকে যা গোপনীয় তা বাদে, রাজনৈতিক সক্রিয়করণ খোলাখুলিভাবে করতে হবে, আর বিপ্লবের স্বার্থকে যারা সমর্থন করতে পারে এমন সবার মধ্যে এই কাজ করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে কর্মীদেরকে বোঝানো।

নতুন সৈন্যদের ভর্তি করতে হবে দুটি বিবেচনার ভিত্তিতেঃ একদিকে জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান এবং জনসংখ্যার অবস্থা বিবেচনা করতে হবে, অন্যদিকে লালফৌজের সেই সময়কার অবস্থা এবং 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে গোটা যুদ্ধাভিযানে লালফৌজের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতিকেও বিবেচনা করতে হবে।

আর্থিক সমস্যা ও খাদ্য সমস্যা যে প্রত্যাভিযানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একথা বলাই বাহুল্য। শত্রুর অভিযানের মেয়াদকাল যে বর্ধিত হতে পারে তা আমাদের বিবেচনা করা উচিত। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সমগ্র সংগ্রামে মুখ্যতঃ লালফৌজের জন্য এবং তা ছাড়া বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ন্যূনতম পরিমাণের হিসাব ধরা উচিত।

রাজনীতিগত বিরোধীদের সম্পর্কে সতর্ক না হলে চলবে না। কিন্তু তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অত্যধিক শঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আমাদের উচিত নয়। জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী কৃষকের সঙ্গে ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে হবে, মুখ্যতঃ রাজনীতির দিক থেকে তাদের কাছে ব্যাপারটাকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, তারা যাতে নিরপেক্ষ থাকে

তার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরে নজর রাখার জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করতে হবে। কেবল অতি অল্পসংখ্যক সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারের মতো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কতটুকু বিজয়লাভ করবে তা প্রস্তুতি পর্যায়ের কর্তব্য যে পরিমাণে সুসম্পন্ন হবে, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শত্রুকে ছোট করে দেখার কারণে প্রস্তুতিতে শিথিল হওয়া এবং শত্রুর আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে হতভম্ব হওয়া—এ দুটিই হচ্ছে অনিষ্টকর ঝোঁক এবং দৃঢ়ভাবে এর বিরোধিতা করা উচিত। আমাদের প্রয়োজন হল উৎসাহী কিন্তু স্থিরচিত্ত মনোবৃত্তির, ব্যাপক কিন্তু শৃংখলাপূর্ণ কাজের।

৩। রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ

নিকৃষ্ট সৈন্যবাহিনী যখন উৎকৃষ্ট শত্রুবাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং বিবেচনা করে যে, সেই আক্রমণকে দ্রুত চুরমার করা অসম্ভব, তখন সেই সৈন্যবাহিনী নিজের সৈন্যশক্তিকে সংরক্ষিত করে রাখার ও শত্রুকে পরাজিত করবার সুযোগের প্রতীক্ষা করবার জন্য যে সুপরিকল্পিত রণনীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাই হচ্ছে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ। সামরিক হঠকারীরা কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এই ধরণের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে; 'গেটের বাইরেই শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে'—এই তাদের অভিমত।

আমরা সবাই জানি যে, দুজন মুষ্টিযোদ্ধা যখন লড়ে, তখন সুচতুর মুষ্টিযোদ্ধা প্রায়শঃই গোড়াতে এক কদম পিছু হটে যায় আর নির্বোধ মুষ্টিযোদ্ধাটি প্রচণ্ডভাবে হঠকারীর মতো সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রথম মুহূর্তেই তার যাবতীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করে ফেলে, আর শেষে প্রায়ই দেখা যায় যে লোকটি গোড়াতে একটু পিছু হটে গিয়েছিল, তারই আঘাতে নির্বোধ মুষ্টিযোদ্ধাটি ধরাশায়ী হয়েছে।

শুই হু চুয়ান[২৪] নামক উপন্যাসে হুং নামে একজন ড্রিলমাষ্টর ছাই চিনের গৃহে লিন ছুংকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল, এবং কয়েকবার হুংকার করে ডাকল—'আয় দেখি,' 'আয় দেখি,' 'আয় দেখি'। লিন ছুং পিছিয়ে যেতে লাগল এবং শেষে হুংয়ের দুর্বল দিকটা ধরতে পেরে এক ঘুসিতে তাকে মাটিতে ফেলে দিল।

বসন্ত ও শরতের 'ছুনছিউ' যুগে লু ও ছী রাজ্য[২৫] দুটির মধ্যে যুদ্ধ বাধল। ছী রাজ্যের-সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়বার আগেই লু-এর রাজা ডিউক চুয়াং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে বাধা দিল ছাও কুই। চুয়াং তখন 'শত্রু যখন ক্লান্ত হয়, আমরা তখন অক্রমন করি'—এই রণকৌশল গ্রহণ করে ছী'র বাহীনীকে পরাজিত করেছিল। চীনের সামরীক ইতিহাসে এটা হচ্ছে দুর্বল সৈন্যবাহিনীর শক্তিশালি সৈন্যবাহিনীকে পারাজিত করার একটা সুবিদিত দৃষ্টান্ত। ইতিহাসবিদ ছিউ মিংয়ের[২৬] বর্ণনা দেখুন :

বসন্তে ছী-বাহিনী আক্রমন করল। রাজা যুদ্ধ করতে চাইলেন। এমন সয়ম ছাও কুই তাঁর দর্শনপ্রার্থী হল। তাঁর প্রতিবেশিগণ বলল, 'এটা হচ্ছে মাংসখাদক অধিকারিদের কাজ, তুমি তাতে নাক গলাচ্ছ কেন ?' ছাও উত্তর দিল, 'মাংসখাদিকগণ নির্বোধ, তারা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করতে পারে না।' সে রাজার সঙ্গে দেখা করল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, যুদ্ধ করতে যেয়ে আপনি কিসের উপর নির্ভর করবেন ?' রাজা উত্তরে বললেন, খাদ্য ও পোশাকাদি সকলই স্বীয় উপভোগের জন্য রাখবার সাহস আমার কোনদিনই নেই, পরন্তু সবদাই সকলের সঙ্গে তা আমি ভাগ করে গ্রহণ করে থাকি।' ছাও কুই বলল, 'এমন তুচ্ছ ভিক্ষাদান সকলের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারে না। প্রজাগণ আপনার অনুসরণ করবে না।' রাজা বললেন, 'দেবগনকে প্রাপ্যের কম যজ্ঞপশু, মণি বা পট্টবস্ত্র নৈবেদ্য উৎসর্গ করে প্রতারণা করবার সাহস রাখি না, আমি আস্থা রাখি।' ছাও বলল, 'এই যৎসামান্য ভক্তি কোন স্থান অর্জন করবে না। দেবতারা আপনাকে আশীর্বাদ করবেন না।' রাজা বললেন, ছোট-বড় যাবতীয় অভিযোগ পুংখানুপুংখরূপে বিচার করতে অক্ষম হলেও আমি নিয়তই সত্য নিবেদন করে থাকি।' ছাও কুই বলল, 'এতে জনগণের প্রতি আপনার গভীর অনুরাগকেই প্রমাণ করছে, অতএব আপনি যুদ্ধ করতে পারেন। আপনি যখন যুদ্ধে যাবেন আমি তখন আপনার অনুগমন করতে চাই। রাজা আর ছাও কুই একই রথে চড়ে ধুদ্ধযাত্রা করলেন। ছাংশাওতে যুদ্ধ বাধল। আক্রমন আরম্ভ করবার জন্য রাজা দুন্দুভি নিনাদ করতে উদ্যত হলে ছাও কুই বলল, 'এখনই নয়।' ছী-বাহিনী তিন বার দুন্দুভি নিনাদ করবার পর ছাও কুই বলল, 'এখন আমারা দুন্দুভি নিনাদ করতে পারি।' ছী-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। রাজা পলায়মান শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন

করতে চাইলেন। আবারও ছাও কুই বলল, 'এখনই নয়।' ছাও রথ থেকে নীচে নেমে শত্রুর রথচক্রের রেখাগুলি পরীক্ষা করে দেখল। তারপর রথের হাতলের উপর আরোহণ করে দূরের পানে তাকিয়ে দেখে বলল, 'এখন আমার পশ্চাদ্ধাবন করতে পারি।' অতএব, ছী বাহিনীর পশ্চাবদ্ধান করা আরম্ভ হল। বিজয় অর্জিত হবার পরে রাজা ছাও কুইকে জিজ্ঞাসা করলেন যে' কেন সে এমন পরামর্শ দিয়েছিল। ছাও উত্তর দিল, 'লড়াই নির্ভর করে সাহসের উপরে। প্রথম দুন্দুভি নিনাদে সাহস সঞ্চারিত হয়, দ্বিতীয় দুন্দুভি নিনাদে তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, আর তৃতীয় দুন্দুভি নিনাদে সাহস সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে পড়ে। শত্রুর সাহস যখন নিঃশেষ হয়ে পড়ল আমাদের সাহস তখন প্রচণ্ড, অতএব, আমরা জয়লাভ করলাম। কিন্তু বড় রাজ্যের সামরিক চাল অনুধাবন করা কঠিন, গুপ্তস্থান থেকে আকস্মিক আক্রমনের আশঙ্কা আমি করেছিলাম। কিন্তু যখন আমি দেখলাম যে, শত্রুর রথচক্রের রেখাগুলি এলোমেলো হয়ে চলে গেছে এবং দূরে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাকের পতাকাগুলি ঝুলে পড়েছে, তখনই আমরা পশ্চাদ্ধাবনের পরামর্শ দিয়েছিলাম।'

একটা দুর্বল রাষ্ট্রের একটা শক্তিশালি রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করবার ঘটনা ছিল এটা। বিবরণে বলা হয়েছে যুদ্ধের আগে রাজনৈতিক প্রস্তুতির কথা—জনগণের আস্থা অর্জনের কথা। পাল্টা আক্রমনের পর্যায়ে প্রবেশ করার পক্ষে অনুকূল রণক্ষেত্রে—ছাংশাও-এর কথা। এই বিবরণে বর্ণনা করা হয়েছে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার পক্ষে অনুকূল সময়ের কথা অর্থাৎ শত্রুর সাহস যে সময়ে নিঃশেষ হয়ে পড়েছে আর আমাদের সাহস পূর্ণ হয়ে উঠেছে—সেই সময়ের কথা। এবিবরণে আরও বলা হয়েছে পশ্চাদ্ধাবন শুরু করার অনুকূল মুহূর্তের কথা, অর্থাৎ যে মুহূর্তে শত্রুর রথচক্রের রেখাগুলি এলোমেলোভাবে চলে গেছে এবং তাদের পতাকাগুলি ঝুলে পড়েছে, সেই মুহূর্তের কথা। উক্ত বিবরণে বর্ণিত লড়াইটি বড় না হলেও তাতেই রণনীতিগত প্রতিরক্ষার মূলনীতিগুলির কথা বলা হয়েছে। এইসব মূলনীতি প্রয়োগ করে যুদ্ধে জয়লাভ করার বহু বাস্তব উদাহরণ রয়েছে চীনের সামরিক ইতিহাসে। ছু ও হান-এর মধ্যে ছেংকাওয়ের লড়াই[২৭], সিন ও হানের মধ্যে খুনইয়াংয়ের লড়াই[২৮], ইউয়ান শাও ও ছাও ছাওয়ের মধ্যে কুয়ানতুয়ের লড়াই[২৯], উ ও ওয়েই-এর মধ্যে ছিপি'র লড়াই[৩০], উ এবং শু'র মধ্যে ইলিংয়ের লড়াই[৩১], ছিন ও তোং-

চিনের মধ্যে ক্ষেইশুইয়ের লড়াইয়ের[৩২] মতো বিখ্যাত লড়াইগুলির প্রত্যেকটিতে যুদ্ধরত দুই পক্ষের শক্তি ছিল অসম, দুর্বলতর পক্ষ প্রথমে কিছুটা পিছু হটে গিয়েছিল, আর শত্রু আঘাত হানবার পরেই শুধু সুযোগ নিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত হেনেছিল, তাই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল।

আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালের শরৎকালে। সে সময়ে আমাদের আদৌ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। নানছাং অভ্যুত্থান[৩৩] ও ক্যুয়াংচৌ অভ্যুত্থান[৩৪] ব্যর্থ হল, আর 'শরৎকালীন ফসল' অভ্যুত্থানের[৩৫] সময়ে লালফৌজও হুনান-হুপে-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকায় কয়েকবার যুদ্ধে পরাজিত হল এবং হুনান-কিয়াংসী সীমান্তস্থ চিংকাং পার্বত্য অঞ্চলে সরে গেল। নানছাং অভ্যুত্থানের পরাজয়ের পরে যেসব সৈন্যবাহিনী অবশিষ্ট ছিল পরবর্তী বছরের এপ্রিল মাসে তারাও দক্ষিণ হুনান হয়ে চিংকাং পর্বতে সরে এল। তবু ১৯২৮ সালের মে মাস থেকেই গেরিলাযুদ্ধের যে মৌলিক নীতিগুলি উদ্ভূত হয়েছিল, সেগুলি ছিল তখনকার অবস্থার উপযোগী এবং প্রকৃতিতে সরল। তা হল ১৬টি চীনা শব্দের সূত্র—'শত্রু এগোয়' আমরা পিছিয়ে যাই। শত্রু শিবির ফেলে, আমরা হয়রান করি। শত্রু ক্লান্ত হয়, আমরা আক্রমণ করি। শত্রু পালায়, আমরা পিছনে ধাওয়া করি।' এই ১৬টি চীনা শব্দের সূত্রের সামরিক মূলনীতিকে লি লি-সান লাইনের পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি স্বীকার করেছিল। পরে আমাদের সামরিক কার্যকলাপের মূলনীতি আরও বিকাশলাভ করেছে। কিয়াংসী ঘাঁটি এলাকায় প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে 'শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনার' নীতিটিকে উপস্থাপিত করা হল, আর কাজেও লাগানো হল সফলভাবে। শত্রুর তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে যখন ব্যর্থ করা হল, তখন লাল-ফৌজের সামরিক কার্যকলাপের মূলনীতিগুলো সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে সামরিক মূলনীতিগুলোর বিকাশের এক নতুন পর্যায়। এই মূল-নীতিগুলোর বিষয়বস্তুতে প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল আর রূপের দিক থেকেও অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রধানতঃ সেগুলি তাদের অতীতের সরল প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মৌলিক নীতি হিসেবে আগেকার সেই ১৬টি চীনা শব্দের সূত্রই থেকে গেছে। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মৌলিক নীতিগুলো গেঁথে রয়েছে ১৬টি চীনা শব্দের সূত্রে, এ সূত্রের সামিল ছিল দুটি পর্যায়—রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত

আক্রমণ, আর প্রতিরক্ষার সময়ে এ সূত্রের সামিল ছিল রণনীতিগত পশ্চাদ-পসরণ ও রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ—এই দুটি পর্যায়ই। পরে যা যোগ করা হয়েছে তা শুধু এই সূত্রের বিকাশ।

'তৃতীয় "পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানকে বিধ্বস্ত করবার পরে একটি অথবা কয়েকটি প্রদেশে সর্বপ্রথমে বিপ্লবের বিজয় অর্জনের জন্য সংগ্রাম' শীর্ষক পার্টির প্রস্তাবের মধ্যে নীতির দিক থেকে মারাত্মক ভুল ছিল। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হবার পরে, ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু করে 'বাম' সুবিধাবাদীরা সঠিক মূলনীতিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাল এবং শেষ পর্যন্ত এই সঠিক মূলনীতিগুলি বাতিল করে দিল, আর সেগুলোর বিপরীতে পুরো আর এক গুচ্ছ তথাকথিত 'নতুন মূলনীতি' অথবা 'নিয়মিত মূলনীতি' প্রবর্তন করল। তখন থেকে আগেকার মূলনীতিগুলোকে আর নিয়মিত বলে ধরা হতো না, পরন্তু সেগুলোকে 'গেরিলাবাদ' আখ্যা দিয়ে অস্বীকার করা হতো। 'গেরিলাবাদ'-বিরোধী আবহাওয়ার প্রাধান্য পুরো তিন বৎসর ধরে বিরাজমান ছিল। এর প্রথম পর্যায়টি ছিল সামরিক হঠকারিতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে সেটা হয়ে উঠল সামরিক রক্ষণশীলতা, আর শেষ পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ে সেটা পরিণত হল পলায়নবাদে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে কুইচৌ প্রদেশের চুনই শহরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়েই শুধু এই ভুল লাইনকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হল, আর আগেকার লাইনের নির্ভুলতাকে পুনরায় স্বীকার করে নেওয়া হল। কিন্তু এটাকে অর্জন করার জন্য কতই না মূল্য দিতে হয়েছে।

যেসব কমরেড তীব্রভাবে 'গেরিলাবাদের' বিরোধিতা করেছিল তারা বলেছিল: শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনাটা ভুল, কারণ এমনি করে বহু জায়গা আমাদের ছেড়ে আসতে হল। আগে এইভাবে বিজয় অর্জিত হলেও এখনকার অবস্থা কি অনেক তফাৎ হয়ে যায়নি? অধিকন্তু, জায়গা ছেড়ে না দিয়ে শত্রুকে পরাজিত করাটা কি আরও বেশী ভাল ছিল না? শত্রুকে তার নিজ এলাকায় বা তার ও আমাদের এলাকার সীমান্তে পরাজিত করাটা কি আরও বেশী ভাল ছিল না। আগের নীতিগুলিতে 'নিয়মিত' বলে কিছুই ছিল না, আর সেগুলি ছিল শুধু গেরিলা বাহিনীর দ্বারা ব্যবহৃত পদ্ধতি। এখন আমাদের নিজস্ব রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে এবং আমাদের লালফৌজ একটা নিয়মিত বাহিনী হয়ে উঠেছে। চিয়াং

কাই-শেক ও আমাদের মধ্যে যে যুদ্ধ, তা হচ্ছে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার যুদ্ধ এবং দুটি বিরাট সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার যুদ্ধ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো উচিত নয়, আর 'গেরিলাবাদের' সমস্ত কিছুই পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করা উচিত। নতুন নীতিগুলো 'পুরোমাত্রায় মার্কসবাদী' এবং পূর্বের নীতিগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল পাহাড়-পর্বতে অবস্থিত গেরিলা বাহিনীগুলোর দ্বারা, এবং পাহাড়-পর্বতে তো আর মার্কসবাদ ছিল না। নতুন নীতিগুলো ছিল পুরানো নীতিগুলোর বিপরীত। সেগুলি হল: 'একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে লড়াও, দশ জনকে একশ জনের বিরুদ্ধে লড়াও, নির্ভীকভাবে ও কৃতসংকল্প হয়ে লড়ে যাও, বিজয়কে কাজে লাগিয়ে সরাসরি শত্রুকে ধাওয়া কর', সকল ফ্রন্টে আঘাত হান', 'প্রধান প্রধান শহরগুলো দখল কর', আর, 'দুই "মুষ্টি" দিয়ে একই সঙ্গে দুদিক থেকে আঘাত হান'। শত্রু যখন আক্রমণ করত তখন তার মোকাবিলার পদ্ধতি ছিল: 'প্রবেশদ্বারের বাইরে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখা', 'প্রথমে আঘাত হেনে প্রাধান্য অর্জন করা', 'আমাদের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে খান খান হতে না দেওয়া', 'এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে না দেওয়া,' আর 'সৈন্যশক্তিকে ছয়টি পথে বিভক্ত করে দেওয়া', 'বিপ্লবের পথ ও উপনিবেশের পথের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই', সংক্ষিপ্ত দ্রুত আকস্মিক আঘাত হানা, দুর্গ যুদ্ধ, শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ, 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ', আরও ছিল বিরাট পশ্চদ্ভাগব্যবস্থার নীতি ও নিরঙ্কুশ কেন্দ্রীভূত পরিচালনা; আর সর্বশেষে এসবের পরিণতি দাঁড়ায় বৃহদাকারে 'ঘর-বাড়ী গুটিয়ে চলে যাওয়ায়'। এইসব বিষয়গুলোকে যে মেনে নিত না, তাকেই শাস্তি দেওয়া হতো, তাকেই সুবিধাবাদী বলে চিহ্নিত করা হতো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব তত্ব এবং প্রয়োগ নিঃসন্দেহে সবই ভুল। সেগুলো হচ্ছে আত্ম-মুখীবাদ। সেইগুলো ছিল অনুকূল অবস্থায় পেটি-বুর্জোয়াদের বিপ্লবী উন্মাদনা ও অসহিষ্ণুতার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু দুর্দশার সময়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী সেগুলি পর্যায়ক্রমে বেপরোয়া হঠকারিতায়, রক্ষণশীলতায় ও পলায়নবাদে পরিণত হয়েছিল। সেগুলি ছিল গোঁয়ারগোবিন্দ আর আনাড়ীদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ। সেসবের ধারেকাছে মার্কসবাদের লেশমাত্র গন্ধও ছিল না। সেগুলো ছিল প্রকৃতই মার্কসবাদবিরোধী।

এখানে আমরা শুধু রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এটাকে কিয়াংসীতে বলা হয় 'শত্রুকে প্রলুব্ধ করে এলাকার গভীরে

টেনে আনা', আর সেচুয়ানে বলা হয় 'ফ্রন্টকে সঙ্কুচিত করা'। অতীতের কোন সামরিক তাত্ত্বিক বা প্রয়োগকারীই এ কথা অস্বীকার করেননি যে, এটা হচ্ছে সেই কর্মনীতি, যা প্রবলতর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে দুর্বল বাহিনীকে যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। একজন বিদেশী রণবিশারদ এ কথা বলেছেন যে, রণনতিগতভাবে প্রতি-রক্ষাত্মক লড়াই চালনায় শুরুতে প্রতিকূল অবস্থায় নির্ধারক লড়াইকে সাধারণতঃ এড়িয়ে যাওয়া হয় আর অবস্থা অনুকূল হলেই শুধু লড়াই করতে নামা হয়। এটা সম্পূর্ণ ঠিক, এর সঙ্গে যোগ করবার আর আমাদের কিছুই নেই।

রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের লক্ষ্য হচ্ছে, সামরিক শক্তি সংরক্ষিত করে রাখা ও পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরি হওয়া। পাশ্চাদপসরণ দরকার, কারণ শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণের মুখে এক পাও পশ্চাদপসরণ না করার অর্থ হচ্ছে অনিবার্যভাবেই নিজের সামরিক শক্তির সংরক্ষণকে বিপদাপন্ন করা। যাই-হোক, অতীতে অনেকেই পশ্চাদপসরণের ঘোর বিরোধী ছিল। এটাকে তারা 'নিছক প্রতিরক্ষার সুবিধাবাদী লাইন' বলে মনে করত। আমাদের ইতিহাসে প্রমাণ করেছে যে. তাদের এ বিরোধিতাটা ছিল পুরোপুরি ভুল।

পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই নিজেদের অনুকূল কিন্তু শত্রুর প্রতিকূল কতকগুলো শর্ত বাছাই করে নিতে হবে অথবা সৃষ্টি করে নিতে হবে, যাতে করে শত্রুর ও আমাদের শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটে, এবং পরে পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে প্রবেশ করা যায়।

আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা অনুসারে বলা যায় যে, পশ্চাদপসরণের পর্যায়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শর্তগুলোর মধ্যে অন্ততঃ দুটিকে নিশ্চিত করে নিলেই শুধু পরিস্থিতিকে আমাদের অনুকূল ও শত্রুর প্রতিকূল বলে মনে করা যায় এবং পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারা যায়। এই শর্তগুলো হচ্ছে ঃ

(১) জনগণ সক্রিয়ভাবে লালফৌজকে সমর্থন করেন।

(২) লড়াই করার জন্য অনুকূল অবস্থান।

(৩) লালফৌজের যাবতীয় প্রধান শক্তি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত।

(৪) শত্রুর দুর্বল স্থান খুঁজে বের করা হয়েছে।

(৫) শত্রুকে পরিশ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত করা হয়েছে।

(৬) ভুল করতে শত্রুকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে।

লালফৌজের পক্ষে প্রথম শর্তটি অর্থাৎ জনসমর্থনই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ শর্ত। এর অর্থ হচ্ছে ঘাঁটি এলাকা থাকা। অধিকন্তু এই শর্তটি পূর্ণ হলে, ৪, ৫ এবং ৬ নম্বর শর্তগুলোকে সৃষ্টি বা অর্জন করাও সহজ হয়। তাই যখন শত্রু লালফৌজের উপর বিরাটাকারের আক্রমণ চালায়, তখন লালফৌজ সর্বদাই শ্বেত এলাকা থেকে হটে ঘাঁটি এলাকায় আসে, কারণ শ্বেত বাহিনীর বিরুদ্ধে লালফৌজকে সাহায্য করতে ঘাঁটি এলাকার জনগণই সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। আবার ঘাঁটি এলাকার সীমান্ত অঞ্চল আর কেন্দ্র-অঞ্চলের মধ্যেও পার্থক্য আছে। শত্রুর কাছে খবর গোপন রাখা, পর্যবেক্ষণ, পরিবহণ, লড়াইয়ে যোগদান করা ইত্যাদি ব্যাপারে সীমান্ত অঞ্চলের চাইতে কেন্দ্র-অঞ্চলের জনগণই বেশি ভাল কাজ করতে পারেন। সেজন্য কিয়াংসীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে এমন সব অঞ্চলকে 'পশ্চাদপসরণের শেষ-স্থান' হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল, যেখানে জনসমর্থন—এই প্রথম শর্তটি ছিল সবচেয়ে ভাল বা অপেক্ষাকৃত ভাল। ঘাঁটি এলাকার এই বৈশিষ্ট্য আমাদের লালফৌজের সামরিক কার্যকলাপকে সাধারণ সামরিক কার্যকলাপ থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ধরনের করেছিল, আর সেটাই ছিল প্রধান কারণ, যার জন্য পরবর্তীকালে শত্রু যুদ্ধের দুর্গনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল।

অন্তর্লাইনে লড়াই করার একটা সুবিধাজনক অবস্থা হচ্ছে যে, পশ্চাদ-পসরণকারী সৈন্যবাহিনী নিজের পছন্দমতো অনুকূল অবস্থান বেছে নিতে পারে এবং আক্রমণকারী বাহিনীকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে লড়াই করতে বাধ্য করতে পারে। প্রবলতর বাহিনীকে পরাজিত করবার জন্য দুর্বল বাহিনীকে অনুকূল অবস্থানের শর্তকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। কিন্তু শুধু এই শর্তটাই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে অন্যান্য শর্তও থাকা চাই; এসবের প্রথমটি হচ্ছে জনসমর্থন। পরেরটি হচ্ছে এমন একটি শত্রু থাকা চাই, যাকে সহজেই পরাজিত করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, এমন এক শত্রু যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বা ভুল করেছে, অথবা অগ্রসরমান এমন এক শত্রুদল যার যুদ্ধ-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এই শর্তগুলোর অনুপস্থিতিতে অনুকূল অবস্থান থাকলেও আমাদের তাকে ত্যাগ করে নিজেদের মনোমত শর্তগুলোকে পাবার জন্য অব্যাহতভাবে পিছু হটে চলতেই হবে। শ্বেত এলাকায় যে অনুকূল অবস্থান

নেই, তা বলা যায় না, কিন্তু সেখানে সক্রিয় জনসমর্থনের অনুকূল শর্তটি আমরা পাই না। অন্যান্য শর্তাদি যদি পূরণ হয়ে না থাকে, তাহলে লালফৌজকে নিজের ঘাঁটি এলাকার দিকে পিছু হয়ে আসতেই হবে। শ্বেত এলাকা ও ঘাঁটি এলাকার মধ্যেকার পার্থক্যের মতোই ঘাঁটি এলাকার সীমান্ত-অঞ্চল ও কেন্দ্র-অঞ্চলের মধ্যেকার পার্থক্যও মোটামুটি এইরকম।

স্থানীয় বাহিনী ও শত্রুকে আটকে রাখবার সৈন্যশক্তি ছাড়া সমস্ত হানা দেবার সৈন্যশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করতে হবে—এটাই নীতি। রণ-নীতিগত প্রতিরক্ষায় রত শত্রুকে আক্রমণ করার সময়ে লালফৌজ সাধারণতঃ নিজের সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে দেয়। শত্রু একবার বিরাটাকারের আক্রমণ শুরু করলেই লালফৌজ 'কেন্দ্রাভিমুখে পশ্চাদপসরণ' করে। পশ্চাদপসরণের শেষ-স্থান সাধারণতঃ ঘাঁটি এলাকার মধ্যভাগেই নির্বাচিত হয়ে থাকে। কিন্তু অবস্থা অনুসারে কখনো কখনো আবার পুরোভাগে বা পশ্চাদ্ভাগেও থাকে। এ ধরনের কেন্দ্রাভিমুখে পশ্চাদপসরণে লালফৌজের প্রধান শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে।

প্রবলতর বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত দুর্বল বাহিনীর পক্ষে আর একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে আক্রমণের জন্য শত্রুর দুর্বলতর ইউনিটগুলোকে বেছে নেওয়া। কিন্তু শত্রুর আক্রমণের শুরুতে আমরা সাধারণতঃ জানি না শত্রুর পৃথকভাবে অগ্রসরমান সৈন্যদলগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী আর কোন্‌টিই-বা-একটু কম শক্তিশালী, কোন্‌টি সবচেয়ে দুর্বল আবার কোন্‌টি একটু কম দুর্বল। এইসব জানার জন্য পর্যবেক্ষণ করা দরকার। প্রায়ই এতে অনেক সময় লাগে। এটা হচ্ছে আর একটি কারণ যার জন্য রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ প্রয়োজন।

যদি আক্রমণকারী শত্রুর সৈন্যসংখ্যা ও শক্তি দুইই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হয়, তাহলে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন আমরা শুধু তখনই ঘটাতে পারি, যখন শত্রু আমাদের ঘাঁটি এলাকার গভীরে ঢুকে পড়েছে এবং সেখানে সমস্ত রকমের কষ্ট ভোগ করছে। তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ে চিয়াং কাই-শেকের কোন এক ব্রিগেডের চীফ অফ স্টাফ যেমন বলেছিল, 'আমাদের মোটা মোটা সৈন্যরা হয়রান হয়ে শুকিয়ে গেছে, আর শুকনো সৈন্যরা ক্লান্তিতে মরে গেছে', অথবা কুওমিনতাঙের 'পরিবেষ্টন ও দমন' বাহিনীর পশ্চিম-রুটের প্রধান সেনাপতি ছেন মিং-শু যেমন বলেছিল, 'জাতীয় বাহিনী সর্বত্র আঁধারে

হাতড়ে বেড়ায়, আর লালফৌজ সর্বত্রই প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়ায়'—ঠিক এই রকম অবস্থা তৈরী হলেই আমাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। এইরকম সময়ে শত্রুবাহিনী শক্তিশালী হলেও অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তার দুর্বল স্থানের অনেকগুলোই প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্বল হলেও লালফৌজ তার শক্তিকে সঞ্চয় করে রেখেছে আর ক্লান্ত শত্রুর জন্য নিশ্চিন্তে প্রতীক্ষা করছে। এইরকম একটা সময়ে সাধারণতঃ দুই পক্ষের মধ্যে কোন একটা পরিমাণের সমতা অর্জিত হতে পারে, বা শত্রুর চরম উৎকৃষ্টতা আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতায় এবং আমাদের চরম নিকৃষ্টতা আপেক্ষিক নিকৃষ্টতায় পরিবর্তিত হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, শত্রুবাহিনী আমাদের বাহিনীর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী বরং শত্রুর সৈন্যবাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কিয়াংসীতে তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে লড়বার সময়ে লালফৌজ চরম সীমা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করেছিল (লালফৌজকে ঘাটি এলাকার পশ্চাদ্ভাগে সমাবেশ করা হয়েছিল); এমন না করলে শত্রুকে পরাজিত করা যেত না। কারণ শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' বাহিনী তখন সংখ্যায় লালফৌজের দশ গুণেরও বেশি ছিল। সুন উ জু বলেছিলেন : 'শত্রু যতক্ষণ সতেজ থাকে তাকে এড়িয়ে চল, আর যখন সে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায় তখন তাকে আঘাত কর'। এ কথা বলতে গিয়ে তিনি শত্রুর উৎকৃষ্টতা নষ্ট করবার জন্য তাকে ক্লান্ত ও মন-মরা করে ফেলার কথাই উল্লেখ করেছিলেন।

পশ্চাদপসরণের সর্বশেষ লক্ষ্য হচ্ছে, শত্রুকে ভুল করতে প্ররোচিত করা বা তার ভুলগুলোকে খুঁজে বের করা। এ কথা উপলব্ধি করতেই হবে যে, শত্রুদের যে কোন কম্যাণ্ডার, তা সে যত বিচক্ষণই হোক না কেন, বেশ একটা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কিছু ভুলত্রুটি এড়াতে পারে না, আর তার রেখে যাওয়া সেই ফাঁকগুলোকে কাজে লাগানো আমাদের পক্ষে সব সময়েই সম্ভব। আমরা যেমন কোন কোন সময়ে নিজেরা হিসেবে ভুল করে শত্রুকে সে ফাঁকের সুযোগ নিতে দিই, শত্রুও তেমনি ভুল করতে পারে। উপরন্তু, আমরা কৌশল খাটিয়ে শত্রুকে ভুল প্রলুব্ধ করতে পারি। উদাহরণ হিসেবে, সুন উ জু যেমন 'ভান করবার' কথা বলেছেন, যেমন পূর্বদিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিমদিকে আক্রমণ করা। এইরকম করতে হলে পশ্চাদপসরণের শেষ-স্থান কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে অনমনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। কোন কোন সময়ে

পূর্বনির্ধারিত অঞ্চলে পিছু হটে গিয়েও সুযোগ নেবার মতো ফাঁক দেখা যায় না, তখন আমাদের আরও দূরে পশ্চাদপসরণ করতে হবে শত্রুর মধ্যে 'ফাঁক' দেখা দেবার সুযোগের অপেক্ষা করার জন্য।

পশ্চাদপসরণের দ্বারা আমরা যে অনুকূল অবস্থা পেতে চাই, সেটা উপরে মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, শুধু এই শর্তাদির সবগুলি উপস্থিত থাকলেই কেবল পাল্টা আক্রমণ শুরু করা যাবে। একই সময়ে এদের সবগুলির উপস্থিতি সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু প্রবলতর শত্রুর বিরুদ্ধে যে দুর্বল বাহিনী অন্তর্লাইনে লড়াই করে, তার পক্ষে শত্রুর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত অর্জন করার জন্য মনোযোগ দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে বিপরীত অভিমতগুলি ভুল।

গোটা পরিস্থিতি বিচারের ভিত্তিতেই পশ্চাদপসরণের শেষসীমা নির্ধারণ করতে হবে। আংশিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতে কোন স্থানকে আমাদের পাল্টা আক্রমণ শুরু করবার পক্ষে অনুকূল বলে মনে হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতির দিক থেকে যদি তা সুবিধাজনক না হয়, তাহলে তেমন স্থানকে পশ্চাদপসরণের শেষ সীমা হিসেবে নিবারণ করাটা সঠিক হবে না। কারণ, পরে কি কি পরিবর্তন ঘটা সম্ভব, তা পাল্টা আক্রমণ শুরু করবার সময়ে অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন, এবং আমাদের পাল্টা আক্রমণ সব সময়েই আংশিক-ভাবে শুরু হয়। কোন কোন সময়ে ঘাঁটি এলাকার সম্মুখভাগে পশ্চাদপসরণের শেষ সীমাকে নির্বাচিত করতে হয়, যেমন করা হয়েছিল কিয়াংসীতে দ্বিতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে এবং শেনসী-কানসু এলাকায় তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে। কোন কোন সময়ে সেটা ঘাঁটি এলাকার মধ্যভাগে হওয়া উচিত, যেমন হয়েছিল কিয়াংসীতে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে। অন্য সময়ে সেটাকে নির্দিষ্ট করতে হবে ঘাঁটি এলাকার পশ্চাৎ অংশে, যেমন করা হয়েছিল কিয়াংসীতে তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে। এইসবের বেলায়, আংশিক পরিস্থিতিকে সামগ্রিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিয়াংসীতে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণের সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই করেনি, কারণ আংশিক পরিস্থিতি বা সামগ্রিক পরিস্থিতি কোনটার প্রতিই তারা

মনোযোগ দেয়নি, এটা সত্যি সত্যিই ছিল বেপরোয়া ও গোঁয়ারগোবিন্দ আচরণ। পরিস্থিতি অনেকগুলো শর্ত নিয়ে গঠিত হয়। আংশিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতির সম্পর্কের কথা বিচার করতে গিয়ে শত্রু ও আমাদের উভয় পক্ষের শর্তগুলো—যা আংশিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সৃষ্টি করে, তা আমাদের পাল্টা আক্রমণ শুরু করার পক্ষে কিছু পরিমাণে অনুকূল কিনা, তার ওপরেই গড়ে তুলতে হবে আমাদের বিচার-বিবেচনার ভিত্তি।

ঘাঁটি এলাকায় পশ্চাদপসরণের শেষ সীমাকে সাধারণভাবে তিন রকমে ভাগ করা যায়, যথা সম্মুখভাগ, মধ্যভাগ ও পশ্চাৎ অংশ। এর অর্থ কি এই যে, আমরা শ্বেত এলাকায় লড়াই করতে একেবারেই অস্বীকার করি? না। কেবলমাত্র শত্রুদের বিরাটাকারের 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মোকাবিলা করতে হলেই আমরা শ্বেত এলাকায় লড়াই করতে অস্বীকার করি। শত্রুর ও আমাদের শক্তির মধ্যে যখন বিরাট অসমতা থাকে, শুধু তখনই আমাদের সামরিক শক্তিকে সংরক্ষিত করার এবং শত্রুকে পরাভূত করবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করার নীতির ভিত্তিতে ঘাঁটি এলাকায় পিছু হটে যাবার ও শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনবার পক্ষে কথা বলি, কারণ শুধু এইভাবেই কাজ করেই আমরা পাল্টা আক্রমণের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে বা খুঁজে পেতে পারি। পরিস্থিতি যদি এতটা গুরুতর না হয়, অথবা এটা যদি এতই গুরুতর হয় যে, ঘাঁটি এলাকাতেও লাল-ফৌজ পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে পারে না, অথবা পাল্টা আক্রমণ যদি অকৃতকার্য হয় এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আরও পিছু হটার দরকার হয়, তাহলে আমাদের মেনে নেওয়া উচিত যে, পশ্চাদপসরণের শেষ সীমাকে শ্বেত এলাকাতেও নির্বাচিত করা সম্ভব। অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে আমাদের এটা স্বীকার করা উচিত, যদিও অতীতে আমাদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই কম।

শ্বেত এলাকায় পশ্চাদপসরণের শেষ সীমাকেও মোটামুটিভাবে তিনটি ধরনে ভাগ করতে পারা যায়: (১) আমাদের ঘাঁটি এলাকার অগ্রে, (২) ঘাঁটি এলাকার পাশে, (৩) ঘাঁটি এলাকার পিছনে। প্রথম ধরনের শেষ সীমার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

কিয়াংসীতে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে যদি লালফৌজের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের

মধ্যে বিভেদ না ঘটত, অর্থাৎ লি লি-সান লাইন ও A-B গ্রুপ[৩৬] —এই দুটি কঠিন সমস্যা যদি না থাকত, তাহলে এটা কল্পনা করা যায় যে, আমরা কিয়ান, নানফেং ও চাংশু এই তিনটি জায়গার মধ্যেকার ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চলে আমাদের সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে পারতাম। কারণ তখন কান ও ফু নদী দুটির মধ্যবর্তী এলাকা[৩৭] দিয়ে যে শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছিল, তার সৈন্যশক্তি লালফৌজের তুলনায় খুব বেশি ছিল না (৪০,০০০-এর বিরুদ্ধে ১০০,০০০)। জনসমর্থনের দিক থেকে ওখানকার অবস্থা ঘাঁটি এলাকার চেয়ে খারাপ হলেও যুদ্ধের জন্য অবস্থানটা আমাদের পক্ষে অনুকূল ছিল। উপরন্তু তখন শত্রু পৃথক পৃথক পথে এগিয়ে আসছিল, এমন সুযোগে তাকে একে একে বিধ্বস্ত করা যেত।

দ্বিতীয় ধরনের শেষ সীমার একটা উদাহরণ ধরা যাক :

কিয়াংসীতে তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে শত্রুর আক্রমণ যদি অত বিরাট আকারে না হতো, শত্রুর একটি সৈন্যদল যদি ফুচিয়ান-কিয়াংসী সিমান্তস্থ চিয়াননিং, লিছুয়ান ও থাইনিং থেকে অগ্রসর হতো এবং আমাদের আক্রমণের পক্ষে সেই সৈন্যদলের শক্তি যদি খুব বেশি না হতো, তাহলে এটাও কল্পনা করা যায় যে, লালফৌজ পশ্চিম ফুচিয়ানের শ্বেত এলাকাতে তার সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করতে পারত এবং প্রথমেই সেই শত্রু দলটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে পারত, জুইচিন দিয়ে সিংকুও পর্যন্ত হাজার লী তাদের ঘুরে যেতে হতো না।

তৃতীয় ধরনের শেষ সীমার উদাহরণ :

কিয়াংসীতে উপরোক্ত তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, শত্রুর প্রধান বাহিনী যদি পশ্চিমদিকে না গিয়ে দক্ষিণদিকে যেত, তাহলে আমরা হয়তো হুইছাং-স্যুনউ-আনইয়ুয়ান এলাকায় (শ্বেত এলাকায়) সরে যেতে বাধ্য হয়ে শত্রুকে আরও দক্ষিণ দিকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, তারপরে লালফৌজ আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে আক্রমণ চালিয়ে লাল ঘাঁটি এলাকার অভ্যন্তরে যেতে পারত, আর সেই সময়ে উত্তরদিকে লাল ঘাঁটি এলাকায় অবস্থিত শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা খুব বেশি হতে পারত না।

কিন্তু উপরোক্ত সবগুলোই হচ্ছে মনগড়া দৃষ্টান্ত—সেগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতার

উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। সেগুলোকে অসাধারণ ব্যাপার হিসেবে গণ্য করতে হবে, সাধারণ নীতি হিসেবে ধরলে চলবে না। শত্রু যখন একটা বিরাট আকারের 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান শুরু করে, তখন আমাদের সাধারণ নীতি হচ্ছে শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনা, ঘাঁটি এলাকার মধ্যে সরে এসে লড়াই করা, কারণ শত্রুর আক্রমণকে বিধ্বস্ত করার এটাই হচ্ছে আমাদের নিশ্চিততম পদ্ধতি।

'প্রবেশদ্বারের বাইরে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবার' সপক্ষে যারা বলে, তারা রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি এই যে, পশ্চাদপসরণ করার অর্থ আমাদের ভূমি হাতছাড়া করা এবং জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা (তথাকথিত 'আমাদের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে খান খান হতে দেওয়া'), আর বাইরে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে তারা যুক্তি দেখাল যে, আমরা এক পা পিছিয়ে গেলে শত্রুর দুর্গগুলোও এক পা এগিয়ে আসবে এবং এইভাবে আমাদের ঘাঁটি এলাকা দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে এবং সেই হৃত ভূমিকে পুনরুদ্ধার করার আমাদের কোন উপায় থাকবে না। তারা বলত যে, শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনাটা অতীতে কার্যকরী হয়ে থাকলেও পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের ক্ষেত্রে শত্রুর দুর্গ-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তা কার্যকরী হবে না। তারা বলত যে, এই অভিযানের মোকাবিলা করবার একমাত্র পথ হল আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে প্রতিরোধ করা আর শত্রুর ওপরে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আকস্মিক হামলা করা।

এ ধরনের অভিমতের জবাব দেওয়া সহজ এবং আমাদের ইতিহাস তা ইতিমধ্যেই দিয়েছে। ভূমি হারানোর ব্যাপারে, এটা প্রায়ই ঘটে যে, হারিয়েই কেবল হারানোকে ঠেকাতে পারা যায়, এ হচ্ছে 'নেওয়ার জন্য প্রথমে দেওয়ার' নীতি। যা আমরা হারাই সেটা যদি ভূমি হয় এবং যা আমরা লাভ করি সেটা যদি শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ হয়, এবং আরও আমাদের ভূমির পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণ হয়, তাহলে সেটা লাভজনক ব্যাপার। বাজারের কেনাকাটায়, ক্রেতা যদি তার কিছু টাকা না 'হারায়' তাহলে সে মাল পেতে পারে না, আবার বিক্রেতা যদি তার কিছু মাল না 'হারায়' তাহলে সে টাকা পেতে পারে না। বিপ্লবী আন্দোলনে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তা হচ্ছে ধ্বংস, আর যা লাভ হয় তা হচ্ছে প্রগতিশীল গঠনকার্য। ঘুমে আর বিশ্রামে

সময়ের লোকসান ঘটে, কিন্তু তাতে আগামীকালের কাজের জন্য কর্মশক্তি অর্জিত হয়। যদিও কোন বোকা এটা না বুঝে ঘুমুতে অস্বীকার করে, তাহলে পরের দিন তার কোন কর্মশক্তি থাকবে না, আর সেটা হচ্ছে লোকসানের ব্যবসা। ঠিক এই কারণেই শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকালে আমাদের হার হয়েছে। কিছু ভূমি ছেড়ে দিতে অনিচ্ছার ফলে সমস্ত ভূমিকেই হারাতে হয়েছিল। শত্রুর সঙ্গে জিদ ধরে সামনাসামনি লড়াই করার ফলে আবিসিনিয়াও তার সমগ্র দেশ হারিয়েছিল—যদিও সেটাই তার পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল না।

জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রশ্নেও এটা খাটে। সাময়িকভাবে জনগণের এক অংশের ঘরের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে খান খান করতে দিতে অস্বীকার করলে সমস্ত জনগণের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে খান খান হবে এবং এমন অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকবে। সাময়িক প্রতিকূল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হলে তার জন্য ভীষণ মূল্য দিতে হবে অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। অক্টোবর বিপ্লবের পরে, রুশ বলশেভিকরা যদি 'বামপন্থী কমিউ-নিস্টদের' অভিমত অনুসারে জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে সই করতে অস্বীকার করত, তাহলে নবজাত সোভিয়েতকে অকালমৃত্যুর বিপদে পড়তে হতো[৩৮]।

এ ধরনের 'বাম' অভিমত যা অপাতঃদৃষ্টিতে বিপ্লবী বলে মনে হয়, তার উৎপত্তি হয়েছে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অসহিষ্ণুতা থেকে এবং ক্ষুদে উৎপাদক-কৃষকদের সঙ্কীর্ণ রক্ষণশীলতা থেকে। কোন সমস্যা বিচার করতে গেলে তারা শুধু তার একটা অংশই দেখে, সামগ্রিক পরিস্থিতিটির পরিপূর্ণ ছবিটা দেখতে তারা অক্ষম। আগামীকালের স্বার্থের সঙ্গে আজকের স্বার্থের অথবা সমগ্রের স্বার্থের সঙ্গে অংশের স্বার্থের সংযোগসাধন করতে তারা অনিচ্ছুক। কিন্তু সমস্ত আংশিক ও সাময়িক জিনিসই তার মরণপণ করে আঁকড়ে ধরে থাকে। সতরং, বর্তমান বাস্তব অবস্থা অনুসারে দেখতে গেলে, যে আংশিক ও সাময়িক জিনিস বর্তমান গোটা পরিস্থিতির পক্ষে ও গোটা পর্যায়ের পক্ষে অনুকূল, বিশেষ করে যে আংশিক ও সাময়িক জিনিস নির্ধারক তাৎপর্যসম্পন্ন, সে সব বস্তুগুলোকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত। অন্যথায়, আমরা স্বতঃস্ফূর্ততার বাড়াবাত না দেওয়ার নীতির সমর্থক হয়ে পড়ব। এই কারণেই পশ্চাদপসরণের জন্য অবশ্যই একটা শেষ সীমা থাকা দরকার। কিন্তু,

এ ক্ষেত্রে ক্ষুদে উৎপাদকদের অদূরদর্শিতার উপর কোনোমতেই আমাদের নির্ভর করা উচিত নয়। বলশেভিকদের বিচক্ষণতা আমাদের শিখে নিতে হবে। আমাদের খোলা চোখের দৃষ্টিশক্তিই যথেষ্ট নয়, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য আমাদের অবশ্যই নিতে হবে। মার্কসবাদী পদ্ধতিই হচ্ছে রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারের দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

অবশ্য, রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের অসুবিধা আছে। পশ্চাদপসরণ শুরু করবার উপযুক্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করা, পশ্চাদপসরণের শেষ সীমা বাছাই করে নেওয়া, রাজনীতিগতভাবে কর্মীদের ও জনগণকে বুঝিয়ে বলা—এ সবই হচ্ছে কঠিন সমস্যা, যার সমাধান অবশ্যই করতে হবে।

পশ্চাদপসরণ শুরু করবার উপযুক্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করার সমস্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিয়াংসীতে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে আমাদের পশ্চাদপসরণটিকে ঠিক যে সময়ে করা হয়েছিল, যদি তখন তা না করা হতো, অর্থাৎ যদি আমরা দেরী করতাম, তাহলে অন্ততঃ আমাদের জয়ের মাত্রাটা কমে যেত। ঠিক সময়ের আগে অথবা পরে পশ্চাদপসরণ ক্ষতিকর। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, খুব আগে পশ্চাদপসরণ করার তুলনায় খুব দেরীতে পশ্চাদপসরণ করার ক্ষতি বেশি। যথাসময়ে পশ্চাদপসরণ করলে উদ্যোগক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে থাকবে, এটা আমাদের পশ্চাদপসরণের শেষ সীমায় পৌঁছানোর পর আমাদের বাহিনীকে পুনরায় দলবদ্ধ করার ব্যাপারে এবং ক্লান্ত শত্রুর জন্য নিশ্চিন্তে প্রতীক্ষা করে পাল্টা আক্রমণের পথে পা বাড়াবার ব্যাপারে খুবই সহায়ক হয়ে থাকে। কিয়াংসীতে শত্রুর প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করার যুদ্ধাভিযানে আমরা আস্থার সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে পেরেছিলাম। শুধু তৃতীয় যুদ্ধাভিযানের সময়ে এক জায়গায় জড়ো হবার জন্য লালফৌজকে তড়িঘড়ি অনেক পথ ঘুরে ঘুরে যেতে হয়েছিল—ফলে তারা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কারণ দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযানে অমন শোচনীয়ভাবে পরাজয় ভোগ করার পরেই এত তাড়াতাড়ি শত্রু যে একটা নতুন আক্রমণ শুরু করবে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি (দ্বিতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের লড়াই শেষ করি ১৯৩১ সালের ২৯শে মে, আর চিয়াং কাই-শেক তার তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান শুরু করে ১লা জুলাই তারিখে)। পশ্চাদপসরণ শুরু

করবার উপযুক্ত মুহূর্তটা স্থির করা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রহের উপর, এবং শত্রুপক্ষের ও আমাদের পক্ষের সাধারণ পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনার উপর। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্যায় শুরু হওয়ার উপযুক্ত মুহূর্ত নির্ধারণের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বনের কথা আগে বলা হয়েছে, এখানেও ঠিক সেই একইরকম পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের ব্যাপারে, যখন কর্মী ও জনগণের কোন অভিজ্ঞতা থাকে না, এবং সামরিক নেতৃত্বের মর্যাদা যখন এমন উচ্চ স্তরের হয়ে উঠেনি যে সে নেতৃত্ব রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের বিষয় নির্ধারণের কর্তৃত্বকে অল্প কয়েকজনের হাতে এমনকি একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে দিতে পারে এবং সেই একই সময়ে কর্মীদের আস্থাও অর্জন করতে পরে, তখন রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কর্মী ও জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়াটা খুবই কঠিন সমস্যা। কর্মীদের অভিজ্ঞতা ছিল না এবং রণনীতিগত পশ্চাদ-পসরণের উপর তাদের বিশ্বাস ছিল না বলে প্রথম ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের শুরুতে এবং পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সমগ্র প্রক্রিয়ায় এই প্রশ্নে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল! প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে লি লি-সান লাইনের প্রভাব দেখা দিয়েছিল বলে কর্মীদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করানোর আগে পর্যন্ত তাদের অভিমত পশ্চাদপ-সরণের পক্ষে ছিল না, বরং আক্রমণ চালানোর পক্ষে ছিল। চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে সামরিক হঠকারিতার প্রভাবে কর্মীরা পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ছিল। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, কর্মীরা প্রথমে অব্যাহতভাবে সামরিক হঠকারিতাবাদী দৃষ্টিকোণ আঁকড়ে ছিল—যা শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনার বিরোধী ছিল, পরে তা সামরিক রক্ষণশীলতাবাদে পরিণত হল। অন্য একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, চাং কুও-তাও লাইনের অনুসরণকারীরা এটা বিশ্বাস করত না যে, তিব্বতীয় এবং হুই জাতির[৩৯] অঞ্চলে আমাদের ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা অসম্ভব, দেওয়ালে মাথা ঠোকার পরেই কেবল তারা এ কথাটা বিশ্বাস করেছে। কর্মীদের পক্ষে অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজনীয়, আর সত্যিই বিফলতাই হচ্ছে সফলতার জননী। কিন্তু অন্য লোকদের অভিজ্ঞতাকেও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার। সব

ব্যাপারেই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতীক্ষায় থাকা এবং তা অর্জিত হওয়ার আগে নিজের মতামতে একগুঁয়েভাব লেগে থেকে অন্যের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করাটা হচ্ছে নিছক 'সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ'। এর জন্য যুদ্ধে আমাদের কম ক্ষতি হয়নি।

অভিজ্ঞতা ছিল না বলে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জনগনের অবিশ্বাস কিয়াংসীতে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে যত প্রচল ছিল, আর কোনদিনই তত প্রবল ছিল না। সেই সময়ে কিয়ান, সিংকুও ইয়োংফেং জেলার স্থানীয় পার্টি-সংগঠনগুলো ও জনসাধারণ সবাই লালফৌজের পশ্চাদপসরণের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম থেকে অভিজ্ঞতালাভের পর, পরবর্তী কয়েকটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে এ ধরনের কোন সমস্যাই আর দেখা দেয়নি। সকলেই বিশ্বাস করেছে যে, আমাদের ঘাঁটি এলাকার ভূমি হারানোটা ও জনগণের দুঃখদুর্দশাটা হচ্ছে সাময়িক ব্যাপার এবং সকলেরই এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেবার ক্ষমতা লালফৌজের আছে। কিন্তু, জনগণের বিশ্বাস থাকা না থাকাটা কর্মীদের বিশ্বাস থাকা না থাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, আর তাই প্রধান এবং প্রথম কাজ হচ্ছে কর্মীদেরকে বিশ্বস করানো

রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের সমগ্র ভূমিকা হচ্ছে পাল্টা আক্রমণের দিকে আমাদের যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এবং রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ হচ্ছে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার প্রথম পর্যায় মাত্র। পরবর্তী পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে জয়লাভ করা যাবে কিনা, তা-ই হচ্ছে গোটা রণনীতির নির্ধারক চাবিকাঠি।

৪। রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ

চরম উৎকৃষ্টতর শত্রুর আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য আমরা নির্ভর করি আমাদের রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের পর্যায়ে সৃষ্ট পরিস্থিতির উপরে—যে পরিস্থিতিটি আমাদের পক্ষে অনুকূল, আর শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল, এবং এই পরিস্থিতিটি শত্রুর আক্রমণ শত্রুর পরিস্থিতি থেকে পৃথক। বিভিন্ন শর্তের দ্বারা এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সবই উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু, আমাদের পক্ষে অনুকূল ও শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল এইসব শর্ত ও পরিস্থিতির উপস্থিতির অর্থ এই নয় যে, আমরা ইতিমধ্যেই শত্রুকে পরাজিত করেছি। এ ধরনের শর্ত ও পরিস্থিতি জয়-পরাজয়ের সম্ভাব্যতা যোগায়, কিন্তু জয় বা পরাজয়ের বাস্তবতা তাতে গড়ে ওঠে না, দুটি সৈন্যবাহীর কারুর কাছেই সেগুলি সত্যিকারের জয় বা পরাজয় এখনো এনে দেয়নি। জয়-পরাজয় স্থির করতে দুটি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটা নির্ধারক লড়াইয়ের দরকার। কে জয়ী, কে পরাজিত—এ প্রশ্নের সমাধান শুধুমাত্র নির্ধারক লড়াইই করতে পারে। এটাই হচ্ছে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ের একমাত্র কর্তব্য। পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত পর্যায়, এবং প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের শেষ পর্যায়ও বটে। সক্রিয় প্রতিরক্ষা বলতে মুখ্যত: এই নির্ধারক চরিত্র সম্পন্ন রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণেরই উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

শুধু যে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের পর্যায়েই শর্ত ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা নয়, পরন্তু পাল্টা আক্রমণের পর্যায়েও অব্যাহতভাবে তার সৃষ্টি হতে থাকে। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে এই সময়ের শর্ত ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে আগের পর্যায়ের মত নয়।

আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে যা একই থাকতে পারে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই ঘটনা যে, পাল্টা আক্রমণের সময়ে শত্রুসৈন্যর ক্লান্তিবৃদ্ধি ও অধিকতর সংখ্যাহ্রাস হচ্ছে আগের পর্যায়ে তাদের ক্লান্তি ও সংখ্যাহ্রাসের ধারাবাহিক রূপ মাত্র।

কিন্তু পুরোপুরি নতুন শর্ত এবং পরিস্থিতিও দেখা দিতে বাধ্য। ধরা যাক, যখন শত্রু যুদ্ধে একবার বা কয়েকবার পরাজয় বরণ করে, তখন আমাদের পক্ষে অনুকূল ও শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল শর্ত শত্রুর ক্লান্তি ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, পরন্তু শত্রু পরাজয় ভোগ করছে এমন নতুন অবস্থাও দেখা দেবে। পরিস্থিতিতেও নতুন পরিবর্তন ঘটবে। শত্রু যখন বিশৃঙ্খলভাবে তড়িঘড়ি তার সৈন্য বিন্যাস পুনর্গঠিত করে, ভুল চাল দিতে শুরু করে, তখন দুটি সৈন্যবাহিনীর আপেক্ষিক শক্তির বৈষম্য স্বভাবতঃই আর আগের মতো থাকবে না।

কিন্তু শত্রুর বদলে আমরাই যদি একবার বা কয়েকবার পরাজিত হই, তাহলে শর্ত ও পরিস্থিতি বিপরীত দিকে বদলে যাবে। অর্থাৎ শত্রুর পক্ষে

অবস্থার প্রতিকূলতা কমে যাবে, আর আমাদের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেবে, এমনকি বাড়বেও। এই অবস্থাটাও হবে সম্পূর্ণ নতুন—পুরানো অবস্থার থেকে এটা হবে একেবারে অন্যরকম।

এ দুইয়ের যে-কোন পক্ষের পরাজয়ই প্রত্যক্ষ ও দ্রুতভাবে পরাজিত পক্ষকে একটা নতুন প্রয়াস নিতে বাধ্য করবে—পরাজিত পক্ষ বিপর্যয় এড়াবার এবং নিজের প্রতি প্রতিকূল ও শত্রুর প্রতি অনুকূল নতুন শর্ত ও পরিস্থিতির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করবে এবং প্রতিপক্ষের উপর চাপ দেওয়ার জন্য এমন শর্ত ও পরিস্থিতি নতুন করে সৃষ্টির চেষ্টা করবে, যা নিজের পক্ষে অনুকূল এবং শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল।

আর ঠিক এর বিপরীত হবে বিজয়ী পক্ষের প্রয়াস। সে নিজের জয়টাকে বাড়াবার ও শত্রুর আরও বেশী ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, যাতে করে নিজের পক্ষে অনুকূল শর্ত ও পরিস্থিতি আরও বৃদ্ধি বা বিকাশ লাভ করে, প্রতিপক্ষ যাতে প্রতিকূল অবস্থার হাত থেকে নিজে মুক্ত করতে এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে না পারে।

এইভাবে, উভয় পক্ষের জন্যই নির্ধারক লড়াইয়ের পর্যায়ের সংগ্রামটি গোটা যুদ্ধের বা গোটা যুদ্ধাভিযানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তীব্র, সবচেয়ে বেশী জটিল, সবচেয়ে বেশী পরিবর্তনশীল এবং সবচেয়ে বেশী দুরূহ ও কষ্টকর হয়ে থাকে। পরিচালনা করার পক্ষে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন সময়।

পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে অনেক সমস্যা থাকে, আর তাদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে পাল্টা অক্রমণ শুরু করার সমস্যা, সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার সমস্যা চলমান লড়াইয়ের সমস্যা, দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের সমস্যা ও নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের সমস্য ইত্যাদি।

পাল্টা আক্রমণেই হোক বা আক্রমণেই হোক, এইসব সমস্যা সম্পর্কিত নীতিগুলির মৌলিক চরিত্রে কোন পার্থক্যই নেই। এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে, পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে আক্রমণ।

তবুও পাল্টা আক্রমণ ও আক্রমণ ঠিক এক জিনিস নয়। যখন শত্রু আক্রমণ করে, তখন আমরা পাল্টা আক্রমণের নীতি প্রয়োগ করি। আর যখন শত্রু প্রতিরক্ষা করে, তখন আমরা আক্রমণের নীতি প্রয়োগ করি। এই অর্থে, পাল্টা আক্রমণ ও আক্রমণের মধ্যে কতকগুলো পার্থক্য রয়েছে।

এই কারণে, যদিও রণনীতিগত প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত অধ্যায়ের পাল্টা

আক্রমণের অংশে লড়াই করার অনেক সমস্যারই আলোচনা করা হয় এবং পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্য রণনীতিগত আক্রমণ সম্পর্কিত অধ্যায়ে শুধুমাত্র অন্যান্য সমস্যার আলোচনা করা হবে, তবুও বাস্তব প্রয়োগের সময়ে, পাল্টা আক্রমণ ও আক্রমণের যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তাদের কোনটিকেই উপেক্ষা করা আমাদের উচিত হবে না।

৫। পাল্টা আক্রমণ শুরু করা।

পাল্টা আক্রমণ শুরু করার সমস্যা হচ্ছে 'প্রথম লড়াই' বা 'প্রারম্ভিক লড়াইয়ের' সমস্যা।

রণনীতিগত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা রণনীতিগত আক্রমণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, বহু বুর্জোয়া রণবিশারদ প্রথম লড়াইয়ের সময়ে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়। অতীতে আমরাও গুরুত্বের সঙ্গে এই সমস্যাটাকে পেশ করেছি। কিয়াংসী প্রদেশে শত্রুর পাঁচটি 'পরিবেষ্টন ও দমন, অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আমাদেরকে প্রচুর অভিজ্ঞতা যুগিয়েছে—সেগুলির পর্যালোচনা করলে আমরা অবশ্যই উপকৃত হব।

প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে শত্রু প্রায় এক লাখ সৈন্য নিয়োজিত করেছিল। তারা কিয়ান-চিয়ানিনিং লাইনে আটটি কলামে বিভক্ত হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে লালফৌজের ঘাঁটি এলাকার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। তখন লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার কিয়াংসী প্রদেশের নিংতূ জেলার হুয়াংপি আর সিয়াওপু অঞ্চলে তারা সৈন্য সমাবেশ করেছিল।

পরিস্থিতিটা ছিল এই রকম :

(১) 'দমন' বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক লাখের বেশী ছিল না এবং তাদের কেউই চিয়াং কাই শেকের নিজস্ব সৈন্য ছিল না, আর সামগ্রিক পরিস্থিতিও খুব গুরুতর ছিল না।

(২) শত্রুবাহিনীর লুও লিনের পরিচিত ডিভিশনটি কিয়ান শহর রক্ষা করছিল। সেই ডিভিশনটি অবস্থিত ছিল কান নদীর অপর পারে অর্থাৎ পশ্চিম পারে।

(৩) কুং পিং-ফান, চাং হুই-জান আর থান তাও-ইউয়ানের অধীনে তিনটি শত্রু ডিভিশন এগিয়ে এসে কিয়ানের দক্ষিণ-পূর্বস্থ ও নিংতুর

উত্তরপশ্চিমস্থ ফুতিয়েন-তুংকু-লুংকাং-ইউয়ানথৌ অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। চাং হুই-জানের ডিভিশনের প্রধান বাহিনী ছিল লুংকাংয়ে আর থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশনের প্রধান বাহিনী ছিল ইউয়ানথৌতে। A-B গ্রুপের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ফুতিয়েন ও তুংকুর অধিবাসীরা এক সময়ে লালফৌজকে বিশ্বাস করত না এবং লালফৌজের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তাই ফুতিয়েন আর তুংকুকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করাটা ছিল অসঙ্গত।

(৪) লিউ হো-তিংয়ের পরিচালিত শত্রু ডিভিশনটি ছিল বহু দূরে—ফুকিয়ান প্রদেশের শ্বেত এলাকার চিয়ানিনিংয়ে; সেই বাহিনীটা অবশ্যই যে কিয়াংসী প্রদেশে প্রবেশ করবে তা কিন্তু মনে হয়নি।

(৫) মাও পিং-ওয়েন আর স্যু খে-সিয়াংয়ের পরিচালিত দুইটি শত্রু ডিভিশন কুয়াংছাং ও নিংতুর মধ্যেকার থৌপি-লুওখো-তুংশাও অঞ্চলে ঢুকে পড়েছিল। থৌপি একটা শ্বেত এলাকা, লুওখো ছিল গেরিলা অঞ্চল, তোংশাওতে থাকত A-B গ্রুপ, এখান থেকে শত্রুর কাছে খবর বেরিয়ে যাওয়া খুব সম্ভব ছিল। অধিকন্তু, আমরা যদি প্রথমে এই জায়গায় মাও পিং-ওয়েন ও স্যু খে-সিয়াংকে আক্রমণ করে পশ্চিমদিকে আক্রমণ চালাতাম, তাহলে চাং হুই-জান, থান তাও ইউয়ান আর কুং পিং-ফানের নেতৃত্বাধীন তিনটি শত্রু ডিভিশন একত্রে মিলে যেতে পারত এবং জয়লাভ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠত, সমস্যার শেষ মীমাংসাও আর হতো না।

(৬) চাং হুই-জান ও থান তাও ইউয়ানের পরিচালনাধীন দুটি ডিভিশন হল 'পরিবেষ্টন ও দমন' বাহিনীর প্রধান শক্তি, আর তারা ছিল 'পরিবেষ্টন ও দমন' বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও কিয়াংসী প্রদেশে গভর্ণর লু তি-পিংয়ের নিজস্ব বাহিনী, আর চাং হুই-জান ছিল যুদ্ধফ্রন্টের প্রধান কম্যাণ্ডার। এই দুটি ডিভিশনকে ধ্বংস করতে পারলে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে মূলতঃ চূর্ণবিচূর্ণ করা যেত। এই দুটি ডিভিশনের প্রত্যেকটিতে প্রায় ১৪ হাজার সৈন্য ছিল, চাং হুই-জান তার ডিভিশনকে ভাগ করে দুই জায়গায় রেখেছিল। তাই প্রত্যেকবার একটি ডিভিশন করে আক্রমণ করলে আমরা চরম উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকতাম।

(৭) লুংকাং-ইউয়ানথৌ এলাকায় অবস্থিত ছিল চাং হুই-জান ও থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশন দুটির প্রধান শক্তি, আর তা ছিল আমাদের

সৈন্যশক্তি সমাবেশিত হওয়ার জায়গার কাছাকাছি। সেখানে জনসমর্থন ভালই ছিল, তাই আমরা গোপনে গোপনে শত্রুর কাছে এগিয়ে যেতে পারতাম।

(৮) লুংকাংয়ে ভৌগোলিক অবস্থা আমাদের যুদ্ধের অনুকূল ছিল, আর ইউয়ানথৌকে আক্রমণ করা সহজ ছিল না। যদি শত্রু সিয়াওপুতে আমাদের আক্রমণ করত তাহলে আমরা সেখানেও ভাল অবস্থায় পেয়ে যেতাম।

(৯) লুংকাংয়ের দিকে আমরা বৃহত্তম সংখ্যক সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করতে পারতাম। লুংকাংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে একশ লীর কম দূরত্বের মধ্যে সিংকুও অবস্থিত, সেখানে আমাদের একটা স্বতন্ত্র ডিভিশন ছিল, তার সৈন্যসংখ্যা এক হাজারের উপরে। এই ডিভিশন ঘুরে শত্রুর পিছনে গিয়ে কৌশলী অভিযান চালাতে পারত।

(১০) আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি কেন্দ্রভাগকে ভেদ করে শত্রুর ফ্রন্টে ফাটল ধরাতে পারত, তাহলে পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত শত্রুর বাহিনীগুলো ব্যাপক ব্যবধানে দুটি দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।

উপরোল্লিখিত যুক্তি অনুসারে আমরা স্থির করেছিলাম যে, আমাদের প্রথম লড়াইটি হবে চাং-হুই-জানের প্রধান শক্তির বিরুদ্ধে, এবং দুইটি ব্রিগেডের উপর ও ডিভিশনের সদর দপ্তরের উপরে আমরা সাফল্যের সঙ্গেই আঘাত হেনেছিলাম, ডিভিশনের সেনাপতিসহ ৯ হাজার সৈন্যের সবাইকেই আমরা বন্দী করেছিলাম—একটি সৈন্য বা ঘোড়াকেও পালাতে দিইনি। এই একটিমাত্র জয়েই আতঙ্কিত হয়ে থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশন পালাল তুংশাওয়ের অভিমুখে আর স্যু কে-সিয়াংয়ের ডিভিশন পালাল থৌপির দিকে। আমাদের সৈন্যবাহিনী থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশনের পিছু ধাওয়া করে তার অর্ধেককেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। পাঁচ দিনের মধ্যে (১৯৩০ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত) আমরা দুটি লড়াই করেছিলাম আর মার খাওয়ার ভয়ে ফুতিয়েন, তুংকু ও থৌপিতে অবস্থিত শত্রুবাহিনী তাড়াহুড়ো করে পিছু হটে গিয়েছিল বিশৃংখলভাবে। এমনি করেই শেষ হল প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান।

দ্বিতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ে পরিস্থিতিটা ছিল এই রকম :

(১) 'দমন' বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল দুই লাখ, তাদের প্রধান সেনাপতি ছিল হো ইং-ছিন। তার সদর দপ্তর ছিল নানছাংয়ে।

(২) শত্রুর প্রথম অভিযানের মতোই, এইসব শক্তিবাহিনীর কোনটাই চিয়াং কাই-শেকের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল না। তাদের মধ্যে ছাই থিং-কাইয়ের অধীনস্থ ১৯তম রুট আর্মি, সুন লিয়ান-চোংয়ের নেতৃত্বাধীন ২৬তম রুট আর্মি এবং চু শাও লিয়াংয়ের পরিচালনাধীন অষ্টম রুট আর্মি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী বা বেশ শক্তিশালী, আর অবশিষ্ট অন্যান্য সব বাহিনীগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

(৩) A-B গ্রুপটিকে একেবারে নির্মূল করে ফেলা হয়েছিল আর আমাদের ঘাঁটি এলাকার সমগ্র জনগণই লালফৌজকে সমর্থন করতেন।

(৪) ওয়াং চিন-ইয়ুব নেতৃত্বাধীন পঞ্চম রুট আর্মি উত্তর চীন থেকে সবেমাত্র এসে পৌঁছেছিল আর তারা আমাদের ভয়ে ছিল সন্ত্রস্ত। এই আর্মির বাম পার্শ্বদেশস্থ কুও হুয়া-জোং এবং হাও মেং-লিংয়ের পরিচালনাধীন ডিভিশন দুটির অবস্থাও ছিল প্রায় একই রকম।

(৫) আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি প্রথমে ফুতিয়েন আক্রমণ করে পূর্বদিকে লড়াই চালিয়ে যেত, তাহলে আমরা আমাদের ঘাঁটি এলাকাটিকে ফুকিয়ান-কিয়াংসী সীমান্তস্থ চিয়াননিং-লিছুয়ান থাইনিং অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে পারতাম এবং পরবর্তী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চূর্ণ করবার ব্যাপারে সাহায্য করবার মতো সরবরাহাদি সংগ্রহ করতে পারতাম। আমরা যদি পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে লড়াই চালিয়ে যেতাম, তাহলে আমরা কানচিয়াং নদীর মুখোমুখী এসে দাঁড়াতাম, ফলে লড়াই শেষ হওয়ার পর প্রসারলাভ করবার মতো জায়গা আমরা পেতাম না। পশ্চিমদিকে লড়াই শেষ করার পরে আমাদের বাহিনী যদি আবার পূর্বদিকে ফিরত, তাহলে আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, আর সময়ও নষ্ট হতো।

(৬) প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে আমাদের সৈন্যসংখ্যা যত ছিল এবারে আমাদের সৈন্যসংখ্যা তার চেয়ে কিছুটা কম হলেও (৩০ হাজারের বেশি) আমাদের বাহিনী ভালভাবে বিশ্রাম করার ও কর্মশক্তি সঞ্চয় করার জন্য চার মাস সময় পেয়েছিল।

উপরোল্লিখিত যুক্তি অনুসারে আমরা ফুতিয়েন অঞ্চলেও ওয়াং চিন-ইয়ু এবং কুং পিং-ফানের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে (এদের সৈন্যসংখ্যা মোট ১১ রেজিমেণ্ট) প্রথমে লড়াই করার সিদ্ধান্ত করলাম। এই লড়াইয়ে জয়লাভের পরে আমরা পর্যায়ক্রমে কুও হুয়া-জোং, সুন লিয়ান-চুং, চু শাও-লিয়াং আর লিউ হো-তিংকে আক্রমণ করেছিলাম। (১৯৩১ সালের ১৬ই থেকে ৩০শে মে পর্যন্ত) ১৫ দিনে সাতশ লী অতিক্রম করেছিলাম, পাঁচবার লড়াই করেছিলাম এবং ২০ হাজারেরও বেশি রাইফেল অধিকার করে নিয়েছিলাম, আর শত্রুর 'পরিবেষ্টন দমন' অভিযানকে সাফল্যের সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলাম। ওয়াং চিন-ইয়ুর সঙ্গে লড়বার সময়ে আমরা ছিলাম ছাই থিং-কাই ও কুও হুয়া-জোংয়ের নেতৃত্বাধীন দুই শত্রুবাহিনীর মাঝখানে—কুও হুয়া-জোংয়ের বাহিনী থেকে আমরা ছিলাম ১০ লীর কিছু বেশি দূরে আর ছাই থিং-কাইয়ের বাহিনী থেকে ৪০ লীর কিছু বেশি দূরে। কেউ কেউ বলতে লাগল যে, আমরা 'কাণাগলিতে ঢুকছি'। আমরা কিন্তু তবুও পথ কেটে বেরিয়ে এসেছিলাম। প্রধানতঃ এটা সম্ভব হয়েছিল ঘাঁটি এলাকার সুবিধাজনক অবস্থার জন্য এবং শত্রুবাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনৈক্যের জন্য। কুও হুয়া-জোংয়ের ডিভিশন পরাজিত হয়ে যাবার পর হাও মেং-লিংয়ের ডিভিশন রাতারাতি পালিয়ে ইয়োংফেংয়ে ফিরে গেল আর এমনি করেই বিপর্যয় এড়াল।

তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে পরিস্থিতিটি ছিল এইরকম :

(১) চিয়াং কাই-শেক নিজেই প্রধান সেনাপতি হিসেবে রণক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণ করল। তার নীচে আরও তিনজন সেনাপতি ছিল, প্রত্যেককে এক একটি কলামের—অর্থাৎ বাম, দক্ষিণ ও মধ্য কলামের ভার দেওয়া হল। হো ইং-ছিন মধ্য কলামকে পরিচালনা করল, চিয়াং কাই-শেকের মতো তারও সদর দপ্তর ছিল নানাছাংয়ে। দক্ষীণ কলামের প্রধান ছিল চেন মিং-শু, তার সদর দপ্তর ছিল কিয়ানে। আর বাম কলামের প্রধান ছিল চু শাও-লিয়াং, তার সদর দপ্তর ছিল নানফেংয়ে।

(২) 'দমন' বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ লাখ। তাদের মধ্যে প্রধান বাহিনী ছিল চিয়াং কাই-শেকের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী। এই প্রধান বাহিনীতে ছিল পাঁচটি ডিভিশন, যা ছিল ছেন ছেং, লুও চুও-ইং চাও কুয়ান-থাও, ওয়েই লি-হুয়াং আর চিয়াং তিং-ওয়েনের পরিচালনাধীনে।

প্রত্যেকটি ডিভিশন ১টা রেজিমেণ্ট নিয়ে তৈরী—মোট সৈন্যসংখ্যা প্রায় ১ লাখ। এগুলো ছাড়া, চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই তিং-কাই আর হান তে-ছিনের পরিচালনাধীন তিনটি ডিভিশন ছিল। এদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। তার পরে ছিল সুন লিয়ান-চোংয়ের আর্মি, এর সৈন্য সংখ্যা ২০ হাজার। বাকী অন্যান্য সব বাহিনীর কোনটাই চিয়াং কাই-শেকের নিজস্ব বাহিনী নয় এবং তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

(৩) এই 'দমন' অভিযানে শত্রুর রণনীতি ছিল 'গভীরে সোজা ঢুকে যাওয়া'। দ্বিতীয় পরিবেষ্টনও দমন' অভিযানে তার রণনীতি ছিল 'প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে সুসংবদ্ধ করা'। এর থেকে এইবারের রণনীতি অনেক ভিন্ন। শত্রুর এই রণনীতির লক্ষ্য ছিল লালফৌজকে কান নদীর দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করা।

(৪) দ্বিতীয় অভিযানের সমাপ্তি তৃতীয় সভিযানের আরম্ভের মধ্যে মাত্র এক মাসের বিরতি ছিল। অত্যন্ত কঠোর লড়াইয়ের পরে লালফৌজ না পেল বিশ্রাম, না পেল সৈন্যশক্তি পুনরায় পূরণের সময় (তখন তার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০ হাজারের মতো)। আর এরা হাজার লী ঘুরে যখন দক্ষীণ কিয়াংসীর ঘাঁটি এলাকার পশ্চিম অংশে সিংকুও নামক স্থানে ফিরে এসে একত্রিত হল, তখন বিভিন্ন পথ দিয়ে শত্রুরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই রকম অবস্থায় আমরা যে পরিকল্পনা প্রথমে স্থির করলাম, তা ছিল সিংকুও থেকে ওয়ানানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ফুতিয়েন শত্রুব্যূহ ভেদ করা, তারপর, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সবেগে ধেয়ে লড়াই চালিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগের যোগাযোগের লাইন ছিন্ন করে এগিয়ে যাওয়া এবং এইভাবে শত্রুর প্রধান শক্তিকে আমাদের দক্ষিণ কিয়াংসীর ঘাঁটি এলাকার গভীরে অকেজোভাবে প্রবেশ করতে দেওয়াই ছিল আমাদের সামরিক কার্যকলাপের প্রথম পর্যায়। শত্রু যখন উত্তরদিকে ফিরে চলে আসত, সে অবশ্যই থাকত খুবই ক্লান্ত। তখন সেই সুযোগ নিয়ে তাদের দুর্বল অংশগুলির ওপর আমাদের আঘাত হানবার কথা। এটা ছিল আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ। এই পরিকল্পনার মর্ম ছিল শত্রুর প্রধান শক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া এবং তাদের দুর্বল অংশে আঘাত হানা। কিন্তু ফুতিয়েনের ওপরে হামলা করবার জন্য এগিয়ে চলবার সময়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী শত্রুর দৃষ্টিতে পড়ে গেল, তার তখন ছেন

ছেং ও লুও চুও-ইংয়ের পরিচালনাধীন দুই ডিভিশন আমাদের দিকে ধাওয়া-করে এল। আমরা তখন পরিকল্পনাটি বদল করতে এবং সিংকুওয়ের পশ্চিমে কাওসিংস্যুতে ফিরতে বাধ্য হলাম। একশয়ের কম বর্গলী বিস্তৃত পারিপার্শ্বসহ কাওসিংস্যু তখন ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে আমাদের সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত হতে পারত। সেখানে একত্র হবার পরের দিন আমরা পূর্বদিকে সিংকুও জেলার পূর্ব অঞ্চলের লিয়ানথাং অভিমুখে, ইয়োফেং জেলার দক্ষীণ অঞ্চলের লিয়াংছুন অভিমুখে ও নিংতু জেলার উত্তর অঞ্চলের হুয়াংপি অভিমুখে দ্রুত এগিয়ে চলবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেই রাতেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমরা সরে পড়লাম, সরে পড়লাম চিয়াং ডিং-ওয়েনের ডিভিশন আর চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই থিং-খাই ও হান তে-ছিনের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্বর্তী চল্লিশ লী বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেগে পৌছালাম লিয়ানথাংয়ে। দ্বিতীয় দিনে আমরা শাংকুয়ান ইয়ুন-সিয়াংয়ের সৈন্যবাহিনীর (শাংকুয়ান ইয়ুন-সিয়াং তার নিজের একটি ডিভিশনসহ হাও মেং-লিংয়ের ডিভিশনটিও পরিচালনা করছিল) অগ্রগামী টহলদারী সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলাম। প্রথম লড়াইটি লড়লাম তৃতীয় দিনে শাংকুয়ান-ইয়ুন-সিয়াংয়ের ডিভিশনের সঙ্গে, আর দ্বিতীয় লড়াইটি লড়লাম চতুর্থ দিনে হাও মেং-লিংয়ের ডিভিশনের সঙ্গে। তারপর তিন দিন ধরে চলার পরে পৌছালাম হুয়াংপিতে এবং সেখানে তৃতীয় লড়াই লড়লাম মাও পিং-ওয়েনের ডিভিশনের বিরুদ্ধে। তিনটি লড়াইয়েই আমরা জিতলাম আর দশ হাজারেরও বেশী রাইফেল দখল করে নিলাম। শত্রুর যেসব প্রধান বাহিনী পশ্চিমদিকে এবং দক্ষিণদিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এই সময়ে তারা পূর্বদিকে মোড় ফিরল। হুয়াংপির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হিংস্র বেগে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এল, এগিয়ে এল একটা বিরাট পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমাদেরকে ফেলবার জন্যে, ঘন ঘন সৈন্য সাজিয়ে। চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই তিং-কাই ও হান তে-ছিনের সৈন্যবাহিনী এবং ছেন ছেং ও লুও চুও-ইংয়ের সৈন্যবাহিনীর মধ্যবর্তী বিশ লী ফাঁকা জায়গার বড় বড় পাহাড় আমাদের সৈন্যবাহিনী চুপি চুপি পার হয়ে গেল এবং পূর্বদিক থেকে গিয়ে সিকুও জেলার এলাকায় জড়ো হল। শত্রু যখন টের পেয়ে আবার পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে লাগল, তখন আমাদের সৈন্যদের আধ মাসের মতো বিশ্রাম হয়ে গেছে, আর শত্রু তখন শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও মনমরা হয়ে এবং লড়াই করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। তাই তারা পিছু হটাই স্থির করল। তাদের পিছু হটার সুযোগ

নিয়ে আমরা চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই তিং-কাই, চিয়াং তিং-ওয়েন আর হান তে-ছিনের সৈন্যবাহিনীগুলিকে আক্রমণ করলাম এবং চিয়াং তিং-ওয়েনের একটি ব্রিগেডকে আর হান তে-ছিনের পুরো ডিভিশনটাকেই নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। ছিয়াং কুয়াং-নাই আর ছাই-তিং-কাইয়ের ডিভিশন দুটির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হল, তাই আমরা তাদের পালিয়ে যেতে দিলাম।

চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ে পরিস্থিতিটি এইরকম ছিল : শত্রুবাহিনী তিনটি কলামে বিভক্ত হয়ে কুয়াংছাংয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, শত্রুর প্রধান বাহিনী ছিল পূর্বদিকে। যে দুই ডিভিশন নিয়ে তারা পশ্চিম কলাম গড়ে উঠেছিল, সেগুলি আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আমরা যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছিলাম তারই কাছাকাছি তারা অবস্থান করছিল। সুতরাং আমরা ইহুয়াং কাউন্টির দক্ষিণ অঞ্চলে শত্রুর পশ্চিম কলামকে প্রথম আক্রমণ করার সুযোগ পেলাম এবং এক আঘাতে আমরা লি মিং ও ছেন শি-চৌর পরিচালিত দুটি ডিভিশনকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেললাম। তখন শত্রু তার মধ্যভাগের কলামকে সাহায্য করবার জন্য তার পূর্ব কলাম থেকে দুই ডিভিশন সৈন্য পাঠিয়ে আরও এগিয়ে এল বলে ইহুয়াং কাউন্টির দক্ষিণ অঞ্চলে আমরা আবার একটি ডিভিশনকে নিশ্চিহ্ন করতে সমর্থ হলাম। এই দুটি লড়াইয়ে আমরা দশ হাজারেরও বেশি রাইফেল দখল করে নিয়েছিলাম আর এমনি করে এই 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে মোটামুটিভাবে চুরমার করে দিয়েছিলাম।

পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে শত্রু এক নতুন রণনীতি অর্থাৎ দুর্গনীতি অবলম্বন করে এগুতে লাগল, প্রথমেই তারা লিছুয়ান দখল করল। কিন্তু লিছুয়ানকে পুনরুদ্ধার করবার ও শত্রুকে ঘাঁটি এলাকার বাইরে রুখবার চেষ্টায় আমরা লিছুয়ানের উত্তরে সিয়াওশির ওপরে আক্রমণ করলাম। সিয়াওশি ছিল শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি এবং সেটা অবস্থিত ছিল শ্বেত এলাকায়। এ লড়াইয়ে জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে আমরা আবার সিয়াওশির দক্ষিণ-পূর্ব দিকের জিসীছিয়াওয়ের ওপরে আক্রমণ করলাম। এটাও ছিল শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি এবং শ্বেত এলাকার অন্তর্গত। সেখানেও আবার আমরা জয়লাভ করতে ব্যর্থ হলাম। তারপর লড়াই বাধাবার চেষ্টায় আমরা শত্রুর প্রধান বাহিনী ও দুর্গগুলোর মাঝ এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করলাম। এইভাবে আমরা এক সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার অবস্থায় এসে পড়লাম। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের

বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চলেছিল এক বছর ধরে, সেই এক বছরে বিন্দুমাত্র উদ্যোগ-তৎপরতা আমরা দেখাইনি। অবশেষে, কিয়াংসী ঘাঁটি এলাকা থেকে সরে আসিতে আমরা বাধ্য হলাম।

উপরোল্লিখিত প্রথম থেকে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় পর্যন্ত আমাদের সৈন্যবাহিনীর লড়াই করার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, একটি শক্তিশালী 'দমন' বাহিনীকে চুরমার করতে হলে প্রতিরক্ষারত লালফৌজের পক্ষে পাল্টা আক্রমণের প্রথম লড়াইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র পরিস্থিতির উপর প্রথম লড়াইটির জয়-পরাজয়ের প্রভাব পড়ে অত্যন্ত গভীরভাবে, এমনকি এর প্রভাব শেষ লড়াইটির ওপরেও পড়ে। তাই আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

প্রথমতঃ, প্রথম লড়াইটিতে অবশ্যই জিততে হবে। শত্রুর পরিস্থিতি, ভৌগোলিক পরিবেশ ও জনসমর্থন সবই যখন আমাদের অনুকূল কিন্তু শত্রুর প্রতিকূল, এবং লড়াইয়ে জেতা সম্পর্কে আমরা যখন একেবারে নিশ্চিত, শুধু তখনই আমরা আঘাত হানব। অন্যথায়, আমাদের বরং পিছু হটা উচিত ও সতর্কতার সঙ্গে সুযোগের প্রতিক্ষা করা উচিত। সুযোগ পাওয়া যাবেই। গোঁয়ারগোবিন্দের মতো আগুপিছু বিবেচনা না করে যুদ্ধে নামা আমাদের উচিত নয়। প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে আমরা প্রথমে থান তাও-ইউয়ানের বাহিনীর ওপরে আঘাত হানতে চেয়েছিলাম, দুবার আমরা অগ্রসরও হয়েছিলাম। কিন্তু দুবারই নিজেদের সংযত করে ফিরে আসতে হয়েছিল। কারণ শত্রুবাহিনী ইউয়ানতৌর উঁচু জায়গার ওপরকার সুবিধাজনক অবস্থান থেকে নড়েনি। কয়েকদিন পরে আমরা চাং হুই-জানের বাহিনীকে খুঁজে বের করলাম। এই বাহিনীর, উপর আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। দ্বিতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী তুংকু পর্যন্ত এগিয়েছিল। ওয়াং চিন-ইয়ুর সৈন্যবাহিনী তার ফুতিয়েনস্থ সুদৃঢ় ঘাঁটি ছেড়ে বেরুবে, তারই প্রতীক্ষা করার জন্য খবর ফাঁস হয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও তাড়াহুড়ো আক্রমণ করার যাবতীয় অসহিষ্ণু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমরা শত্রুর খুব কাছে পঁচিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। অবশেষে আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল। তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, যদিও আমাদের চারদিকে বিপর্যয় ফেটে পড়েছিল এবং হাজার

লী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমাদের ফিরে আসতে হয়েছিল, আর শত্রুবাহিনীর পার্শ্বে ও পিছনে ঘুরে গিয়ে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনাটা যদিও শত্রু টের পেয়েছিল, তবুও আমরা ধৈর্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছিলাম এবং পরিকল্পনা বদলে নিয়ে শত্রুর মধ্যভাগে ভেদ করার কৌশল গ্রহণ করেছিলাম আর অবশেষে লিয়ানথাংয়ে আমরা প্রথমবার সাফল্যের সঙ্গেই লড়াই করলাম। চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, যখন নানফেংয়ের উপর আক্রমণ করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হলাম, তখন দ্বিধাহীনভাবে আমরা পশ্চাদপসরণ করলাম এবং ঘুরে ঘুরে অবশেষে শত্রুর ডান পার্শ্বে গিয়ে পৌঁছে তুংশাও এলাকায় আমাদের সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে ইহুয়াং কাউন্টির দক্ষিণ অঞ্চলে খুব সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলাম। শুধুমাত্র পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগাম করার সময়ে প্রথম লড়াইয়ের গুরুত্বকে আদৌ বিবেচনা করা হয়নি। একটিমাত্র লিছুয়ান নগরের পতনে আতঙ্কিত হয়ে সেই নগরটিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টায় আমাদের সৈন্যবাহিনী শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য উত্তরদিকে এগিয়ে গেল, স্যুনখৌয়ের অপ্রত্যাশিত সম্মুখ লড়াইয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী জয়লাভ করল (এক ডিভিশন শত্রুসৈন্য নিশ্চিহ্ন করা হল)। কিন্তু এ লড়াইকে প্রথম লড়াই হিসেবে ধরা হল না, আর এই লড়াইয়ের ফলে যেসব পরিবর্তনগুলো ঘটতে বাধ্য ছিল, সেগুলিকে আগে থেকে লক্ষ্য করা হল না, পরন্তু হঠকারীভাবে সিয়াওশি আক্রমণ করা হল, যেখানে জয়ের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এইভাবে আমরা প্রথম চালেই আমাদের উদ্যোগক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম' আর বস্তুতঃ সেটা ছিল লড়াইয়ের সবচেয়ে বুদ্ধিহীন ও খারপ পদ্ধতি।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম লড়াইয়ের পরিকল্পনাকে অবশ্যই হতে হবে গোটা যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনার প্রস্তাবনা ও সুব্যবস্থিত অঙ্গ। গোটা যুদ্ধাভিযানের একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকলে একটা সত্যিকারের ভাল প্রথম লড়াই করা একেবারেই অসম্ভব। অর্থাৎ প্রথম লড়াইয়ে জয়লাভ করলেও সে লড়াই যদি গোটা যুদ্ধাভিযানকে সাহায্য না করে বরং ক্ষতি করে, তাহলে এ ধরনের জয়কে শুধু পরাজয় হিসেবেই ধরতে হবে (যেমন পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে স্যুনখৌ লড়াই)। তাই প্রথম লড়াইয়ের পূর্বে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ লড়াই এবং এমনকি সর্বশেষ লড়াই অবধি আমরা কিভাবে লড়ব সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার, আর পরবর্তী লড়াইগুলির প্রত্যেকটিতে আমরা

জিতলে শত্রুর সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কি কি পরিবর্তন ঘটবে, হারলে আবার কি কি পরিবর্তন ঘটবে, তা অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করা দরকার। যেমনটি আশা করা যায়, প্রকৃত ফলটা হয়তো ঠিক তেমনটি নাও হতে পারে, এবং বস্তুতঃ নিশ্চয়ই তেমনটি হবে না—তবুও উভয় পক্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুসারে সবকিছুই আমাদেরকে পুংখানুপুংখভাবে ও বাস্তবভাবে ভেবেচিন্তে পরিষ্কার করে নিতে হবে। সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা না থাকলে দাবার ছকে কোন সত্যিকারের ভাল চাল দেওয়া অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, পরবর্তী রণনীতিগত পর্যায়ে কি ঘটবে, তাও অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। রণনীতিগত পরিচালক যদি কেবল পাল্টা আক্রমণের প্রতিই মনোযোগ দেয় এবং সে পাল্টা আক্রমণে জয় অথবা ঘটনা-চক্রে পরাজয়ের পরে আমাদের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা না করে, তাহলে সে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে। একটা নির্দিষ্ট রণনীতিগত পর্যায়ে, পরবর্তী বহু পর্যায়কে, অথবা অন্ততঃপক্ষে, ঠিক পরবর্তী পর্যায়টিকে রণনীতিগত পরিচালকের অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। যদিও ভবিষ্যৎ পরিবর্তন পূর্ব থেকেই দেখা কঠিন এবং যতই দূরে তাকানো যায় বিষয়গুলোকে ততই অস্পষ্ট বলে মনে হয়, তবুও একটা মোটামুটি হিসেব করা সম্ভব এবং সুদূর ভবিষ্যতের অবস্থার মূল্যায়ন করাও দরকার। যেমনি রাজনীতিতে তেমনি যুদ্ধে, এগিয়ে চলার সময়ে প্রতি পদক্ষেপে শুধু একটি পদক্ষেপকে দেখার পরিচালনার পদ্ধতি হচ্ছে ক্ষতিকর। প্রতি পদক্ষেপে কি কি বাস্তব পরিবর্তন ঘটছে তা দেখতে হবে, এবং এগুলোর ওপর ভিত্তি করে নিজের রণনীতিগত পরিকল্পনা এবং যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনাকে শুধরে নেওয়া বা পরিপুষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায়, বিপদকে অগ্রাহ্য করে হঠকারিতার সঙ্গে সোজা সামনে ছুটে চলার ভুল করা হবে। তথাপি, গোটা একটি রণনীতিগত পর্যায় বা কতকগুলো রণ-নীতিগত পর্যায় জুড়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাকা একান্ত অপরিহার্য। এটা হবে এমন পরিকল্পনা যা সামগ্রিকভাবে ভেবে দেখা হয়েছে। এইভাবে না করলে ইতস্ততঃ করার এবং নিজেকে বাধ্যবাধকতায় বেঁধে ফেলার ভুল করা হবে। এটা বাস্তবে শত্রুর রণনীতিগত অভিপ্রায়ের প্রয়োজনানুরূপ কাজ করবে এবং নিজেকে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এনে ফেলবে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শত্রুর সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীরও কোন একটা রণনীতিগত

অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে ট্রেনিং দিয়ে আমরা যখন নিজেদেরকে শত্রুর থেকে এক স্তর বেশি উন্নত করে তুলব শুধু তখনই রণনীতিগত জয়লাভ সম্ভব হবে। এমনি করতে না পারাটাই ছিল শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ে 'বাম' সুবিধাবাদী লাইন ও চাং কুও-তাও লাইনের রণনীতিগত পরিচালনার ভুল-ভ্রান্তির প্রধান কারণ। এক কথায়, পশ্চাদপসারণের পর্যায়ে অবশ্যই পাল্টা আক্রমণের কথা হিসেব করতে হবে, পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে অবশ্যই আগে থেকেই আক্রমনপর্যায়ের কথা হিসাব করতে হবে এবং আক্রমণপর্যায়ে আবার অবশ্যই পশ্চাদপসরণের কথা হিসেব করতে হবে। এমনি হিসেব না করে শুধুমাত্র বর্তমান মূহূর্তের সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখাটা হচ্ছে পরাজয়ের পথ।

প্রথম লড়াইটিতে অবশ্যই জিততে হবে, গোটা যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনার দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে, এবং পরবর্তী রণনীতিগত পর্যায়টিকেও অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করতে হবে। পাল্টা আক্রমণের শুরুতে, অর্থাৎ প্রথম লড়াইয়ের সময়ে এই তিনটি মুলনীতিকে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

৬। সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করা

সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করাটা মনে হয় সহজ, কিন্তু আসলে তা বেশ কঠিন। প্রত্যেকেই জানে যে, সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সংখ্যাল্পকে পরাজিত করাই হচ্ছে সবচেয়ে সেরা উপায়, তবুও অনেকেই তেমনটি করতে পারে না; পক্ষান্তরে প্রায়শঃই নিজেদের সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে দেয়। কারণ এই যে, এ ধরনের পরিচালকদের রণনীতি বুঝবার মতো অত মাথা নেই, আর তারা জটিল পরিবেশের দ্বারা বিভ্রান্ত। আর সেজন্যই তারা এইসব পরিবেশের আয়ত্তাধীনে পড়ে নিজেদের উদ্যোগক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে মোকাবলা করার নীতি অবলম্বন করে।

পরিবেশ যতই জটিল, গুরুতর ও কঠোর হোক না কেন, একজন সামরিক পরিচালকের যা সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন, তা হচ্ছে তার নিজের নেতৃত্বাধীন সৈন্যশক্তিকে স্বাধীনভাবে সংগঠিত করবার ও ব্যবহার করবার সামর্থ্য। অনেক সময়ে শত্রুর দ্বারা বাধ্য হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়তে হয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাড়াতাড়ি উদ্যোগক্ষমতা ফিরে পাওয়া। এমন করতে না পারলে অবশ্যই পরাজয় ঘটবে।

উদ্যোগক্ষমতা কাল্পনিক কিছু নয়, বরং সেটা হচ্ছে বাস্তব ও বস্তুগত। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যথাসম্ভব বৃহদাকারের ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর সৈন্যবাহিনীকে সংরক্ষিত করা সমাবিষ্ট করা।

প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে যাওয়টা সহজ। আক্রমণাত্মক লড়ায়ের তুলনায় প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে উদ্যোগক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ খুব কমই থাকে। তবু প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ের নিষ্ক্রিয় রূপের মধ্যেও সক্রিয় বিষয়বস্তু থাকেতে পারে, এবং যে পর্যায়ে প্রতিরক্ষাত্মক লড়াই রূপের দিক থেকে নিষ্ক্রিয় থাকে, সে পর্যায় থেকে প্রতিরক্ষাত্মক লড়াই এমন একটি পর্যায়ে যেতে পারে, যেখানে তা রূপে ও বিষয়বস্তুতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাহ্য রূপের দিক থেকে দেখলে পুরোপুরি পরিকল্পিত রণনীতিগত পশ্চাদপসরণকে বাধ্যতামূলক বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা করা হয় আমাদের সৈন্যবাহিনীর শক্তি সংরক্ষিত করবার ও শত্রুকে চুরমার করার সুযোগের অপেক্ষা করবার জন্য, এবং শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনবার ও পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি করবার জন্য। অন্যদিকে, পশ্চাদপসরণ অস্বীকার করে তাড়ঘড়ি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে নামাটাকে (যেমন সিয়াওশির লড়াইয়ে) বাহ্য দৃষ্টিতে উদ্যোক্ষমতা লাভের প্রয়াস বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়। রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুধু বিষয়-বস্তুতেই সক্রিয়তাপূর্ণ নয়, পরন্তু রূপের দিক থেকেও তা পশ্চাদপসরণ-পর্যায়ের নিষ্ক্রিয় ভঙ্গীটি ত্যাগ করে। শত্রুবাহিনীর কাছে আমাদের পাল্টা আক্রমণের অর্থ হল, শত্রুকে তার উদ্যোগক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য করার এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফেলার জন্য আমাদের বাহিনীর প্রয়াস।

এই লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা, সচল লড়াই করা, দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এরা এবং নির্মূলী-করণের লড়াই করা। আর এগুলোর মধ্যে সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করাটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান শর্ত।

শত্রুর ও আমাদের উভয় পক্ষের পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়ার জন্য অমাদের সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা অবশ্য প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ সম্পর্কিত পরিস্থিতিকে বদল করা। আগে শত্রু অগ্রসর হচ্ছিল এবং আমরা পিছু হটছিলাম। এখন আমরা এই পরিস্থিতিকে আমাদের অগ্রগমনে ও শত্রুর পশ্চাদপসরণে বাদলাতে চাই।

যখন আমরা সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে একটা লড়াইয়ে জয়লাভ করি, তখন সেই লড়াইয়ে আমাদের উপরোক্ত উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয় এবং সেই জয়লাভটা গোটা যুদ্ধাভিযানের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয়তঃ, সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্য হল আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়া। প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে পশ্চাদপসরণের শেষ সীমা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করাটা মূলতঃ নিষ্ক্রিয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ 'প্রতিরক্ষা'-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে সক্রিয় পর্যায়ের অর্থাৎ 'আক্রমণে'-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যদিও গোটা রণনীতিগত প্রতিরক্ষার পর্যায়ের মধ্যে পাল্টা আক্রমণ তার প্রতিরক্ষাত্মক চরিত্র হারায় না, তবু পশ্চাদপসরণের তুলনায় পাল্টা আক্রমণ শুধু রূপেয়ই নয়, বিষয়বস্তুতেও ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণের মধ্যবর্তী একটা উত্তরণ-পর্যায় এবং চরিত্রের দিক থেকে এটা হচ্ছে রণনীতিগত আক্রমণের প্রাক্কাল। এই উদ্দেশ্যেই সৈন্যশক্তি কেন্দ্রভূত করা হয়।

তৃতীয়তঃ, সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্য হল অন্তর্লাইন ওবহির্লাইনের পরিস্থিতিটিকে পরিবর্তিত করা। রণনীতিগত অন্তর্লাইনে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনী অনেক অসুবিধা ভোগ করে, 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সম্মুখীন লাল-ফৌজের ক্ষেত্রে এটা আরও বিশেষ করে খাটে। কিন্তু যুদ্ধাভিযানে বা লড়াইয়ে আমরা এ অবস্থাকে বদলাতে পারি এবং তা আমাদের অবশ্যই করা উচিত। আমাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীর একটা বিরাট 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে পরিবর্তিত করে সেটাকে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বাহিনীর দ্বারা চালিত অনেকগুলো ছোট ছোট ও পৃথক পৃথক 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে পরিণত করতে হবে। রণনীতিগত ক্ষেত্রে আমাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীর পৃথক পৃথকভাবে এগিয়ে আঘাত হানার যে অভিযান চালায়, সেটাকে আমাদের এইভাবে পরিবর্তিত করা উচিত, যাতে করে আমাদের বাহিনীর যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে এগিয়ে একত্রে আঘাত হানার অভিযানগুলো চালাতে পারে। রণনীতিগত ক্ষেত্রে আমাদের বাহিনীর তুলনায় শত্রুবাহিনীর উৎকৃষ্টতর অবস্থাকে বদল করতে হবে, যাতে করে যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর তুলনায় আমাদের বাহিনীর অবস্থা উৎকৃষ্টতর হয়ে ওঠে। রণ-

নীতিগত ক্ষেত্রে যে শত্রুবাহিনী প্রবলতর অবস্থায় রয়েছে, যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তাকে দুর্বল অবস্থায় ফেলে দিতে হবে। সেই একই সময়ে আবার আমাদের রণনীতিগত দুর্বল অবস্থাকে যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে আমাদের সবল অবস্থায় পরিবর্তিত করে নিতে হবে। এগুলোকে আমরা বলি অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই, 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মধ্যে পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান, অবরোধের মধ্যে অবরোধ, প্রতিরক্ষার মধ্যে আক্রমণ, নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে উৎকৃষ্ট অবস্থা, দুর্বলতার মধ্যে সবলতা, অসুবিধার মধ্যে সুবিধা এবং নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে উদ্যোগ। রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় জয়লাভ করাটা নির্ভর করে মূলতঃ সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উপরে।

চীনা লালফৌজের যুদ্ধের ইতিহাসে প্রায়শঃই এই প্রশ্নটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের প্রশ্ন। ১৯৩০ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে কিয়ানের লড়াইয়ে আমাদের সৈন্যশক্তি পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত হওয়ার আগেই অগ্রগমন ও আক্রমণ শুরু হয়েছিল। ঘটনাক্রমে শত্রুবাহিনী (তেং ইংয়ের ডিভিশন) নিজের থেকেই পালিয়ে যায়। আমাদের আক্রমণটা নিজের দিক থেকে মোটেই কার্যকরী ছিল না।

১৯৩২ সাল থেকে শুরু করে শ্লোগান ছিল— 'সমগ্র ফ্রণ্টে আঘাত হানো'। ঘাঁটি এলাকা থেকে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর—চতুর্দিকে আঘাত হানার জন্য দাবি করা হয়েছিল। এটা শুধু রণনীতিগত প্রতিরক্ষার ভুলই নয়, পরন্তু রণনীতিগত আক্রমনের বেলায়ও ভুল। শত্রুর ও আমাদের সামগ্রিক শক্তির ভারসাম্যে মৌলিক পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত রণনীতি ও রনকৌশল উভয় দিক থেকেই প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ পাশাপাশি চলে, শত্রুকে আটকে রাখার লড়াই ও হানা দেওয়ার লড়াই পাশাপাশি চলে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত 'সমগ্র ফ্রণ্টে আঘাত হানা' খুবই কম সময়েই ঘটে। এই শ্লোগান হচ্ছে সামরিক সমতাবাদ, যা সামরিক হঠকারিতার সঙ্গে সঙ্গেই আসে।

সামরিক সমতাবাদীরা ১৯৩৩ সালে 'দুই মুষ্টি দিয়ে আঘাত হানার' মতবাদকে তুলে ধরেছিল এবং দুটি রণনীতিগত লক্ষ্যপথে একই সঙ্গে জয়লাভের আশায় লালফৌজের প্রধান শক্তিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। ফলে, একটি 'মুষ্টি' হয়ে রইল অকেজো, আর অন্য 'মুষ্টি'টি লড়াই করতে করতে খুবই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ল, এবং সেই সময়ের সম্ভাব্য সর্বাধিক জয়লাভও সম্ভব হল না। আমার মতে, যখন আমারা শক্তিশালী শত্রুবাহিনীর

সম্মুখীন হই, তখন আমাদের যত বেশি সৈন্যবাহিনী হোক না কেন, এক সময়ে শুধু একটি প্রধান লক্ষ্যপথেই আমাদের সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করা উচিত, দুই লক্ষ্যপথে নয়। দুই বা তারও বেশি লক্ষ্যপথে লড়াই চালানোর বিরোধিতা আমি করি না, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে কেবল একটিমাত্র প্রধান লক্ষ্যপথ থাকা উচিত। গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্রে চীনা লালফৌজ নেমেছিল একটা ছোট ও দুর্বল শক্তি হিসেবে। কিন্তু সে তার শক্তিশালী শত্রুকে বারংবার পরাজিত করেছে—তার এই জয় সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়াভিভূত করেছে। লালফৌজ প্রধানতঃ সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যবহার করার উপর নির্ভর করেই এই জয়লাভ করেছে। লালফৌজের বিরাট বিরাট জয়ের যে-কোন একটিই এটাকে প্রমাণ করতে পারে। আমরা যখন বলি, 'একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে লড়াও, দশজনকে একশজনের বিরুদ্ধে লড়াও' তখন আমরা রণনীতির কথা সমগ্র যুদ্ধের কথা ও শত্রুর ও আমাদের সামগ্রিক শক্তির তুলনার কথাই বলছি। আর এই অর্থে, সেটা হচ্ছে ঠিক তাই, যা আমরা করছি। কিন্তু যুদ্ধাভিযান ও রণকৌশলের দিক থেকে এই কথাটা আমরা বলছি না। সেক্ষেত্রে আমাদের কোনমতেই এইরকম করা উচিত নয়। পাল্টা আক্রমণেই হোক বা আক্রমণেই হোক, আমরা সব সময়েই অনেক বেশি সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর একটা অংশের ওপরে আঘাত হানি। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে থান তাও-ইউয়ানের বিরুদ্ধে কিয়াংসী প্রদেশের নিংতু কাউন্টির তুংশাও অঞ্চলের লড়াইয়ে, ১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে ১৯তম রুটআর্মির বিরুদ্ধে কিয়াংসীর সিংকুও কাউন্টির কাওসিংসু অঞ্চলের লড়াইয়ে, ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে ছেন চী তাংয়ের বিরুদ্ধে কুয়াংতোং প্রদেশের নানসিয়ুং জেলার শুইখৌসু অঞ্চলের লড়াইয়ে এবং ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে ছেন ছেংয়ের বিরুদ্ধে কিয়াংসীর লিছুয়ান কাউন্টির থুয়ানছুন অঞ্চলের লড়াইয়ে আমাদের যে ক্ষতি ভোগ করতে হয়েছিল, তার কারণ ছিল আমাদের সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা হয়নি। অতীতে সাধারণভাবে শুইখৌসুর ও থুয়ানছুনের লড়াইয়ের মতো লড়াইগুলিকে জয় হিসেবে, এমনকি বিরাট জয় হিসেবে ধরা হতো (শুইখৌসুর লড়াইয়ে ছেন চী-তাংয়ের পরিচালিত ২০টি রেজিমেন্টকে এবং থুয়ানছুনের লড়াইয়ে ছেন ছেংয়ের পরিচালিত ১২টি রেজিমেন্টকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে)। কিন্তু এ ধরনের জয়কে আমরা কোনদিনই স্বাগত জানাইনি, এমনকি, এক অর্থে এগুলোকে পরাজয় বলেই ধরতে পারি। আমাদের মতে, এইরকম লড়াইয়ের

তাৎপর্য খুবই কম, কারণ এর ফলে আমাদের কিছুই লাভ হয়নি, অথবা যা লাভ করেছি তা আমাদের ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বেশি নয়। আমাদের রণনীতি হচ্ছে 'একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে লড়াও,' আমাদের রণকৌশল হচ্ছে 'দশজনকে একজনের বিরুদ্ধে লড়াও, আর শত্রুকে পরাজিত করার এটাই হচ্ছে আমাদের অন্যতম মৌলিক নীতি।

সামরিক সমতাবাদ তার চরমে উঠেছিল ১৯৩৪ সালে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে। তখন এটা মনে হয়েছিল যে, 'সৈন্যবাহিনীকে ছয়টি পথে বিভক্ত করে দিয়ে এবং 'সমগ্র ফ্রন্টে প্রতিরোধ' করে শত্রুকে পরাজিত করা যাবে। কিন্তু ফল হল উল্টো, আমাদের বাহিনীই পরাজিত হল—নিজস্ব ভূমি হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ই ছিল এসবের কারণ। নিজেদের প্রধান শক্তি এক লক্ষ্যপথেই কেন্দ্রীভূত করে অন্যান্য লক্ষ্যপথে কেবলমাত্র রক্ষীবাহিনী রাখলে স্বভাবতঃই কোন কোন ভূমি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু এই ক্ষতিটা হল সাময়িক ও আংশিক, এই ক্ষতির মূল্যে আমরা যে জায়গায় প্রচণ্ড আঘাত হানি, সেখানেই জয়লাভ করতে পারি। এই প্রচণ্ড আঘাতের লক্ষ্যপথে জয়লাভের ফলেই রক্ষীবাহিনীর এলাকার হৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করা যায়। শত্রুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের প্রত্যেকটিতেই আমাদের কতকগুলো ভূমি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে, শত্রুর তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ে কিয়াংসী প্রদেশে লালফৌজের ঘাঁটি এলাকাটি প্রায় পুরোপুরিই হাতছাড়া হয়ে যায়, কিন্তু পরিশেষে আমরা শুধু সেইসব হৃত ভূমিই পুনরুদ্ধার করিনি, উপরন্তু আমাদের শাসনাধীন এলাকাও সম্প্রসারিত করেছিলাম।

ঘাঁটি এলাকার জনগণের শক্তিকে উপলব্ধি করতে না পারায় ঘাঁটি এলাকা থেকে লালফৌজকে বহু দূরে পাঠানোর ব্যাপারে অযথা ভয়ের উদ্ভব প্রায়ই ঘটত। যখন কিয়াংসীস্থ লালফৌজ ১৯৩২ সালে ফুকিয়ান প্রদেশের চাংচৌ আক্রমণ করার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গিয়েছিল, এবং যখন ১৯৩৩ সালে চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধাভিযানে জয়লাভের পরে লালফৌজ মোড় ঘুরিয়ে ফুকিয়ান আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, তখন এই ভয় দেখা দিয়েছিল। প্রথম অবস্থায় ভয় হয়েছিল যে, শত্রু আমাদের গোটা ঘাঁটি এলাকা দখল করে নেবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ভয় ছিল যে, ঘাটি এলাকার একটা অংশ হাতছাড়া হয়ে যাবে। ফলে আমাদের সৈন্য-

বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারে আপত্তি উঠেছিল আর ঘাঁটি এলাকাকে রক্ষা করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে দেবার অভিমত পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষে ভুল প্রমাণিত হয়ে যায়। শত্রুর দৃষ্টিতে, এক-দিকে সে আমাদের ঘাঁটি এলাকার মধ্যে ঢুকতে ভয় পেত, অন্যদিকে যে লালফৌজ লড়াই চালিয়ে শ্বেত এলাকায় ঢোকে, সেই লালফৌজকে সে তার প্রধান বিপদ 'বলে মনে করত। নিয়মিত লালফৌজ যেখানে অবস্থিত, সেখানে শত্রুবাহিনী সব সময়ে দৃষ্টি রাখে এবং খুব কম সময়েই সে তার দৃষ্টি নিয়মিত লালফৌজ থেকে সরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র আমাদের ঘাঁটি এলাকার উপরই নিবদ্ধ করে। লালফৌজ যখন প্রতিরক্ষায় লিপ্ত থাকে, তখনও শত্রুর দৃষ্টি লালফৌজের উপরই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। আমাদের ঘাঁটি এলাকার আয়তন হ্রাস করার পরিকল্পনা হচ্ছে শত্রুর গোট পরিকল্পনার একটা অংশ। কিন্তু লালফৌজ যদি নিজের প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত করে শত্রুবাহিনীর একটি কলাম ধ্বংস করে, তাহলে শত্রুবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী লালফৌজের উপর আরও বেশি মনোযোগ দিতে এবং লালফৌজের বিরুদ্ধে আরও বেশি সৈন্যশক্তি নিয়োগ করতে বাধ্য হবে। তাই আমাদের ঘাঁটি এলাকার আয়তন হ্রাস করার ব্যাপারে শত্রুর পরিকল্পনাকে বানচাল করাও সম্ভব।

'পঞ্চম "পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানে শত্রু যখন দুর্গনীতি অবলম্বন করেছে, তখন সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে লড়াই করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আর যা কিছু আমরা করতে পারি, তা হচ্ছে প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যশক্তি বিভক্ত করে দেওয়া এবং সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আকস্মিক আঘাত হানা—এমন কথা বলাও ভুল। একই সময়ে শত্রুর ৩, ৫, ৮ অথবা ১০ লী ঠেলে এগিয়ে যাবার দুর্গনীতিতে যুদ্ধচালনার পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবেই ছিল প্রতিটি পদক্ষেপে লালফৌজের প্রতি-রোধের ফল। যদি আমাদের সৈন্যবাহিনী অন্তর্লাইনে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিরোধের রণকৌশলকে পরিত্যাগ করত এবং প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সময়ে মোড় ফিরিয়ে শত্রুর অন্তর্লাইনের ভেতরে আক্রমণ চালাত, তাহলে পরিস্থিতি নিশ্চয়ই ভিন্নরূপ হতো। সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার নীতিই হচ্ছে দুর্গ-নীতিকে ব্যর্থ করার হাতিয়ার।

আমরা সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জনগণের গেরিলাযুদ্ধ ত্যাগ করতে হবে। লি লি-সান লাইনের অভিমত ছিল যে, ক্ষুদ্রাকারের গেরিলাযুদ্ধ ত্যাগ করতে হবে এবং 'প্রত্যেকটি বন্দুক

লালফৌজের হাতে রাখা চাই'। এই অভিমত অনেক আগেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সামগ্রিক বিপ্লবী যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, জনগণের গেরিলাযুদ্ধ ও প্রধান শক্তি হিসেবে লালফৌজ একজন মানুষের ডান হাত আর বাঁ হাতের মতো। জনগণের গেরিলাযুদ্ধ বাদ দিয়ে যদি কেবলমাত্র প্রধান শক্তি হিসেবে লালফৌজই থাকত, তাহলে আমরা হয়ে পড়তাম এক-বাহুবিশিষ্ট সেনাপতির মতো। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বিশেষ করে সামরিক যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে, ঘাঁটি এলাকায় আমাদের জনগণের অবস্থা হচ্ছে, তাঁরা সশস্ত্র। ঘাঁটি এলাকায় এগোতে শত্রুরা যে ভয় পায়, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এটাই।

লড়াই করার গৌণ লক্ষ্যপথে লালফৌজের একটা শাখা নিয়োগ করাও দরকার। মুখ্য লক্ষ্যপথে সমস্ত সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা আমাদের উচিত হবে না। আমরা যে সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে কথা বলি, তা হচ্ছে রণক্ষেত্রে আমাদের চরম বা আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতাকে সুনিশ্চিত করার নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য অথবা গুরুত্বপূর্ণ একটা রণক্ষেত্রে লড়াই করার জন্য আমাদের অবশ্যই চরম উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি থাকতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম লড়াইয়ে চাং হুইৎজানের ৯ হাজার সৈন্যের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের ৪০ হাজার সৈন্য কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। দুর্বল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য, অথবা অত গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন একটা রণক্ষেত্রে লড়াই করার জন্য, একটা আপেক্ষিক উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তিই যথেষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ,- ১৯৩১ সালের ২৯শে মে তারিখে দ্বিতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শেষ লড়াইয়ে চিয়াংনিংয়ে লিউ হো-তিংয়ের ডিভিশনের ৭ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য লালফৌজ শুধু ১০ হাজারের কিছু বেশি সৈন্য নিয়োগ করেছিল।

এর অর্থ কিন্তু এও নয় যে, প্রত্যেকবার আমাদের অবশ্যই সংখ্যাগতভাবে উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি নিয়োগ করতে হবে। কোন কোন অবস্থায়, একটা অপেক্ষিক বা চরম নিকৃষ্ট সৈন্যশক্তি নিয়ে আমরা রণক্ষেত্রে যেতে পারি। অপেক্ষিক নিকৃষ্ট সৈন্যশক্তি নিয়ে লড়াইয়ে যাবার কথা ধরা যাক। কোন একটা এলাকায় আমাদের যখন শুধু একটা ছোট আকারের লালফৌজের বাহিনী রয়েছে (এ নয় যে আমাদের বেশি সৈন্য আছে কিন্তু আমরা তাদের কেন্দ্রীভূত

কবিনি) তখন কোন একটা অধিকতর শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবার জন্যে জনসমর্থন, ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়া প্রভৃতি অবস্থা আমাদেরকে খুব বেশি সাহায্য দিলে শত্রুর সম্মুখভাগ ও একটা পার্শ্বদেশকে আটকে রাখার জন্য গেরিলাবাহিনী অথবা লালফৌজের ছোট শাখা নিয়োগ করা এবং শত্রুর অপর পার্শ্বদেশের একটি অংশের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালানোর জন্যে লালফৌজের অন্যান্য সমস্ত সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করাও অবশ্যই প্রয়োজন, এবং এইভাবে জয়লাভ করাও সম্ভব। শত্রুর পার্শ্বদেশের সেই অংশের উপর আমাদের আকস্মিক আক্রমণে একটি নিকৃষ্ট সৈন্যশক্তির বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তির ব্যবহার করার ও সংখ্যাল্পকে পরাজিত করার জন্য সংখ্যাধিক্যকে ব্যবহার করার নীতি এখনো খাটে। চরম নিকৃষ্ট সৈন্যশক্তি নিয়ে যুদ্ধে যাবার কথা ধরা যাক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন গেরিলাবাহিনী একটা বিরাট শ্বেত বাহিনীর উপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়, তখন সে কেবল শ্বেতবাহিনীর একটা ছোট অংশের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নীতি প্রযোজ্য।

একটিমাত্র রণক্ষেত্রে লড়াই করার জন্যে একটি বিরাট সৈন্যশক্তির কেন্দ্রীভূত করাটা ভৌগোলিক পরিবেশ, পথঘাট, সরবরাহ ও বাসস্থানের সুযোগাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ—এই যুক্তিকে অবস্থানুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে বিচার করতে হবে। লালফৌজ ও শ্বেত বাহিনীকে এইসব সীমাবদ্ধতা কি পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে, তার একটা মাত্রাগত পার্থক্য আছে, কারণ শ্বেত বাহিনী থেকে লালফৌজ অনেক বেশি কষ্ট সহ্য করতে পারে।

সংখ্যাল্পতা নিয়ে সংখ্যাধিক্যকে আমরা পরাজিত করি—সমগ্র চীন দেশের শাসকদের এই কথাই আমরা বলে থাকি। আবার সংখ্যাধিক্য নিয়ে সংখ্যাল্পকে আমরা পরাজিত করি—রণক্ষেত্রে লড়াইরত শত্রুর প্রত্যেকটি পৃথক অংশের প্রতিই আমাদের এই কথা। এই ব্যাপারটা এখন আর গোপনীয় নয়, এবং শত্রু সাধারণতঃ আমাদের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু শত্রু আমাদের জয়কে ঠেকাতে পারে না এবং তার নিজের ক্ষতিও এড়াতে পারে না, কারণ আমরা কখন, কোথায়, কিভাবে তাকে আক্রমণ করব তা সে জানে না। এই ব্যাপারটা আমরা গোপনে রাখি। লালফৌজ সাধারণতঃ আচমকা আক্রমণ করে থাকে।

৭। চলমান যুদ্ধ

চলমান যুদ্ধ না অবস্থানগত যুদ্ধ? আমাদের উত্তর হচ্ছে চলমান যুদ্ধ। আমাদের সৈন্যশক্তি বিরাট নয়, গোলাবারুদাদির সরবরাহ-ব্যবস্থা নেই এবং প্রত্যেকটি ঘাঁটি এলাকায় লড়াই করার জন্য রয়েছে কেবলমাত্র লালফৌজের একটিই বাহিনী—এরকম অবস্থায় আমাদের কাছে অবস্থানগত লড়াইটা হচ্ছে সাধারণভাবে অকেজো। আমাদের পক্ষে অবস্থানগত লড়াই যে শুধু প্রতিরক্ষার বেলায়ই সাধারণভাবে অপ্রযোজ্য তা নয়, আক্রমণের বেলায়ও একইভাবে অপ্রযোজ্য।

শত্রু প্রবল এবং লালফৌজ কারিগরী ক্ষেত্রে দুর্বল। তাই লালফৌজের লড়াই চালনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির একটি হচ্ছে এই যে, তার স্থায়ী যুদ্ধরেখা নেই।

যে গতিমুখে লালফৌজ লড়াই চালায়, সেই গতিমুখ অনুসারেই লালফৌজের যুদ্ধরেখা নির্ধারিত হয়। লড়াই চালনার গতিমুখ স্থায়ী না হওয়ায় লালফৌজের যুদ্ধরেখাও স্থায়ী নয়। কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদিও সাধারণ গতিমুখ বদলায় না, তবুও তার মধ্যে ছোট ছোট গতিমুখগুলো যেকোন মুহূর্তেই পরিবর্তিত হতে পারে। একটা গতিমুখে লড়াই চালাতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে, অন্য গতিমুখে যেতেই হবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরে, লড়াই চালনায় সাধারণ গতিমুখেও যদি নিজেরা বাধাপ্রাপ্ত হই, তাহলে সেটাও বদলে নিতে হবে।

বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধরেখা স্থায়ী হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নেও এমন অবস্থা ঘটেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনী ও আমাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধরেখা আমাদের মতো এত বেশি অস্থায়ী ছিল না। কোন যুদ্ধেই একেবারে স্থায়ী যুদ্ধরেখা থাকতে পারে না, যুদ্ধে জয়-পরাজয় ও অগ্রগমন-পশ্চাদপসরণের পরিবর্তনের কারণে যুদ্ধরেখাটা স্থায়ী হতে পারে না। তবে. আপেক্ষিক স্থায়ী যুদ্ধরেখা সাধারণ যুদ্ধে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান পর্যায়ের চীনা লালফৌজের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি কোন সৈন্যবাহিনী যদি তার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লড়ে, কেবল তখনই ব্যতিক্রম দেখা যায়।

যুদ্ধরেখা স্থায়ী না থাকার ফলে ঘাটি এলাকার ভূখণ্ড স্থায়ী থাকে না। প্রায়শঃই ঘাটি এলাকার আয়তন কখনও কমে কখনও বাড়ে, কখনও সঙ্কুচিত

হয় কখনও প্রসারিত হয়, এবং প্রায়ই একটি ঘাঁটি এলাকার পতন ঘটলে অন্য একটি ঘাঁটি এলাকার উদ্ভব হয়। ঘাঁটি এলাকার ভূখণ্ডের এই প্রবাহমানতা পুরোপুরিভাবেই যুদ্ধের প্রবাহমানতা থেকে উদ্ভূত হয়।

যুদ্ধ ও ঘাঁটি এলাকার ভূখণ্ডের প্রবাহমানতার প্রভাবে ঘাঁটি এলাকায় বিভিন্ন ধরনের গঠনকার্যও প্রবাহমান হয়ে ওঠে। কয়েক বছর মেয়াদবিশিষ্ট গঠন-পরিকল্পনার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। আমাদের পক্ষে পরিকল্পনার ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে দৈনন্দিন ব্যাপার।

এই বৈশিষ্ট্যটিকে স্বীকার করে নেওয়া আমাদের পক্ষে লাভজনক। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমাদের কার্যক্রম স্থির করতে হবে। পশ্চাদপসারণবিহীন শুধু কেবল অগ্রসরমান যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের মোহ থাকা উচিত নয়, আমাদের শাসনাধীন ভূখণ্ডের ও সামরিক পশ্চাদ্ভাগের সাময়িক প্রবহণে অবশ্যই আমাদের ভয় পাওয়া চলবে না, দীর্ঘমেয়াদী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনার চেষ্টা করাও আমাদের উচিত নয়। আমাদের চিন্তাধারা ও কাজকে অবস্থার উপযোগী করে নিতে হবে। বসে থাকার জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে, আবার চলে যাবার জন্যেও তৈরী থাকতে হবে, আর সবসময়েই আমাদের রসদাদি হাতের কাছে অবশ্যই তৈরী রাখতে হবে। আজকের প্রবাহমান জীবনের আমাদের প্রচেষ্টার দ্বারাই শুধু ভবিষ্যৎকালে আমরা অপেক্ষাকৃত অপ্রবাহমানতা অর্জন করতে পারব এবং পরিশেষে পূর্ণ স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারব।

পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে তথাকথিত 'নিয়মিত যুদ্ধের' রণনীতি প্রাধান্যলাভ করেছিল। এই রণনীতির প্রবক্তরা এই প্রবাহমানতাকে অস্বীকার করত এবং তথাকথিত 'গেরিলাবাদের' বিরোধিতা করত। প্রবাহমানতার বিরোধী কমরেডরা এমনভাবে কাজ-কারবার চালাত যেন তারা একটা বিরাট রাষ্ট্রের শাসক, আর ফল হল একটা অস্বাভাবিক ও বিপুল প্রবাহমানতা—২৫,০০০ লীর দীর্ঘ অভিযান।

আমাদের শ্রমিক-কৃষক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হচ্ছে একটি রাষ্ট্র, কিন্তু আজও সেটা পুরাদস্তুর রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। আমরা আজও গৃহযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় পর্যায়েই রয়ে গেছি, আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আজও পুরাদস্তুর রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে অনেক দূরে, নিজের সংখ্যা ও কারিগরির দিক দিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী এখনো শত্রুদের চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে আছে, আমাদের এলাকার আয়তন এখনো খুব ছোট, আর

আমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য শত্রু সততই সচেষ্ট এবং আমাদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত সে আনন্দিত হবে না। এসবের ভিত্তিতে আমাদের নীতি স্থির করতে গিয়ে আমাদের পক্ষে বিচারহীনভাবে গোরিলাবাদের বিরোধিতা করা উচিত হবে না; বরং লালফৌজের গেরিলা চরিত্রকে সততার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে। এই ব্যাপারে লজ্জিত হবার কিছু নেই। এর বিপরীতে গোরিলা চরিত্রেই আমাদের বৈশিষ্ট, আমাদের গুণ এবং শত্রুকে পরাজিত করার জন্য আমাদের হাতিয়ার। গেরিলা চরিত্রকে ত্যাগ করার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে, কিন্তু আজই আমরা তা করতে পারি না। ভবিষ্যতে গেরিলা চরিত্র নিশ্চয় লজ্জাজনক একটা কিছু হয়ে উঠবে এবং আমাদের তা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু আজ এটা মূল্যবান এবং এটাতে আমাদের দৃঢ় থাকতে হবে।

'যখন জিততে পারব বুঝি তখন আমরা লড়ি, আর জেতার আশা না থাকলে সরে পড়ি'—আজকের আমাদের চলমান লড়াইয়ের এটাই হচ্ছে সহজ ব্যাখ্যা। দুনিয়ার কোথাও এমন কোন রণবিশারদ নেই, যিনি কেবল লড়াই চালনাকেই স্বীকার করেন, সরে যাওয়াটাকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আমরা যত বেশী সরে যাই, তাঁরা তত বেশী সরে যান না। লড়াই করার চেয়ে সাধরণতঃ সরে যাওয়াতে আমরা অধিক সময় ব্যয় করি, আর মাসে যদি গড়ে একটা বড় আকারের লড়াই করতে পারি, তাই যথেষ্ট ভাল। আমাদের 'সরে যাওয়ার' একটি মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে 'লড়াই করা'। 'লড়াই করা'—এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত অমোদের সমস্ত রণনীতি ও যুদ্ধাভিযানের নীতি তবুও কখনো কখনো এমন অবস্থা দেখা যায়, যখন লড়াই করাটা আমাদের পক্ষে অসমীচীন হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, আমাদের সম্মুখে যদি খুব বেশি শত্রু থাকে তাহলে লড়াই করাটা অসমীচীন। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সম্মুখে শত্রুবাহিনী খুব বেশী বড় না হয়েও যদি আশপাশের শত্রুবাহিনীগুলোর খুব কাছাকাছি হয়, তাহলে তেমন অবস্থায় কখনো কখনো লড়াই করাটাও অসমীচীন। তৃতীয়তঃ, সাধারণতঃ বলতে গেলে, যে শত্রুবাহিনী বিচ্ছিন্ন নয় পরন্তু অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান অধিকার করে আছে, তেমন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করাও অসমীচিন। চতুর্থতঃ, যে লড়াইয়েজয়ের সম্ভাবনা নেই এমন লড়াই অব্যাহত রাখাও উচিত নয়। এমন অবস্থায় আমাদের সরে যেতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এইরূপে সরে যাওয়াটা অনুমোদনযোগ্য এবং অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ প্রথমে

লড়াই করার প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নেবার শর্তেই আমরা স্বীকার করি সরে যাবার প্রয়োজনীয়তাকে। এখানেই নিহিত রয়েছে লালফৌজের চলমান লড়াইয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

আমাদের যুদ্ধ মূলতঃ চলমান লড়াই, কিন্তু যেখানে প্রয়োজন ও সম্ভব সেখানে অবস্থানগত লড়াইকেও আমরা প্রত্যাখান করি না। আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, রণনীতিগত প্রতিরক্ষার সময়ে আমাদের রক্ষী বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করার জন্যে এবং রণনীতিগত আক্রমণের সময়ে বিচ্ছিন্ন ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত শত্রুর মোকাবিলার জন্যে অবস্থানগত লড়াইয়ের পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। এ ধরনের অবস্থানগত লড়াইয়ের মাধ্যমে শত্রুকে পরাজিত করার অভিজ্ঞতা আমাদের কম ছিল না। এইভাবে বহু শহর, দুর্গ ও সুরক্ষিত গ্রাম ভেঙে উন্মুক্ত করেছিলাম আমরা, ভেদ করে দিয়েছিলাম শত্রুর যথেষ্ট সুরক্ষিত রণক্ষেত্রের অবস্থানগুলিকে। এইক্ষেত্রে পরে আমাদের প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে এবং আমাদের এইক্ষেত্রের দুর্বলতাকেও দূর করতে হবে। যে অবস্থানগত আক্রমণ ও অবস্থানগত প্রতিরক্ষা অবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং তাতে অনুমোদনীয়, তা আমাদের সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করা উচিত। আজকের দিনে অবস্থানগত লড়াইয়ের সাধারণ ব্যবহার অথবা চলমান লড়াইয়ের সঙ্গে অবস্থানগত লড়াইকে সমান স্থান দেওয়ারই শুধু আমরা বিরোধিতা করি। সেগুলো অনুমোদন করা যায় না।

দশ বছরের গৃহযুদ্ধের মধ্যে লালফৌজের গেরিলা চরিত্রে, স্থায়ী যুদ্ধরেখার অভাবে, ঘাঁটি এলাকা ও তার গঠনকার্যের প্রবহমানতায় কি কোন পরিবর্তন হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছে। চিংকাং পর্বতের দিনগুলি থেকে শুরু করে কিয়াংসীতে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগে পর্যন্ত কালটি ছিল প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে গেরিলা চরিত্র ও প্রবহমানতা খুব বেশি স্পষ্ট ছিল, লালফৌজ ছিল তার শৈশবাবস্থায় এবং ঘাটি এলাকা তখনও পর্যন্ত গেরিলা অঞ্চলই ছিল। প্রথম থেকে তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পর্যন্ত কালটি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে গেরিলা চরিত্র ও প্রবহমানতা অনেক পরিমাণে কমে যায়, লালফৌজের প্রথম ফ্রন্ট-আর্মি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বেশ কয়েক লক্ষ লোকসংখ্যাবিশিষ্ট ঘাটি এলাকা স্থাপিত হয়। তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পর থেকে

শুরু করে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পর্যন্ত সময়টা ছিল তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে গেরিলা চরিত্র ও প্রবহমানতা আরও কমে গিয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও বিপ্লবী সামরিক কমিশন ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। দীর্ঘ অভিযান ছিল চতুর্থ পর্যায়। ভ্রান্তভাবে ক্ষুদ্রাকারের গেরিলা চরিত্র ও ঘাঁটি এলাকার সামান্য প্রবহমানতাকে অস্বীকার করার ফলে বিরাট গেরিলা চরিত্রের ও বিরাট প্রবহমানতার উদ্ভব ঘটেছিল। এখানে আমরা রয়েছি পঞ্চম পর্যায়ে। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করে দেবার ব্যাপারে আমাদের ব্যর্থতার কারণে এবং এই বিরাট প্রবহমানতার কারণে লালফৌজ ও ঘাঁটি এলাকাগুলো অনেক হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে আমরা দৃঢ়ভাবে পা রেখে দাঁড়িয়েছি এবং শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সামান্ত ঘাঁটি এলাকাকে সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করেছি। লালফৌজের প্রধান শক্তি তিনটি ফ্রন্ট-আর্মিকে একীভূত পরিচালনার অধীনে আনা হয়েছে—পূর্বে আর কখনও এমনটি হয়নি।

রণনীতির প্রকৃতি বিচার করলে, আমরা এ কথাও বলতে পারি যে, চিংকাং পর্বতের সময় থেকে চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পর্যন্ত কালটা ছিল একটা পর্যায়, পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ছিল আর একটা পর্যায়; এবং দীর্ঘ অভিযান থেকে অদ্যাবধি কালটি হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে অতীতের সঠিক নীতিকে ভ্রান্তভাবে অস্বীকার করা হয়েছিল। আর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে অবলম্বিত ভুল নীতিকে আজ আমরা সঠিকভাবে অস্বীকার করেছি এবং আগেকার সঠিক নীতিকে পুনঃপ্রবর্তিত করেছি। কিন্তু পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সবকিছুকেই যেমন আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিইনি, তেমনি অতীতের সবকিছুকেই যে আমরা পুনঃপ্রবর্তিত করেছি, তাও নয়। অতীতে যা ভাল ছিল আমরা শুধু তাকে আবার পুনঃপ্রবর্তিত করেছি, পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে ভুল হয়েছিল শুধু তাকেই আমরা পরিত্যাগ করেছি।

গেরিলাবাদের দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে অনিয়মানুবর্তিতা, অর্থাৎ কেন্দ্রীয়করণের অভাব, একত্বের অভাব, কঠোর শৃংখলার অভাব এবং কর্ম পদ্ধতির অতি সরলতা ইত্যাদি। এগুলো এসেছিল লালফৌজের শৈশবাবস্থা

থেকে, এগুলোর কোন কোনটার প্রয়োজন তখন ছিল। কিন্তু লালফৌজ উচ্চতর পর্যায়ে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবশ্যই ক্রমে ক্রমে ও সচেতনভাবে সেগুলো দূর করা দরকার, যাতে করে লালফৌজ আরও বেশী কেন্দ্রীভূত, আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ, আরও বেশি সুশৃংখলাপূর্ণ হতে পারে এবং কাজকর্ম আরও বেশি পুংখানুপুংখভাবে করতে পারে, অর্থাৎ যাতে করে লালফৌজ আরও বেশি নিয়মিত চরিত্রসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। সামরিক কার্যকলাপের পরিচালনায় যেসব গেরিলা চরিত্র উচ্চতর পর্যায়ের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে ও সচেতনভাবে কমিয়ে ফেলতে হবে। এই ব্যাপারে এগিয়ে অস্বীকার করা এবং পুরানো পর্যায়ে একগুঁয়ের মতো থামাটা হচ্ছে অনুমোদনযোগ্য ও ক্ষতিকর, আর বিরাটাকারের লড়াই চালনার পক্ষে তা হচ্ছে ক্ষতিকর।

গেরিলাবাদের অপর দিকটা হচ্ছে চলমান লড়াইয়ের নীতি, রণনীতিগত ও যুদ্ধাভিযানগত লড়াই চালনার গেরিলা চরিত্র—যা এখনো প্রয়োজীয়। এই দিকটা হচ্ছে ঘাঁটি এলাকাগুলোর অপরিহার্য প্রবহমানতা, ঘাঁটি এলাকাগুলোতে গঠন পরিকল্পনার নমনীয়তা, এবং লালফৌজের গঠনে অসময়োচিত নিয়মানুবর্তিতার প্রত্যাখ্যান। এই ক্ষেত্রে ইতিহাসের তথ্যকে অস্বীকার করা, যা উপযোগী তাকে বজায় রাখার বিরোধিতা করা, অবিবেচিতভাবে বর্তমান পর্যায়কে ছেড়ে যাওয়া, এবং যা নাগালের বাইরে ও বর্তমান বাস্তবিক তাৎপর্যবিহীন সেই তথাকথিত 'নতুন পর্যায়ে' অন্ধের মতো ছুটে যাওয়াটা অনুরূপভাবে হচ্ছে অনুমোদনযোগ্য ও ক্ষতিকর এবং বর্তমানের লড়াই চালনার পক্ষে তা হচ্ছে অনিষ্টকর।

আমরা এখন লালফৌজের কারিগরী ও সাংগঠনিক বিকাশের একটা নতুন পর্যায়ের পূর্বক্ষণে রয়েছি। এই নতুন পর্যায়ে যাবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। এই ধরনের প্রস্তুতি না করাটা হবে ভুল, আমাদের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পক্ষেও তা হবে অনিষ্টকর। ভবিষ্যতে, যখন লালফৌজের কারিগরী ও সাংগঠনিক অবস্থা বদলাবে এবং লালফৌজের গঠনকার্য নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করবে, তখন লালফৌজের লড়াই চালনার দিকস্থিতি (operational direcrions) ও যুদ্ধ-রেখা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়ে উঠবে, অবস্থানগত লড়াই বৃদ্ধি পাবে, যুদ্ধের প্রবাহমানতা, আমাদের ভূখণ্ডের ও গঠনকার্যের প্রবাহমানতা বহুল পরিমাণে কমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শত্রুর উৎকৃষ্ট শক্তি ও তার

সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত অবস্থান প্রভৃতি যে সমস্ত অসুবিধা বর্তমানে আমাদেরকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখছে, সেগুলো তখন আর আমাদেরকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখতে পারবে না।

বর্তমানে আমরা একদিকে 'বাম' সুবিধাবিদের প্রাধান্যকালের ভুল পদ্ধতিগুলোর বিরোধিতা করি, অন্যদিকে লালফৌজের শৈশবাব্যস্থার অনেক-গুলো অনিয়মিত চরিত্র যা বর্তমানের জন্য অপ্রয়োজনীয়, তার পুনঃপ্রবর্তনেরও বিরোধিতা করি। কিন্তু সৈন্যবাহিনী গঠনের এবং রণনীতি ও রণকৌশলের বহু অমূল্য নীতিকে দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইগুলোকে অবলম্বন করেই লালফৌজ যুদ্ধে বারংবার জয়লাভ করছে। অতীতের যা কিছু ভাল সেগুলোর সার সংকলন করে সুব্যবস্থিত, আরও বিকশিত ও আরও সমৃদ্ধ সামরিক লাইনে পরিণত করতে হবে, যাতে করে আজ আমরা শত্রুকে পরাজিত করতে পারি এবং ভবিষ্যতে নতুন পর্যায়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি।

চলমান লড়াই চালানোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহু সমস্যা। যথা: পর্য-বেক্ষণ, বিচার, সংকল্প লড়াইয়ের জন্য বিন্যাসব্যবস্থা, পরিচালনা, আত্মগোপন, কেন্দ্রীকরণ, অগ্রগমন, প্রসারণ, আক্রমণ, পশ্চাদ্ধাবন, আকস্মিক আক্রমণ, অবস্থানগত আক্রমণ, অবস্থানগত প্রতিরক্ষা, সম্মুখ সংঘর্ষ, পশ্চাদপসরণ, নৈশ লড়াই, বিশেষ ধরনের লড়াই, সবলকে এড়িয়ে দুর্বলকে আক্রমণ, শহর ঘেরাও করে এর সাহায্যে ধেয়ে আসা শত্রুকে ধ্বংস করা, কপট আক্রমণ' বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা, কয়েকটি শত্রুবাহিনীর মধ্যে সামরিক কার্যকলাপ চালানো, শত্রুর একাংশ অতিক্রম করে অন্য অংশের উপরে আক্রমণ চালানো, অবিরাম লড়াই চালানো, পৃষ্ঠদেশহীন লড়াই, ভালভাবে বিশ্রাম করার ও কর্মশক্তি সঞ্চয় করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো লালফৌজের যুদ্ধ-ইতিহাসে অনেক বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত করেছে। যুদ্ধাভিযান-বিজ্ঞানে এই সব বৈশিষ্ট্যগুলোর সুশৃংখলভাবে আলোচনা হওয়া উচিত এবং সে-সবের সারসংক্ষেপও থাকা উচিত। সে-সব নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করছি না।

৮। দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ

রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধাভিযান ও লড়াই

হচ্ছে একই বিষয়ের দুইটি দিক। গৃহযুদ্ধে এই দুটি নীতি একই সময়ে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধেও এগুলি প্রযোজ্য।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি খুবই প্রবল হওয়ার কারণে বিপ্লবী শক্তি বাড়ে শুধু ক্রমে ক্রমে—এটাই যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এই ক্ষেত্রে অধৈর্য হওয়া ক্ষতিকর এবং এখানে 'দ্রুত নিষ্পত্তির' কথা বলা ভুল। আমরা দশ বছর ধরে বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়েছি, অন্যান্য দেশের কাছে এটা বিস্ময়কর হতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা যেন একটা অষ্টপদী রচনার শিরোনামার ব্যাখ্যা এবং প্রাথমিক মন্তব্য[৪০] মাত্র লেখা হয়েছে—রচনাটির অনেক আকর্ষণীয় অংশ এখনো লিখতে বাকী আছে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থার প্রভাবে ভবিষ্যতের বিকাশ যে আগের চেয়ে অনেক দ্রুততর হতে পারবে—তাতে কোন সন্দেহই নেই। কারণ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই পরিবর্তন ঘটেছে এবং আরও বৃহত্তর পরিবর্তন ঘটবে। তাই এ কথা বলা যায় যে, মন্থর বিকাশ ও একা লড়াই করার অতীত অবস্থা থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি। কিন্তু আগামীকালই সাফল্যলাভের আশা করা উচিৎ হবে না 'প্রাতরাশের পূর্বেই শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার উচ্চাভিলাষ ভাল, কিন্তু তেমনি করবার জন্য বাস্তব পরিকল্পনা করাটা খারাপ। চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো বহু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় দেশী ও বিদেশী শত্রুর প্রধান অবস্থানগুলোকে ভেঙে ফেলবার মতো যথেষ্ট শক্তি চীনের বিপ্লবী শক্তিগুলো সঞ্চয় না করা পর্যন্ত এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শক্তিগুলোর দ্বারা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর অধিকাংশকে চূর্ণ না করা ও আটকে না রাখা পর্যন্ত, আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবেই চলতে থাকবে। এই ভিত্তিতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লড়াই চালনার রণনীতিগত নীতি নির্ধারণ করাটা হচ্ছে আমাদের রণনীতিগত পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলির একটি।

যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের নীতি ঠিক এর বিপরীত—দীর্ঘস্থায়িত্ব নয়, বরং দ্রুত নিষ্পত্তিই হল নীতি। যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টা করা প্রয়োজন, প্রাচীনকালে বা আধুনিককালে, চীনদেশে বা বিদেশে এটা একইভাবে সত্য। যুদ্ধের ব্যাপারেও সব সময়ে ও সব দেশে দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি করা হয় এবং দীর্ঘ প্রলম্বিত যুদ্ধকে সর্বদাই ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা হয়। চীনের যুদ্ধকেই কেবল সর্বাধিক ধৈর্যের সঙ্গে চালাতে হবে, এবং তাকে অবশ্যই

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবে চালাতে হবে। লি লি-সান লাইনের আমলে কেউ কেউ আমাদের কার্যকলাপকে 'মুষ্টিযুদ্ধের রণকৌশল' বলে বিদ্রূপ করত (মুষ্টিযুদ্ধের রণকৌশল বলতে বুঝায় বারবার লড়াই করার পরই কেবল একটি বড় শহর দখল করার কথা)। তারা এই বলে উপহাস করত যে, আমাদের চুল পেকে সাদা হওয়ার পরেই শুধু বিপ্লবের জয় আমরা দেখতে পাই। এই ধরনের অসহিষ্ণু মনোভাব অনেক আগেই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সমালোচনা রণনীতির সম্পর্কে প্রয়োগ না করে যদি যুদ্ধাভিযান ও লড়াই সম্পর্কে প্রয়োগ করা হতো, তাহলে সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল হতো। তার কারণঃ প্রথমতঃ, লালফৌজের অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ করে গোলাবারুদের সরবরাহের উৎস নেই; দ্বিতীয়তঃ, শ্বেতবাহিনীর অনেক সৈন্যদল রয়েছে কিন্তু লালফৌজের আছে শুধু একটা—প্রতিটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে লালফৌজকে দ্রুতভাবে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকতে হয়; তৃতীয়তঃ, শ্বেতবাহিনী কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথকভাবে অগ্রসর হলেও সেগুলির অধিকাংশই একে অপরের খুবই কাছাকাছি থাকে। আমরা যদি তাদের একটাকে আক্রমণ করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে না পারি, তাহলে অন্য দলগুলিও সবাই আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এইসব কারণেই আমরা দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই না চালিয়ে পারি না। প্রায়শঃই, আমরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে, অথবা এক বা দুই দিনের মধ্যে একটা লড়াই শেষ করে থাকি। 'শহর ঘেরাও করে এর সাহায্যে ধেয়ে আসা শত্রুকে ধ্বংস করার' নীতির উদ্দেশ্য পরিবেষ্টিত শহরের শত্রুকে ধ্বংস করা নয়, বরং তার সাহায্যে ধেয়ে আসা শত্রুকে ধ্বংস করা। শুধু এই নীতিতেই আমরা পরিবেষ্টিত শত্রুর বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালাতে প্রস্তুত, কিন্তু তখনো তার সাহায্যে ধেয়ে আসা শত্রুর বিরুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই চালাব। আমরা যখন রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় শত্রুকে আটকে রাখবার কার্যকলাপে কোন ঘাঁটিকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করি, অথবা যখন রণনীতিগত আক্রমণে আমরা বিচ্ছিন্ন ও সাহায্যে থেকে বঞ্চিত শত্রুকে আঘাত হানি, অথবা আমাদের ঘাঁটি এলাকার অভ্যন্তরস্থ শ্বেত ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করি, তখন প্রায়শঃই আমরা যুদ্ধাভিযান বা লড়াইকেও দীর্ঘস্থায়ীভাবে চালিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করি। কিন্তু এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী লড়াই নিয়মিত লালফৌজকে তার দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ে শুধু সাহায্যই করে, বাধা দেয় না।

দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের ব্যাপারে যে শুধু ইচ্ছা থাকলেই সাফল্যলাভ করা যাবে, তা নয়। এরজন্য আরও অনেকগুলো বাস্তব শর্ত থাকা দরকার। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—পূর্ণপ্রস্তুতি, উপযুক্ত মুহূর্তটি না হারানো, উৎকৃষ্টতর সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা; ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্বে বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশল, অনুকূল অবস্থান, চলমান শত্রুকে আঘাত হানা, অথবা শত্রু যখন শিবির ফেলার জন্য থেমেছে কিন্তু তার অবস্থান, সংহত হয়নি তখন তাকে আঘাত হানা। এইসব শর্তের সৃষ্টি করা না হলে যুদ্ধাভিযান অথবা লড়াইয়ের দ্রুত নিষ্পত্তি অসম্ভব।

শত্রুর প্রতিটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেওয়াটা হচ্ছে একটা বিরাটাকারের যুদ্ধাভিযান, এতেও দ্রুত নিষ্পত্তির নীতি প্রযোজ্য, দীর্ঘস্থায়িত্বের নীতি নয়। কারণ ঘাঁটি এলাকার জনশক্তি, অধিক শক্তি এবং সামরিক শক্তি প্রভৃতি শর্তগুলো দীর্ঘস্থায়িত্বের অনুমোদন করে না।

কিন্তু দ্রুত নিষ্পত্তির সাধারণ নীতিতে অপ্রয়োজনীয় অসহিষ্ণুতার বিরোধিতা করা অবশ্যই দরকার। এটা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজন যে, ঘাঁটি এলাকার এই সমস্ত শর্ত ও শত্রুর অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে একটা বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার সর্বোচ্চ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় সংস্থার উচিত শত্রুর তর্জন-গর্জনের ভয়ে ভীত না হওয়া, সহ্য করা সম্ভব এমন কষ্টের ভয়ে নিরুৎসাহ না হওয়া, কয়েকবার ব্যর্থ হয়াতে হতাশ না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা। কিয়াংসী প্রদেশে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানকে চুরমার করতে প্রথম থেকে শেষ লড়াই পর্যন্ত শুধু এক সপ্তাহ লেগেছিল ; দ্বিতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' আভযানকে চুরমার করতে একপক্ষকাল মাত্র লেগেছিল ; তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করার জন্য তিন মাস ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছিল ; চতুর্থটিকে লেগেছিল তিন সপ্তাহ ; পঞ্চমটিতে গোটা একবছর অতি কষ্টে ও ধৈর্যের সঙ্গে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করতে ব্যর্থ হবার পরে আমরা যখন শত্রুর পরিবেষ্টনকে ভেদ করে যেতে বাধ্য হলাম, তখন অপ্রয়োজনীয় তাড়াহুড়ো দিয়েছিল। তখনকার অবস্থা অনুসারে আমারা আরও দু-তিন মাস টিকতে পারতাম, তাতে বিশ্রামের জন্য ও নিজেকে ঠিকঠাক করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে কিছুটা সময়ও দেওয়া যেত। এটা যদি করা হতো এবং পরিবেষ্টনকে ভেদ করার পরে আমাদের নেতৃত্ব যদি একটু বেশি

বিচক্ষণ হতো তাহলে পরিস্থিতিটা অনেক ভিন্ন হতো।

তৎসত্ত্বেও, গোটা যুদ্ধাভিযানের সময়কে যথাসম্ভব উপায়ে হ্রাস করার নীতি যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তা অপরিবর্তিতই রয়েছে। যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের পরিকল্পনাগুলোর উচিত সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা এবং চলমান লড়াই চালানো প্রভৃতির জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এইসবই করা উচিত অন্তর্লাইনে (অর্থাৎ ঘাঁটি এলাকায়) শত্রুর কার্যকারী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য এবং 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে দ্রুত চুরমার করার জন্য। এগুলি ছাড়া, যখন এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্তর্লাইনের 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করা অসম্ভব, তখন শত্রুর পরিবেষ্টনকে ভেদ করে যাবার জন্য আমাদের উচিত লালফৌজের প্রধান শক্তিকে নিয়োগ করা এবং আমাদের বহির্লাইনে অর্থাৎ শত্রুর অন্তর্লাইনে সরে এসে সেখানেই শত্রুকে পরাজিত করা। আজ যখন দুর্গনীতি খুবই চালু করে নিয়েছে, তখন প্রায়শঃই উপরোক্ত পদ্ধতিই হবে আমাদের লড়াইয়ের পদ্ধতি। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হবার দু'মাস পরেই ফুকিয়েনের ঘটনাটা[৪১] ঘটল। তখন লাল ফৌজের প্রধান শক্তিগুলোর নিঃসন্দেহে উচিত ছিল চেকিয়াংকে কেন্দ্র করে কিয়াংসু-চেকিয়াং-আনহুই-কিয়াংসী অঞ্চলে জোর করে ঢুকে পড়া, আর হাংচৌ, সুচৌ, নানকিং, উহু, নানছাং ও ফুচৌয়ের মধ্যবর্তী গোটা এলাকার সর্বত্রই সক্রিয়ভাবে সামরিক তৎপরতা বিস্তৃত করা, আমাদের রণনীতিগত প্রতিরক্ষাকে রণনীতিগত আক্রমণে পরিবর্তিত করা, শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ মূল অঞ্চলগুলোকে বিপদাপন্ন করা এবং যে বিশাল এলাকার দুর্গ নেই, সেখানে শত্রুকে যুদ্ধে লিপ্ত করা। যে শত্রু দক্ষিণ কিয়াংসী পশ্চিম ফুকিয়েনের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল, এই ধরনের উপায়ে আমরা তাকে তার নিজের গুরুত্বপূর্ণ মূল অঞ্চলগুলোকে রক্ষা করবার জন্যে পিছু হঠতে বাধ্য করতে পারতাম, কিয়াংসীর ঘাঁটি এলাকার ওপরে অক্রমণকে চুরমার করে দিতে পারতাম, এবং ফুকিয়েন গণসরকারকে সাহায্য করতে পারতাম— নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারতাম এই উপায়ে। এই পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল বলেই শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করতে পারা গেল না, আর ফুকিয়েনে গণ-সরকারও ভেঙে পড়তে বাধ্য হল। এক বছর ধরে লড়াইয়ের পরে চেকিয়াংয়ের দিকে এগিয়ে যাবার কোন সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও, আমরা অন্যদিকে রণনীতিগত আক্রমণ চালাতে পারতাম, অর্থাৎ

আমাদের প্রধান বাহিনীগুলোকে হুনান অভিমুখে পরিচালিত করে, মানে হুনানের ভেতর দিয়ে কুইচৌয়ে যাবার বদলে মধ্য হুনানে এগিয়ে যেতে পারতাম, এবং এইভাবে শত্রুকে কিয়াংসী থেকে হুনানে টেনে এনে সেখানে তাকে ধ্বংস করতে পারতাম। কিন্তু এ পরিকল্পনাটাও অগ্রাহ্য করা হল, ফলে শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেবার শেষ আশাও নির্মূল হল, এবং লং মার্চ ছাড়া আমাদের আর কোন পথই রইল না।

৯। নির্মূলীকরণের যুদ্ধ

আজ চীনা লালফৌজের জন্য 'শক্তিক্ষয়ের প্রতিযোগিতার' ওকালতি করা অসমীচীন। 'মণিরত্নের প্রতিযোগিতা' দুটি ড্রাগন রাজার মধ্যে না চলে ড্রাগন রাজা ও এক ভিখারীর মধ্যে চলছে এটা খুবই হাস্যকর। লালফৌজ তার প্রায় সবকিছু শত্রুর কাছ থেকে পায়, তার পক্ষে নির্মূলীকরণের লড়াই হচ্ছে মৌলিক নীতি। শত্রুর কার্যকরী শক্তিকে নির্মূল করেই শুধু আমরা 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দিতে ও বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাকে সম্প্রসারিত করতে পারি। শত্রুকে হতাহত করার নীতিটা ব্যবহৃত হয় শত্রুকে নির্মূল করার উপায় হিসেবে, অন্যথায় সেটার কোন অর্থই হয় না। শত্রুকে হতাহত করতে গিয়ে আমরা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হই, আবার শত্রুকে নির্মূল করেই আমরা আমাদের নিজেদের পূরণ করি। এইভাবে আমরা যে শুধু আমাদের সৈন্যবাহিনীর ক্ষতিরই পূরণ করে নিই তা নয় বরং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনীর শক্তির বৃদ্ধিও করে নিই। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন শত্রুবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করায় জয়-পরাজয়ের মৌলিক মীমাংসা হয় না। পক্ষান্তরে নির্মূলীকরণের লড়াই যে-কোন শত্রুর উপর তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড চাপ দেয়। একটি লোকের দশটা আঙুল ক্ষতবিক্ষত করাটাও তার একটি আঙুলকে একেবারে কেটে দেওয়ার মতো কার্যকরী নয়, শত্রুর দশটি ডিভিশনকে ছত্রভঙ্গ করাটাও তাদের একটিকে নির্মূল করে ফেলার মতো কার্যকরী নয়।

শত্রুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের নীতি ছিল নির্মূলীকরণের লড়াই। প্রত্যেকবারে যেসব শত্রুকে নির্মূল করা হয়েছে, তা শুধু সমগ্র শত্রুবাহিনীর একটি অংশ মাত্র, তবুও এইসব 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করা

হয়েছে। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে এর বিপরীত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, আর এটা বাস্তবে শত্রুকে তার লক্ষ সাধনে সাহায্য করেছিল।

একদিকে নির্মূলীকরণের লড়াই, অপরদিকে উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্বে বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশল গ্রহণ করা—এ দুটোর তাৎপর্য একই। দ্বিতীয়টা না হলে আমরা প্রথমটা পেতে পারি না। জনসমর্থন, অনুকূল অবস্থান, সহজে আঘাত হানা যায় এমন শত্রু এবং আকস্মিকতার সুবিধা প্রভৃতি শর্তাদি সবই হচ্ছে নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের পক্ষে অপরিহার্য।

যখন আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান শক্তি সমগ্র লড়াইয়ে বা সমগ্র যুদ্ধাভিযানে শত্রুর একটা নির্দিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে নির্মূলীকরণের লড়াই চালায় শুধু তখনই শত্রুর অন্য অংশকে ছত্রভঙ্গ করার তাৎপর্য থাকে, এমনকি তাকে পালিয়ে যেতে দেওয়ার তাৎপর্যও থাকে। অন্যথায় সেটা অর্থহীন। এইক্ষেত্রে লাভের দ্বারা ক্ষতি সার্থক হয়েছিল।

আমাদের সামরিক শিল্প স্থাপন করতে গিয়ে নিজেদের আমরা অবশ্যই তার উপর নির্ভরশীল হতে দেব না। আমাদের মৌলিক নীতি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের ও দেশী শত্রুর সামরিক শিল্পের উপর নির্ভর করা। লণ্ডন ও হানইয়াংয়ের অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার উপরে আমাদের অধিকার আছে, এবং শত্রুর পরিবহণ বাহিনীর মাধ্যমে এই অস্ত্রাদি আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। এটা সরল সত্য, এটা ঠাট্টা নয়।

টীকা

১। উত্তর অভিযানের যুদ্ধ হচ্ছে ১৯২৬-২৭ সালে চীনা জনগণের দ্বারা চালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী মহান বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে, কুয়াংতোংয়ের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা একীকরণ করার পর, উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসন উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী কুয়াংতুং থেকে উত্তর অভিযান শুরু করেছিল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের আন্তরিক সমর্থনে ১৯২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী যুদ্ধ

চালিয়ে দ্রুতভাবে ইয়াংসি ও হুয়াংহো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পৌঁছেছিল এবং অর্ধেক চীন দখল করে নিয়েছিল, এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির উপরে মোক্ষম আঘাত হেনেছিল। যখন উত্তর অভিযান বিজয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীরা (যারা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী ও বৃহৎ জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে) সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিবিপ্লবী ক্যুদেতা ঘটায়। তা ছাড়া চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ছেন তু-সিউর প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা পার্টির নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে কমরেড মাও সে-তুঙের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী লাইনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং আত্মসমর্পণবাদী লাইনকে পালন করে বিপ্লবের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেছিল, বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব ত্যাগ করেছিল। ফলে এবারকার বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়।—অনুবাদক

২। রণনীতির বিজ্ঞান, যুদ্ধাভিযানের বিজ্ঞান ও রণকৌশলের বিজ্ঞান—এসবগুলিই চীনা সামরিক বিজ্ঞানের অংগ। রণনীতির বিজ্ঞান সামগ্রিক যুদ্ধ-পরিস্থিতির নিয়মগুলির পর্যালোচনা করে। যুদ্ধাভিযানের বিজ্ঞান যুদ্ধাভিযানের নির্ধারক নিয়মগুলির পর্যালোচনা করে, এবং যুদ্ধাভিযানে প্রযুক্ত হয়। রণ-কৌশলের বিজ্ঞান খণ্ডযুদ্ধের নির্ধারক নিয়মগুলির পর্যালোচনা করে ও খণ্ডযুদ্ধে প্রযুক্ত হয়।

৩। সুন উ জু অর্থাৎ সুন উ ছিলেন খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের বিখ্যাত চীনা সমরতত্ত্ববিদ। তিনি সুন জু নামে একখানি বই লিখেছিলেন, এই বইয়ে ১৩টি অধ্যায় আছে। এই উদ্ধৃতিটি 'আক্রমণের রণনীতি' নামক তৃতীয় অধ্যায় থেকে গৃহীত।

৪। কমরেড মাও সে-তুঙ যখন ১৯৩৬ সালে এই প্রবন্ধটি লেখেন, তখন ১৯২১ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পনের বছর পূর্ণ হয়েছে।

৫। ছেন তু-সিউ ছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। 'সিন ছিন-নিয়ান' (নবযুবক) নামক একটি সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ছিলেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ৪ঠা মে আন্দোলনে তাঁর খ্যাতি ও পার্টির প্রাথমিক পর্যায়ের অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের সর্বশেষ পর্যায়ে পার্টির ভেতরে ছেন তু-সিউ যে দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তা আত্মসমর্পণবাদী লাইনে রূপ লাভ করেছিল। তখনকার 'আত্মসমর্পণবাদীরা স্বেচ্ছায় কৃষকসাধারণ, শহরে পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াদের ওপরে নেতৃত্বকে ত্যাগ করেছিল, বিশেষ করে তারা ত্যাগ করেছিল সশস্ত্র বাহিনীর ওপরে নেতৃত্বকে। এমনি করে তারা পরাজয় ঘটিয়েছিল বিপ্লবের' ('বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' : মাও সে-তুঙ)। ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পরে ছেন তু-সিউ ও মুষ্টিমেয় অন্যান্য আত্মসমর্পণবাদীরা বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং বিলোপবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ট্রটস্কিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন এবং ট্রটস্কিবাদীদের সঙ্গে মিলে একটি পার্টি-বিরোধী উপদল গঠন করেছিলেন। ফলতঃ ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে ছেন তু-সিউ পার্টি থেকে বিতাড়িত হন। ১৯৪২ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

৬। লি লি-সানের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ বলতে সেই 'বাম' সুবিধাবাদী লাইনকে বোঝায়, যার প্রাধান্য পার্টিতে ১৯৩০ সালের জুন মাস থেকে শুরু করে চার মাস যাবৎ ছিল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন প্রধান নেতা কমরেড লি লি-সান এই লাইনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এটা সাধারণতঃ লি লি-সান লাইন নামে পরিচিত। লি লি-সান লাইনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল: এই লাইন পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের নীতিকে লংঘন করে, বিপ্লবের জন্যে জনসাধারণের শক্তি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে, অস্বীকার করে বিপ্লবের অসমবিকাশকে। গ্রামীণ ঘাঁটি এলাকার সৃষ্টিতে, গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলোকে ঘেরাও করার ব্যাপারে, এবং দেশব্যাপী বিপ্লবের উত্তাল জোয়ারকে এগিয়ে নেবার জন্য এই ঘাঁটি এলাকাগুলোর ব্যবহারে প্রধানতঃ আমাদের মনোযোগ দীর্ঘকাল ধরে নিবদ্ধ রাখতে হবে—কমরেড মাও সে-তুঙের এ চিন্তাধারাকে এই লাইন 'মারাত্মক ভুল' এবং 'কৃষক মনোভাবের স্থানিকতা ও রক্ষণশীলতা' বলে মনে করত। আর এই লাইনটা এই অভিমত পোষণ করত যে, দেশের সব অংশে তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ ঘটানোর জন্যে প্রস্তুতি করতে হবে। এই ভুল লাইনের ভিত্তিতে কমরেড লি লি-সান সারা দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে তখনই সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাবার এক হঠকারী পরিকল্পনা তৈরী করে বসলেন। একই সময়ে এই লাইন আবার বিশ্ব-বিপ্লবের অসম

বিকাশকে মেনে নিতে অস্বীকার করল এই বলে যে, চীনা বিপ্লবের সামগ্রিক বিস্ফোরণ অনিবার্যরূপেই সামগ্রিক বিশ্ব-বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটাবে, যাকে বাদ দিয়ে চীনা বিপ্লব সফল হতে পারে না। চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রকে মানতেও অস্বীকার করল এই বলে যে, এক বা একাধিক প্রদেশে বিপ্লবের জয়ের সূচনাই হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরের সূচনা, এবং এইভাবে তিনি কতকগুলো অসময়োচিত 'বাম' হঠকারী নীতি নির্ধারিত করলেন। কমরেড মাও সে-তুঙ এই ভুল লাইনের বিরোধিতা করেন এবং সমগ্র পার্টির ব্যাপক কর্মী ও সদস্যগণও এর সংশোধন দাবি করেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনে উল্লিখিত ভুলগুলোকে কমরেড লি লি-সান নিজেই স্বীকার করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বপদ থেকে সরে দাঁড়ান। দীর্ঘকাল ধরে কমরেড লি লি-সান নিজের ভুল অভিমতগুলো সংশোধন করে নেন, আর তাই পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে তিনি আবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

৭। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন এবং এর পরবর্তীকালের কেন্দ্রীয় কমিটি লি লি-সান লাইনের অবসান ঘটাবার জন্য অনেকগুলো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে পার্টির ভেতরে বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রামে অনভিজ্ঞ কিছু সংখ্যক কমরেড ছেন শাও-ইয়ু (ওয়াং মিং) ও ছিন পাং-সিয়ান (পো কু)-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলির বিরোধিতা করতে দাঁড়ান। সেই সময়ে প্রকাশিত 'দুই লাইন' অথবা 'চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আরও বেশি বলশেভিকীকরণের জন্য সংগ্রাম' শীর্ষক পুস্তিকায় তাঁরা বিশেষ জোর দিয়ে ঘোষণা করেন যে, পার্টির ভেতরে তখন প্রধান বিপদ 'বাম' সুবিধাবাদ নয়, বরং তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ'। আর নিজেদের কার্যকলাপের রাজনৈতিক পুঁজি সংগ্রহের জন্য তাঁরা লি লি-সান লাইনকে 'দক্ষিণপন্থী' লাইন বলে 'সমালোচনা' করেন। লি লি-সান লাইন এবং অন্যান্য 'বাম' ভাবধারা ও 'বাম' নীতিগুলোকে নতুন রূপে অব্যাহতভাবে চালু করা, পুনরুদ্ধার করা অথবা পরিপুষ্ট করার একটা নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচী তাঁরা পেশ করেন, আর এটাকে তাঁরা দাঁড় করান কমরেড মাও সে-তুঙের সঠিক লাইনের বিরুদ্ধে। 'চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা' শীর্ষক বর্তমান প্রবন্ধটি

কমরেড মাও সে-তুঙ প্রধানতঃ এই নতুন 'বাম' সুবিধাবাদী লাইনের সামরিক ক্ষেত্রের ভুলভ্রান্তির সমালোচনা করার জন্যই রচনা করেছিলেন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ বর্ধিত অধিবেশন থেকে শুরু করে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে কুইচৌ প্রদেশের চুনইতে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহূত পলিটব্যুরোর অধিবেশন পর্যন্ত, পার্টির ভেতরে এই নতুন 'বাম' সুবিধাবাদী লাইনের প্রাধান্য ছিল। আর পলিটব্যুরোর এই অধিবেশনটি এই ভুল লাইনের নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভুল 'বাম' লাইনের প্রাধান্য দীর্ঘকাল (চার বছর) ধরে পার্টিতে বিরাজ করে, এবং পার্টির ও বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি করে। তার কুফল হয়েছিল নিম্নরূপ: চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, চীনা লালফৌজ ও তার ঘাঁটি এলাকার শতকরা ৯০ ভাগেরই ক্ষতি হয়েছিল, বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় কোটি কোটি মানুষ কুওমিনতাঙের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল, আর বিলম্বিত করা হয়েছিল চীনা বিপ্লবের অগ্রগতিকে। যেসব কমরেড এই 'বাম' লাইনের ভুল করেছিলেন, তাঁদের ব্যাপকতম সংখ্যাগুরু অংশ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের ভুল বুঝেছিলেন ও সংশোধন করে নিয়েছিলেন, এবং পার্টি ও জনগণের জন্য বহু হিতকর কাজ করেছিলেন। কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে এক অভিন্ন রাজনৈতিক উপলব্ধির ভিত্তিতে অন্যান্য ব্যাপক কমরেড-সাধারণের সঙ্গে এইসব কমরেডরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

৮। চাং কুও-থাও চীনা বিপ্লবের প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতক। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যৌবনে সে চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। পার্টিতে সে বহু ভুল করে আর মারাত্মক অপরাধ করে। তার সবচেয়ে বড় অপরাধ এই যে, সে ১৯৩৫ সালে লালফৌজের উত্তরমুখী অভিযানের বিরোধিতা করে এবং পরাজয়বাদ ও বিলোপবাদের জেদ ধরে লালফৌজের সিচুয়ান-সীখাং সীমান্তস্থ সংখ্যালঘু জাতিগুলির এলাকায় পশ্চাদপসরণের ওকালতি করে। পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যকলাপে সে প্রকাশ্যভাবে লেগে পড়ে, একটি নিজস্ব মেকী কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন করে, পার্টি ও লালফৌজের ঐক্য লংঘন করে এবং লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট-আর্মির গুরুতর ক্ষতি ঘটায়। কমরেড মাও সে-তুঙের ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহিষ্ণু শিক্ষাদানের ফলে, লাল-ফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট-আর্মি ও তার ব্যাপক কর্মী অচিরেই কেন্দ্রীয় কমিটির

সঠিক নেতৃত্বের আওতায় ফিরে এলেন এবং পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেন। চাং কুও-থাও নিজে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসংশোধিতই রইল। ১৯৩৮ সালের বসন্তকালে শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাকা থেকে সে একাই পালিয়ে যায় এবং কুওমিনতাঙের গুপ্তচর-বিভাগে যোগ দেয়।

৯। লুশানস্থ অফিসার ট্রেনিং দল ছিল কমিউনিস্টবিরোধী সামরিক কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য চিয়াং কাই-শেকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে কিয়াংসী প্রদেশের কিউকিয়াং জেলার লুশান পাহাড়ে এই সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল। জার্মান, ইতালীয় ও আমেরিকান সামরিক শিক্ষাদাতাদের কাছ থেকে ফ্যাসিস্ট সামরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করার জন্য চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের পর্যায়ক্রমে সেখানে পাঠানো হতো।

১০। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের এই নতুন সামরিক নীতিগুলি বলতে প্রধানতঃ চিয়াং কাই-শেক দস্যু-চক্রের 'দুর্গনীতি'কেই বুঝায়। এই নীতি অনুসারে চিয়াং কাই-শেক চক্রের সৈন্যবাহিনী ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে দুর্গ নির্মাণ করে প্রতি পদক্ষেপে নিজেদের অবস্থান সুসংবদ্ধ করে নেয়।

১১। ভি. আই. লেনিনের 'কমিউনিজম' নামক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট বেলা কুনকে সমালোচনা করে এই প্রবন্ধে লেনিন বলেছিলেন যে, বেলা কুন 'এড়িয়ে গেছে মার্কসবাদের একান্ত সারবস্তু এবং মার্কসবাদের জীবন্ত মর্মবস্তু—বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ' ('সংকলিত রচনাবলী', রুশ সংস্করণ, মস্কো ১৯৫০, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১৪৩)।

১২। হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার পার্টির প্রথম কংগ্রেস, অর্থাৎ ১৯২৮ সালের ২০শে মে তারিখে নিংকাং জেলার মাওপিংয়ে অনুষ্ঠিত হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস।

১৩। বিরাটাকারের পশ্চাদ্ভাগ-ব্যবস্থাকে বলতে বুঝায় বিরাট ও জগদ্দল আকারের পশ্চাদ্ভাগের কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা তখনকার যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়নি। ছোট আকারের পশ্চাদ্ভাগ-ব্যবস্থাকে বলতে বুঝায় সহজতর এবং যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত এমন ছোট আকারের পশ্চাদ্ভাগের কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করা।—অনুবাদক

১৪। ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীপনা সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের 'পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে' প্রবন্ধের ৪ ও ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫। 'দস্যু-বৃত্তি' বলতে নিয়মানুবর্তিতা, সংগঠন ও স্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের অভাবজাত লুটপাট বুঝায়।

১৬। এখানে কিয়াংসী থেকে উত্তর শেনসী পর্যন্ত লালফৌজের ২৫ হাজার লীর দীর্ঘ অভিযানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে চীনা শ্রমিক-কৃষকদের লালফৌজের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম আর্মি-গ্রুপ (অর্থাৎ লালফৌজের প্রথম ফ্রন্ট-আর্মি কেন্দ্রীয় লালফৌজের নামেও পরিচিত ছিল) পশ্চিম ফুকিয়েনের ছাংথিং ও নিংহুয়া এবং দক্ষিণ কিয়াংসীর রুইচিন, ইয়ুতু ও অন্যান্য স্থান থেকে রওনা হলেন আর শুরু করলেন একটা বিরাট রণনীতিগত স্থানান্তর। ফুকিয়েন, কিয়াংসী, কুয়াংতুং, হুনান, কুয়াংসী, কুইচৌ, সিছুয়ান, ইয়ুন্নান, সীখাং, কানসু ও শেনসী প্রদেশের মতো এগারটি প্রদেশের ভেতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে গেলেন চিরতুষারাচ্ছন্ন উচ্চ পর্বতমালা ও নির্জন তৃণভূমি পেরিয়ে, অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করে, বারবার শত্রুর পরিবেষ্টন, পশ্চাদ্ধাবন, অবরোধ ও বাধাকে ব্যর্থ করে এবং ২৫ হাজার লী (সাড়ে বারো হাজার কিলোমিটার) পথ অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে বিজয় উল্লাসে এসে পৌছালেন উত্তর শেনসীর বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায়।

১৭। 'সহায়ক বাহিনী' অর্থাৎ প্রধান বাহিনী নয়, এটা কেবলমাত্র সৈন্যবাহিনীর একটা অংশবিশেষ যা এই সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বভাগ হিসেবে নিযুক্ত।

১৮। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার বিদ্রোহ পরভূত হবার পরের যুগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়ে বিপ্লবী জোয়ার ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছিল। 'সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৯। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে ব্রেস্টলিটভস্ক শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। তখন শত্রুর শক্তি স্পষ্টতঃই বিপ্লবী শক্তির চেয়ে বেশি প্রবল ছিল এবং নবজাত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না। এই অবস্থায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আঘাত এড়াবার জন্য এটা হল সাময়িক পশ্চাদপসরণ। এই চুক্তির সম্পাদন করে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার, তার অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার ও লালফৌজকে গড়ে তোলার সময় পেয়েছিল। সর্বহারাশ্রেণীকে এই চুক্তি সমর্থন করেছিল কৃষকসাধারণের উপর তার নেতৃত্ব

বজায় রাখার ব্যাপারে, সমর্থন করেছিল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করার ব্যাপারে যার ফলে ১৯১৮-২০ সালে শ্বেত রক্ষীবাহিনী এবং বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশের সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে পরাজিত করা হয়েছিল।

২০। ১৯২৭ সালের ৩০শে অক্টোবর কুয়াংতুং প্রদেশের হাইফেং ও লুফেং জেলার কৃষকেরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তৃতীয়বার বিদ্রোহ করেছিলেন, আর হাইফেং ও লুফেং এবং এদের নিকটবর্তী এলাকাকে দখল করে নিয়েছিলেন, লালফৌজ গড়ে তুলেছিলেন এবং শ্রমিক কৃষকদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শত্রুকে ছোট করে দেখার ফলে পরবর্তীকালে তারা পরাজিত হন।

২১। ১৯৩৬ সালের শরৎকালে লালফৌজের চতুর্থ ফ্রণ্ট-আর্মি ও দ্বিতীয় ফ্রণ্ট-আর্মি একসঙ্গে মিলিত হওয়ার পরা সীকাংয়ের উত্তর-পূর্ব অংশ থেকে শুরু করে উত্তরদিকে সরে গিয়েছিল। চাং কুও-থাও তখনও তার পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল, আর তার পশ্চাদপসরণবাদ ও বিলোপবাদকে আঁকড়ে ছিল। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে লালফৌজের দ্বিতীয় ফ্রণ্ট-আর্মি ও চতুর্থ-ফ্রণ্ট-আর্মি যখন কানসুতে এসে পৌছাল, তখন চাং কুও-থাও চতুর্থ ফ্রণ্ট-আর্মির অগ্রগামী বাহিনীকে—যার সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০ হাজারের উপরে—হুয়াংহো নদী পেরিয়ে পশ্চিমাভিমুখে এগিয়ে ছিংহাইয়ে পৌছানোর জন্য পশ্চিম রুট বাহিনী গঠন করতে নির্দেশ দিল। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসের লড়াইয়ে মার খাবার পরে পশ্চিম রুট বাহিনী মূলতঃ পরাজিত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালের মাচ মাসে।

২২। প্যারী কমিউন সম্পর্কে এল. কুগেলম্যানকে লিখিত কার্ল মার্কসের চিঠি দ্রষ্টব্য।

২৩। এর অর্থ হল আমাদের সৈন্যবাহিনীকে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এক-একটা কোম্পানিতে বা এক-একটা প্ল্যাটুনে বিভক্ত করে সর্বত্রই স্থানীয় উৎপীড়কদের উপর আঘাত হানা, ভূমি বণ্টন করা, পার্টির সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনসাধারণকে সাহায্য করা, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা, জনসাধারণের মধ্যে কাজ চালানো এবং সেই স্থানগুলোকে ঘাঁটি এলাকায় পরিণত করা, যাতে করে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের সুবিধা হয়।—অনুবাদক

২৪। **শুই হু চুয়ান** ('জলাবিলের বীর নায়কগণ') হচ্ছে একখানি বিখ্যাত

চীনা উপন্যাস। কৃষক-যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে এতে। এই উপন্যাসখানিকে শি নাই-আনের রচনা বলে বলা হয়। ইউয়ান রাজবংশের শেষের দিকে এবং মিং রাজবংশের গোড়ার দিকে চতুর্দশ শতকে শি নাই-আন জীবিত ছিলেন। লিন ছুং আর ছাই চিন হচ্ছে এই উপন্যাসের দুইজন বীরনায়ক। আর হুং ছিল ছাই চিনের গৃহের একজন ড্রিলমাষ্টার।

২৫। ছুনছিউ যুগের (খৃষ্টপূর্ব ৭২২-৪৮১) দুটি সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য ছিল লু আর ছী। বর্তমান শানতুং প্রদেশের মধ্যভাগে একটা বিরাট রাজ্য ছিল ছী, আর দক্ষিণভাগে লু অপেক্ষাকৃত ছোট একটা রাজ্য। রাজা চুয়াং কোং লু'তে রাজত্ব করেছিলেন খৃষ্টপূর্ব ৬৯৩ থেকে ৬৬২ অব্দ অবধি।

২৬। জু ও ছিউ-মিং ছিলেন 'জু ও চুয়ানের' গ্রন্থকার। চৌ রাজবংশের ধ্রুপদী ইতিহাসের ধারাবিবরণী হচ্ছে 'জু ও চুয়ান'। বর্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশটা 'জু ও চুয়ান'-এর 'রাজা চুয়াং কোংয়ের দশম বৎসর' শীর্ষক বিভাগে দ্রষ্টব্য।

২৭। প্রাচীন শহর ছেংকাও অবস্থিত ছিল হোনান প্রদেশের বর্তমান ছেংকাও জেলার উত্তর-পশ্চিমে; প্রাচীনকালে প্রভূত সামরিক গুরুত্ব ছিল তার। এটাই ছিল খৃঃ পূঃ ২০৩ অব্দে হানের রাজা লিউ পাং এবং ছুর রাজা সিয়াং ইয়ুর মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ক্ষেত্র। প্রথমে সিয়াং ইয়ু ক্রমশঃ সিংইয়াং ও ছেংকাও দখল করে নেয়। লিউ পাংয়ের সৈন্যরা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। সুবিধাজনক মূহূর্তটি না আসা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে লিউ পাং, সে মূহূর্তটি এল তখনই যখন সিয়াং ইয়ুর সৈন্যরা সিশুই নদীটি পেরুতে গিয়ে নদীর মাঝপথে উপস্থিত হল, আর তখনই সিয়াং ইয়ুর সৈন্যবাহিনীকে চুরমার করে লিউ পাং ছেংকাও পুনর্দখল করল।

২৮। প্রাচীন শহর খুনইয়াং বর্তমান হোনান প্রদেশের ইয়েসিয়ান জেলার ভিতরে। লিউ সিউ (তোং হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট গুয়াং উতি) এই জায়গাতেই সিন রাজবংশের সম্রাট ওয়াং মাংয়ের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছিল ২৩ খ্রীষ্টাব্দে। দুই পক্ষের মধ্যে সৈন্যশক্তির দিক থেকে একটা বিরাট অসমতা ছিল। লিউ সিউয়ের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮-৯ হাজার আর তার বিরুদ্ধে ওয়াং মাংয়ের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪ লাখের বেশি। ওয়াং মাংয়ের সেনাপতি ওয়াং স্যুন ও ওয়াং ই শত্রুর শক্তিকে ছোট করে দেখে। তাদের এই অবহেলার সুযোগ গ্রহণ করে মাত্র ৩ হাজার বাছাই করা সৈন্য নিয়ে লিউ সিউ ওয়াং মাংয়ের প্রধান বাহিনীকে চুরমার করে দিল। এই বিজয়ের সুযোগ

নিয়ে সে শত্রুসৈন্যদের উপর আক্রমণ করে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

২৯। হোনান প্রদেশের বর্তমান চোংমৌ জেলার উত্তর-পূর্বে ছিল কুয়ানতু। ২০০ খ্রীষ্টাব্দে ছাও ছাও এবং ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে লড়াই হয় এখানে। ইউয়ান শাওয়ের ছিল ১ লাখ সৈন্য, শাওয়ের সৈন্য সংখ্যা ছিল কম আর তার রসদও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যরা শত্রুকে তাচ্ছিল্য করে, ফলে ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ছাও ছাও তার দ্রুতগামী সৈন্যদের পাঠিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে এবং তাদের রসদ ও অন্যান্য সরবরাহাদি জ্বালিয়ে দেয়। ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যরা আতঙ্কে ও বিশৃংখলায় পড়ে। ছাও ছাওয়ের বাহিনী তাদের আক্রমণ করে এবং তাদের প্রধান বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

৩০। উ রাজ্যটি শাসিত হতো সুন ছুয়ানের দ্বারা, আর ওয়েই রাজ্যটি শাসিত হতো ছাও ছাওয়ের দ্বারা। ছিপি হচ্ছে ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ পারে, হুপেই প্রদেশের চিয়াইয়ু জেলার উত্তর-পূর্বে। সুন ছুয়ানের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য ২০৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাও ছাও ৫ লাখের বেশি সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে এগুলো। ছাও ছাও অবশ্য ঘোষণা করল যে, তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৮ লাখ। ছাও ছাওয়ের শত্রু লিউ পেইয়ের সঙ্গে মিলে সুন ছুয়ান ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে বেরুল। ছাও ছাওয়ের সৈন্যবাহিনীতে মড়ক লেগেছে এবং জলযুদ্ধে তারা অনভ্যস্ত—এই কথা জেনে নিয়ে সুন ছুয়ান ও লিউ পেইয়ের বাহিনী ছাও ছাওয়ের নৌবহরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তার সৈন্যবাহিনীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে।

৩১। হুপে প্রদেশের ইছাং জেলার পূর্বদিকে ইলিং অবস্থিত। এখানে ২২২ খ্রীষ্টাব্দে উ রাজ্যের সেনাপতি লু স্যুন শু রাজ্যের রাজা লিউ পেইয়ের সৈন্যবাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করে। যুদ্ধের গোড়াতে লিউ পেইয়ের সৈন্যবাহিনী পর পর কতকগুলো জয়লাভ করেছিল আর উ রাজ্যের পাঁচ-ছয়শ লী ভেতরে ঢুকে ইলিং পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। লু স্যুন ইলিং রক্ষা করে। ৭-৮ মাস সময় ধরে সে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে, যতদিন না লিউ পেইয়ের 'সৈন্যরা ক্লান্ত ও মনমরা এবং নিরুপায় হয়ে পড়ে। তারপর, অনুকূল বাতাসের সুযোগ নিয়ে লিউ পেইয়ের সৈন্যদের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে তার সৈন্যদের ধ্বংস করল লু স্যুন।

৩২। তোংচিন বংশের সেনাপতি সিয়ে স্যুয়ান ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে আনহুই

প্রদেশে ফেইশুই নদীর পারে ছিন রাজ্যের রাজা ফু চিয়ানকে পরাজিত করেছিল। ফু চিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৬ লাখের ওপর পদাতিক সৈন্য, ২ লাখ ৭০ হাজার অশ্বারোহী, ৩০ হাজারের ওপরে অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনী। অপরপক্ষে, তোংচিনের জল ও স্থল সৈন্যের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ হাজার। ফেইশুই নদীর দুই পারে সারিবদ্ধ হয়ে ব্যূহ রচনা করল দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী শত্রুবাহিনীর আত্মগর্বের ও অতিবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে গিয়ে স্যুফান ফু চিয়ানকে অনুরোধ করল ছিন বাহিনীকে একটু পিছু হটিয়ে নিয়ে সামনে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে, যাতে তোংচিন বাহিনী নদী পেরিয়ে গিয়ে সেখানে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তির লড়াই করতে পারে। ফু চিয়ান রাজি হয়ে গেল, কিন্তু তার বাহিনী যখন পিছিয়ে যেতে লাগল তখন আর তাদের থামানো সম্ভব ছিল না। এই সুযোগে তোংচিন বাহিনী নদী পার হয়ে আক্রমণ করে ছিন বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করল।

৩৩। চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের প্রতিবিপ্লবের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে এবং ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী কার্য অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবার জন্য ১৯২৭ সালের ১লা আগস্ট কিয়াংসী প্রদেশের রাজধানী নানছাংয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বিখ্যাত অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ৩০ হাজারেরও বেশি সৈন্যের সশস্ত্র বাহিনী এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে। এই অভ্যুত্থানের পরিচালকগণ ছিলেন চৌ এন-লাই, চু তে, হো লোং ও ইয়ে থিং প্রমুখ কমরেড! পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫ই আগস্ট নানছাং থেকে সরে গেল বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনী, কিন্তু কুয়াংতুং প্রদেশের ছাওচৌ ও শানথৌয়ের মুখে পরাজয় ভোগ করতে হল। কমরেড চু তে, চেন ঈ এবং লিন পিয়াওয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ লড়তে লড়তে পথ করে নিয়ে চিংকাং পর্বতে উপস্থিত হল এবং কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম আর্মির প্রথম ডিভিশনের সঙ্গে মিলিত হল।

৩৪। ১৯২৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কুয়াংতুং প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বে কুয়াংচৌয়ের শ্রমিক ও সৈনিকরা সম্মিলিতভাবে অভ্যুত্থান করে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন প্রাপ্ত প্রতিবিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তীব্রভাবে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু শক্তির দিক থেকে একটা বিরাট অসমতা ছিল বলে অবশেষে এই গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।

৩৫। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার সিউশুই, পিংসিয়াং, পিংকিয়াং এবং লিউইয়াং জেলার জনগণের সশস্ত্র বাহিনী বিখ্যাত 'শরৎকালীন ফসল' অভ্যুত্থানটি ঘটিয়েছিল, এবং গড়ে তুলেছিল শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম আর্মির প্রথম ডিভিশন। কমরেড মাও সে-তুঙ নেতৃত্ব দিয়ে এই বাহিনীকে চিংকাং পর্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হুনান-কিয়াংসী সীমান্তের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা।

৩৬। A-B গ্রুপটি ছিল লাল এলাকায় লুক্কায়িত কুওমিনতাঙ গুপ্তচরদের প্রতিবিপ্লবী সংগঠন। A-B হচ্ছে ইংরাজী ভাষায় Anti-Bolshevik (বলশেভিক-বিরোধী) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

৩৭। কানচিয়াং নদী কিয়াংসী প্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত, ফুশুই নদী কিয়াংসী প্রদেশের পূর্বভাগে অবস্থিত। এখানে এই দুই নদীর মধ্যবর্তী এলাকার কথা বলা হয়েছে।—অনুবাদক

৩৮। ভি. আই. লেনিনের রচিত 'একটি পৃথক ও সম্প্রসারণবাদী শান্তির আশু সম্পাদন সমস্যার ওপর থিসিস', 'অদ্ভুত এবং আজগুবী কথা,' 'একটি গুরুতর শিক্ষা ও গুরুতর দায়িত্ব', 'যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে রিপোর্ট' দ্রষ্টব্য এবং 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', সপ্তম অধ্যায়, সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩৯। এখানে তিব্বতীয় ও হুই জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হচ্ছে সীখাং এলাকার তিব্বতীয় জাতি এবং কানসু, ছিংহাই ও সিনচিয়াংয়ের হুই জাতি।

৪০। অষ্টপদী রচনা সামন্তযুগীয় চীনের পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতক অবধি—চীনা সামন্ততান্ত্রিক আমলে রাজকীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে এক ধরনের বিশেষ প্রবন্ধ রচনার রীতি। এই রচনায় শিরোনামার উপস্থাপনা, শিরোনামার ব্যাখ্যা, প্রাথমিক মন্তব্য, মন্তব্যের সূচনা, প্রারম্ভিক পর্ব, মধ্যবর্তী পর্ব, পশ্চাদ্ভাগস্থ পর্ব এবং সমাপ্তিসূচক পর্ব থাকে। 'শিরোনামার উপস্থাপনা' দুটি বাক্য নিয়ে গঠিত, এতে শিরোনামার মুখ্য অর্থ উপস্থাপিত করা হয়। 'শিরোনামার ব্যাখ্যা' তিনটি বা চারটি বাক্য নিয়ে রচিত, এতে শিরোনামার উপস্থাপনের অর্থানুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়। 'প্রাথমিক মন্তব্যে' গোটা রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে, আর এর থেকেই মন্তব্য শুরু হয়।

'মন্তব্যের সূচনা' হল প্রাথমিক মন্তব্যের পরে মন্তব্যের সূচনা। প্রারম্ভিক পর্ব, মধ্যবর্তী পর্ব, পশ্চাদ্ভাগস্থ পর্ব ও সমাপ্তিসূচক পর্ব—শুধু এই চারটি পরিচ্ছেদই হল আনুষ্ঠানিক মন্তব্য, মধ্যবর্তী পব হল গোটা রচনার কেন্দ্র। এই চারটি পরিচ্ছেদের প্রত্যেকটিই গঠিত হয় পরস্পর বৈশাদৃশ্যপূর্ণ দুটি পর্ব নিয়ে। এইভাবে মোট আটটি পর্ব হয়। তাই এই রচনা আট পর্ববিশিষ্ট রচনা অথবা অষ্টপদী রচনা বলে পরিচিত। বিপ্লবী বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে রূপক হিসেবে এ ধরনের রচনার বিভিন্ন অংশের সংযোগের প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে গোঁড়ামিবাদকে উপমিত ও বিদ্রূপ করার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ 'অষ্টপদী রচনা' শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন।

৪১। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাবের প্রভাবে এবং ব্যাপক অফিসার ও সৈনিকদের চাপ দেওয়ার কারণে কুওমিনতাঙের ১৯তম রুট বাহিনীর অধ্যক্ষ চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই থিং-থাই প্রমুখ উপলব্ধি করল যে, লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালালে তাদের কোন লাভ হবে না, তাই কুওমিনতাঙ পার্টির ভেতরকার লি চী-শেন প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে খোলাখুলিভাবে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়। ফুকিয়েন প্রদেশে তারা 'চীনা প্রজাতন্ত্রের গণ-বিপ্লবী সরকার' স্থাপন করে এবং লালফৌজের সঙ্গে সম্পন্ন করে জাপানবিরোধী ও চিয়াংয়ের বিরুদ্ধে পরামর্শচুক্তি। এটাহচ্ছে তথাকথিত 'ফুকিয়েন ঘটনা'। পরে, চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে ১৯তম রুট বাহিনী ও ফুকিয়েনের গণ-সরকার ব্যর্থ হয়ে যায়।

চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তব্য

(ডিসেম্বর ২৮, ১৯৩৬)

সিয়ানে চিয়াং কাই-শেক জেনারেল ছ্যাং সুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেং এবং উত্তর-পশ্চিমের জনগণ কর্তৃক উত্থাপিত জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার দাবি মেনে নিয়েছেন, এবং এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত তার সেনাবাহিনীকে শেনসী ও কানসু থেকে সরে আসবার নির্দেশ দিয়েছেন। গত এক দশক ধরে[১] চিয়াং যে ভুল নীতি অনুসরণ করছিলেন, এটা হচ্ছে তার পরিবর্তনের সূচনা। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও চীনা 'পিটুনি' চক্র[২] গৃহযুদ্ধ মঞ্চস্থ করার জন্য, ভাঙন ধরাবার জন্য এবং সিয়ানের ঘটনায় চিয়াঙের মৃত্যু ঘটানোর জন্য যেসব চক্রান্ত চালাচ্ছিল, এ ঘটনা তার ওপর আঘাত হেনেছে। তাদের হতাশা ইতিমধ্যেই বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে। চিয়াং কাই-শেক যে চোখ মেলে তাকাতে শুরু করেছেন, এই ঘটনাকে কুওমিনতাঙ কর্তৃক গত দশ বছর ধরে অনুসৃত ভুল নীতির অবসান ঘটাবার ইচ্ছে বলে ধরা যেতে পারে।

২৬শে ডিসেম্বর চিয়াং কাই-শেক লোইয়াং থেকে তথাকথিত 'চ্যাং সুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেঙের প্রতি ভৎ‌র্সনা' শীর্ষক যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা এত দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ও ভাসাভাসা যে সেটাকে চীনের রাজনৈতিক দলিলসমূহের মধ্যে একটি চমৎকার উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। চিয়াং এই ঘটনা থেকে সত্যিই যদি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে চান এবং কুওমিনতাঙকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চান, তিনি যদি পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারে আপোষের এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গৃহযুদ্ধ ও নিপীড়নের দীর্ঘ অনুসৃত ভুল নীতির অবসান ঘটাতে চান—যাতে কুওমিনতাঙ আর জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না, তাহলে শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে তাঁর রচিত ছিল আরেকটু ভাল বিবৃতি রচনা করা—তাঁর অতীত রাজনীতির জন্য অনুতাপ প্রকাশ করা এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন পথ তুলে ধরা। ২৬শে ডিসেম্বরের এই বিবৃতি চীনা জনগণের দাবি মেটাতে পারছে না।

যাই হোক, এই বিবৃতির মধ্যে একটি প্রশংসাযোগ্য অংশ আছে, চিয়াং যেখানে জোর দিয়ে বলছেন, 'প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং দৃঢ়-

প্রতিজ্ঞ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে।' তার অর্থ হল, যদিও তিনি সিয়ানে চ্যাং ও ইয়াংয়ের নির্দেশিত শর্তাবলীতে সই করতে রাজী হননি, তবুও রাষ্ট্র ও দেশের স্বার্থে তিনি সেই ধরনের দাবি গ্রহণে ইচ্ছুক, এবং শর্তে সই না করলেও তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। আমরা দেখব, সামরিক বাহিনী সরিয়ে নেবার পর চিয়াং আস্থার মর্যাদা রক্ষা করেন কি না এবং যেসব শর্ত তিনি মেনে নিয়েছেন তা পালন করেন কিনা। শর্তগুলো হল :

(১) কুওমিনতাঙ ও জাতীয় সরকারকে পুনঃসংগঠিত করা, জাপ-সমর্থকদের বহিষ্কার করে জাপ-বিরোধীদের গ্রহণ করা ;

(২) সাংহাইর দেশপ্রেমিক নেতাদের[৩] ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা, এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার মেনে চলার নিশ্চয়তা দেওয়া ;

(৩) 'কমিউনিস্ট অবদমনের' নীতির অবসান এবং লালফৌজের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা ;

(৪) সমস্ত পার্টি, গ্রুপ, সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে জাতীয় মুক্তি সম্মেলন আহ্বান করা, জাতিকে বাঁচানো এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার নীতি নির্ধারণ করা ;

(৫) জাপ-প্রতিরোধের ব্যাপারে যেসব দেশ আমাদের সমর্থক, তাদের সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ; এবং

(৬) জাতিকে বাঁচানোর জন্য অন্যান্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই সব শর্ত পূরণের মূল কথা হল দৃঢ় বিশ্বাস ও কিছু সাহস। ভবিষ্যতের কার্য-কলাপ দেখেই আমরা চিয়াংকে বিচার করব।

কিন্তু তাঁর বিবৃতিতে এই মর্মে একটি মন্তব্য আছে যে, সিয়ান ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে 'প্রতিক্রিয়াশীলদের' চাপে। এটা সত্যিই দুঃখজনক যে, 'প্রতিক্রিশাশীল' বলতে তিনি কোন্ ধরনের লোককে বুঝিয়েছেন বিবৃতিতে তিনি তার ব্যাখ্যা দেননি, বা এটাও সুস্পষ্ট নয় যে, চিয়াং-এর অভিধানে 'প্রতিক্রিয়াশীল' কথাটার অর্থ কি। যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, সিয়ান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নিম্নলিখিত শক্তির প্রভাবে :

(১) জেনারেল চ্যাং ও ইয়াংয়ের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিপ্লবী জনসাধারণের জাপ-বিরোধী ক্রমবর্ধমান ঘৃণার তীব্র প্রকাশ ;

(২) সমগ্র দেশব্যাপী জনগণের মধ্যে জাপ-বিরোধী তীব্র ঘৃণা ;

(৩) কুওমিনতাঙের মধ্যে বামপন্থী শক্তির স্ফুরণ ;

(৪) বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতারূঢ় গ্রুপের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ ও জাতির মুক্তির দাবি ;

(৫) কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুক্ত মোর্চা গঠনের দাবি ; এবং

(৬) বিশ্বশান্তি মোর্চার বিকাশ।

এসবই অবিসংবাদী ঘটনা। এইসব শক্তিসমূহকেই চিয়াং উল্লেখ করছেন 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে। অন্যেরা যাঁদের বলে বিপ্লবী, চিয়াং তাঁদের অভিহিত করছেন 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে—এই তো যথেষ্ট। সিয়ানে তিনি যখন ঘোষণা করেছেন যে, দৃঢ়ভাবেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, মনে হয়, সিয়ান পরিত্যাগের পর পরই তিনি বিপ্লবী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবেন না। তাঁর নিজের ও তাঁর দলের রাজনৈতিক জীবনই শুধু যে তাঁর এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করছে তাই নয়, আজ তাঁদের মুখোমুখীও দাঁড়িয়েছে ; তাঁদের রাজনৈতিক পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই শক্তি, যার বৃদ্ধি ঘটেছে তাঁদেরই ক্ষতিসাধনের জন্য—সেই 'পিটুনি' চক্র, যারা সিয়ান ঘটনার সময়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। সুতরাং আমরা চিয়াংকে উপদেশ দিচ্ছি তিনি যেন তাঁর রাজনৈতিক অভিধানটির সংশোধন করে, 'প্রতিক্রিয়ার' স্থানে 'বিপ্লবী' কথাটা বসান, কারণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কথাগুলোর অর্থ ঠিক হওয়া উচিত।

চিয়াং-এর মনে রাখা উচিত যে, তাঁর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপে, এবং সিয়ান ঘটনার নেতৃদ্বয় জেনারেল চ্যাং ও ইয়াংয়ের প্রচেষ্টায়। সেই ঘটনার সময় কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদা শান্তিপূর্ণ মীমাংসাই চেয়েছে এবং তার জন্য সব প্রচেষ্টা চালিয়েছে, আর সেটা চালিয়েছে একমাত্র জাতিকে বাঁচাবার প্রয়োজনে। গৃহযুদ্ধ যদি বিস্তৃত হতো, চ্যাং ও ইয়াং যদি তাঁকে বন্দী করে রাখতেন বহুদিনের জন্য, তাহলে সেই ঘটনাটি জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা 'পিটুনী' চক্রেরই সুবিধা করে দিত। এই অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও ওয়াং চিং-ওয়েই[৪], হো ইং-চিন[৫] ও চীনা 'পিটুনী' চক্রের অন্যান্য সভ্যদের ষড়যন্ত্রকে উদ্ঘাটিত করে দেয় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কথা বলে, যা আবার জেনারেল সুয়ে-লিয়াং

ও ইয়াং হু-চেং ও কুওমিনতাঙের টি. ভি. সুং[৬] প্রভৃতি সভ্যদের মতের সঙ্গে মিলে যায়। সমগ্র দেশব্যাপী জনসাধারণ এটাই চাইছে, কারণ তারা এই তিক্ত গৃহযুদ্ধকে ঘৃণা করে।

সিয়ানের শর্ত গ্রহণের পরই চিয়াং মুক্ত হন। এখন যে প্রশ্নটি সামনে এসেছে, তা হল, চিয়াং সেই শর্তানুযায়ী 'প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে যুদ্ধ পরিচালনা' করবেন কি না, জাতিকে বাঁচানোর জন্য সেইসব শর্ত সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করবেন কি না। জাতি তাঁকে আর দোদুল্যমান অবস্থায় থাকতে দেবে না, দেবে না শর্তপূরণে কোনরকম গাফিলতি দেখাতে। জাপ-প্রতিরোধে যদি তিনি গড়িমসি করেন, বা অঙ্গীকার পূরণে কালহরণ করেন, তাহলে দেশব্যাপী বিপ্লবী জোয়ার তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। চিয়াং ও তাঁর চক্রকে সেই পুরানো প্রবাদটি মনে করিয়ে দিচ্ছি : 'অঙ্গীকার যে রাখে না, তার কি মূল্য আছে ?'

কুওমিনতাঙ কর্তৃক প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করার ফলে বিগত দশ বৎসরের যে নোংরা জমে উঠেছে, তা যদি চিয়াং পরিষ্কার করতে পারেন, তিনি যদি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমঝোতা করার এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধ ও নিপীড়নের ভুল বিদূরিত করতে, সমস্ত পার্টি ও গ্রুপগুলিকে একত্রীভূত করে এই মুহূর্তে জাপ-বিরোধী মোর্চা গঠন করতে পারেন, এবং জাতিকে রক্ষার জন্য সত্যিসত্যিই সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারেন—তবে কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চয়ই তাঁকে সমর্থন দেবে। সেই ২৫শে আগস্ট তারিখেই কমিউনিস্ট পার্টি তার চিঠিতে কুওমিনতাঙ ও চিয়াংকে সেই সমর্থনের কথা বলেছে।[৭] বিগত পনের বৎসর ধরে সমগ্র দেশের জনগণ জানেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি যে নীতিটি অনুসরণ করে তা হচ্ছে : 'প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করতে হবে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে।' জনগণ নিঃসন্দেহে চীনের অন্য যে-কোন পার্টি বা গ্রুপের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টির কথা ও কাজের ওপরেই বেশি আস্থা রাখেন।

টীকা

১। চীনা লালফৌজ ও জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত চ্যাং সুয়ে-লিয়াঙের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনী ও ইয়াং

হু-চেঙের নেতৃত্বাধীন ১৭ নং রুট বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের প্রস্তাবে সম্মতি জানায় এবং চিয়াং কাই-শেকের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে যোগ দেবার দাবি জানায়। চিয়াং এ দাবি অগ্রাহ্য করেন, 'কমিউনিস্ট দমনের' সামরিক প্রস্তুতিকে জোরদার করে তোলেন, এবং সিয়ানের জাপ-বিরোধী যুবকদের হত্যা করেন। চ্যাং সুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেং একসঙ্গে চিয়াং-এর বিরুদ্ধে চলে যান এবং চিয়াংকে গ্রেপ্তার করেন। ১৯৩৬-এর ১২ই ডিসেম্বরের সিয়ান ঘটনা নামে এটি ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছে। চিয়াংকে বাধ্য করা হয় কমিনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যের শর্ত ও জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রস্তাব মেনে নিতে, এবং তার পরই তাঁকে মুক্ত করা হয় এবং চিয়াং নানকিঙে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।

২। নানকিঙে অবস্থিত কুওমিনতাঙ সরকারের মধ্যে জাপ-সমর্থকদের চক্র 'পিটুনি' চক্র নামে পরিচিত। তারা সিয়ান ঘটনার সময়ে চিয়াং কাই-শেকের হাত থেকে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল। ওয়াং চিং-ওয়েই ও হো য়িং-চিনের নেতৃত্বে এরা চ্যাং শুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেঙের বিরুদ্ধে 'পিটুনি' অভিযানের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ঘটনাটির সুযোগ নিয়ে তারা পরিকল্পনানুযায়ী বৃহদাকারের গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে চিয়াঙের ক্ষমতা নিজেদের কব্জায় নিয়ে এসে জাপানী আক্রমণকারীদের সামনে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দিতে চায়।

৩। ১৯৩৬-এর নভেম্বর মাসে সাংহাই নগরীতে সাতজন জাপ-বিরোধী দেশব্রতী যুবককে চিয়াং কাই-শেক গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁদের নাম: শেন চুন-জু, চ্যাং নাই-চি, সৌ তাও-ফেন, লি কুং-পু, শা চিয়েন-লি, শী লিয়াং ও ওয়াং সাও-শী। ১৯৩৭-এর জুলাই পর্যন্ত তাঁরা কারাগারে বন্দী ছিলেন।

৪। কুওমিনতাঙের মধ্যেকার জাপ-সমর্থক চক্রের মধ্যমণি ছিল ওয়াং চিং-ওয়েই। ১৯৩১ এ জাপানীরা উত্তর-পূর্ব চীনে হামলা করার সময় থেকে ওয়াং তাদের গোপন সেবাদাস। ১৯৩৮ এর ডিসেম্বরে চুংকিং পরিত্যাগ করে ওয়াং খোলাখুলি জাপানী হানাদারদের পক্ষে দাঁড়ায় এবং নানকিঙের দালাল সরকারের প্রধান হয়ে বসে।

৫। জাপ-সমর্থক চক্রের আর-একজন হল কুওমিনতাঙ দলভুক্ত যুদ্ধবাজ হো য়িং-চিন। সিয়ান ঘটনার সময়ে সে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে গৃহযুদ্ধ বাঁধাবার জন্য কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীকে দিয়ে লুংহাই রেলপথ ধরে শেনসী আক্রমণের ব্যবস্থা করে। চিয়াংকে হত্যা করে চিয়াঙের স্থলাভিষিক্ত হবার বাসনায় সে

সিয়ান নগরীকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল।

৬। কুওমিনতাঙ দলভুক্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ও মার্কিন স্বার্থের প্রবক্তা টি. ভি. সুং সিয়ান ঘটনাকে ভিত্তি করে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার কথা বলেছিল। দূর প্রাচ্যে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে টোক্কর দিয়ে নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে খুবই মুশকিল হচ্ছিল, তাদের স্বার্থসংঘাত হচ্ছিল তীব্রভাবে।

৭। এই চিঠিতে কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের এবং তাদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত অধিবেশনের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট সংগঠিত করা এবং কুওমিনতাঙের সঙ্গে সহযোগিতার কথাও এই চিঠিতে বলা হয়েছিল। চিঠির প্রধান অংশটি হচ্ছে :

'কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণ' প্রসঙ্গে আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত অধিবেশন সত্যিসত্যিই কারণ ও ফল সম্বন্ধে গুলিয়ে ফেলেছে। বিশেষ জোর দিয়েই একথা বলতে হবে যে, আপনাদের পার্টি ও পার্টি-পরিচালিত সরকার কর্তৃক অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতার, বিশেষ করে, ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের ঘটনা থেকে জাপ-প্রতিরোধ না করার নীতিরই ফল হচ্ছে গৃহযুদ্ধ ও গত দশ বছরের ঐক্যহীনতা। 'বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পূর্বে আভ্যন্তরীণ শান্তিস্থাপন' ধ্বনির মধ্য দিয়ে আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকার গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, লালফৌজের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক পরিবেষ্টন অভিযান পরিচালনা করছে, এবং সমগ্র দেশব্যাপী দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক গণ-আন্দোলন ও জনসাধারণকে পিষে মারবার সবরকম চেষ্টাই চালিয়ে গেছে। চীনের সব থেকে বড় দুশমন যে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ—এই সত্যটি আপনারা অনুধাবন করতে পারেননি, এবং সেজন্য দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তরাংশ ছেড়ে দিতেও আপনারা দ্বিধা করেননি, সর্বশক্তি দিয়ে আপনারা চীনের লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং আপনাদের পার্টির অভ্যন্তরে বিভিন্ন চক্রের খেয়োখেয়ি চালিয়েছেন, জাপানের বিরুদ্ধে লালফৌজের যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, তার পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন, সর্বদেশব্যাপী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের দাবি আপনারা অগ্রাহ্য করেছেন, এবং দেশবাসীকে তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বিচ্যুতি করে দিচ্ছেন। সর্বত্র দেশকে ভালবাসার জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আরও শাস্তি

দেওয়া হচ্ছে নির্দোষ ব্যক্তিদের। বিশ্বাসঘাতকতা আজ পুরস্কৃত, বিশ্বাসঘাতকরা তাদের নতুন নতুন উচ্চপদ প্রাপ্তি ও সম্মানের জন্য পরম পুলকিত। 'কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণের' নামে এই ভ্রান্ত পথানুসরণের অর্থ হচ্ছে 'গাছের মাথায় উঠে মাছ ধ'রার মতো, এবং তার ফলটি হবে একেবারে বিপরীত। ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা আপনাদের সাবধান করে দিতে চাইছি, আপনারা যদি আপনাদের ভ্রান্ত নীতির মৌলিক পরিবর্তন না করেন, দেশবাসীর বিরুদ্ধে বর্ধিত আপনাদের ঘৃণা যদি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে না ঘোরান, আপনাদের এই 'স্থিতাবস্থাও' আপনারা রক্ষা করতে পারবেন না, এবং আপনাদের এই কেন্দ্রীকরণ, একীকরণ ও তথাকথিত 'আধুনিক রাষ্ট্র' তৈরীর পরিকল্পনা অলীক স্বপ্নে পরিণত হয়ে যাবে। সমগ্র জাতি চাইছে জাপ-প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণের মধ্য দিয়ে জাতির রক্ষা ব্যবস্থা, তারা বিদেশীদের প্রতি তোষামোদ আর দেশের লোকদের ওপর অত্যাচারের বিরোধী। দেশবাসী দাবি জানাচ্ছে এমন একটি গণতান্ত্রিক সরকারের, যা সত্যিসত্যিই দেশকে ও জনগণকে রক্ষা করতে পারবে। তারা চাইছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার, যা তাদের স্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম। এই জাতীয় সরকারের কর্মসূচী প্রধানতঃ হবে: এক, বৈদেশিক হানাদারীর প্রতিরোধ; দুই, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার; এবং তিন, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশসাধন, বা অন্ততঃপক্ষে জনসাধারণের দুরবস্থার অবসান ঘটানো। 'আধুনিক রাষ্ট্র' তৈরীর কথাটির সত্যিসত্যিই যদি কোন অর্থ থাকে, তাহলে এটাই হল একমাত্র সাচ্চা কর্মসূচী, যা বর্তমান যুগে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক চীনের প্রয়োজন পূরণ করছে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য জনসাধারণ আশা ও দৃঢ়মত নিয়ে এই পথে অগ্রসর হবার জন্য সংগ্রাম করছে। কিন্তু আপনাদের পার্টি এবং আপনাদের পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকার এমন নীতি অনুসরণ করছে, যা জনগণের এই আশার চরম বিরোধী এবং আপনারা জনগণের আস্থা কোনমতেই অর্জন করতে পারবেন না। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের লালফৌজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করছে: আমরা সমগ্র দেশব্যাপী একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং সার্বিক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি লোকসভা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং জাপ-বিরোধী সমগ্র জনগণ ও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা জাপ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি কংগ্রেস আহ্বান ও সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের পক্ষপাতী। আমরা এখানে ঘোষণা করছি: যে

মুহূর্তে সমগ্র চীনব্যাপী একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, লাল এলাকাগুলি সেই সরকারের অংশীভূত হয়ে যাবে, লাল অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সর্ব-চীন লোকসভায় উপস্থিত থাকবেন এবং চীনের অন্যান্য অংশে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, লাল অঞ্চলেও তাই অনুসরণ করা হবে। আমরা মনে করি, আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত অধিবেশন জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা তৈরী এবং জাতীয় পরিষদ আহ্বানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকার তরে জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, তা জাপানকে রুখবার জন্য কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণে সাফল্যলাভ করতে পারবে না, পারবে না জাতিকে রক্ষা করতে। আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত অধিবেশনে গৃহীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা তৈরীর যে বিধিনিয়ম প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তা আপনাদের পার্টির ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকারের জনাকয়েক ক্ষমতাশালী পদাধিকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে এবং এর কর্মপরিধি ও সরকারের উপদেষ্টা হিসেবেই সীমিত। এটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এই ধরনের মন্ত্রণাসভা নিরর্থক এবং জনগণের আস্থা সে অর্জন করতে পারে না। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে জাতীয় পরিষদ আহ্বান করতে চাইছেন, তার সম্বন্ধেও আমাদের এই একই বক্তব্য। আপনাদের সরকার কর্তৃক গৃহীত 'প্রজাতান্ত্রিক চীনের খসড়া শাসনতন্ত্র' এবং 'জাতীয় পরিষদের নির্বাচন-বিষয়ক বিধিনিয়ম ও আইন' অনুসারে এই পরিষদটি হবে আপনাদের পার্টি ও সরকারের জনাকয়েক পদাধিকারী ব্যক্তির কুশলতা প্রদর্শনের মঞ্চ, হবে তাদের কুকর্মের মঞ্চ, হবে একটি অলঙ্কার বিশেষ। এই ধরনের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা ও জাতীয় পরিষদের সঙ্গে আমাদের পার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত নিখিল চীন জাপ-বিরোধী জাতিরক্ষা কংগ্রেস, জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা, চীনের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার লোকসভার কোন মিলন নেই। আমাদের বক্তব্য হল, জাপ-প্রতিরোধের ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগঠিত মন্ত্রণাসভায় গ্রহণ করতে হবে সব রাজনৈতিক দল ও গ্রুপের প্রতিনিধিদের, সমস্ত সামরিক বাহিনী ও জীবনের সর্বক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের, এবং জাতিকে রক্ষা ও জাপ-প্রতিরোধের জন্য প্রধান প্রধান নীতি নির্ধারণ ও কর্তৃত্ব থাকবে তার হাতে, এবং এই মন্ত্রণাসভা থেকেই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতীয়

পরিষদটি অবশ্যই হবে সার্বিক নির্বাচনের ভিত্তিতে তৈরী লোকসভা, হবে চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্বকর্তৃত্বের আধার। এই ধরনের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা ও নিখিল চীন লোকসভা দেশব্যাপী জনসাধারণের অনুমোদন, সমর্থন ও গণোদ্যোগ সৃষ্টি করবে এবং জাতি ও দেশকে রক্ষা করার মহান কর্মটিকে দৃঢ় ও অনড় ভিত্তির ওপর স্থাপন করবে। ভাল ভাল কথার ফুলঝুরি ছড়ানো নিরর্থক এবং তাতে গণসমর্থন আসবে না। আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকারের নানা সম্মেলনের ব্যর্থতাই এর প্রমাণ বহন করছে। আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত অধিবেশনের ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা আসবেই; কিন্তু জাতির সামনে যে অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা এসেছে, তার মোকাবিলা করার জন্য আমরা আমাদের কর্তব্যকর্ম সম্পূর্ণ করা থেকে বিমুখ হব না।' এবং আরও বলা হয়েছে, 'জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পার্টি অব্যাহত কর্মধারা অনুসরণ করে যাবে, করবে মনে-প্রাণে।' কথাটি ঠিকই চীনের সর্বাধিক অংশের শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দরুণ আপনাদের বিগত দিনের কৃতকর্মের জন্য আপনাদের পার্টিকেই রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে; যেহেতু কুওমিনতাঙ সরকার হচ্ছে একক পার্টির একনায়কত্ব, এ দায়িত্ব থেকে আপনার পার্টি রেহাই পেতে পারে না। বিশেষ করে, চীনের প্রায় অর্ধেক স্থান হারানোর দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারবেন না আপনারা, কারণ ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে জণসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সমগ্র জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে আপনারা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করছেন, এ তারই ফল।' আমরা এবং সমগ্র জনগণ দেখছি যে, যেহেতু আপনাদের পার্টি অর্ধেক চীন খুইয়েছে, সেহেতু তাকে এই স্থান উদ্ধারের কর্তব্যকর্মে ব্রতী হওয়ার দায়িত্ব এড়ালে চলবে না, এড়ানো চলবে না চীনের স্বাধীন সত্তাকে পুনরুদ্ধার করার কর্তব্যকর্মটি। এমনকি, এই সময়েই আপনাদের পার্টির মধ্যেও দেখছি যে, বহু বিবেকবান লোক জাতীয় পরাধীনতাজনিত বিভীষিকা ও জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া প্রসঙ্গে সজাগ হয়ে উঠেছেন; একটা নতুন দিকে যাবার কথা তাঁরা ভাবছেন, এবং তাঁদের পার্টি ও জাতির ভাগ্যে যে বিপর্যয় তাঁদের মধ্যের কিছু লোক নিয়ে এসেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তাঁরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এই নতুন দিক্-পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রতি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সমর্থন আছে এবং কুওমিনতাঙের মধ্যস্থ এইসব

দেশব্রতী ও চিন্তাশীল সভ্যদের উচ্চ চিন্তাকে সাদর সমর্থন জানাচ্ছে, সমর্থন জানাচ্ছে তাঁদের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করার সদিচ্ছাকে, মুখোমুখী এসে দাঁড়ানো জাতিকে রক্ষার জন্য তাঁরা যে সংশোধনের প্রস্তাবাদি এনেছেন তার প্রতি। আমরা জানি যে, প্রতিদিনই আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দপ্তরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সংবাদপত্র ও শিল্প জগতে, মহিলা, ধর্ম ও চিকিৎসা কেন্দ্রে, পুলিশ ও বিভিন্ন ধরনের গণ-সংগঠনে, এবং বিশেষ করে সেনাবাহিনীর ব্যাপক সৈনিকদের মধ্যে, পুরানো ও নতুন কুওমিনতাঙ সভ্যদের মাঝে, এবং কুওমিনতাঙের নেতৃবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন স্তরে জাগ্রত দেশপ্রেমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ঘটনাটি সত্যই উৎসাহোদ্দীপক। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সর্বসময়ে কুওমিনতাঙের এইসব সভ্যদের প্রতি তাদের সমর্থনের হাত প্রসারিত করে দিচ্ছে, যাতে জাতির সব-থেকে হিংস্র শত্রু জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগঠিত করার জন্য দৃঢ় জাতীয় যুক্ত-মোর্চা গড়ে উঠতে পারে। আমরা আশা করি যে, তাঁরা অতি দ্রুত কুওমিনতাঙের মধ্যে একটি প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন এবং সেইসব বদ নির্লজ্জ সভ্যদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন যারা জাতির স্বার্থকে পদদলিত করেছে এবং কার্যতঃ জাপানের সহযোগী ও দালালে পরিণত হয়েছে—যারা ডঃ সান ইয়াৎ-সেন-এর স্মৃতির অবমাননার প্রতীক হিসেবে নিজেদের দাঁড় করিয়েছে—এবং আমরা আশা করি, তাঁরা এইভাবে ডঃ সানের বিপ্লবী তিন-গণনীতির মূল উদ্দেশ্যকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হবেন, তাঁর রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা এবং শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ সমর্থনের তিন মহান পন্থার পুনর্ঘোষণা করবেন, এবং 'বিরামহীনভাবে কাজ করবেন' বিপ্লবী তিন-গণনীতি, তিন মহান পন্থা এবং ডঃ সানের বিপ্লবী ইস্তাহার কার্যকরী করতে। আমরা আশা করি যে, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, গ্রুপ ও জীবনের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের দেশপ্রেমিক নেতাদের সহ তাঁরা দৃঢ়ভাবে ডঃ সানের বিপ্লবী নীতিকে রূপদান করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে এগিয়ে আসবেন, চীনকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার জন্য, জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবার জন্য, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য, চীনের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য, চীনের বিপুল জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের জন্য এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তন সহ চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রসঙ্গে কুওমিনতাঙের সমস্ত সভ্যদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে : আপনারা যদি সত্যসত্যই এ কাজ করেন, আমরা আপনাদের কাজে দৃঢ় সমর্থন জানাব, এবং ১৯২৪-২৭এ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত দৃঢ় বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্টের মতো যুক্তফ্রণ্ট গড়তে আমরা প্রস্তুত আছি, কারণ আজকের পরিস্থিতিতে এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ, যার সাহায্যে আমরা জাতিকে পরাধীনতা থেকে বাঁচাতে পারি এবং তার বাঁচবার নিশ্চিতি সৃষ্টি করতে পারি।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ

(মে ৩, ১৯৩৭)

চীনের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহের বিকাশের বর্তমান স্তর

এক। বর্তমানে চীন ও জাপানের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটিই প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছে এবং চীনের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহ গৌণ ও অপ্রধান হয়ে পড়েছে। এর ফলে চীনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এর বর্তমান পরিস্থিতির বিকাশ এক নতুন স্তরে উপনীত হয়েছে।

দুই। চীন দীর্ঘদিন ধরে দুটি সুতীব্র ও মৌলিক দ্বন্দ্বের জালে জড়িয়ে ছিল—চীন ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, এবং সামন্ততন্ত্র ও ব্যাপক জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। ১৯২৭ সালে বুর্জোয়াশ্রেণী—যাদের প্রতিনিধি ছিল কুওমিনতাঙরা-বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে চীনের জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে দেয়, এবং এভাবে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে, যেখানে শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে কুওমিনতাঙদের রাষ্ট্রক্ষমতার তীব্র সংঘাত দেখা দেয়, এবং স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব তখন একমাত্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরেই এসে বর্তায়।

তিন। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে, এবং বিশেষ করে ১৯৩৫ সালের উত্তর চীনের ঘটনার[১] পর থেকে এই দ্বন্দ্বসমূহে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে :

(১) চীন ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার সাধারণ দ্বন্দ্ব চীন ও জাপ-সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট ও সুতীব্র দ্বন্দ্বে রূপ নিয়েছে। জাপান-সাম্রাজ্যবাদ চীনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবার নীতি গ্রহণ করেছে। ফলতঃ চীন ও অন্যান্য কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি অপ্রধান হয়ে পড়েছে,

---

১৯৩৭ সালের মে মাসে ইয়েনানে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্টটি পেশ করেন।

এবং একই সঙ্গে এইসব শক্তির সঙ্গে জাপানের ফাটল আরও বেড়ে গেছে। ফলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণের সামনেও বিশ্বের শান্তি ফ্রণ্টের সঙ্গে চীনের জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের সংযোগ সাধনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই চীনা জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আছে, চীন শুধুমাত্র সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেই ঐক্যবদ্ধ হবে না, উপরন্তু, যেসব সাম্রাজ্যবাদী দেশ বর্তমানে শান্তি রক্ষা করতে ইচ্ছুক এবং নতুন আগ্রাসী যুদ্ধের বিরোধী, তাদের সঙ্গেও যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধ হয়েই যুক্তভাবে জাপ-বিরোধিতা করবে। আমাদের যুক্তফ্রণ্টের লক্ষ্য হতে হবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং একই সময়ে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা না করা।

(২) চীন ও জাপানের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চীনের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণী, এমনকি যুদ্ধবাজদেরও সামনে এনে দিয়েছে অস্তিত্বের প্রশ্ন। তারই ফলে তারা এবং তাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমশই পরিবর্তন ঘটেছে। এলে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণের সামনে একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণী এবং যারাই মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক তাদের সকলকে নিয়েই আমাদের এই যুক্তফ্রণ্ট হওয়া উচিত, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতি এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই কাজ শুধু অবশ্যকরণীয়ই নয়—এই কাজ সম্পন্নও করা যায়।

(৩) চীন এবং জাপানের দ্বন্দ্ব দেশব্যাপী জনগণের (সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়া) এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এবং পার্টির কর্মনীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ক্রমেই বেশি বেশি লোক জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে এগিয়ে আসছে। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর কমিউনিস্ট পার্টি যে নীতি ঘোষণা করেছে তা হল কুওমিনতাঙের যেসব অংশ প্রতিরোধের জন্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, তাদের সঙ্গে তিনটি শর্তে (বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ বন্ধ করা, জনগণের স্বাধীনতা এবং অধিকার সুনিশ্চিত করা, জনগণকে সশস্ত্র করা) কমিউনিস্ট পার্টি চুক্তিবদ্ধ হতে প্রস্তুত আছে। এই নীতিটিই সমগ্র জাতির জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে কারণ যার জন্য আমাদের পার্টি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করছে: ১৯৩৫ সালের

আগস্ট ঘোষণা[২] এবং ১৯৩৬-এর ডিসেম্বর প্রস্তাব[৩]; মে মাসে[৪] 'চিয়াং কাই-শেক-বিরোধী' শ্লোগান পরিত্যাগ, আগস্ট মাসে কুওমিনতাঙের নিকট চিঠি,[৫] সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ওপর প্রস্তাব,[৬] এবং ডিসেম্বরে সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর জোর দেওয়া, ও ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয়, কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের প্রতি টেলিগ্রাম।[৭]

(৪) চীন এবং জাপানের দ্বন্দ্বের ফলে চীনা যুদ্ধবাজাদের রাজত্বগুলিতে ও তাদের মধ্যেকার গৃহযুদ্ধগুলির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে, যেগুলো আবার প্রভাবাধীন অঞ্চল বিস্তারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং চীনের আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক অবস্থারই ফল। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ চীনের উপর তার একচেটিয়া আধিপত্যের পথ সুগম করবার উদ্দেশ্যে এ ধরনের আলাদা আলাদা রাজত্ব এবং গৃহযুদ্ধের ইন্ধন জোগায়। অন্যান্য কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও তাদের নিজস্ব স্বার্থেই সাময়িকভাবে চীনের ঐক্য এবং শান্তি চায়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণও তাদের স্বার্থের দিক থেকে গৃহযুদ্ধ ও বিভেদের বিরুদ্ধে শান্তি ও ঐক্যের জন্য তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে।

(৫) রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে তুলনামূলক বিচারে, চীন ও জাপানের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ জাতীয় দ্বন্দ্বটির বিকাশ শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও রাজনৈতিক পার্টিতে পার্টিতে দ্বন্দ্বটিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে ফেলেছে এবং অপ্রধান করে তুলেছে। কিন্তু এগুলির অস্তিত্ব এখনও আছে, কোনক্রমেই তা হ্রাস পায়নি বা বিলীন হয়ে যায়নি। জাপান ছাড়া অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও চীনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণ যে কর্তব্যের সামনে এসে পড়েছে, তা হচ্ছে —আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত সামঞ্জস্যবিধান করে বর্তমানে জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যের সাধারণ কার্যাবলীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। এ কর্তব্যপালন অবশ্যই করতে হবে এবং করা যায়ও। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক শান্তি, ঐক্য, গণতন্ত্র, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং যেসব জাপ-বিরোধী দেশ আছে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাবার নীতি অনুসরণের এই হচ্ছে কারণ।

চার। চীনা বিপ্লবের নতুন যুগের প্রথম স্তর আরম্ভ হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বরে, এবং ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুওমিনতাঙের কেন্দ্রিয়

কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনে তার সমাপ্তি ঘটে। এই স্তরের প্রধান ঘটনাগুলি ছিল ছাত্র, সাংস্কৃতিক এবং পত্রপত্রিকা-মহলে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ; উত্তর-পশ্চিমে লালফৌজের প্রবেশ ; জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার এবং সংগঠন, সাংহাই এবং সিংতাওয়ে[৮] জাপ-বিরোধী ধর্মঘট ; জাপানের প্রতি বৃটেনের তুলনামূলক কঠোর মনোভাব[৯] ; কোয়াংতুং-কোয়াংসী ঘটনা[১০] ; স্থইচুয়ানের প্রতিরোধ এবং তার সমর্থনে আন্দোলন[১১] ; চীন-জাপান আলোচনায় নানকিঙের কিছু পরিমাণে দৃঢ় মনোভাব[১২] ; সিয়ান ঘটনা ; এবং সর্বশেষে, নানকিঙে কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন[১৩]। এই সমস্ত ঘটনাগুলি চীন ও জাপানের মধ্যের মূল দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। এই স্তরে বিপ্লবের মূল কাজ ছিল আভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য সংগ্রাম করা এবং আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ করা, যাতে করে জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান জানিয়েছিল : 'গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর এবং জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও।' এই আহ্বান প্রধানতঃ কার্যকরী করা হয়েছে এবং তারই ফলে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট প্রকৃতপক্ষে গঠন করবার প্রাথমিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করেছে।

পাঁচ। কুওমিনতাঙের মধ্যে জাপ-সমর্থক চক্র থাকার জন্য এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনে সুনির্দিষ্ট অথবা আগাগোড়া পরিবর্তনের কোন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি এবং সুনির্দিষ্টভাবে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। যাই হোক, জনগণের চাপে এবং তার নিজের সভ্যদের মধ্যে বিরোধের জন্য কুওমিনতাঙকে বিগত দশ বৎসরের ভ্রান্ত নীতির পরিবর্তন শুরু করতে হয়েছে, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের নীতি, একনায়কত্ব, এবং জাপানকে প্রতিরোধ না করার নীতি থেকে সরে এসে শান্তি, গণতন্ত্র এবং জাপানকে প্রতিরোধের নীতির দিকে চলে আসতে হয়েছে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের নীতি গ্রহণের কাজ শুরু করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনেই এই প্রাথমিক পরিবর্তনগুলি পরিলক্ষিত হয়। এখন থেকে কুওমিনতাঙের কাছে পুরোপুরি নীতিপরিবর্তনের দাবি অবশ্যই রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমাদের পার্টি এবং জনগণকে জাপ-প্রতিরোধের জন্য ও গণতন্ত্রের জন্য দেশব্যাপী আরও অনেক ব্যাপকভাবে

আন্দোলন করতে হবে, কুওমিনতাঙকে সমালোচনার ব্যাপারে আরও এক ধাপ অগ্রসর হতে হবে এবং একে সক্রিয়তার দিকে ঠেলে দিতে হবে, সর্বক্ষণের জন্য চাপ রাখতে হবে, কুওমিনতাঙের মধ্যে যাঁরা শান্তি, গণতন্ত্র ও জাপ-প্রতিরোধ চান তাঁদের সঙ্গে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এবং দোদুল্যমান ব্যক্তিদের এগিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করতে হবে, যাতে জাপ-সমর্থকদের কুওমিনতাচ থেকে তাঁরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন।

ছয়। বর্তমান স্তরটি হচ্ছে নতুন পর্যায়ের দ্বিতীয় স্তর। আগের এবং বর্তমানের—এই উভয় স্তর দুটিই হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সশস্ত্র প্রতিরোধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্তর। আগের স্তরে যদি প্রধান কাজ হয়ে থাকে শান্তির জন্য সংগ্রাম করা, তবে বর্তমান স্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করা। এ কথা বোঝা দরকার যে, প্রকৃত এবং সুদৃঢ় জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট যেমন আভ্যন্তরীণ শান্তি ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তেমনি আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ছাড়াও তা হতে পারে না। সুতরাং বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম হচ্ছে বিপ্লবী কাজের কেন্দ্রীয় যোগসূত্র। আমরা যদি সুস্পষ্টভাবে গণতন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই এবং এর জন্য সংগ্রামে শৈথিল্য দেখাই, তাহলে আমরা একটি প্রকৃত ও সুদৃঢ় জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনে সমর্থ হব না।

গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

সাত। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে আক্রমণের প্রস্তুতির তোড়জোড় করছে। পাশ্চাত্যে হিটলার এবং মুসোলিনির আগ্রসী যুদ্ধের প্রস্তুতির তোড়জোড়ের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে জাপান একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ভিত রচনার কাজে প্রাচ্যে তার প্রতি বিন্দু শক্তি নিয়োগ করছে, যাতে করে একটি আঘাতেই চীনকে সে পদানত করতে পারে। এজন্য সে দেশের মধ্যে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থা সৃষ্টি করছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে কূটনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করছে, এবং চীনের মধ্যে জাপ-সমর্থক শক্তিকে বাড়িয়ে তুলছে। 'জাপ-চীন সহযোগিতা' এবং কূটনৈতিক ব্যাপারে কিছু কিছু নমনীয়তা, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় তার আগ্রাসী নীতির কলা-কৌশলের প্রয়োজনেই করা হয়েছে। চীন আজ বাঁচবে, কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি এসে গিয়েছে।

জাপ-প্রতিরোধের প্রস্তুতিকে আমাদের বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং দেশকে বাঁচাতে হবে। আমরা সুনিশ্চিতভাবেই প্রস্তুতি-পর্বের বিরোধী নই; কিন্তু আমরা বিরোধী দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতির এবং সামরিক ও অসামরিক অফিসার-রাজত্বের গয়ংগচ্ছ ভাবের, বিরোধী কোন ব্যাপারকেই গুরুত্ব না দেওয়ার—যার ফলে দেশের সর্বনাশ সাধিত হয়ে যাবে। এসব প্রকৃতপক্ষে শত্রুকেই সাহায্য করে এবং অবশ্যই অতি দ্রুত আমাদের এসব দূর করতে হবে।

আট। জাতিকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য, জাতীয় প্রতিরক্ষার রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত প্রস্তুতি প্রয়োজন, প্রয়োজন এর সব কিছুরই এবং এর একটিকেও এক মুহূর্তের জন্যও ফেলে রাখা যায় না। কিন্তু আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিজয়কে সুনিশ্চিত করবার চাবিকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা অর্জন। সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ শান্তি ও ঐক্য। কিন্তু গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে যে শান্তি অর্জিত হয়েছে তাকে সুসংবদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে শক্তিশালী করা যাবে না। সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন জনগণের সমাবেশ, কিন্তু স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ছাড়া তাদের সমাবেশ করানোর আর কোন পথই নেই। যদি শান্তি এবং ঐক্য সুসংহত করা না যায়, যদি জনগণকে সমাবিষ্ট করা না যায়, তবে আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের ভাগ্য আবিসিয়ার মতোই হবে। আবিসিনিয়ার পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল এই যে, তার সামন্ত শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ়মূল আভ্যন্তরীণ ঐক্য অর্জন করতে পারেনি এবং জনগণের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেনি। চীনে গণতন্ত্র ছাড়া জাপানের বিরুদ্ধে প্রকৃত এবং দৃঢ়মূল জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না এবং তার লক্ষ্যও অর্জিত হবে না।

নয়। চীনকে এক্ষুণি নিম্নলিখিত দুটি ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন শুরু করতে হবে। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক ব্যবস্থান ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙের এক পার্টির এবং এক শ্রেণীর একনায়কত্বের পরিবর্তন করে সমস্ত পার্টি ও সমস্ত শ্রেণীর সহযোগিতার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে। এই ব্যাপারে, জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ও আহ্বানের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন করে পরিষদে গণতান্ত্রিক নির্বাচন করতে হবে, এবং পরিষদের সভার কাজ পরিচালনায় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে। তারপর প্রয়োজন একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করা ও তা গ্রহণ করা, একটি

প্রকৃত গণতান্ত্রিক লোকসভার অধিবেশন আহ্বান করা এবং একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত করা, যে সরকার প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ কার্যকরী করবে। কেবলমাত্র এভাবেই সত্যিকারের আভ্যন্তরীণ শান্তি সংহত হতে পারে, আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ হতে পারে, আভ্যন্তরীণ ঐক্য শক্তিশালী হতে পারে এবং সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে বিদেশী শত্রুর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেতে পারে। আমাদের এসব পরিবর্তন সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং, যখন জাপানী আক্রমণ আসবে তখন তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করবার জন্য আমাদের অতি দ্রুত সংস্কারের কাজে এগিয়ে যেতে হবে এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণভাবে এগুলি শেষ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সমগ্র দেশের জনগণ এবং সমস্ত পার্টির দেশপ্রেমিকগণকে জাতীয় পরিষদ এবং সংবিধানের ব্যাপারে আগেকার অবহেলার ভাব পরিত্যাগ করতে হবে এবং জাতীয় পরিষদ ও একটি সংবিধানের জন্য আন্দোলনে গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য এ আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতাধিষ্ঠিত পার্টি কুওমিনতাংকে সুতীব্রভাবে সমালোচনা করতে হবে এবং চাপ সৃষ্টি করে এক-পার্টি ও এক-শ্রেণীর এক-নায়কত্ব ত্যাগ করে জনগণের মতানুযায়ী চলতে বাধ্য করতে হবে। এই বছরের আগামী কয়েক মাস জাতীয় পরিষদ এবং সংবিধানকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক করে তোলার আশু লক্ষ্য নিয়ে দেশব্যাপী এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার জাগিয়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, জনগণের জন্য বাক-স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করা ও সংগঠন করবার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা ছাড়া শাসন-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন, প্রতিরোধ যুদ্ধে জনগণকে সমাবিষ্ট করা, মাতৃভূমিকে সফলভাবে প্রতিরক্ষা করা এবং বিজিত অঞ্চগুলি পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। আগামী কয়েক মাসে দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্ততঃপক্ষে এই নিম্নতম স্বাধীনতাগুলি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত, যার মধ্যে থাকবে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, রাজনৈতিক পার্টিগুলির প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি। শাসন-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন এবং জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের কার্যসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একই সঙ্গে এগুলিই আবার প্রকৃত এবং সুদৃঢ় জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের পূর্ব শর্ত।

দশ। আমাদের শত্রুরা—জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, চীনা বিশ্বাসঘাতক, জাপ-সমর্থক লোকেরা এবং ট্রটস্কিপন্থীরা—চীনে শান্তি ও ঐক্য, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা এবং জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধকে বানচাল করবার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছে। অতীতে যখন আমরা অক্লান্তভাবে শান্তি ও ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করছিলাম, তখন তারা গৃহযুদ্ধ এবং অনৈক্যের সর্বপ্রকার ইন্ধন জুগিয়েছে। বর্তমানে এবং অদূর ভবিষ্যতে যখন আমরা অক্লান্তভাবে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি, তখন নিঃসন্দেহে তারা তাদের ধ্বংসমূলক কাজ আবার আরম্ভ করবে। তাদের সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে মাতৃভূমির রক্ষার জন্য আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের কাজকে প্রতিহত করা এবং চীনকে পদানত করবার জন্য তাদের আগ্রাসী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা। গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামে এখন থেকে আমরা আমাদের প্রচার, বক্তৃতা এবং সমালোচনা কেবলমাত্র কট্টরপন্থী কুওমিনতাঙ সদস্য ও জনগণের পশ্চাৎপদ অংশের দিকেই নিয়োজিত করব না, উপরন্তু জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের এবং চীন-আক্রমণের ব্যাপারে তাদের পোষা কুত্তা জাপ-সমর্থক ব্যক্তিবর্গ ও ট্রটস্কিপন্থীদের চক্রান্তের মুখোসও সম্পূর্ণভাবে খুলে দেব এবং সুদৃঢ়ভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব।

এগারো। আভ্যন্তরীণ ঐক্য, গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রয়োজনে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের প্রতি প্রেরিত এক টেলিগ্রামের মাধ্যমে নিম্নলিখিত চারটি প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছে:

(১) শেনসী-কানসু-নিংসিয়া বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলের কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের নাম হবে চীন প্রজাতন্ত্রের বিশেষ অঞ্চলের সরকার, লালফৌজ জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে, এবং তারা যথাক্রমে নানকিঙের কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর সামরিক পরিষদের নির্দেশাধীনে আসবে;

(২) বিশেষ অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ স্থানসমূহে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী করা হবে;

(৩) কুওমিনতাঙকে সশস্ত্র শক্তি দ্বারা উৎখাতের নীতি বন্ধ থাকবে; এবং

(৪) জমিদারের জমি বাজেয়াপ্তকরণ বন্ধ থাকবে।

এই প্রতিশ্রুতিগুলি প্রয়োজনীয় এবং উপযোগীও বটে। কারণ একমাত্র এইভাবেই আমরা দেশের মধ্যে দুটি বিভিন্ন সরকারের মধ্যেকার বিরোধের পরিবর্তন সাধন করতে পারি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের জন্য ঐক্য অর্জন করতে পারি। এগুলি হবে চীনের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের তুলনামূলক রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলি হচ্ছে নীতিসম্মত এবং শর্তাধীন সুবিধাদান। সমগ্র জাতির পক্ষে যা প্রয়োজনীয়—শান্তি, গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ—সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই এই সুবিধাদান। তাছাড়া, এই সুবিধাদানেরও কিন্তু সীমা আছে। বিশেষ অঞ্চলে এবং লাল-ফৌজের ওপরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বজায় রাখা, এবং কুওমিনতাঙের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনায় স্বাধীনতা—এগুলি হচ্ছে সীমা, যা পেরিয়ে যাওয়া চলবে না। সুবিধাদানের অর্থ উভয় পার্টিরই সুবিধাদান: কুওমিনতাঙ গৃহযুদ্ধের নীতি, একনায়কত্ব ও বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ না করার নীতি পরিত্যাগ করবে, এবং কমিউনিস্ট পার্টি দুই সরকারের মধ্যে বৈরিতা চালাবার নীতি পরিত্যাগ করবে। আমরা পরেরটির বিনিময়ে আগেরটি চাই, এবং জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনে আমরা কুওমিন-তাঙের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাই। একে কমিউনিস্ট পার্টির আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করা আ কিউবাদ[১৪] বা নোংরা অপপ্রচার ছাড়া তার কিছুই নয়।

বারো। কমিউনিস্ট পার্টি কি তিন-গণনীতিকে স্বীকার করে? আমাদের উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করি।[১৫] তিন-গণনীতি তার ইতিহাসের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন-গণনীতি জনগণের আস্থা অর্জন করেছিল এবং তা ১৯২৪-২৭ সালের বিজয়ী বিপ্লবের পতাকা হয়েছিল, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সহযোগিতায় ফলেই সুদৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যদিও ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট পার্টির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে (পার্টি থেকে বিতাড়ণ[১৬] এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ) এবং বিরুদ্ধ নীতি অনুসরণ করে বিপ্লবের পরাজয় ঘটায় এবং দেশকে বিপদগ্রস্ত করে। ফলে, জনগণ তিন-গণনীতির ওপর আস্থা হারায়। যেহেতু এখন জাতীয় সংকট খুবই গভীর এবং কুওমিনতাঙ আর পুরানো কায়দায় শাসন চালাতে পারছে না, সেহেতু সমগ্র দেশের জনগণ এবং

কুওমিনতাঙের মধ্যেকার দেশপ্রেমিকরা দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা জরুরী-ভাবে দাবি করছেন। ফলে তিন-গণনীতির সারমর্মকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং জাতীয়তার আদর্শ বা জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম, গণতন্ত্রের আদর্শ বা আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অর্জন, এবং জনগণের জীবনযাত্রার আদর্শ বা জনগণের হিতসাধনের ভিত্তিতে দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে চীনা বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে এসব আদর্শ সুদৃঢ়ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করবার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদস্যকে একথা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কমিউনিস্টরা কখনো তাদের সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের আদর্শ পরিত্যাগ করবে না, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েই এই আদর্শে তারা পৌঁছাবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী আছে। এর সর্বোচ্চ কর্মসূচী হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ, যা তিন গণনীতি থেকে স্বতন্ত্র। এমনকি, তার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের কর্মসূচীও চীনের অন্যান্য পার্টির তুলনায় অনেক বেশি নিখুঁত ও সম্পূর্ণ। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী এবং কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বিঘোষিত তিন গণনীতি মূলতঃ বিরোধী নয়। সুতরাং তিন-গণনীতিকে প্রত্যাখ্যান করা তো দূরের কথা, আমরা একে কার্যকরী করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে প্রস্তুত। উপরন্তু, আমরা এই কর্মসূচী আমাদের সঙ্গে একযোগে রূপায়ণের জন্য কুওমিনতাঙকে আহ্বান জানাচ্ছি, এবং সমগ্র দেশকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এই কর্মসূচীকে কার্যকরী করবার জন্য। আমরা মনে করি যে, জাতীয় স্বাধীনতা গণতন্ত্র, এবং স্বাধীনতা—এই তিন সুমহান লক্ষ্যের জন্য এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের জন্য, কমিউনিস্ট পার্টি, কুওমিনতাঙ এবং সমগ্র দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সংগ্রাম চালাতে হবে।

তেরো। শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের যে শ্লোগান আমরা আগে দিয়েছিলাম তা কি ভুল ছিল? না, ভুল ছিল না। বুর্জোয়ারা, বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোয়ারা, বিপ্লব থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত শক্তির রক্ষকে পরিণত হয়েছে, এবং জনগণের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় বিপ্লবের একমাত্র চালিকাশক্তি থাকছে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক এবং শহরের

পেটি-বুর্জোয়ারা এবং একমাত্র বিপ্লবী পার্টি থাকছে কমিউনিস্ট পার্টি, যার ওপরেই অবশ্যম্ভাবীরূপে বিপ্লব সংগঠনের দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। একমাত্র কমিউনিস্ট-পার্টিই বিপ্লবের পতাকা উঁচুতে তুলে রেখেছে, বিপ্লবের ঐতিহ্য রক্ষা করেছে, শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্লোগান উপস্থাপিত করেছে, এবং বহু বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম করেছে। এই স্লোগান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজের বিরোধী ছিল না, বরং আমরা যে সুদৃঢ়ভাবে সে-কাজই সম্পন্ন করেছি, তাই প্রমাণ করেছে। আমাদের প্রকৃত সংগ্রামে আমরা যে নীতি গ্রহণ করেছিলাম তার একটিও এই কর্তৃব্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ এবং আট ঘণ্টা শ্রম-সময় প্রবর্তন সহ আমাদের অন্যান্য নীতিসমূহ কখনও ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিমালিকানার সীমানার বাইরে যায়নি। সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে কার্যকরী করা আমাদের তৎকালীন নীতি ছিল না। নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শরিক কারা কারা হবে? এর শরিক হবে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক, শহরের পেটি-বুর্জোয়া, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং দেশের অন্যান্য ব্যক্তি যারা জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব চায়,—এ হবে জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবে এইসব শ্রেণীর মৈত্রী। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, বুর্জোয়াদের এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার কারণ, বর্তমান অবস্থায় বুর্জোয়াদের আবার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার এবং জাপ-প্রতিরোধে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং তাই সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির তাদের বাদ না দিয়ে স্বাগত জানানোই উচিত হবে এবং যৌথ সংগ্রামে তাদের সঙ্গে মৈত্রী পুনরুজ্জীবিত করে চীনা বিপ্লবকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করাই উচিত হবে। আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষের অবসান ঘটাবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি জমিদারদের জমি বলপূর্বক বাজেয়াপ্তকরণের কাজটি আর না করতে রাজী আছে এবং ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্য নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়বার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংসদীয় এবং অন্যান্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করতে রাজী আছে। প্রথম যে প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হবে তা হচ্ছে, চীনের জমির মালিক চীনারা হবে, না জাপানীরা হবে? যেহেতু কৃষকদের ভূমি-সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি চীনের প্রতিরক্ষার প্রশ্নটির সঙ্গে বিজড়িত, তাই আমাদের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন হবে বলপূর্বক বাজেয়াপ্তকরণের পথ পরিত্যাগ করে উপযুক্ত নতুন পথ গ্রহণ করা। অতীতে শ্রমিক কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্লোগানটি খুবই সঠিক ছিল, এবং আজ এ স্লোগান বর্জন করাটাও সঠিক।

চোদ্দ। শত্রুকে যৌথভাবে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজনে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সঠিক সমাধান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নীতি হওয়া উচিত এই যে, এই সমাধান যেন জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে দুর্বল ও সংকুচিত না করে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, পার্টিতে পার্টিতে এবং রাজনৈতিক গ্রুপে গ্রুপে দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব, কিন্তু যেসব সংগ্রাম ঐক্য এবং জাপ-প্রতিরোধের পক্ষে ক্ষতিকর (গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক পার্টিগুলির বৈরিতামূলক সংঘর্ষ প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতাবাদ, একদিকে সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন এবং অন্যদিকে প্রতিরোধের পক্ষে ক্ষতিকারক অভ্যুত্থানের নীতি ও বেশি বেশি অর্থনৈতিক দাবি ইত্যাদি), সেগুলির অবসান ঘটানো সম্ভব ও প্রয়োজন। আর যেসব সংগ্রাম ঐক্য এবং জাপ-প্রতিরোধকে সাহায্য করে (সমালোচনার স্বাধীনতার জন্য, রাজনৈতিক পার্টিগুলির স্বাধীনতার জন্য, জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য) সেগুলিকে চালিয়ে যাওয়া।

পনেরো। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট এবং সংযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামের সামগ্রিক কর্তব্যের মধ্যে লালফৌজ এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলগুলির কাজ হচ্ছে :

(১) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যের জন্য লালফৌজকে অবিলম্বে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী হিসেবে পুনঃসংগঠিত করতে হবে এবং সামরিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষার মান বাড়িয়ে একটি আদর্শ সেনাবাহিনী হতে হবে।

(২) আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলগুলিকে রাষ্ট্রের অংশ হতে হবে, নতুন অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে, শান্তিরক্ষী বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে হবে। বিশ্বাসঘাতক এবং অন্তর্ঘাতীদের বিতাড়িত করতে হবে এবং একে প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের আদর্শ অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

(৩) এই অঞ্চলে অতিপ্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক গঠনকার্য চালাতে হবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে হবে।

(৪) প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

ষোলো। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী কোন কোন ঐতিহাসিক অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ত-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেও, তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার ফলে অন্য অবস্থায় তারা আবার দোদুল্যমান হয়ে পড়ে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে। চীনা বুর্জোয়াশ্রেণী সম্বন্ধে চীনের ইতিহাস এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং এ হচ্ছে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত—সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে সম্পন্ন করা যায় না, কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই তা সম্পন্ন করা যায়। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর অধ্যবসায় এবং শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার পরিপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করেই কেবল বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তর্নিহিত দোদুল্যমানতা এবং শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার অক্ষমতাকে কাটিকে ওঠা সম্ভব এবং বিপ্লবের মাঝপথে বিশ্বাসঘাতকতাকে ঠেকানো সম্ভব। সর্বহারাশ্রেণী কি বুর্জোয়াশ্রেণীকে অনুসরণ করবে, না বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বহারাশ্রেণীকে অনুসরণ করবে? নেতৃত্ব দেওয়ার এই দায়িত্বের প্রশ্নটিই হচ্ছে চীন বিপ্লবের চাবিকাঠি, যার ওপরে বিপ্লবের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। ১৯২৪-২৭ সালের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, যখন বুর্জোয়ারা সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বে চলেছিল তখন বিপ্লব কিভাবে এগিয়ে গিয়েছিল, এবং সর্বহারাশ্রেণী কমিউনিস্ট পার্টির ভুলের জন্য[১৭] বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক লেজুড়ে পরিণত হল, তখন কিভাবে বিপ্লব ব্যর্থ হল। ইতিহাসের এই ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করতে দেওয়া ঠিক হবে না। বর্তমান অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণী ও তার পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন করা, শান্তি, গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের লক্ষ্য অর্জন করা এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা করা অসম্ভব, এবং অসম্ভব সংযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আজও কুওমিনতাঙের বুর্জোয়ারা খুবই নিষ্ক্রিয় ও রক্ষণশীল, এবং তার প্রমাণ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সৃষ্ট জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে মেনে নিতে তাদের দীর্ঘদিন ব্যাপী দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব। এই অবস্থা সর্বহারাশ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। জাপ-প্রতিরোধের প্রধান বাহিনী হিসেবে কাজ করবার এবং দেশকে বাঁচাবার দায়িত্বভার থেকে কমিউনিস্ট পার্টি মুক্ত হতে পারে না—এই বাধ্যবাধকতা তারা অস্বীকার করতে পারে না।

সতেরো। দেশের সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীগুলিকে সর্বহারাশ্রেণী কিভাবে তার পার্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়? প্রথমতঃ, বিপ্লবের প্রতিটি পর্যায়ের বিকাশ অনুযায়ী ঐতিহাসিক স্তরের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক শ্লোগান উপস্থাপিত করে এবং এইসব রাজনৈতিক শ্লোগানগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা 'একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট' এবং 'একটি সংযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মূল শ্লোগান উপস্থাপিত করেছি। এছাড়াও আমরা 'গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাও', 'গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম কর', 'সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাও' প্রভৃতি শ্লোগান তুলে ধরেছি ঐক্যবদ্ধ কাজের লক্ষ্য হিসেবে। এরকম সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নই উঠতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যখন সমগ্র দেশ তাদের এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজে নেমে পড়েছে, তখন সর্বহারাশ্রেণীকে, বিশেষ করে তার অগ্রগামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে তার অসীম উদ্দীপনা এবং আনুগত্যের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবার সংগ্রামে কমিউনিস্টদের হতে হবে সবচাইতে বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সবচাইতে বেশি আত্মত্যাগী, সবচাইতে বেশি সুদৃঢ় এবং প্রতিটি অবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য সবচাইতে কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ব্যাপক জনগণের ওপর আস্থা স্থাপন করে তাদের সমর্থন অর্জন করতে হবে। তৃতীয়তঃ, নির্ধারিত রাজনৈতিক লক্ষ্যকে এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না করে কমিউনিস্ট পার্টিকে তার মিত্রদের সঙ্গে উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং সে মৈত্রীকে বিকশিত এবং সংহত করতে হবে। চতুর্থতঃ, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে, মতাদর্শগত ঐক্য এবং কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। এ সমস্ত কাজ করেই কেবল সমগ্র চীনা জনগণের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে। এগুলিই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভিত্তির গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে পারে, বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে পারে, এবং আমাদের দোদুল্যমানতায় যাতে বিপ্লবের বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তার নিশ্চিতি অর্জন করতে পারে।

আঠারো। যখন আভ্যন্তরীণ শান্তি অর্জিত হবে এবং আমাদের দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সংগ্রামের ধরন, সংগঠন এবং আমাদের কাজকর্মের পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে, কুওমিনতাঙ শাসনের সঙ্গে যে

বৈরিতামূলক সম্পর্ক আমরা অনুসরণ করছিলাম, তার পরিবর্তন সাধন করতে হবে। প্রধানতঃ এগুলি হবে সামরিক থেকে শান্তিপূর্ণ ধরনে পরিবর্তন, বে-আইনী ধরন থেকে আইনী ধরনে পরিবর্তন। এ সমস্ত পরিবর্তন সাধন করা সহজ হবে না এবং আমাদের নতুন করে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং আমাদের কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা একটি মূল চাবিকাঠি।

উনিশ। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রকৃতি ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু কমরেড প্রশ্ন করছেন। আমাদের উত্তর হচ্ছে: শ্রেণী-চরিত্রের দিক থেকে এই প্রজাতন্ত্র হবে সমস্ত বিপ্লবীশ্রেণীর মৈত্রী, এবং ভবিষ্যতের দিক থেকে এর সম্ভাবনা থাকবে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে এবং নতুন আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে (সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় এবং বিশ্ববিপ্লবের নতুন যুগের আরম্ভ) আমাদের এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুতরাং, যদিও সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে এ তখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকবে, তা সত্ত্বেও এটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সাধারণ চরিত্র থেকে পৃথক হবে, কারণ, নির্ভুল রাজনৈতিক ভাষায়. একে হতে হবে এমন একটি রাষ্ট্র, যার ভিত্তি হবে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মৈত্রী। সুতরাং, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা যায়, যদিও এর ধনতান্ত্রিক পথে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন আছে, ঠিক তেমনি আবার সমাজতান্ত্রিক পথে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে, এবং চীনা সর্বহারাশ্রেণীর পার্টিকে পরের সম্ভাবনাটির জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হবে।

কুড়ি। পার্টির দায়-দায়িত্ব বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য রুদ্ধদ্বার নীতি এবং হঠকারিতার বিরুদ্ধে ও লেজুড়বৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গণ-আন্দোলনে আমাদের পার্টির একটি দীর্ঘদিনের ঝোঁক আছে চূড়ান্ত রুদ্ধদ্বার নীতির দিকে, ঔদ্ধত্যপূর্ণ সংকীর্ণতাবাদের দিকে এবং হঠকারিতার দিকে যাবার। এইসব কুৎসিৎ ঝোঁক পার্টি কর্তৃক জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে জয় করবার প্রতিবন্ধক। আমাদের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্র থেকে এই ঝোঁককে সমূলে উৎপাটিত করা একান্তভাবেই দরকার। আমরা যা বলছি তা হচ্ছে: সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর নির্ভর কর এবং সমগ্র পরিস্থিতিকে বিচার কর। চেন তু-শিউ ধরনের লেজুড়-বৃত্তি—যা হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া সংস্কারবাদেরই প্রতিফলন—

কিছুতেই আর ঘটতে দেওয়া চলবে না। পার্টির শ্রেণী-অবস্থানকে বিচ্যুত করা, তার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে মুছে ফেলা, বুর্জোয়া সংস্কারবাদের স্বার্থে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া—এইসব বিপ্লবকে সুনিশ্চিত পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেবে। আমরা যা বলছি তা হচ্ছে : সুদৃঢ় বিপ্লবী কর্মনীতিগুলিকে কার্যকরী কর এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাও। যেসব অবস্থিত ঝোঁকের কথা আমরা বললাম সেগুলিকে দূর করবার জন্য সমস্ত পার্টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্ত্বিক জ্ঞানের মানকে উন্নত করে তোলা একান্তভাবে দরকার, কেননা মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হচ্ছে একমাত্র দিক্‌নির্দেশক, যা চীন-বিপ্লবকে বিজয় অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

টীকা

১। ১৯৩৫ সালে যখন জাপানীরা উত্তর চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ চালায় এবং যখন চিয়াং কাই-শেক-এর নেতৃত্বে কুওমিনতাঙ সরকার আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এক অবমাননাজনক অবস্থায় আমাদের টেনে নামিয়ে আনে, তখনই উত্তর চীন ঘটনা ঘটে। ঐ বছরের মে মাসে কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে জাপানীরা উত্তরে চীনের শাসন-ব্যবস্থার অধিকার দাবি করে এবং জুন মাসে কুওমিনতাঙ সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি হো-ইং-চিন উত্তর চীনের হানাদারী জাপ-বাহিনীর অধিনায়ক য়োসিজিরো উমেজুর সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিটি 'হো-উমেজু চুক্তি' নামে খ্যাত হয়। এই চুক্তি অনুসারে চীনকে হোপেই এবং চাহার প্রদেশের ওপর থেকে আর সার্বভৌমত্বের অনেকখানিই ত্যাগ করতে হয়। অক্টোবর মাসে, জাপানী আক্রমণকারীদের প্ররোচনায়, কিছু চীনা বিশ্বাসঘাতক হোপেই প্রদেশের সিয়াংহোতে বিদ্রোহ করে এবং ঐ কাউন্টি শহরটি অধিকার করে। নভেম্বর মাসে জাপ-আক্রমণকারীরা জনাকয়েক চীনা বিশ্বাসঘাতককে দিয়ে উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চালায় এবং পূর্ব হোপেইতে একটি 'কমিউনিস্ট বিরোধী স্বায়ত্তশাসিত শাসন-ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা করে। 'উত্তর চীনের জন্য বিশেষ শাসন-ব্যবস্থা'র দাবি নিয়ে জাপানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার্থে কুওমিনতাঙ সরকার একটি 'হোপেই এবং চাহারের

নিমিত্ত রাজনৈতিক পরিষদ' গঠনের জন্য সুং চে-যুয়ান এবং অন্যান্যদের মনোনীত করে।

২। ১৯৩৫ সালের ১লা আগস্ট চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘোষণাটি করে। নিম্নলিখিত সারাংশে ঘোষণাটির প্রধান বিষয়গুলি দেওয়া হল :

এই মুহূর্তে যখন আমাদের দেশ ও আমাদের জনগণ ধ্বংসের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়াছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টি স্বদেশবাসীদের কাছে আর একবার আবেদন জানাচ্ছে : বিগত দিনে বা বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে স্বার্থের এবং রাজনৈতিক মতাবাদের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, আমাদের স্বদেশবাসীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর এবং স্বার্থের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, বিভিন্ন সেনাবাহিনীর মধ্যে বিগত দিনের বা বর্তমানের যত বিরোধিতায় থাকুক না কেন, আমাদের সকলেরই এই উপলব্ধিতে প্রকৃতই জেগে উঠা প্রয়োজন যে, 'বাড়িতে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হলেও তারা বাইরের আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়', এবং আমাদের প্রথম এবং প্রধানতম কাজ হচ্ছে জাপানকে প্রতিরোধ করে জাতিকে বাঁচানোর পবিত্র কর্তব্যের জন্য সংগ্রামের জাতির সমস্ত শক্তিকে (জনবল, অর্থবল এবং সশস্ত্র-বাহিনী) কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো। কমিউনিস্ট পার্টি আবার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করছে : যদি কুওমিনতাঙ সামরিকবাহিনী লালফৌজের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ বন্ধ করে, এবং তাদের কোন ইউনিট যদি জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালায়, তবে লালফৌজ, পুরোনো ঝগড়া বা বর্তমান সংঘর্ষ বা অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে মত-পার্থক্য সব কিছুকে ভুলে গিয়ে এইসব কিছুকে ইউনিটের বিরুদ্ধে তাদের সংঘর্ষমূলক কাজকর্ম এই মুহূর্তে শুধু বন্ধই করবো না, জাতিকে বাঁচানোর জন্য সানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে কাজ করবে।

কমিউনিস্ট পার্টি এ ধরনের একটি জাতিয় প্রতিরক্ষা সরকার গঠনের উদ্যোগ নিতে রাজী আছে। এরকম একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার গঠনের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, সমস্ত সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন, চেম্বার অব কমার্স, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংবাদ পত্রসেবী সংঘ, শিক্ষক প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয়সমূহের কর্মচারীবর্গ, শহরবাসীদের প্রতিষ্ঠান, চি কুং-তাং জাতীয় সশস্ত্র আত্মরক্ষার প্রতিষ্ঠান,

জাপ-বিরোধী সংঘ, জাতীয় মুক্তিসংঘ ইত্যাদি), সব নামী ব্যক্তি, রাজনীতিজ্ঞ, পণ্ডিত, এবং সমস্ত স্থানীয় সামরিক এবং প্রশাসনিক সংগঠন, যারা জাপানকে প্রতিরোধ করতে এবং জাতিকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি এখনি আলাপ-আলোচনায় বসতে প্রস্তুত আছে। এই আলাপ-আলোচনা থেকে উদ্ভূত জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার হবে পরাধীনতার হাত থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য এবং বেঁচে থাকাকে সুনিশ্চিত করবার জন্য নেতৃত্বের একটি অস্থায়ী হাতিয়ার। এর পক্ষে উচিত হবে দেশের সমস্ত লোকের সত্যিকারের প্রতিনিধি নিয়ে (বিভিন্ন অংশের শ্রমিক, সৈন্য, কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং ছাত্র, সমস্ত পার্টি এবং প্রতিষ্ঠান—যারা জাপানকে প্রতিরোধ করতে এবং দেশকে বাঁচাতে ইচ্ছুক, এবং সমস্ত প্রবাসী চীনাদের ও চীনের মধ্যেকার সমস্ত জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে) একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গঠন করা এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ ও জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির আরও সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা। কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দের এরকম এক সভা আহ্বানের ব্যাপারে সমস্ত শক্তি দিয়ে সাহায্য করবে এবং এর সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করিতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে।

'জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সমস্ত সৈন্যদের নিয়ে একটি জাপ-বিরোধী সংযুক্ত বাহিনী গঠন করতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের নেতৃত্বে এই সেনাবাহীর একটিমাত্র সাধারণ সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সদর দপ্তর বিভিন্ন জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির সৈন্য এবং অফিসারদের দ্বারা নির্বাচিত হবে, না অন্য কোন উপায়ে হবে, সেই প্রশ্নটি সমস্ত অংশের প্রতিনিধি এবং জনগণের ইচ্ছানুসারেই নির্ধারিত হওয়া উচিত। লালফৌজ এরকম সংযুক্ত বাহিনীতে শর্তহীনভাবে সবার প্রথমেই যোগ দেবে এবং জাপানকে প্রতিরোধ ও দেশকে বাঁচাবার জন্য তার কর্তব্য পালন করবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার এবং জাপ-বিরোধী সংযুক্ত সেনাবাহিনী কর্তৃক জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং জাপানকে প্রতিরোধের অসীম দায়িত্ব কার্যকরীভাবে পালনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি তাই সমগ্র জাতির কাছে আবেদন জানাচ্ছে: যাঁদের টাকা আছে তাঁরা টাকা, যাঁদের বন্দুক আছে তারা বন্দুক দিন, যাঁদের খাদ্যশস্য

আছে তাঁরা তা দিন, যাঁদের শ্রমক্ষমতা আছে তাঁরা শ্রমক্ষমতা দিন এবং যাঁদের বিশেষ দক্ষতা আছে তাঁরা সেই বিশেষ দক্ষতা নিয়ে এগিয়ে আসুন, যাতে করে আমাদের সশস্ত্র স্বদেশবাসীকে সমাবিষ্ট করা যায় এবং আধুনিক এবং পুরানো সমস্ত অস্ত্র দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে সশস্ত্র করা যায়।

৩। ডিসেম্বর প্রস্তাব হচ্ছে ১৯৩৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে উত্তর শেনসীর ওয়াওপাওতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সভায় গৃহীত 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টির কর্তব্য' শীর্ষক প্রস্তাবটি। এই প্রস্তাব বর্তমান আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং চীনের শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ করে পার্টির নীতি রচনা করে। প্রস্তাবটি আংশিকভাবে নিম্নরূপ ঃ

> বর্তমান অবস্থা থেকে ধরা পড়েছে যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনকে গ্রাস করবার প্রচেষ্টা সমস্ত দেশ ও সমস্ত বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। চীনের রাজনৈতিক জীবনে সমস্ত শ্রেণী, স্তর, রাজনৈতিক পার্টি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে। জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট এবং জাতীয় প্রতিবিপ্লবী ফ্রন্ট—এই উভয় ক্ষেত্রেই শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। সুতরাং পার্টির কৌশলগত লাইন হচ্ছে, প্রধান শত্রু অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং চরম বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিপ্লবী শক্তিকে এবং সমস্ত জাতিগুলিকে প্রতিরোধের জন্য জাগিয়ে তোলা, ঐক্যবদ্ধ করা এবং সংগঠিত করা। সমস্ত জনগণ, সমস্ত পার্টি, সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী এবং সমস্ত শ্রেণী—যারাই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের বিরোধী, তাদের উচিত ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং মহান জাতীয় বিপ্লবী-যুদ্ধ শুরু করা, জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের চীন থেকে বিতাড়িত করা, চীনে সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুকুরদের শাসনকে উচ্ছেদ করা, চীনা জাতির পূর্ণ মুক্তি অর্জন করা এবং চীনের স্বাধীনতা এবং চীনা ভূমির সংহতি রক্ষা করা। কেবলমাত্র ব্যাপকতম জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট (উচ্চ এবং নিম্নস্তরের সকল লোককে নিয়ে) গঠন করেই আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুকুর চিয়াং কাই-শেককে পরাজিত করতে পারি। এ কথা ঠিক যে, বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও স্তর এবং

বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবে যোগদান করছে। কেউবা করছে তাদের প্রভাব বজায় রাখবার জন্য, কেউবা আন্দোলন যাতে তাদের নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করার জন্য, আবার কেউবা চীনদেশের সত্যিকার পূর্ণ মুক্তি অর্জনের জন্য। উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে বলেই কিছু লোক সংগ্রামের শুরুতে দোদুল্যমানতা দেখাবে বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, কিছু লোক উদাসীন হয়ে যাবে বা মাঝপথে সংগ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, এবং কিছু লোক দৃঢ়সংকল্প নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করবে। তা সত্বেও আমাদের কাজ শুধু সমস্ত সম্ভাব্য মূল শক্তিগুলিকেই ঐক্যবদ্ধ করা নয়, উপরন্তু জাপানকে প্রতিরোধ করবে এরূপ সমস্ত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কার্যকরী শক্তিকেও ঐক্যবদ্ধ করা, যাতে করে দেশব্যাপী সমগ্র জনগণ, যাদের শ্রমক্ষমতা আছে তারা শ্রম-ক্ষমতা দিতে পাবে, যাদের অর্থ আছে তারা অর্থ দিতে পারে, যাদের বন্দুক আছে তারা বন্দুক দিতে পারে, যাদের জ্ঞান আছে তারা জ্ঞান ছড়াতে পারে, এবং যাতে কোন স্বদেশপ্রেমিক চীনাই জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের বাইরে না থাকে। এই হচ্ছে ব্যাপকতম সম্ভাব্য জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য পার্টির রণকৌশলের সাধারণ লাইন। কেবলমাত্র এই লাইন অনুসরণ করেই আমরা আমাদের সাধারণ শত্রু জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সশস্ত্র জনগণকে সমাবিষ্ট করতে পারি। চীনা সর্বহারাশ্রেণী এবং কৃষকরাই চীনা বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি। পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যেকার ব্যাপক অংশ এবং বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে জাতীয় বিপ্লবে তাদের সবচাইতে বিশ্বস্ত মিত্র। এবং এদের সুদৃঢ় মৈত্রী হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্বাস-ঘাতক ও সহযোগীদের পরাজিত করবাব মূল বাহিনী। যখন জাতীয় বুর্জোয়া এবং যুদ্ধবাজদের একটি অংশ নৈতিক সমর্থন দেয়, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে কিংবা জাপানের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বাসঘাতক ও জাপ-সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে, তখন কৃষি-বিপ্লব ও লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি তাদের বিরোধিতা সত্বেও জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট সম্প্রসারণের কাজকে তারা কিন্তু সাহায্যই করে। কারণ, এইভাবেই প্রতিবিপ্লবের সামগ্রিক শক্তি হ্রাস পায় এবং বিপ্লবী

শক্তিসমূহের সামগ্রিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই পার্টির উচিত হবে যথোপযুক্ত উপায় ও পথ গ্রহণ করা, যাতে করে জাপ-বিরোধী ফ্রণ্টের পক্ষে এই শক্তিসমূহকে জয় করা সম্ভব হয়। উপরন্তু, জমিদার ও মুৎসুদ্দিশ্রেণীদের মধ্যেও কোনরকম ঐক্য নেই। যেহেতু বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী চুক্তিগুলির মধ্যে চীনকে নিয়ে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা আছে—তাই বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বাসঘাতক গ্রুপের উৎপত্তি হয়েছে এবং তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ আছে। পার্টির উচিত হবে এমন সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি অবলম্বন করা, যাতে করে কিছু সময়ের জন্যও সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিরা সক্রিয়ভাবে জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের বিরোধিতা না করতে পারে। জাপান ছাড়া অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের বেলায়ও এই একই কৌশল অবলম্বন করতে হবে। দেশব্যাপী সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের শক্তিকে জাগরিত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার জন্য জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে পার্টি সুদৃঢ়ভাবে এবং অনমনীয়-ভাবে সমস্ত প্রকারের দোদুল্যমানতা, আপোষ, নতিস্বীকার ও বিশ্বাস-ঘাতী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী আন্দোলনে যারা বিভেদ সৃষ্টি করে, তারা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক অথবা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী। তাদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই মিলে একযোগে কঠোর আঘাত হানব। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক চক্র এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে কথায় এবং কাজে সুদৃঢ় ও সঠিক পথ অনুসরণ করে জাপ-বিরোধী ফ্রণ্টে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত। কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই জাপ-বিরোধী যুদ্ধে ব্যাপৃত জনগণের মূল স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিসমূহ (কৃষকদের জমির দাবি, শ্রমিকশ্রেণীর, সেনাদের এবং শহরের দরিদ্র বুদ্ধিজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন) পূরণ করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র তাদের দাবিসমূহ পূরণ করেই আমরা জনগণের ব্যাপক অংশকে জাপ-বিরোধী বাহীনিতে সমাবিষ্ট করতে পারি, এবং কেবলমাত্র এইভাবেই পার্টি জাপ-বিরোধী যুদ্ধে নেতৃত্ব অর্জন করতে পারে।

এই খণ্ডেই প্রকাশিত 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪। ১৯৩৬ সালের ৫ই মে লালফৌজ টেলিগ্রাম করে এই দাবী জানায়

যে, নানকিং সরকার গৃহযুদ্ধ অবসান ঘটাক, জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যের জন্ত কমিউনিস্টদের সঙ্গে শান্তি-আলোচনা চালাক। টেলিগ্রামটি ছিল নিম্নরূপ :

নানকিং সরকারের সামরিক পরিষদের নিকট, সমস্ত জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর প্রতি, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপের প্রতি, সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রগুলির প্রতি এবং সেইসব স্বদেশবাসীদের প্রতি যাঁরা বিদেশী জাতির অধীনে দাসত্ব বরণে রাজী নন :

পূর্বদিকে অভিযানের পথে ইয়েলো নদী পার হওয়ার পর চীনা লাল-ফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন কর্তৃক সংগঠিত চীনা জনগণের লাল-ফৌজের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী বাহিনী প্রতিটি জায়গাতেই বিজয়ী হয়েছে, দেশব্যাপী সকলের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু যখন এই বাহিনী টাটুং-পুচৌ রেলপথ দখল করে প্রত্যক্ষভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য পূর্বদিকে হোপেইতে অগ্রসর হবার জন্য উৎসাহ সহকারে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল, তখন চিয়াং কাই-শেক দশ ডিভিশনের অধিক সৈন্ত শানসীতে পাঠায় ইয়েন সি-সান-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপানীদের বিরুদ্ধে আমাদের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য। চ্যাং সুয়ে-লিয়াং এবং ইয়াং হু-চেঙের অধীনস্ত সেনাবাহিনী এবং উত্তর শেনসীর সেনাবাহিনীকেও চিয়াং শেনসী-কানসু লাল অঞ্চলে অভিযান চালাবার নির্দেশ দিয়েছে, আমাদের জাপ-বিরোধী পশ্চাদ্ভাগকে ব্যতিব্যাস্ত করে তুলবার উদ্দেশ্যে। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্তে জনগণের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী বাহিনীর পক্ষে সঠিক কাজ হতো তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করা এবং এই পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে সেই চিয়াং-এর বাহিনীকে নির্মূল করা। কিন্তু লালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বর্তমান জাতীয় সংকটের সময় দুই পথের আমৃত্যু যুদ্ধ কেবলমাত্র চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষার শক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদেরই খুশি করবে—তা সে যুদ্ধে যে পক্ষই বিজয়ী হোক না কেন। অধিকন্তু, চিয়াং কাই-শেক এবং ইয়েন সি-সানএর বাহিনীতে বেশ কিছু সংখক দেশপ্রেমিক অফিসার ও যোদ্ধা আছেন, যারা গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লালফৌজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার জন্ত চিয়াং এবং ইয়েন-এর নির্দেশ পালন করা প্রকৃতই তাঁদের বিবেকের

বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সুতরাং শানসীতে অনেকগুলি বিজয় অর্জন সত্ত্বেও লালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন জনগণের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী বাহিনীকে ইয়েলো নদীর পশ্চিমে সরিয়ে নিয়েছেন চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষার শক্তিকে রক্ষা করবার জন্য এবং এইভাবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ নিকটবর্তী করবার জন্য, গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাবার নিমিত্ত ক্রমাগত ঘোষণাকে সুদৃঢ়ভাবে কার্যকরী করবার জন্য, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য এবং চিয়াং কাই-শেক ও তার বাহিনীর দেশপ্রেমিক অফিসার ও সৈন্যদের চূড়ান্ত জাগরণকে ত্বরান্বিত করবার জন্য। নানকিং সরকার, দেশের সমস্ত জল, স্থল, বিমান বাহিনী এবং সমগ্র জাতির নিকট আমাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়ে আমরা ঘোষণা করছি, যে সমস্ত সশস্ত্র ইউনিট জাপ-বিরোধী লালফৌজকে আক্রমণ করছে, তাদের সঙ্গে এক মাসের মধ্যে আমরা যুদ্ধাবসানের ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত আছি এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য তাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালাতে রাজী আছি। লালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে নানকিং সরকারের ভদ্রলোকেদের এই সৎ পরামর্শ দিচ্ছে যে, যখন আমাদের দেশ এবং জনগণ ধ্বংসের আশঙ্কার মধ্যে আছে তখন বিগত দিনের অপরাধসমূহ স্খালনের জন্য সুদৃঢ় প্রচেষ্টার প্রয়োজন, সমগ্র গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো প্রয়োজন, ঘরের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার মনোভাব ত্যাগ করে বাইরের শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে হাত মেলানো দরকার, এবং সর্বপ্রথমেই শেনসী, কানসু এবং শানসীর গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা প্রয়োজন। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং জাতিকে রক্ষা করার সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। এটা হবে দেশ ও জাতির কাছে এক আশীর্বাদস্বরূপ এবং আপনাদের পক্ষেও মঙ্গলজনক। কিন্তু যদি আপনারা একগুয়েমি করে এই যুক্তিগুলি না শোনেন এবং বিশ্বাসঘাতক ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হিসেবে থাকতেই পছন্দ করেন, তবে শেষ পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবেই আপনাদের শাসন ভেঙে পড়বে এবং আপনারা সমগ্র জাতি কর্তৃক ঘৃণিত হবেন এবং উৎখাত হয়ে যাবেন। প্রাচীন প্রবচন আছে, 'হাজার হাজার আঙুল দোষী সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দিলে বিনা রোগেও একজন লোক মারা যায়', অথবা যেমন আর একটি

প্রবচন আছে, 'যে জহ্লাদ অস্ত্র নামিয়ে রাখে, সে তক্ষুণি বুদ্ধদেব বনে যায়'। ভদ্রমহোদয়গণ, এ সমস্ত কথা বলছি আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করবার এবং ভাববার জন্য। লালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সমস্ত পার্টি এবং দেশের সমগ্র জনগণ, যারা বিদেশী জাতির ক্রীতদাস হতে চায় না, তাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন আমাদের অস্ত্র সংবরণ এবং শান্তি আলোচনা এবং জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যের প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য, আহ্বান জানাচ্ছেন গৃহযুদ্ধ অবসানকে ত্বরান্বিত করবায় জন্য, উভয় পক্ষের যুদ্ধ বন্ধ করবার প্রয়োজন ফ্রন্টে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য, এবং প্রস্তাবকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী করার ব্যাপারে তদারকী করবার জন্য কমিটি গঠন করবার জন্য।

৫। এই খণ্ডে 'চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তব্য', ৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' শ্লোগানটি প্রথমে 'বর্তমান পরিস্থিতি এবং পার্টির কর্তব্য প্রস্তাব'টিতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং এটি কমরেড মাও সে-তুঙের 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে' রচনাতেও আছে। পরবর্তী পরিস্থিতিতে চিয়াং কাই-শেককে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে বাধ্য করার নীতি গ্রহণ করা পার্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেহেতু এই শ্লোগানটি চিয়াং কাই-শেক চক্রের কাছে গ্রহণীয় হতো না, তাই এটিকে পাল্টে ১৯৩৬ সালে কুওমিনতাঙের কাছে পার্টির চিঠিতে 'একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' করা হয়। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লোগানটি পরে 'জাপানকে প্রতিরোধ এবং দেশকে রক্ষা করার আন্দোলন সম্পর্কে এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে প্রস্তাব' এ আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তা ঐ বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত হয়। যদিও দুইটি ভিন্ন ধরনের তবুও দুটি শ্লোগানের মর্মবস্তু একই। ১৯৩৬ সালের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বর প্রস্তাব থেকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধৃত দুটি দেওয়া হল :

কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে 'একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'র শ্লোগান উপস্থাপিত করা প্রয়োজন, কারণ চীনা ভূমির সংহতি রক্ষা করার জন্য, সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার

জন্য, চীনকে সর্বনাশা ধ্বংসের বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য এবং তার জনগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে রক্ষা করবার জন্য এই ইচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এছাড়াও ব্যাপক জনগণের গণতান্ত্রিক দাবির ওপর ভিত্তি করে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার জন্যেও এই শ্লোগানটি সবচাইতে উপযোগী। 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' দ্বারা আমরা সেই গণতন্ত্রকেই বুঝি, যা চীনের একাংশের শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের চাইতে ভৌগোলিকভাবে অনেক ব্যাপক এবং রাজনৈতিকভাবে চীনের প্রধান অংশে কুওমিংতাঙের এক-পার্টি এক-নায়কত্বের চাইতে অনেক বেশি প্রগতিশীল। সুতরাং এটি জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপক বিকাশকে এবং পরিপূর্ণ বিজয়কে আরও অনেক ভালভাবে সুনিশ্চিত করবে। অধিকন্তু, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কেবলমাত্র চীনা জনগণের ব্যাপকতম অংশকেই দেশের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বিকাশে সাহায্য করবে না, চীনা সর্বহারাশ্রেণী এবং তার নেতা কমিউনিস্ট পার্টিকেও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিজয়ের সংগ্রামের কাজকর্মের সুযোগ এনে দেবে। সুতরাং, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য তার সক্রিয় সমর্থন ঘোষণা করছে, এবং আরও ঘোষণা করছে যে, যখন চীনের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং যখন সার্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা হবে, তখন লাল অঞ্চলগুলি প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ হিসেবেই পরিগণিত হবে, পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং একই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা লাল অঞ্চলগুলিতেও কার্যকরী করা হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি জোর দিয়ে বলছে যে, আমরা নানকিঙের কুওমিনতাঙ সরকারকে জাপানকে প্রতিরোধ করায় বাধ্য করব এবং চীনা জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্প্রসারিত করব; সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির, সমস্ত অংশের জনগণের এবং সেনাবাহিনীর ব্যাপকতম জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন করব; জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে শক্তিশালী করব; লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও লালফৌজকে আরও অনেক সংহত করব এবং যেসব কথা ও কাজ আমাদের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিশ্বাসঘাতী ও আমাদের দেশের পক্ষে

অপমানজনক এবং জাতীয় ফ্রন্টকে দুর্বল করে, তার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম করব। কেবলমাত্র এভাবেই আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করতে পারব। তিক্ত এবং ধৈর্যশীল সংগ্রাম না চালিয়ে, সমগ্র চীনা জাতিকে সমাবিষ্ট না করে, এবং বিপ্লবের এক প্রবল জোয়ার সৃষ্টি না করে আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করে তুলতে পারব না। একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকালীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে জোর দিতে হবে, যেন জাপানকে প্রতিরোধ করবার এবং জাতিকে বাঁচানোর জন্য আমাদের পার্টি কর্তৃক প্রদত্ত কর্মসূচী কার্যকরী করেই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কাজ শুরু করা হয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চীনা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কর্তব্যগুলি সমাধা না হচ্ছে, ততদিন এইভাবেই চালিয়ে যাওয়া হয়।

৭। এই টেলিগ্রামটি ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাঠানো হয়েছিল। এর পূর্ণ বয়ানটি নিম্নরূপ :

কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের প্রতি।

ভদ্রমহোদয়গণ,

এ একটি জাতীয় আনন্দের বিষয় যে, সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। এখন থেকে আভ্যন্তরীণ শান্তি, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্য এবং সংহতির নীতি কার্যকরী হওয়া সম্ভব হবে। দেশ ও জাতির কাছে এটা একটা আশীর্বাদ। এই মুহূর্তে যখন জাপানী আক্রমণকারীরা সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে এবং চীনা জাতির বাঁচার প্রশ্নটি একটি সুতোয় ঝুলছে, তখন আমাদের পার্টি সাগ্রহে আশা করে যে, এই নীতি অনুযায়ী আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর জাতীয় নীতি হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন :

(১) সমস্ত গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাও এবং দেশের সমস্ত শক্তিকে বিদেশী আগ্রাসনের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীভূত কর ;

(২) বাক-স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ ও সংগঠন গড়বার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত কর এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও ;

(৩) সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির, প্রতিটি স্তরের জনগণের এবং সমস্ত সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে আহ্বান কর এবং দেশকে বাঁচানোর সাধারণ প্রচেষ্টায় জাতির সমস্ত গুণাবলীকে কেন্দ্রীভূত কর ;

(৪) জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি দ্রুততার সঙ্গে শেষ কর ;

(৫) জনগণের জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন কর।

যদি আপনাদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন এ প্রশ্নগুলির ওপর জাতীয় নীতি হিসাবে সুদৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃতকার্য হয়, তবে আমাদের পার্টি বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে :

(১) জাতীয় সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বারা উৎখাতের নীতি দেশব্যাপী বন্ধ থাকবে ;

(২) শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক সরকারের নাম পাল্টে চীন প্রজাতন্ত্রের বিশেষ অঞ্চলের সরকার বলে অভিহিত করা হবে, লালফৌজ জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে, এবং তারা যথাক্রমে নানকিং সরকার এবং তার সামরিক পরিষদের নির্দেশাধীনে থাকবে ;

(৩) সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশেষ অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতেও প্রবর্তন করা হবে ; এবং

(৪) জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণের নীতি বন্ধ থাকবে; এবং জাপবিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সংযুক্ত কর্মসূচী সুদৃঢ়ভাবে কার্যকরী করা হবে।

৮। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে সাংহাইতে ছাব্বিশটি জাপানী ও চীনা মালিকানার অধীনস্থ সুতাকলে ৪৫,০০০ শ্রমিকের এক বিরাট ধর্মঘট হয়। ডিসেম্বর মাসে সিংটাওয়ের সমস্ত জাপ-মালিকানার সুতাকলগুলির সমস্ত শ্রমিক সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট করেন। সাংহাই শ্রমিকরা ধর্মঘটে জয়লাভ করেন, এবং নভেম্বর মাস থেকে তাঁদের মজুরী শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং মালিকরা শ্রমিকদের খেয়ালখুশী মতো ছাঁটাই করবে না বা গালাগাল বা মারধোর করবে না, এই শর্ত মেনে নেয়। কিন্তু জাপানী নৌবাহিনী সিংটাওয়ের ধর্মঘটকে অবদমিত করে।

৯। বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা শুরু করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সানহাইকুয়ান দখল ও ১৯৩৩ সালে উত্তর চীনে অনুপ্রবেশের পর, এবং বিশেষ করে ১৯৩৫ সালে হো-উমেজু চুক্তি' স্বাক্ষরের পর (১নং টীকা দ্রষ্টব্য)—যে চুক্তি সরাসরিভাবে উত্তর ও মধ্য চীনে এদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৯৩৬ সালে সিয়ান ঘটনার সময়ে বৃটেন চীনে বৃটিশ-স্বার্থহানিকর জাপানী দাবি প্রত্যাখ্যান করবার পরামর্শ দেয়, এবং এমনকি, এই বলে ভয়ও দেখায় যে, যদি চিয়াং কাই-শেক সরকার চীনা জনগণের ওপর তার শাসন চালিয়ে গিয়ে জাপানী আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য 'কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা' দরকার মনে করে, তবে সেটা খুব খারাপ কিছু হবে না।

১০। ১৯৩৬ সালের জুন মাসে কোয়াংসীর যুদ্ধবাজ লি সুং-জেন ও পাই চুং-সি এবং কোয়াংতুঙের যুদ্ধবাজ চেন চি-তাং 'জাপানকে প্রতিরোধ করবার এবং জাতিকে বাঁচাবার' অজুহাতে একযোগে চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা ঘোষণা করে। আগস্ট মাসে চিয়াং কাই-শেকের উৎকোচ এবং বিভক্ত করে রেখে শাসন করার নীতির ফলে তাদের বিরোধিতা বন্ধ হয়ে যায়।

১১। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে জাপবাহিনী এবং পুতুল বাহিনী সুইচুয়ান আক্রমণ আরম্ভ করে। নভেম্বর মাসে সেখানকার চীনা বাহিনী প্রতিরোধ আক্রমণ শুরু করে এবং দেশব্যাপী জনগণ তাদের এই যুদ্ধের সমর্থনে এক আন্দোলন শুরু করে।

১২। ১৯৩৫ সালে 'হো-উমেজু চুক্তির' পর জনগণের ক্রমবর্ধমান জাপ-বিরোধী মনোভাবের চাপে এবং জাপানের প্রতি বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের কঠোর মনোভাব গ্রহণের ফলে নানকিঙের কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের প্রতি দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করে। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সময় নেবার কৌশল গ্রহণ করে, ফলে এই আলোচনায় কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় না।

১৩। সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পরে ১৯৩৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এই সভাটি হয়েছিল

১৪। চীনের মহান লেখক লু সুনের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'আ কিউ-এর

সত্য কাহিনী'র নায়ক ছিলেন আ কিউ। বাস্তব জীবনে ব্যর্থতা এবং বিপর্যয়কে নৈতিক বা আত্মিক বিজয় বলে যাঁরা সান্ত্বনা পান, আ কিউ হচ্ছেন তাঁদেরই প্রতিরূপ।

১৫। চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে কমিউনিস্টরা সান ইয়াৎ-সেনএর কর্মসূচীর মূল বিষয়গুলির সঙ্গে ঐক্যমত হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। এর অর্থ এই নয় যে, কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া বা পেটি-বুর্জোয়া বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী অথবা ভাবধারা, যার প্রবক্তা ছিলেন সান ইয়াৎ-সেন, তা গ্রহণ করেছিল। চীনা সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে চীনের কমিউনিস্টদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী বা মতাদর্শগত ভাবধারা এবং জাতীয় ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সান ইয়াৎ-সেনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

১৬। ১৯২৪ সালে সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক পুনঃসংঠিত হবার পর কুওমিনতাঙ অনেকগুলি শ্রেণীর বিপ্লবী মৈত্রীতে পরিণত হয়, এবং ব্যক্তিগত-ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যেরাও তার সদস্য হন। ১৯২৭ সালের বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর কুওমিনতাঙ সমগ্র দেশ জুড়ে তথাকথিত এক 'পার্টি থেকে বিতাড়ন' অভিযান চালায়, এবং কমিউনিস্ট ও তার নিজের ভেতকার যে সমস্ত বামপন্থীরা ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন মহান নীতিকে প্রকৃতই সমর্থন করতেন, তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করে। তার পর থেকেই কুওমিনতাঙ পরিণত হয় বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টিতে।

১৭। ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সুবিধাবাদী নেতৃত্ব যে অবস্থার সৃষ্টি করে, এখানে তার কথাই বলা হচ্ছে।

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের জন্য কোটি কোটি জনগণের সমাবেশ ঘটাও

(মে ৭, ১৯৩৭)[১]

কমরেডগণ ! 'জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ' শীর্ষক আমি যে রিপোর্ট পেশ করেছি, তার ওপর গত কয়েকদিনের আলোচনায় আপনারা প্রায় সবাই একমত হয়েছেন। কয়েকজন কমরেড অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এই ভিন্ন মতগুলি যেহেতু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমার সমাপ্তিভাষণে অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা আগে আমি সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব।

শান্তির প্রশ্ন

প্রায় দু'বছর ধরে আমাদের পার্টি আভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের পর আমরা ঘোষণা করেছিলাম, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'শান্তির জন্য সংগ্রাম'-এর স্তর এবার শেষ হল, এবং নতুন কর্তব্য হচ্ছে 'শান্তিকে সুসংহত করা'। আমরা এ কথাও বলেছিলাম যে, এই নতুন কর্তব্যটি 'গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম'-এর সঙ্গে সংযুক্ত, অর্থাৎ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শান্তিকে সুসংহত করে তুলতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু কমরেডের মতে, আমাদের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা হয় বিপরীত মতে উপনীত হবেন, অথবা দুটোর মাঝে দোদুল্যমান থাকবেন। কেননা তাঁদের মতে, 'জাপান পিছু হটছে[১] এবং নানকিং আগের চেয়েও বেশি দোদুল্যমান মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে—এই দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা হ্রাস পাচ্ছে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠছে।' স্বভাবতঃই, এই মূল্যায়ন অনুসারে, নতুন কোন স্তরের বা কর্তব্যের সৃষ্টি হয়নি, এবং পরিস্থিতিটি আবার আগের স্তরেই ফিরে গেছে, বা এমনকি তার চেয়েও খারাপ হয়ে পড়েছে। আমার মনে হয়, এই অভিমত ঠিক নয়।

---

[১] ১৯৩৭ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে এটি ছিল কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণ

শান্তি এসেছে বলা মানে এই নয় যে, শান্তির সংহতি সাধন হয়েছে। বরং উল্টোটাই, অর্থাৎ শান্তির সংহতি সাধন হয়নি। শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তির সংহতি সাধন—দুটো কিন্তু ভিন্ন জিনিস। কিছু সময়ের জন্যে ইতিহাসের দিক-পরিবর্তন ঘটতে পারে, এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক দল ও জাপ-সমর্থক চক্রের অবস্থানের জন্য শান্তির বিঘ্নও ঘটতে পারে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে, সিয়ান ঘটনার পর শান্তি এসেছে এবং তা কয়েকটি ঘটনার ফলশ্রুতি (জাপানের মূল হানাদারী নীতি, চীনের আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং তাছাড়া ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের অনুকূল মনোভাব, চীনের জনগণের চাপ, সিয়ান ঘটনার সময়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শান্তি নীতি ও দুটি শাসন-ব্যবস্থার মধ্যের বিরোধ মিটিয়ে নেবার নীতি, বুর্জোয়াদের মধ্যেকার বিভেদ, কুওমিনতাঙের মধ্যেকার বিভেদ প্রভৃতি); শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বা তা বিঘ্নিত করা চিয়াং কাই-শেকের একক ক্ষমতা দ্বারা আর সম্ভব নয়। শান্তি বিঘ্নিত করতে হলে তাকে বহু শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তাকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও জাপ সমর্থক চক্রের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে হবে। নিঃসন্দেহে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও জাপ-সমর্থক চক্রের আপ্রাণ প্রচেষ্টাই হচ্ছে চীনের গৃহযুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করা। এই মূল কারণটির জন্যেই এখানে শান্তি সংহত হচ্ছে না। এই যখন অবস্থা, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে 'গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর' এবং 'শান্তির জন্য সংগ্রাম কর' এই পুরানো শ্লোগানে ফিরে না গিয়ে আমাদের এক ধাপ এগিয়ে নতুন শ্লোগান দেওয়া উচিত—'গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম কর'। কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তির সংহতি সাধন ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে আসার এটাই হল একমাত্র পথ। পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত তিনটি শ্লোগান—'শান্তিকে সংহত কর', 'গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম কর', এবং 'সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাও'—কেন আমরা দিচ্ছি? উত্তরটি হচ্ছে এই যে, আমরা চাইছি বিপ্লবের চাকাকে ঠেলে এগিয়ে নিতে এবং পরিস্থিতিও আমাদের তাই করতে দিচ্ছে। নতুন পর্যায় ও নতুন কর্তব্যকে যাঁরা অস্বীকার করতে চাইছেন, কুওমিনতাঙের 'পরিবর্তন শুরু হওয়া'-কে যাঁরা অস্বীকার করতে চাইছেন, তাঁরা কিন্তু সেই একই যুক্তিতে বিগত দেড় বৎসর ধরে বিভিন্ন শক্তি কর্তৃক শান্তির জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ফলকেই অস্বীকার করছেন, তাঁরা আগে যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে যাবেন, তারা এক ইঞ্চিও এগোতে পারবেন না।

এই কমরেডরা এরকম অযৌক্তিক মূল্যায়ন কেন করছেন? কারণ, বর্তমান পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণে তাঁরা মূল বিষয়টিকে বিশ্লেষণের সূত্র হিসেবে না ধরে কতকগুলি সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী ঘটনাকে (সাটোর কূটনীতি, সুচৌ-এর বিচার,[২] ধর্মঘট দমন, উত্তর-পূর্ব বাহিনীকে[৩] পূর্বদিকে সরিয়ে নেওয়া, জেনারেল ইয়াং হু-চেঙের বিদেশ গমন[৪] প্রভৃতি) সূত্র হিসেবে ধরেন। এর ফলেই এই হতাশার ছবি। আমরা বলছি, কুওমিনতাঙের পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং আমরা আরও বলছি, পুরোপুরি পরিবর্তন হয়নি। আমাদের পক্ষ থেকে এবং জনগণের পক্ষ থেকে নতুন চেষ্টা ছাড়া, আরও বিরাট ও কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া কুওমিনতাঙের বিগত দশ বছরের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পরিবর্তন সাধিত হবে এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। যাঁরা প্রায়ই অত্যন্ত কঠোরভাবে কুওমিনতাঙকে নিন্দা করেন, সিয়ান ঘটনার সময়ে যাঁরা চিয়াংকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলেছিলেন এবং 'টুং কুয়ানের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করে আমাদের পথ করে নেওয়ার'[৫] কথা বলেছিলেন, সেই বেশ কিছু সংখ্যক নামজাদা 'বামপন্থী' ব্যক্তিবৃন্দ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই সুচৌ বিচারের মতো ঘটনা ঘটায় অত্যন্ত অবাক হয়েছেন এবং তাঁরা জানতে চাইছেন 'কেন চিয়াং কাই-শেক এখনো এই ধরনের কাজকর্ম করছেন?' তাঁদের বোঝা উচিত, কমিউনিস্টরা বা চিয়াং কাই-শেক—এঁদের কেউই ভগবান নন বা তাঁরা বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি নন, তাঁরা একটি পার্টি বা একটি শ্রেণীর সদস্য। কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দেশের সমস্ত আবর্জনা এক রাত্রির মধ্যে পরিষ্কার করতে পারে না। চিয়াং কাই-শেক এবং কুওমিনতাঙের পরিবর্তন শুরু হয়েছে মাত্র, কিন্তু বিগত দশ বছর ধরে যেসব আবর্জনা জমা হয়েছে, সুনিশ্চিতভাবেই তা সমগ্র জনগণের পক্ষ থেকে কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া দ্রুত অপসারিত হতে পারে না। আমরা মনে করি, প্রবণতাটি শান্তি, গণতন্ত্র ও প্রতিরোধের দিকেই আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পুরানো আবর্জনা—গৃহযুদ্ধ, একনায়কত্ব এবং প্রতিরোধ না করা—কোনরকম কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়াই দূর করা সম্ভব হবে। কেবলমাত্র সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম এবং সুকঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই আমরা পুরানো আবর্জনা ও পুরানো পঙ্কিলতা দূর করতে পারি এবং অবস্থার অবনতি, এমনকি বিপ্লবের বিপর্যয়কেও ঠেকাতে পারি।

'তারা আমাদের ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর।' কথাটি খুবই সত্য,

তারা সব সময়ই আমাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে। আমি এই সুযুক্তিপূর্ণ মূল্যায়ণের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, এবং বাস্তবিকপক্ষে এই দিকটির প্রতি নজর না দেওয়ার অর্থ গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে থাকা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা যে আমাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে, তার পদ্ধতিগত কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি? আমি মনে করি, পরিবর্তন ঘটেছে। যুদ্ধ এবং নির্বিচার হত্যা থেকে সংস্কার ও প্রতারণা, কঠোর নীতি থেকে নরম নীতি এবং সামরিক নীতি থেকে রাজনৈতিক নীতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। কেন এই পরিবর্তন হয়েছে? আমরা যেমন বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি, ঠিক একইভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হয়ে বুর্জোযারা এবং কুওমিনতাঙও সাময়িকভাবে বাধ্য হয়েছে সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে। সমস্যাটির বিচার-বিশ্লেষণের সময় এটিই আমাদের প্রাথমিক সূত্র হওয়া উচিত। ঠিক একই কারণে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফরাসী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শত্রুতা ত্যাগ করে মিত্রতা করেছে।[৬] আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপও সামরিক ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের দিক থেকে ষড়যন্ত্র বা ফন্দী আঁটার প্রয়োজন নেই, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বুর্জোয়া ও কুওমিনতাঙের যে অংশ প্রতিরোধের সপক্ষে, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা।

গণতন্ত্রের প্রশ্ন

'গণতন্ত্রের ওপর জোর দেওয়া ভুল, জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া সম্পূর্ণ জোর দিতে হবে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া গণতন্ত্রের কোন আন্দোলনই হতে পারে না। অধিকাংশ লোক কেবল জাপানকেই রুখতে চায়, গণতন্ত্র চায় না, এবং আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে আর একটি ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন।'[৭]

আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব। এর আগের স্তরে (অর্থাৎ ১৯৩৫ এর ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে '৯৩৭ এর ফেব্রুয়ারী মাসে কুওমিন-তাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন পর্যন্ত) অধিকাংশ লোকই কি শুধু জাপানকে প্রতিরোধ করতেই চেয়েছিল? তারা কি অভ্যন্তরীণ শান্তি চায়নি? তখন কি অভ্যন্তরীণ শান্তির ওপর জোর দেওয়া ভুল হয়েছিল? জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া কি অভ্যন্তরীণ শান্তির

আন্দোলন করা অসম্ভব হয়েছিল? (সুইচুয়ানের প্রতিরোধ সমাপ্তির পরই সিয়ান ঘটনা ঘটে এবং কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন হয়, এবং বর্তমানেও সুইচুয়ান প্রতিরোধ বা ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলনের মতো কিছুরই অস্তিত্ব নেই।) প্রত্যেকেই জানত, জাপানকে প্রতিরোধ করতে হলে আভ্যন্তরীণ শান্তির অবশ্যই প্রয়োজন, আভ্যন্তরীণ শান্তি ছাড়া জাপানকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার এক শর্ত হচ্ছে আভ্যন্তরীণ শান্তি। আগের স্তরের সমস্ত জাপ-বিরোধী কার্যকলাপে—সে প্রত্যক্ষই হোক আর পরোক্ষই হোক—(৯ই ডিসেম্বর আন্দোলন থেকে শুরু করে কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন পর্যন্ত) আভ্যন্তরীণ শান্তির সংগ্রামকে কেন্দ্রীয় কর্তব্য বলে ধরা হয়েছিল এবং তাই ছিল কেন্দ্রবিন্দু, জাপ-বিরোধী আন্দোলনের সবচাইতে দরকারী বিষয়।

একইভাবে আজ, নতুন স্তরে, জাপানকে প্রতিরোধের জন্য গণতন্ত্র হচ্ছে সবচাইতে প্রয়োজনীয় জিনিস, এবং গণতন্ত্রের জন্য কাজ করার অর্থই হচ্ছে জাপানকে প্রতিরোধের জন্য কাজ করা। প্রতিরোধ আর গণতন্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল, যেমন পরস্পর নির্ভরশীল প্রতিরোধ আর আভ্যন্তরীণ শান্তি এবং গণতন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ শান্তি। গণতন্ত্রই হচ্ছে প্রতিরোধের গ্যারান্টি, আবার প্রতিরোধই পারে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনকে বিকশিত করবার প্রয়োজনীয় অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে।

আমরা আশা করছি, এই নতুন স্তরে জাপানের বিরুদ্ধে বহু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংগ্রামের সম্ভাবনা দেখা দেবে—বাস্তবিকপক্ষে তা হবেও—এবং এগুলিই প্রতিরোধ-যুদ্ধকে উদ্দীপনা দেবে এবং গণতন্ত্রের আন্দোলনকে বিরাটভাবে সাহায্য করবে। কিন্তু ইতিহাস যে বিপ্লবী দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করেছে, তার মর্মবস্তু ও সারকথা হচ্ছে গণতন্ত্র অর্জন করা। তাহলে গণতন্ত্রের উপর জোর দিতে থাকা কি ভুল? আমি তা মনে করি না।

'জাপান পিছু হটে যাচ্ছে। বৃটেন ও জাপান কার্যত: একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঝুঁকে পড়েছে এবং নানকিং আগের চাইতে অনেক বেশি দোদুল্যমান।' ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই অহেতুক উৎকণ্ঠার কারণ। যদি জাপানে একটি বিপ্লব হতো এবং সত্যিসত্যিই চীন থেকে সরে যেত, তাহলে সে চীন-বিপ্লবকে সাহায্যই করত এবং আমরা যা

চাই ঠিক তাই হতো, আগ্রাসনের বিশ্বফ্রন্টের ধ্বংসের সূচনা হতো। তাহলে আর কোন উৎকণ্ঠার অবকাশ থাকত কি? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, এরকম কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না। সাটোর কূটনৈতিক চালগুলি, হচ্ছে একটা বড় রকমের যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রস্তাবনা মাত্র, এবং আমরা একটি বড় রকমের যুদ্ধেরই সম্মুখীন হতে যাচ্ছি। বৃটেনের দোদুল্যমানতার নীতি তার কোন কাজেই আসছে না, বরং জাপানের সঙ্গে তার স্বার্থের সংঘর্ষই সুনিশ্চিত করে তুলেছে। যদি নানকিং বেশিদিন টালবাহানা করে, তবে সে সমগ্র জাতির শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, এবং তার নিজস্ব স্বার্থই তাকে আর টালবাহানা করতে দেবে না। একটা সাময়িক পিছু-হটা ইতিহাসের সাধারণ নিয়মকে পাল্টে দিতে পারে না। তাই নতুন স্তরের অস্তিত্বকে বা কর্তব্য হিসেবে গণতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করাকে কারও অস্বীকার করা উচিত নয়। উপরন্তু সব সময়েই গণতন্ত্রের শ্লোগানটি যথোপযোগী, কারণ এটি প্রতিটি লোকের কাছেই সুস্পষ্ট যে, চীনা জনগণের অতি সামান্যই গণতন্ত্র আছে, যাকে বিশেষ নেই বললেই হয়। প্রকৃত ঘটনাবলী এও দেখিয়েছে যে, নতুন স্তরের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা এবং গণতন্ত্রের লক্ষ্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করার অর্থই হচ্ছে প্রতিরোধের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। ঘটনা এগিয়ে গিয়েছে, আমরা যেন ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে না দিই!

'আমরা জাতীয় পরিষদের ওপর কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছি?' কারণ, এ এমন একটা জিনিস যা জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করতে পারে, কারণ এটাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্ব থেকে গণতন্ত্রে পৌছাবার সেতু, কারণ এ হচ্ছে জাতীয় প্রতিরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং একটি আইনসম্মত সংস্থা। অনেক কমরেড যে প্রস্তাব করেছেন, যেমন পূর্ব হোপেই এবং উত্তর চাহার পুনরুদ্ধার করা, চোরা-চালানের[৮] বিরুদ্ধে লড়াই করা, 'অর্থনৈতিক সহযোগিতার'[৯] বিরোধিতা ইত্যাদি, এগুলি অত্যন্ত সঠিক। গণতন্ত্র এবং জাতীয় পরিষদের জন্য লড়াই করার সঙ্গে এগুলির কোনরকম বিরোধিতা তো নেইই, বরং এরা পরস্পরের সম্পূরক। এখনো জাতীয় পরিষদ এবং জনগণের স্বাধীনতাই হচ্ছে আসল কথা।

জাপানের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন লড়াই এবং জীবিকার জন্য জনগণের সংগ্রামকে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে—এ কথা সঠিক এবং কেউই তার বিরোধিতা করতে পারে না। তবুও বর্তমান পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ও মূল ব্যাপার হচ্ছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা।

বিপ্লবের ভবিষ্যৎ

কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্নটি তুলেছেন এবং আমি তার সংক্ষিপ্ত উত্তরই মাত্র এখানে দিতে পারি।

একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, প্রবন্ধের প্রথমার্ধ লেখা শেষ হবার পরেই কেবল দ্বিতীয়ার্ধ লেখা সম্ভব। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য দৃঢ়চিত্ত নেতৃত্বই হচ্ছে সমাজ-তন্ত্রের বিজয়ের পূর্বশর্ত। আমরা সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি, এবং যাঁরা বিপ্লবী তিন নীতির মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন, তাঁদের সঙ্গে এই বিষয়েই আমাদের পার্থক্য রয়েছে। এই ভবিষ্যৎ মহান লক্ষ্যের দিকেই আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা পরিচালিত। এই লক্ষ্য যদি আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে অপসারিত হয়, তাহলে আমরা আর কমিউনিস্ট থাকি না। আবার, আমরা যদি আজকের কাজে গাফিলতি করি তাহলেও আমরা আর কমিউনিস্ট থাকি না।

আমরা বিপ্লবের উত্তরণের তত্ত্বের[১০] প্রবক্তা এবং আমরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে চাই। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লোগানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিকশিত হবে। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রাধান্য থেকে সর্বহারাশ্রেণীর প্রাধান্যে পরিবর্তন একটা দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হতে পারে। নেতৃত্বের জন্যে এই সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক চেতনার স্তরকে এবং সংগঠনকে উন্নীত করবার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ওপর।

সর্বহারাশ্রেণীর সবচাইতে দৃঢ়চিত্ত মিত্র হচ্ছে কৃষকেরা এবং তার পরেই শহরের পেটি-বুর্জোয়ারা। একমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীই নেতৃত্বের জন্য আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর দোদুল্যমানতা এবং তাদের পরিপূর্ণ বৈপ্লবিক নিষ্ঠার অভাবকে জয় করবার জন্য আমাদের আস্থা রাখতে হবে জনগণের শক্তির ওপর এবং আমাদের নীতির অভ্রান্ততার ওপর, অন্যথায় বুর্জোয়াশ্রেণীই নেতৃত্ব দখল করে নেবে।

একটি রক্তপাতহীন উত্তরণই আমাদের বাঞ্ছনীয় এবং তার জন্যেই আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব, কিন্তু কি অবস্থা দাঁড়াবে তা নির্ভর করবে জনগণের শক্তির ওপর।

আমরা বিপ্লবের উত্তরণের তত্ত্বের প্রবক্তা, ট্রটস্কিপন্থীদের 'স্থায়ী বিপ্লবের'[১১] তত্ত্বের প্রবক্তা নই। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত প্রয়োজনীয় স্তরগুলি অতিক্রম করবার মধ্য দিয়েই আমরা সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে চাই। আমরা লেজুড়বৃত্তির বিরোধী, এবং একই সঙ্গে হঠকারিতা এবং অধৈর্যপনারও বিরোধী।

বুর্জোয়াদের বিপ্লবে অংশগ্রহণ স্বল্পস্থায়ী, এই অজুহাতে তাদের বিপ্লবে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করা, এবং বুর্জোয়াদের যে অংশ জাপ-বিরোধী (একটা আধা-ঔপনিবেশিক দেশে) তাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনকে আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করাটা হচ্ছে ট্রটস্কিপন্থী ব্যাখ্যা, যার সঙ্গে আমরা একমত নই। বস্তুতপক্ষে আজকের দিনে এরূপ একটি মৈত্রী সমাজতন্ত্রের পথে একটি আবশ্যকীয় সেতু।

কর্মীদের প্রশ্ন

একটি মহান বিপ্লবকে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন একটি মহান পার্টির এবং অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর কর্মীর। যদি বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকে একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ গ্রুপ, এবং যদি পার্টি-নেতারা এবং কর্মীরা হন সংকীর্ণমনা, অদূরদর্শী এবং অযোগ্য তাহলে ৪৫ কোটি লোকের চীনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই বিরাট বিপ্লবকে সার্থক করে তোলা অসম্ভব। দীর্ঘদিন ধরেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টি একটি বড় পার্টি, এবং প্রতিক্রিয়ার যুগে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও এখনও এটি একটি বড় পার্টি। এ পার্টির অনেক ভাল ভাল নেতা এবং কর্মী আছে, কিন্তু তবুও তা যথেষ্ট নয়। আমাদের পার্টি-সংগঠনকে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত করতেই হবে এবং অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলকভাবে হাজারে হাজারে কর্মী এবং প্রথম শ্রেণীর নেতাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদে সুশিক্ষিত, রাজনৈতিকভাবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, কাজে উপযুক্ত, আত্মত্যাগে পরিপূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ, নিজে নিজেই সমস্যার মোকাবেলায় সমর্থ, বিপদে ধীর ও স্থির, এবং দেশ, শ্রেণী ও পার্টির কাজে অনুরক্ত ও আসক্ত হতে হবে। সাধারণ সদস্য ও জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কাজে পার্টি এই ধরনের কর্মী এবং নেতাদের ওপরেই ভরসা করে এবং জনগণের ওপর তাদের সুদৃঢ় নেতৃত্বের ওপর ভরসা করেই পার্টি শত্রুকে পরাজিত করতে পারে। এসব কর্মী এবং নেতাদের অবশ্যই স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বীরপনা, হামবড়াভাব,

কুঁড়েমি, নিষ্ক্রিয়তা, এবং সংকীর্ণমনা ঔদ্ধত্য থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং তাদের অবশ্যই নিঃস্বার্থভাবে জাতয়া ও শ্রেণী-নায়ক হতে হবে। আমাদের পার্টির সদস্য, কর্মী এবং নেতাদের কাছে এরকম গুণ ও কাজের পদ্ধতিই পার্টি দাবি করে। যে শত শত প্রথম শ্রেণীর নেতা, লক্ষ লক্ষ সদস্য এবং হাজারে হাজারের কর্মী আমাদের আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁরা আমাদের জন্য এই চেতনাগত উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ সমস্ত গুণ আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন। নতুনভাবে যাতে আমরা আমাদের গড়ে তুলতে পারি তার জন্য আমাদের আরও ভালভাবে কাজ করা দরকার এবং আমাদের নিজেদের বৈপ্লবিক মানকে আরও উন্নীত করা দরকার। এটাও কিন্তু যথেষ্ট নয়। পার্টি ও দেশের মধ্য থেকে অনেক নতুন নতুন কর্মী ও নেতা আবিষ্কার করা আমাদের একটা অবশ্যকর্তব্য হিসেবে মনে রাখতে হবে। আমাদের বিপ্লব নির্ভর করে কর্মীদের ওপর। যেমন স্তালিন বলেছেন, 'কর্মীরাই সবকিছু নির্ধারণ করে'।[১২]

পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের প্রশ্ন

এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র একান্ত প্রয়োজনীয়। পার্টিকে যদি শক্তিশালী করে তুলতে হয়, তবে সমস্ত সদস্যদের মধ্যে উদ্যোগ সঞ্চারের জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। গৃহযুদ্ধ ও প্রতিক্রিয়ার যুগে কেন্দ্রিকতাই ছিল বেশি। নতুন যুগে কেন্দ্রিকতাকে ঘনিষ্ঠ-ভাবে গণতন্ত্রের সঙ্গে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। আসুন, আমরা গণতন্ত্রের প্রয়োগ করি এবং সমগ্র পার্টির মধ্যে উদ্যোগের সুযোগ করে দিই, এবং এইভাবে বিপুল সংখ্যায় নতুন কর্মীদের শিক্ষিত করে তুলি, সংকীর্ণতা-বাদের অবশেষকে অপসারণ করি এবং সমগ্র পার্টিকে ইস্পাত-দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করি।

সম্মেলনে এবং সমগ্র পার্টিতে ঐক্য

রাজনৈতিক সমস্যাবলীর ওপর এই সম্মেলনে যেসব ভিন্ন মত রাখা হয়েছিল, বিশ্লেষণের পর তাতে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন এবং কয়েকজন কমরেডের নেতৃত্বে পশ্চাদপসরণের যে লাইন গৃহীত হয়েছিল, সেই আগেকার মতপার্থক্যেরও সমাধান হয়েছে[১৩]। এ থেকে প্রমাণিত

হচ্ছে যে, আমাদের পার্টি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্য বর্তমান জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি সৃষ্টি করেছে, কারণ কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের মাধ্যমেই সব কয়টি শ্রেণী ও সমগ্র জাতির ঐক্য সাধিত হতে পারে, শত্রুকে পরাজিত করা যেতে পারে, এবং জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা যেতে পারে।

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের জন্য কোটি কোটি জনগনের সমাবেশ ঘটাও

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে কোটি কোটি জনগণকে টেনে আনাটাই হচ্ছে আমাদের নির্ভুল রাজনৈতিক নীতি ও ঘনিষ্ঠ ঐক্যের লক্ষ্য। সর্বহারা, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়া ব্যাপক জনতার মধ্যে আমাদের প্রচার, আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। বুর্জোয়াদের যে অংশ জাপ-বিরোধী, তাদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যও আমাদের তরফ থেকে আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। পার্টির নীতিকে জনগণের নীতিতে পরিণত করতে হলে প্রচেষ্টা প্রয়োজন,—দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টা, নিরবচ্ছিন্ন এবং সুতীব্র প্রচেষ্টা, ধৈর্যশীল ও যত্নশীল প্রচেষ্টা। এরকম প্রচেষ্টা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারব না। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট ও তার সংহতি সাধন, সেজন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করা ও চীনে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণকে জয় করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা—এ দুটি কাজ একেবারে অবিচ্ছেদ্য। এরকম প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা যদি কোটি কোটি জনগণকে আমাদের নেতৃত্বাধীনে আনতে সমর্থ হই, তবে আমাদের বৈপ্লবিক দায়িত্ব অতি দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সুনিশ্চিতভাবেই জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করব এবং পরিপূর্ণ জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি অর্জন করব।

টীকা

১। সিয়ান ঘটনার পর, যে আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তা বানচাল করে দেবার জন্য এবং যে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গড়ে উঠছিল তা ভেঙে দেবার জন্য, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষের

সামনে সামরিক আপোষের টোপ ফেলে। তাদের তাঁবেদার অন্তর্মঙ্গোলিয়ার ভুয়া স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে দিয়ে নানকিঙের কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে দুটি বিবৃতি প্রচার করানো হয়—একটি ১৯৩৬এর ডিসেম্বরে, আরেকটি ১৯৩৭এর মার্চে। আর জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাটো নিজে প্রকাশ্যেই চিয়াং কাই-শেকের প্রশংসা করে অসম্ভব ধূর্ততার সঙ্গে ঘোষণা করে যে, জাপান চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করবে, এবং চীনের রাজনৈতিক ঐক্যসাধন ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করবে। তাছাড়া, জাপানী পুঁজিপতি কেন্‌জি কোডামার নেতৃত্বে জাপান একটি তথাকথিত অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ দলকে চীনে পাঠায়, চীনের 'আধুনিক রাষ্ট্র-সংগঠনকে সম্পূর্ণ' করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। এগুলি ছিল আগ্রাসী পরিকল্পনা, এবং এগুলো 'সাটোর কূটনীতি' নামে পরিচিত হয়েছিল। জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ছলনায় প্রতারিত লোকেরাই কেবল এগুলোকে 'জাপানের পশ্চাদপসরণ' বলে আখ্যা দিয়েছিল।

২। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে জাপানকে প্রতিরোধ কর এবং দেশকে বাঁচাও আন্দোলনের নেতা শেন চুন-জু এবং আরও ছয় জন নেতার বিচার হয় সুচাও-এর কুওমিনতাঙ হাইকোর্টে। এঁরা ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে সাংহাইতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 'প্রজাতন্ত্রকে বিপদগ্রস্ত করা'। প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের দেশ-প্রেমিক আন্দোলনকে দমন করবার জন্য এই ধরনের অভিযোগ তুরুপের তাস হিসেবে সাধারণভাবে প্রয়োগ করত।

৩। সিয়ান ঘটনার আগে উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনীকে শেনসী এবং কানসু প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চলে রাখা হয়েছিল এবং উত্তর শেনসীর লালফৌজের সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ফলে লালফৌজ দ্বারা বিপুলভাবে তারা প্রভাবান্বিত হয়। পরবর্তীকালে এই বাহিনী সিয়ানে এক অভ্যুত্থান ঘটায়। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে এই উত্তর-পূর্ব সেনাবাহীকে হোনান এবং আনহুই প্রদেশে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। লালফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে এবং এই বাহিনীর মধ্যে অনৈক্যর বীজ বপন করবার উদ্দেশ্যেই কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

৪। জেনারেল ইয়ং হু-চো ছিলেন চীনের উত্তর-পশ্চিমের একজন

সামরিক নেতা। তিনি চ্যাং শুয়ে-লিয়াঙের সঙ্গে একযোগে সিয়ান ঘটনা ঘটান। কাজেই এই ঘটনার প্রধান পরিচালক দু'জনের দুই পদবী দিয়ে 'চ্যাঙ-ইয়াং' কথাটি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। চিয়াং কাই-শেককে মুক্ত করে দেওয়ার পর চ্যাং তার সঙ্গে নানকিঙে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে তক্ষুণি সেখানে আটক রাখা হয়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে নানকিঙ-প্রতিক্রিয়াশীলেরা ইয়ংকেও তাঁর পদ থেকে অপসারিত করে এবং তাঁকে ছুটি নিয়ে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য করে। প্রতিরোধ যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইয়ং চীনে ফিরে আসেন এবং তাঁকে কাজে লাগাবার আবেদন জানান। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক তাঁকে সারা জীবনের জন্য অন্তরীণ করে রাখে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণমুক্তি ফৌজ যখন চুংকিং-এর পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন কুওমিনতাঙ দল তাঁকে বন্দীশিবিরের মধ্যে হত্যা করায়।

৫। টুং কুয়ান হচ্ছে শেনসী, হোনান এবং শানসীর সীমান্তের সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ-পথ। সিয়ান ঘটনার সময় কুওমিনতাঙ সেনা-বাহিনী প্রধানতঃ এই প্রবেশদ্বারের পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। পার্টির মধ্যে চেং কুও-তাও'র মতো জনাকয়েক প্রখ্যাত 'বামপন্থী' ব্যক্তি লালফৌজকে 'টুং কুয়ানের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করে বেরিয়ে যাওয়ার' জন্য প্রস্তাব করে। তার অর্থ হল: কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লালফৌজ আক্রমণ সংগঠিত করুক। সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধানের যে নীতি কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করেছিল, এ প্রস্তাব ছিল তার বিরোধী।

৬। অক্টোবর বিপ্লবের পর দীর্ঘকাল ধরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক নীতি অনুসরণ করে এসেছে। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চোদ্দটি শক্তি যে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছিল, তাতে ফরাসী সরকার সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং এই আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পরেও তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে একঘরে করে রাখার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে চলে। ১৯৩৫ সালের মে মাসে ফরাসী জনগণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তি-নীতির প্রভাবের ফলে এবং জার্মান ফ্যাসিষ্টদের দ্বারা ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কার ফলে ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের এক চুক্তি করে—যদিও তার প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এ চুক্তি পালন করেনি।

৭। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর পিকিঙে

দেশপ্রেমিক ছাত্রদের বিক্ষোভ। এই আন্দোলন গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের দাবি তোলে এবং দেশব্যাপী সমর্থন লাভ করে।

৮। চীনে জাপানী পণ্যের চোরা-চালান।

৯। চীন-জাপান অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা এখানে বলা হয়েছে।

১০। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার', চতুর্থ খণ্ড; ভি. আই. লেনিনের 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সামাজিক গণতন্ত্রের দুই কৌশল', দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ খণ্ড; 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', তৃতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১। জে. ভি. স্তালিন, 'লেনিনবাদের ভিত্তি', ৩য় খণ্ড; 'অক্টোবর বিপ্লব এবং রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল', দ্বিতীয় খণ্ড; 'লেনিনবাদের প্রশ্ন সম্পর্কে', তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১২। দ্রষ্টব্য: জে. ভি. স্তালিন—'লালফৌজ এ্যাকাডেমির স্নাতকদের প্রতি ক্রেমলিন প্রাসাদে প্রদত্ত বক্তৃতা', মে, ১৯৩৫। এই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন,'...দুনিয়ার সবচেয়ে দামী সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে দামী ও সবচেয়ে নির্ধারক হচ্ছে জনগণ ও কর্মীরা। এটা আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে "কর্মীরাই সবকিছু নির্ধারণ করে"।'

১৩। মতানৈক্যটা ছিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে চ্যাং কুও-তাও'র পশ্চাদপসরণের লাইনের মধ্যে। এই খণ্ডের 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে, প্রবন্ধের ২২ নং টীকা দ্রষ্টব্য। 'আগেকার মতপার্থক্যেরও সমাধান হয়েছে'—একথা বলে কমরেড মাও সে-তুঙ লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী কর্তৃক কেন্দ্রীয় লালফৌজে যোগ দেবার ঘটনাকে বোঝাচ্ছেন। পরবর্তীকালে চ্যাং কুও-তাও পার্টির প্রতি খোলাখুলি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে এবং একজন প্রতিবিপ্লবীতে অধঃপতিত হয়। এভাবে সে ব্যক্তিগতভাবে একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়, এবং তখন থেকে আর পার্টিলাইনের সঙ্গে তার মতপার্থক্যের কথা ওঠেনি।

প্রয়োগ সম্পর্কে

জ্ঞান ও প্রয়োগের মধ্যে, জানা ও করার মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে

(জুলাই, ১৯৩৭)

মার্কসের আগে বস্তুবাদ মানুষের সামাজিক প্রকৃতি এবং তার ঐতিহাসিক বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানের সমস্যাকে বিচার করত। এই কারণে ঐ বস্তুবাদ সামাজিক প্রয়োগের ওপর জ্ঞানের নির্ভরশীলতা, অর্থাৎ উৎপাদন ও শ্রেণী-সংগ্রামের ওপর জ্ঞানের নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিল।

সর্বোপরি, মার্কসবাদীরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের কার্যকলাপকেই সবচেয়ে মূল বাস্তব কার্যকলাপ বলে এবং তার অন্যান্য সকল কার্যকলাপের নির্ধারক বলে মনে করে। মানুষের জ্ঞান প্রধানতঃ তার বৈষয়িক উৎপাদনের কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে, এবং এই কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই সে ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির ঘটনা, বৈশিষ্ট্য ও নিয়মগুলিকে এবং তার নিজের ও প্রাকৃতির

আমাদের পার্টির মধ্যে কিছু কিছু মতান্ধ কমরেড ছিলেন, যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ চীনা বিপ্লবের অভিজ্ঞতা বর্জন করেছিলেন। এঁরা এই সত্যকে অস্বীকার করতেন যে 'মার্কসবাদ একটা অন্ধ মতবাদ নয় বরং কাজের পথনির্দেশক'। তাঁরা মার্কসীয় রচনাবলীর এখান-সেখান থেকে খুশীমতো প্রেক্ষাপটহীন টুকরো উদ্ধৃতি সাজিয়ে মানুষকে ধাপ্পা দিতেন। আবার কিছু অভিজ্ঞতাবাদী কমরেডও ছিলেন যাঁরা দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেদের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতেন এবং বিপ্লবী প্রয়োগের জন্য তত্ত্বের গুরুত্ব বুঝতেন না বিপ্লবকে সমগ্রভাবে দেখতেন না। এঁরা অধ্যবসায়ের সঙ্গে হলেও অন্ধের মতো কাজ করতেন। এই দুই ধরনের কমরেডদের ভুল চিন্তা, বিশেষ করে মতান্ধের ভুল চিন্তা, ১৯৩১-৩৪ সালের চীনা বিপ্লবের বিপুল ক্ষতিসাধন করে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই মতান্ধদের মার্কসবাদের নামাবলী গায়ে দিয়ে বহু সংখ্যক কমরেডকে বিভ্রান্ত করেন। কমরেড মাও-সে-তুঙ 'প্রয়োগ সম্পর্কে' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টিতে মতান্ধতা এবং অভিজ্ঞতাবাদের অধ্যাত্মবাদ ভুলগুলি এবং বিশেষ করে মতান্ধতার ভুলগুলি উদ্ঘাটিত করার জন্য। প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয় 'প্রয়োগ সম্পর্কে', কারণ মতান্ধরা প্রয়োগকে ছোট করে দেখে। আর ঐ মতান্ধতার অধ্যাত্মবাদ খুলে ধরার ওপর এই প্রবন্ধে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধটির বক্তব্যগুলো কমরেড মাও সে তুঙ ইয়েনানে জাপ-বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতায় উপস্থিত করেছিলেন।

মধ্যেকার সম্পর্ককে বুঝতে সক্ষম হয় এবং এই উৎপাদনী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সে ক্রমশঃ মানুষের সঙ্গে মানুষের নির্দিষ্ট সম্পর্কগুলিকেও বিভিন্ন পরিমাণে বুঝতে সক্ষম হয়। উৎপাদনের কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই জ্ঞান কিছুতেই অর্জিত হতে পারে না। শ্রেণীহীন সমাজে প্রত্যেক মানুষই সমাজের একজন সদস্য হিসেবে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সাধারণ প্রচেষ্টায় যোগ দেয়, নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কে প্রবেশ করে এবং মানবজাতির বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদন-কর্মে লিপ্ত হয়। আবার সকল রকমের শ্রেণীবিভক্ত সামাজেই বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর সদস্যরাও বিভিন্নভাবে নির্দিষ্ট উৎপাদক সম্পর্ক-গুলিতে প্রবেশ করে এবং মানবজাতির বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদন-কর্মে লিপ্ত হয়। এ-ই হচ্ছে মানুষের জ্ঞানবিকাশের মূল উৎস।

মানুষের সামাজিক অনুশীলন উৎপাদন-কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা গ্রহণ করে আরও আনেক রূপ—শ্রেণী-সংগ্রাম, রাজনৈতিক জীবন, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকলা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সামাজের বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। তাই মানুষ, কেবল তার বৈষয়িক জীবনের মধ্যে দিয়েই নয়, তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের (উভয়ই ঘনিষ্ঠভাবে বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে জড়িত) মধ্য দিয়েও বিভিন্ন পরিমাণে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারে। এইসব অন্যান্য ধরনের সামাজিক প্রয়োগের মধ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী-সংগ্রামই মানুষের জ্ঞানের বিকাশের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর সদস্য হিসেবে বাস করে, তাই ব্যতিক্রমহীনভাবে সব রকমের চিন্তাধারার উপরেই শ্রেণীর ছাপ থাকে।

মার্কসবাদীরা মনে করে যে, মানবসমাজে উৎপাদনের কার্যকলাপ নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে ধাপে ধাপে বিকাশলাভ করে। কাজেই প্রকৃতি সম্পর্কেই হোক অথবা সমাজ সম্পর্কেই হোক, মানুষের জ্ঞানও ধাপে ধাপে নিম্নতর থেকে উচ্চতর স্তরে বিকাশলাভ করে, অর্থাৎ অগভীর জ্ঞান থেকে গভীর জ্ঞানে, একমুখী জ্ঞান থেকে বহুমুখী জ্ঞানে বিকাশলাভ করে। ইতিহাসের একটা অত্যন্ত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষকে সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে একতরফা ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। কারণ, একদিকে যেমন শোষকশ্রেণীগুলির পক্ষপাতদুষ্ট মতামত সব সময়েই সামাজিক ইতিহাসকে বিকৃত করত, তেমনি অন্যদিকে ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদন-ব্যবস্থা মানুষের দৃষ্টিকে সীমিত করে রাখত।

উৎপাদনের বিরাট শক্তিগুলির (বৃহৎ শিল্পের) সঙ্গে আধুনিক সর্বহারাশ্রেণী আবির্ভূত হওয়ার পরেই কেবল মানুষ সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে সার্বিক ও ঐতিহাসিক ধারণা লাভ করতে এবং সমাজ স—র্কে নিজের জ্ঞানকে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয় একটি বিজ্ঞানে—মার্কসবাদের বিজ্ঞানে।

মার্কসবাদীরা মনে করে যে, মানুষের সামাজিক প্রয়োগই বহির্জগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের সঠিকতা যাচাই করার একমাত্র মাপকাঠি। আসলে যা ঘটে তা এই যে, মানুষ যখন সামাজিক প্রয়োগের প্রক্রিয়ার (বৈষয়িক উৎপাদন, শ্রেণী-সংগ্রাম অথবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়ার) মধ্যে তার প্রত্যাশিত ফললাভ করে, তখনই কেবল মানুষের জ্ঞানের সঠিকতা প্রমাণিত হয়। যদি কোন মানুষ কাজে সাফল্যলাভ করতে চায় অর্থাৎ প্রত্যাশিত ফল পেতে চায়, তহেলে তার নিজের চিন্তাকে অবশ্যই বিষয়গত বহির্জগতের নিয়মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তুলতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে সে প্রয়োগে ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হয়েই মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজের চিন্তাকে সংশোধন করে বহির্জগতের নিয়মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তোলে। তখন মানুষ তার বিফলতাকে সফলতায় পরিবর্তিত করতে পারে। 'বিফলতাই সফলতার জননী' এবং 'ঠেকে শেখা' বলতে এটাই বুঝায়। দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব প্রয়োগকে প্রথমে স্থান দেয়। এই তত্ত্ব মনে করে যে, মানুষের জ্ঞানকে তার প্রয়োগ থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেসব ভ্রান্ত মতবাদ প্রয়োগের গুরুত্বকে অস্বীকার করে অথবা জ্ঞানকে প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব সেইসব মতবাদের বিরোধী। তাই লেনিন বলেছিলেন, 'প্রয়োগ (তত্ত্বগত) জ্ঞানের চেয়ে অনেক বড়, কারণ তার যে শুধু সর্বজনীনতার গুণই আছে তাই নয়, তাতে আছে আশু বাস্তবতার গুণও।'[১] দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মার্কসবাদী দর্শনের দুটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। একটা হচ্ছে তার শ্রেণী-প্রকৃতি। তা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সর্বহারাশ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত। অপরটা হচ্ছে এর বাস্তব প্রকৃতি। এতে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় যে, তত্ত্ব প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল, তত্ত্বের ভিত্তিই হচ্ছে প্রয়োগ, আবার তত্ত্ব প্রয়োগের সেবা করে। জ্ঞান বা তত্ত্বের সত্যতা বিষয়ীগত অনুভূতির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় সামাজিক প্রয়োগে তার বাস্তব ফলাফলের দ্বারা। সামাজিক প্রয়োগই সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে। দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্বে প্রয়োগের দৃষ্টি-

ভঙ্গীই হল প্রথম এবং মূল দৃষ্টিভঙ্গী।[২]

কিন্তু মানুষের জ্ঞান কিভাবে প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত হয় এবং আবার প্রয়োগেরই সেবা করে ? আমরা যদি জ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়ার দিকে তাকাই, তাহলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রথমে শুধুমাত্র বিভিন্ন বস্তুর বাহ্য রূপ, তাদের পৃথক পৃথক দিক এবং তাদের পরস্পর-বহিঃসম্পর্কগুলোকেই দেখতে পায়। যেমন, ইয়েনান পরিদর্শনে যাঁরা বাইরে থেকে আসেন তাঁদের কথাই ধরুন। প্রথম দু-এক দিন তাঁরা দেখেন ইয়েনানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর। অনেক লোকের সঙ্গে তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় ; তাঁরা ভোজসভায়, সান্ধ্য অনুষ্ঠানে, জনসভায় যোগ দেন, নানা ধরনের কথাবার্তা শোনেন এবং বিভিন্ন রকমের দলিলপত্র পাঠ করেন। এ সব কিছুই হল বস্তুগুলোর বাহ্য রূপ, তাদের পৃথক পৃথক দিক, তাদের বহিঃসম্পর্ক। এটাকে বলা হয় জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূতি ও মনের উপর ছাপ পড়ার পর্যায়। অর্থাৎ ইয়েনানে এই বিশেষ বস্তুগুলো পরিদর্শক-দলের সদস্যদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর ক্রিয়া করে, তাঁদের অনুভূতিবোধকে জাগিয়ে তোলে, তাঁদের মস্তিষ্কে নানা ছাপ ফেলে, এবং এইসব ছাপের মধ্যেকার বহিঃসম্পর্কের একটা ভাসাভাসা ছবি এঁকে দেয়। এইটিই হল জ্ঞানের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে মানুষ তখনও গভীর ধারণা গঠন করতে পারে না, পারে না কোন যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত টানতে।

সামাজিক প্রয়োগ চলার সঙ্গে সঙ্গে, যে বিষয়গুলো মানুষের প্রয়োগের মধ্যে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও ছাপগুলোর জন্ম দেয়, সেই বিষয়গুলোর বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তখন মানুষের মস্তিষ্কে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা আকস্মিক পরিবর্তন (অর্থাৎ দ্রুত-অতিক্রমণ) ঘটে এবং ধারণা গঠিত হয়। এই ধারণাগুলো তখন আর বস্তুগুলোর বাহ্য রূপ, তাদের পৃথক পৃথক দিক এবং তাদের বহিঃসম্পর্ক নয়—সেগুলো তখন বস্তুর সারাংশকে, সমগ্রতাকে এবং অন্তঃসম্পর্ককে আয়ত্ত করে। ধারণা এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণগত পার্থক্যই নয়, গুণগত পার্থক্যও রয়েছে। এইভাবে আরও এগিয়ে গিয়ে বিচার ও অনুমানের সাহায্যে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর হয়। 'সানকু ও ইয়ান ই'-তে[৩] উল্লিখিত 'ভ্রূ কোঁচকালেই মাথায় বুদ্ধি আসে' বলতে অথবা চলতি কথায় 'ব্যাপারটা ভেবে দেখি' বলতে মানুষ কর্তৃক

মস্তিষ্কের ধারণাগুলোকে বিচার ও অনুমান গঠনে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকেই বোঝায়। এইটি হল জ্ঞানের দ্বিতীয় পর্যায়। যখন পরিদর্শক-দলের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার এবং তদুপরি 'ঐগুলো ভেবে দেখা'র কাজটি শেষ করেন, তখনই তাঁরা এই বিচারে এসে পৌঁছাতে পারেন যে, 'কমিউনিস্ট পার্টির জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতি পূর্ণাঙ্গ, আন্তরিক এবং সাচ্চা'। এই বিচারে আসার পর, তাঁরাও যদি দেশকে বাঁচাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সাচ্চা হন, তবে তাঁরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, 'জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট সাফল্যলাভ করতে পারে।' কোন বস্তুকে জানার সমগ্র প্রক্রিয়ায় ধারণা, বিচার এবং অনুমানের এই পর্যায় হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই পর্যায় হচ্ছে ধারণাত্ম (rational) জ্ঞানের পর্যায়। জানার আসল কাজটি হল ইন্দ্রিয়ানুভূতি মধ্য দিয়ে চিন্তায় পৌঁছানো, ধাপে ধাপে বাস্তব বস্তুর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিষয়ে, তার নিয়মবিধি সম্পর্কে এবং একটি প্রক্রিয়া ও আরেকটি প্রক্রিয়ার মধ্যেকার অন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে উপলব্ধিতে পৌঁছানো, অর্থাৎ যৌক্তিক জ্ঞানে পৌঁছানো। আবার বলা যায়, যৌক্তিক জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের তফাৎ এখানেই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান বস্তুর পৃথক পৃথক দিক, বাহ্য রূপ এবং বহিঃসম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আর যৌক্তিক জ্ঞান সামনের দিকে একটা বড় ধাপ অগ্রসর হয়ে বস্তুর সমগ্রতা, সারাংশ ও অন্তঃসম্পর্কে গিয়ে পৌঁছায়, এবং পারিপার্শ্বিক জগতে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে। সুতরাং যৌক্তিক জ্ঞান পারিপার্শ্বিক জগতের বিকাশকে তার সমগ্রতায়, তার সমস্ত দিকগুলির অন্তঃসম্পর্কের মধ্যে আয়ত্ত করতে সক্ষম।

অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং অগভীর থেকে গভীরের দিকে অগ্রসরমান এই জ্ঞান-বিকাশের প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী তত্ত্ব মার্কসবাদের আবির্ভাবের আগে কেউ কখনো উপস্থিত করেনি। মার্কসীয় বস্তুবাদই সর্বপ্রথম এই সমস্যার সঠিক সমাধান করে, বস্তুবাদী ও দ্বান্দ্বিক উভয় দিক থেকেই জ্ঞানের ক্রমগভীর গতিকে দেখিয়ে দেয়, এবং দেখিয়ে দেয় যে, সমাজে মানুষ তার উৎপাদন ও শ্রেণী-সংগ্রামের জটিল ও নিয়মিতভাবে পুনরাবর্তনশীল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে যৌক্তিক জ্ঞানে এগিয়ে যায়। লেনিন বলেছিলেন, 'পদার্থের বিমূর্তকরণ (abstraction), প্রকৃতির নিয়ম-বিধির বিমূর্তকরণ, মূল্য প্রভৃতির বিমূর্তকরণ, সংক্ষেপে, সকল বিজ্ঞানসম্মত (সঠিক, গুরুত্বপূর্ণ, অভ্রান্ত) বিমূর্তকরণ প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে, সঠিকভাবে

এবং **পূর্ণভাবে** প্রতিফলিত করে।[8] মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ার দুটো পর্যায়ের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। নিম্ন পর্যায়ে জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান হিসেবে, আর উচ্চতর পর্যায়ে তা আত্মপ্রকাশ করে যৌক্তিক জ্ঞান হিসেবে। কিন্তু উভয় পর্যায়ই জ্ঞানলাভের এক্‌ক প্রক্রিয়ার অংশ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান এবং ধারণাত্মক জ্ঞান গুণগতভাবে পৃথক, কিন্তু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—প্রয়োগের ভিত্তিতে তারা ঐক্যবদ্ধ। আমাদের প্রয়োগ প্রমাণ করে যে, যা অনুভব করা যায় তা তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, এবং যা হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছে কেবল তাই অধিকতর গভীরভাবে অনুভব করা যায়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি শুধুমাত্র বস্তুর বাহ্য রূপের সমস্যাটুকুই সমাধান করে, আর একমাত্র তত্ত্বই পারে সারাংশের সমাধান করতে। এই উভয় সমস্যার সমাধানকে প্রয়োগ থেকে এতটুকুও আলাদা করা যায় না। কেউ কোন বস্তুকে জানতে চাইলে তার সংস্পর্শে আসা, অর্থাৎ সে বস্তুর পরিবেশে বাস করা (প্রয়োগ করা) ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদী সমাজের নিয়মগুলি আগে থেকে জানা অসম্ভব ছিল, কারণ তখনও পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটেনি এবং তার আনুষঙ্গিক প্রয়োগও ছিল না। একমাত্র পুঁজিবাদী সমাজবাদী সমাজ থেকেই মার্কসবাদের জন্ম সম্ভব ছিল। অবাধ পুঁজিবাদের যুগে মার্কসের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী যুগের বিশেষ কতকগুলি নিয়মবিধি আগে থাকতে মূর্তভাবে জানা অসম্ভব ছিল, কারণ সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ পুঁজিবাদের সর্বশেষ পর্যায় তখনও পর্যন্ত আবির্ভূত হয়নি এবং তার আনুষঙ্গিক প্রয়োগও ছিল না। একমাত্র লেনিন ও স্তালিনই পেরেছিলেন সেই দায়িত্বভার তুলে নিতে। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের মনীষার কথা বাদ দিলেও, তাঁরা যে তাঁদের তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তার কারণ প্রধানতঃ ছিল এই যে, তাঁরা স্বয়ং তাঁদের সময়কার শ্রেণী সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োগে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন। এই অবস্থা না থাকলে কোন মনীষার পক্ষেই সাফল্যলাভ করা সম্ভব ছিল না। প্রাচীনকালে যখন প্রযুক্তিবিদ্যা ছিল অনুন্নত, তখন 'পণ্ডিত-ব্যক্তি ঘরে বসেই দুনিয়ার সবকিছু জানতে পারেন'—এই কথা ছিল একেবারেই ফাঁকা বুলি। যদিও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার বর্তমান যুগে এই কথাটা কাজে পরিণত হতে পারে, তবুও দুনিয়ায় যারা প্রয়োগে নিয়োজিত, তারাই হচ্ছে প্রকৃত নিজস্ব জ্ঞানসম্পন্ন লোক। এইসব লোক তাদের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যখন

'জ্ঞান' লাভ করে আর তাদের সেই জ্ঞান যখন রচনা ও প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে 'পণ্ডিতব্যক্তির' কাছে পৌঁছায়, 'পণ্ডিতব্যক্তি' একমাত্র তখনই পরোক্ষভাবে 'দুনিয়ার সবকিছু জানতে পারেন'। আপনি যদি কোন একটি বস্তু অথবা একাধিক বস্তু প্রত্যক্ষভাবে জানতে চান, তবে বাস্তবকে পরিবর্তন করার, সেই বস্তু অথবা সেই একাধিক বস্তুগুলি পরিবর্তন করার বাস্তব সংগ্রামে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতেই হবে, কারণ কেবল এইভাবেই আপনি সেই বস্তু বা সেই একাধিক বস্তুগুলির বাহ্য রূপের সংস্পর্শে আসতে পারেন ; এবং বাস্তবকে পরিবর্তন করার বাস্তব সংগ্রামে ব্যক্তিগত অংশগ্রহনের মাধ্যমেই কেবল আপনি সেই বস্তু অথবা সেই একাধিক বস্তুগুলির সারাংশকে উন্মোচিত করতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। আসলে প্রত্যেক মানুষই জ্ঞানলাভের জন্য এই পথেই চলে, যদিও কিছু লোক ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে এর বিরুদ্ধে তর্ক করে থাকে। দুনিয়াতে সেই 'সবজান্তা'-ই হচ্ছে সবচেয়ে হাস্যাস্পদ ব্যক্তি, যারা পরের কাছে শোনা কিছু ভাসাভাসা কথা সংগ্রহ করে নিজেকে 'দুনিয়ার পয়লা নম্বরের জ্ঞানী' বলে জাহির করে। এতে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিজের ক্ষমতা কতখানি সে ধারণাই তার নেই। জ্ঞান হচ্ছে একটা বিজ্ঞানের ব্যাপার। বিন্দুমাত্রও কপটতা কিংবা অহমিকা এই ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য নয়. যা দরকার তা ঠিক এর বিপরীত—অর্থাৎ দরকার সততা ও বিনয়ের মনোভাব। যদি আপনি জ্ঞানার্জন করতে চান তাহলে বাস্তব জগৎকে পরিবর্তন করার প্রয়োগে আপনাকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি অপনি নাশপাতির স্বাদ জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই নাশপাতির পরিবর্তন করতে হবে, নিজের মুখে খেয়ে। যদি আপনি পরমাণুর গঠন ও গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে পরমাণুটির অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ভৌত ও রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেই হবে যদি আপনি বিপ্লবের তত্ত্ব ও পদ্ধতি জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে হবে। সমস্ত প্রকৃত জ্ঞানের উৎসই হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু একজনের পক্ষে সবকিছুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই আসে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, যেমন, প্রাচীনকালের ও বিদেশের সকল জ্ঞান। আমাদের পূর্বপুরুষ এবং বিদেশীদের কাছে এই জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। আমাদের পূর্বপুরুষ ও বিদেশীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সময়ে এই জ্ঞান যদি লেনিনের উল্লিখিত 'বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্তকরণ'-এর শর্ত

পূরণ করে এবং বাস্তব বিষয়কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিফলিত করে, তাহলে এই জ্ঞান নির্ভরযোগ্য। অন্যথায় এই জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং একজন মানুষের জ্ঞান কেবল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত: একটি হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসা, আরেকটি হল পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসা। অধিকন্তু, যেটা আমার কাছে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, অন্য কারও কাছে সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। অতএব, সমগ্রভাবে বিচার করলে, যে কোন ধরনের জ্ঞানই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অবিচ্ছেদ্য। সকল জ্ঞানই উৎপন্ন হয় মানুষের দৈহিক ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির দ্বারা বাস্তব বহির্জগৎকে অনুভব করার মধ্যে। যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অস্বীকার করে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে, অথবা বাস্তবকে পরিবর্তন করার প্রয়োগে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণকে অস্বীকার করে, সে বস্তুবাদী নয়। এই কারণেই, 'সবজান্তা' ব্যক্তিরা হাস্যাস্পদ। একটি পুরানো চীনা প্রবাদ আছে: 'বাঘের গুহায় না ঢুকে বাঘের বাচ্চা কি ধরা যায়?' কথাটি মানুষের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি সত্য জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও। প্রয়োগ ছাড়া জ্ঞান অসম্ভব।

বাস্তবকে পরিবর্তন করার প্রয়োগের ভিত্তিতে উদ্ভূত জ্ঞানের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী গতিকে—জ্ঞানের ক্রমগভীর গতিকে—স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য আরও কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বহারাশ্রেণী তার প্রয়োগের প্রথম যুগে অর্থাৎ মেশিনভাঙা ও স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের যুগে কেবল জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায়ে ছিল। সেই যুগে সে শুধুমাত্র পুঁজিবাদের বাহ্য রূপের কতকগুলি পৃথক পৃথক দিক ও বহিঃসম্পর্ক জানত। সর্বহারাশ্রেণী তখনও ছিল 'নিজের-মধ্যেই-শ্রেণী'। কিন্তু সর্বহারাশ্রেণী যখন তার প্রয়োগের দ্বিতীয় যুগে, অর্থাৎ সচেতন এবং সংগঠিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের যুগে পৌঁছাল, তখন সর্বহারাশ্রেণীর নিজের প্রয়োগের ফলে, দীর্ঘ সংগ্রামে নিজের অভিজ্ঞতার ফলে, এবং মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এইসব অভিজ্ঞতার সার-সংকলনের মধ্যে মার্কসবাদী তত্ত্বের সৃষ্টি করা ও তার দ্বারা সর্বহারাশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলার ফলেই সর্বহারাশ্রেণী পুঁজিবাদী সমাজের সারমর্মকে বুঝতে পারল, সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যেকার শোষণের সম্পর্কগুলিকে এবং সর্বহারাশ্রেণীর নিজের ঐতিহাসিক কর্তব্যকে বুঝতে পারল। আর তখনই সর্বহারাশ্রেণী 'নিজের-জন্য-শ্রেণী'-তে পরিণত হল।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে চীনা জনগণের জ্ঞানের ব্যাপারেও ঐ একই কথা। প্রথম পর্যায় ছিল ভাসাভাসা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের পর্যায়, যার প্রতিফলন দেখা যায় থাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের আন্দোলনে[৫] এবং ই হো থুয়ান আন্দোলন[৬] প্রভৃতিতে নির্বিচারে বিদেশী-বিরোধী সংগ্রামগুলির ক্ষেত্রে। কেবল দ্বিতীয় পর্যায়েই চীনা জনগণ ধারণাত্মক জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সাম্রাজ্যবাদের ভেতরের ও বাইরের বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলিকে দেখেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ যে ব্যাপক চীনা জনগণকে নিপীড়ন ও শোষণ করার জন্য চীনের মুৎসুদ্দি ও সামন্তশ্রেণী-গুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এই মূল সত্যকে দেখেছিল। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের[৭] কাছাকাছি সময়ে এই জ্ঞানের শুরু হয়েছিল।

এরপর, যুদ্ধের কথা বিচার করা যাক। যারা যুদ্ধ পরিচালনা করে, তাদের যদি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে গোড়ার দিকে তারা একটি সুনির্দিষ্ট যুদ্ধ (যেমন আমাদের বিগত দশ বছরের কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ) পরিচালনা সম্পর্কিত গভীর নিয়মবিধিগুলো উপলব্ধি করতে পারবে না। গোড়ার দিকে তাদের কেবল বেশ কিছু লড়াই করার অভিজ্ঞতা হবে এবং তার চেয়েও যা বেশি, অনেক পরাজয় সইতে হবে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা (জেতা লড়াইগুলির অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে হারা লড়াইগুলির অভিজ্ঞতা) দ্বারাই তারা গোটা যুদ্ধের অন্তর্নিহিত সূত্র অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট যুদ্ধের নিয়মবিধিগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করতে, এবং রণনীতি ও রণকৌশল বুঝতে সক্ষম হবে। এর ফলে আস্থার সঙ্গে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। যদি, এ রকম মুহূর্তে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে পরিচালনভার তুলে দেওয়া হয়, তবে তাকেও যুদ্ধের সঠিক নিয়মবিধি হৃদয়ঙ্গম করতে পারার আগে অনেকগুলি পরাজয় সইতে হবে (অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে)।

'আমি নিশ্চিত নই যে, এটা আমি পারব।' যখন একজন কমরেড একটি ন্যস্ত কাজ গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করে, তখন প্রায়শঃই এই মন্তব্য আমরা শুনতে পাই। নিজের সম্পর্কে তার এই অনিশ্চয়তা কেন? কারণ ন্যস্ত কাজটির বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোন নিয়মিত উপলব্ধি নেই, অথবা ঐ ধরনের কাজের অতি অল্প সংস্পর্শে সে এসেছে বা একেবারেই আসেনি, এবং সেজন্য ঐ কাজের নির্ধারক নিয়মবিধিগুলি তার অনায়ত্ত। কাজটির প্রকৃতি পরিস্থিতির পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণের পর সে নিজের সম্পর্কে বেশ কিছুটা নিশ্চিত হবে এবং কাজটি স্বেচ্ছায় করতে এগোবে। যদি সে ঐ

কাজে কিছুটা সময় ব্যয় করে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যদি সে এমন লোক হয় যে খোলা মন নিয়ে বিষয়ের গভীরে দৃষ্টি প্রসারিত করতে আগ্রহী এবং যদি সে এমন লোক না হয় যে সমস্যাকে বিষয়ীগতভাবে, একতরফাভাবে এবং ভাসাভাসাভাবে বিচার করে, তাহলে কাজটিকে কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে সে নিজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারবে এবং কার্যসাধনে তার সাহস বহু গুণ বেড়ে যাবে। যারা বিষয়ীগত, একতরফা এবং ভাসাভাসাভাবে সমস্যাকে দেখে, শুধু তারাই কোন জায়গায় আসামাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা না করে, ব্যাপারটাকে সামগ্রিকভাবে (তার ইতিহাস ও সমগ্র বর্তমান অবস্থাকে) বিবেচনা না করে এবং ব্যাপারের সারাংশকেও (তার প্রকৃতি এবং তার ও অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যেকার অন্তঃসম্পর্ক) উপলব্ধি না করেই আত্মতৃপ্তির সঙ্গে হুকুম জারি করতে থাকে। এ ধরনের লোক হোঁচট ও আছাড় খেতে বাধ্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় বহির্জগতের বিষয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ হল প্রথম ধাপ। এটা ইন্দ্রিয়ানুভূতির পর্যায়ের অন্তর্গত। দ্বিতীয় ধাপটি হল ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ তথ্যগুলিকে সাজিয়ে ও পুনর্গঠন করে সেগুলির সংশ্লেষণ (synthesize) করা। এটা ধারণা, বিচার এবং অনুমান পর্যায়ের অন্তর্গত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যগুলি যখন খুব সমৃদ্ধ (অসংলগ্ন নয়) ও বাস্তববানুগ (ভ্রান্ত নয়) হয়, একমাত্র তখনই সেগুলি সঠিক ধারণা যুক্তি গঠনের ভিত্তি হতে পারে।

এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমটি আগেই বলা হয়েছে, তবুও এখানে আবার বলা উচিত। সেটি হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের উপর ধারণাত্মক জ্ঞানের নির্ভরশীলতা। যিনি একথা মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানের উদ্ভব হওয়ার প্রয়োজন নেই, তিনিই একজন ভাববাদী। দর্শনের ইতিহাসে 'যুক্তিবাদী' গোষ্ঠী রয়েছে, যারা কেবল যুক্তির বাস্তবতাকেই স্বীকার করে, অভিজ্ঞতার বাস্তবতাকে স্বীকার করে না। তাদের বিশ্বাস, একমাত্র যুক্তিই নির্ভরযোগ্য আর ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা নির্ভরযোগ্য নয়। এই গোষ্ঠী বিষয়কে উল্টো করে দেখার ভুল করে থাকে। ধারণাত্মক জ্ঞান ঠিক এই কারণেই নির্ভরযোগ্য যে, তার উৎস নিহিত রয়েছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে। অন্যথায় তা হতো উৎসহীন জলধারা বা শিকড়হীন গাছের মতো মনগড়া, আত্মজাত কোন বস্তু, যা নির্ভরযোগ্য নয়। জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ায় ক্রম অনুযায়ী সর্বপ্রথম আসে ইন্দ্রিয়লব্ধ

অভিজ্ঞতা। আমরা যে জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় সামাজিক প্রয়োগের তাৎপর্যের উপর বিশেষ করে জোর দিই তার কারণ, একমাত্র সামাজিক প্রয়োগই মানুষের জ্ঞানের জন্ম দিতে পারে এবং মানুষকে বাস্তব বহির্জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা অর্জনে চালিত করতে পারে। যে লোক তার চোখ-কান বন্ধ রাখে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বাস্তব বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তার কাছে জ্ঞান বলে কিছু থাকতে পারে না। অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞানের সূচনা—এই হল জ্ঞানতত্ত্বের বস্তুবাদ।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই যে, জ্ঞানকে গভীরতর করা দরকার, জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায়কে ধারণাত্মক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন—এটাই হল জ্ঞানতত্ত্বের দ্বন্দ্ববাদ[৮]। জ্ঞান নিম্নতর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায়ে থেমে থাকতে পারে এবং শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানই নির্ভরযোগ্য, আর ধারণাত্মক জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয়—এইভাবে ভাবলে 'অভিজ্ঞতাবাদের' ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি করা হবে। এই মতবাদের ভুল হল এটা না বোঝা যে, যদিও ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলি বাস্তব বহির্জগতের কতকগুলি সত্যকে প্রতিফলিত করে (আমি এখানে সেই ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদের কথা বলছি না যা অভিজ্ঞতাকে তথাকথিত অন্তর্দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে), কিন্তু সেগুলি নিছক একপেশে ও ভাসাভাসা, সেগুলি বিষয়কে অসম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে এবং বিষয়ের সারাংশকে প্রতিফলিত করে না। সম্পূর্ণভাবে কোন বিষয়কে তার সমগ্রতায় প্রতিফলিত করতে হলে, বিষয়ের সরাংশকে ও তার অন্তর্নিহিত নিয়মগুলিকে প্রতিফলিত করতে হলে প্রয়োজন চিন্তার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সমৃদ্ধ তথ্যগুলিকে পুনর্গঠন করা—বাজে জিনিস পরিত্যাগ করে সারবস্তু বেছে নেওয়া, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করা, এক বিষয় থেকে শুরু করে অন্য বিষয়ে যাওয়া, এবং বাইরে থেকে শুরু করে ভেতরে যাওয়া। ধারণা ও তত্ত্বের একটা প্রণালী গঠনের জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানে একটা দ্রুত-অতিক্রমণ। এই পুনর্গঠিত জ্ঞান অধিকতর ফাঁকা বা অনির্ভরযোগ্য নয়। বরং বিপরীতভাবে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় প্রয়োগের ভিত্তিতে যা কিছু বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পুনর্গঠিত হয়, তাইই, লেনিনের ভাষায়,—আরও গভীররূপে, আরও সঠিকরূপে এবং আরও পরিপূর্ণরূপে বাস্তব বিষয়গুলিকে প্রতিফলিত করে। এরই বিরুদ্ধে স্থূল 'ব্যবহারিক ব্যক্তিরা' অভিজ্ঞতাকে মর্যাদা দেয়, কিন্তু তত্ত্বকে অবজ্ঞা করে। সেজন্য তারা একটা সমগ্র বাস্তব প্রক্রিয়া সম্বন্ধে

সামগ্রিক ধারণা করতে পারে না, তাদের স্পষ্ট দিক্‌নির্দেশ ও দূরদৃষ্টি নেই, তারা মাঝে-মধ্যে দু-একটা সাফল্যপ্রাপ্তিতে ও সত্যের আংশিক দর্শনেই আত্মতুষ্ট। এ ধরনের লোকেরা যদি বিপ্লব পরিচালনা করে, তবে তারা বিপ্লবকে এক কানাগলিতে পৌঁছে দেবে।

ধারণাত্মক জ্ঞান নির্ভর করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ওপর, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে উন্নীত করতে হয় ধারণাত্মক জ্ঞানে—এটাই হচ্ছে দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব। দর্শনশাস্ত্রে 'যুক্তিবাদ' বা 'অভিজ্ঞতাবাদ' কোনটাই জ্ঞানের ঐতিহাসিক বা দ্বান্দ্বিক প্রকৃতিকে বোঝে না। যদিও মতবাদ দুটির প্রত্যেকটির মধ্যেই সত্যের একটি দিক আছে (এখানে আমি বস্তুবাদী যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের কথাই বলছি, ভাববাদী যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের কথা বলছি না), তবুও উভয় মতবাদই সমগ্র বিচারে জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে ধারণাত্মক পর্যায়ে জ্ঞানের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী গতিটা জ্ঞানের একটা ছোটখাট প্রক্রিয়ার (যেমন, কোন একটিমাত্র বস্তু বা কাজ জানার) বেলায় যেমন সত্য, তেমনি জ্ঞানের একটা বৃহৎ প্রক্রিয়ার (যেমন, একটা গোটা সমাজকে বা একটা বিপ্লবকে জানার) বেলায়ও সত্য।

কিন্তু জ্ঞানের গতির এখানেই শেষ নয়। যদি জ্ঞানের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী গতি ধারণাত্মক জ্ঞানে এসে থামত, তাহলে কেবল অর্ধেক সমস্যার সমাধান হতো। এবং মার্কসবাদী দর্শনের দিক থেকে তাতে শুধুমাত্র যে অর্ধাংশটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেই অর্ধাংশটুকুরই সমাধান হতো। মার্কসবাদী দর্শনের মতানুসারে, বাস্তব জগতের বিধিনিয়ম বোঝা এবং এইভাবে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়, বরং সমস্যাটা হচ্ছে বাস্তব বিধিনিয়মের জ্ঞানের সাহায্যে জগৎটাকেই পুরোপুরি বদলে দেওয়া। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে লেনিনের এই বক্তব্যে: 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না।'[১] কিন্তু মার্কসবাদ তত্ত্বের গুরুত্বের উপর জোর দেয় ঠিক এবং শুধুমাত্র এই কারণেই যে, তত্ত্ব কর্মের পথনির্দেশ করতে পারে। যদি আমাদের একটা নির্ভুল তত্ত্ব থাকে, কিন্তু যদি তা নিয়ে শুধু বকবকই করা হয়, যদি তাকে খোপের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় এবং কাজে লাগানো না হয়, তাহলে সেই তত্ত্বটি যত ভালই হোক না কেন তার কোনো তাৎপর্যই থাকে না। প্রয়োগ থেকে জ্ঞানের শুরু হয়, এবং প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে আবার অবশ্যই প্রয়োগে

ফিরে আসতে হবে। জ্ঞানের সক্রিয় ভূমিকা কেবলমাত্র যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানে সক্রিয়ভাবে দ্রুত অতিক্রমণের মধ্যে ব্যক্ত হয় তা-ই নয়, বরং আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ধারণাত্মক জ্ঞান থেকে বিপ্লবী প্রয়োগে দ্রুত অতিক্রমণের মধ্যেও তা অভিব্যক্ত হয়। যে জ্ঞান জগতের নিয়মবিধিকে আয়ত্ত করে, তাকে অবশ্যই আবার জগৎকে পরিবর্তন করার প্রয়োগে নিয়োজিত করতে হবে, তাকে নতুন করে কাজে লাগাতে হবে উৎপাদনের প্রয়োগে, বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োগে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োগে। এটা হচ্ছে তত্ত্বের পরীক্ষা ও বিকাশসাধনের প্রক্রিয়া, জ্ঞানের সমগ্র প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা। তত্ত্ব বাস্তব সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা—এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে ধারণাত্মক পর্যায়ে জ্ঞানের গতির মধ্যে হয়নি এবং হতেও পারে না। সমস্যাটির পুরোপুরি সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে ধারণাত্মক জ্ঞানকে আবার সামাজিক প্রয়োগে চালিত করা, তত্ত্বকে প্রয়োগ করা এবং এতে প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য সাধিত হয় কিনা তা দেখা। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বকেই সত্য বলে গণ্য করা হয়। তা কেবল এইজন্যে নয় যে, প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা যখন তত্ত্বগুলো উদ্ভাবন করেছিলেন তখন তত্ত্বগুলোকে সত্য বলে গণ্য করা হতো, বরং এইজন্যেই যে, ঐ তত্ত্বগুলো পরবর্তী বৈজ্ঞানিক প্রয়োগেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সত্য বলে গণ্য করা হয় কেবল এইজন্যে নয় যে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিন যখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঐ মতবাদ উদ্ভাবন করেছিনের, তখন সেটা সত্য বলে গণ্য করা হতো, বরং এইজন্যেও যে, পরবর্তী বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োগে ঐ মতবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একটি সার্বজনীন সত্য, কারণ কেউই নিজের প্রয়োগে এর আওতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের ইতিহাস আমাদের এটাই শেখায় যে, বহু তত্ত্বই অসম্পূর্ণ, এবং কেবল প্রয়োগের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই এই অসম্পূর্ণতা দূর করা যায়। বহু তত্ত্বই ভুল এবং প্রয়োগের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই সেসব তত্ত্বের ভুলগুলি শোধরানো যায়। সেজন্যই প্রয়োগ হল সত্যের মাপকাঠি, এবং সেজন্যই 'জীবনের ও প্রয়োগের দৃষ্টিকোণই জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম ও মৌলিক দৃষ্টিকোণ হওয়া উচিত'।[১০] স্তালিন ঠিকই বলেছেন, 'বিপ্লবী প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত না হলে তত্ত্ব হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন, ঠিক যেমন বিপ্লবী তত্ত্বের দ্বারা

তার পথ আলোকিত না হলে প্রয়োগ অন্ধকারে পথ হাতড়ায়।'[১১]

এই পর্যন্ত এসেই কি জ্ঞানের গতিবিধি শেষ হয়ে যায়? আমাদের উত্তর: হ্যাঁ, এবং সেই সঙ্গে না-ও বটে। বিকাশের কোন একটি পর্যায়ে কোন একটি বাস্তব প্রক্রিয়াকে (প্রাকৃতিকই হোক বা সামাজিক হোক) পরিবর্তন করার অনুশীলনে যখন সমাজের মানুষ নিজেদের নিয়োজিত করে, তখন তারা তাদের মস্তিষ্কে বাস্তব প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ও তাদের আত্মগত কর্মতৎপরতার সঞ্চালনের ফলে তাদের জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায় থেকে ধারণাত্মক পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং ঐ বাস্তব প্রক্রিয়ার নিয়ম-বিধির সঙ্গে সাধারণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচী সৃষ্টি করতে পারে। তারপর তারা ঐ চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্ম-সূচীগুলোকে ঐ একই বাস্তব প্রক্রিয়ার অনুশীলনে প্রয়োগ করে। এবং যদি তারা প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, অর্থাৎ যদি ঐ একই প্রক্রিয়ার প্রয়োগে তারা ঐ পূর্ব-নিরূপিত চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচীগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অথবা মোটামুটিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের গতিবিধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃতিকে বদলানোর প্রক্রিয়ায় একটি ইঞ্জিনীয়ারিং পরিকল্পনার বাস্তবে রূপায়ণ, একটা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সত্য প্রতিপাদন (verification), একটা যন্ত্রের উৎপাদন বা কোন ফসল কাটা; অথবা সমাজকে বদলানোর প্রক্রিয়ায় একটি ধর্মঘটের সাফল্য, একটি যুদ্ধে জয়লাভ বা একটি শিক্ষা পরিকল্পনার রূপায়ণ—এসব কিছুকেই প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রকৃতিকে বদলানোর প্রয়োগেই হোক অথবা সমাজকে বদলানোর প্রয়োগেই হোক, মানুষের পূর্ব-নিরূপিত চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচী কদাচিৎ কোন পরিবর্তন ছাড়াই বাস্তবে রূপায়িত হয়। এর কারণ, যারা বাস্তবকে পরিবর্তনে নিয়োজিত, তারা সাধারণতঃ বহু রকমের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকে। তারা শুধুমাত্র প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাসংক্রান্ত পরিস্থিতির দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয়, উপরন্তু বাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশ এবং তার প্রকাশের মাত্রার দ্বারাও সীমাবদ্ধ (বাস্তব প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক ও তার সারাংশ তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়েনি)। এই অবস্থায় প্রয়োগের প্রক্রিয়ার অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতির আবিষ্কারের ফলে চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচী প্রায়ই

আংশিকভাবে পাল্টানো হয় এবং কখনো কখনো পুরোপুরিও পাল্টানো হয়। অর্থাৎ এমন ঘটনা ঘটে যে, পূর্ব-নিরূপিত চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা ও কর্মসূচীগুলি বাস্তবের সঙ্গে আংশিকভাবে বা পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিসাধন করতে পারে না, সেগুলি আংশিকভাবে বা পুরোপুরিই ভুল হয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বহুবার ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটার পরই কেবল জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুলগুলি সংশোধিত হয় এবং বাস্তব প্রক্রিয়ার নিয়মবিধিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য অর্জিত হয়, এবং তার ফলে আত্মগতকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারা যায়, বা অন্য কথায়, প্রয়োগে প্রত্যাশিত ফল অর্জিত হয়। কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন, এ ব্যাপার যখন ঘটে, তখন বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে একটা নির্দিষ্ট বাস্তব প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের গতিবিধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা যায়।

তবে, প্রক্রিয়ার ক্রমাগ্রগতির দিক থেকে বলতে গেলে, মানুষের জ্ঞানের গতি সম্পূর্ণ হয় না। প্রকৃতির ক্ষেত্রেই হোক বা সমাজের ক্ষেত্রেই হোক, প্রত্যেক প্রক্রিয়াই তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কারণেই এগিয়ে যায় ও বিকাশলাভ করে, এবং মানুষের জ্ঞানের গতি ও সেই সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া ও বিকাশলাভ করা উচিত। সামাজিক গতিসমূহের বেলায়, উপরে যেমন বলা হয়েছে—সাচ্চা বিপ্লবী নেতাদের শুধুমাত্র নিজেদের চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচীগুলিতে ভুল আবিষ্কৃত হলে সেগুলি সংশোধনে পারদর্শী হলেই চলবে না, উপরন্তু যখন কোন একটি বাস্তব প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই এগিয়ে গেছে এবং বিকাশের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়ে গেছে—তখন তাদের নিজেদের ও সমস্ত সহকর্মী বিপ্লবীদের আত্মগত জ্ঞানের মধ্যে আনুষঙ্গিক অগ্রগতি ও পরিবর্তন ঘটানোয় অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে। অর্থাৎ তাদের অবশ্যই স্থিরনিশ্চিত হতে হবে, -যাতে প্রস্তাবিত নতুন বিপ্লবী কর্তব্য ও নতুন কাজের কর্মসূচীগুলি পরিস্থিতির নতুন পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বিপ্লবের সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অতি দ্রুত। বিপ্লবীদের জ্ঞানও যদি পরিবর্তিত অবস্থানুযায়ী দ্রুত পরিবর্তিত না হয়, তাহলে তারা বিপ্লবকে বিজয়ের দিকে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না।

অবশ্য, প্রায়ই দেখা যায়, চিন্তা বাস্তবের পেছনে পড়ে আছে। এর কারণ মানুষের জ্ঞান বহু রকম সামাজিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। বিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে আমরা সেইসব গোঁড়াদের বিরোধী, যাদের চিন্তা পরিবর্তন-

শীল বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে না পেরে ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এইসব লোকেরা এটা দেখতে পায় না যে, দ্বন্দ্বসমূহের সংগ্রাম ইতিমধ্যেই বাস্তব প্রক্রিয়াকে ঠেলে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে, অথচ এদিকে তাদের জ্ঞান পুরানো পর্যায়েই থেমে আছে। সকল গোঁড়াপন্থীর চিন্তাধারার এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। তাদের চিন্তাধারা সামাজিক প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা সমাজের রথকে পথ দেখিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। তারা শুধু পিছিয়ে পড়ে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে যে, এটা বড্ড জোরে যাচ্ছে। তারা ঐ রথকে পেছনে টেনে রাখতে বা তাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

'বাম' বাগাড়ম্বরেরও আমরা বিরোধী। 'বামপন্থীদের' চিন্তাধারা বাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়কে ছাড়িয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ নিজেদের অলীক কল্পনাকেই সত্য বলে মনে করে। আবার কেউ কেউ যে আদর্শ কেবল ভবিষ্যতেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব বর্তমানের মধ্যে সেই আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য গলদঘর্ম হয়। এরা জনগণের অধিকাংশের বর্তমান প্রয়োগ থেকে এবং বর্তমান বাস্তবতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং কার্য-কলাপে হঠকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ভাববাদ এবং যান্ত্রিক বস্তুবাদ, সুবিধাবাদ এবং হঠকারিতা—এ সবেরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মগত এবং বাস্তবের বিচ্ছেদ, প্রয়োগ ও জ্ঞানের সংযোগ-হীনতা। বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক প্রয়োগ হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। এই জ্ঞানতত্ত্ব ঐসব ভ্রান্ত মতাদর্শের দৃঢ় বিরোধিতা না করে পারে না। মার্কসবাদীরা মনে করে যে, বিশ্বের অনাপেক্ষিক (aboslute) ও সামগ্রিক বিকাশের প্রক্রিয়াধারায়, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার বিকাশ হচ্ছে আপেক্ষিক, এবং সেজন্যে অনাপেক্ষিক সত্যের অন্তহীন প্রবাহে বিকাশের কোন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের একটা বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান কেবল আপেক্ষিক সত্য মাত্র। অসংখ্য আপেক্ষিক সত্যের মোট যোগফলই অনাপেক্ষিক সত্য[১২]। বাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে পরিপূর্ণ, মানুষের জ্ঞানের গতিবিধির বিকাশও তাই। বাস্তব জগতের সকল দ্বান্দ্বিক গতি আগে হোক বা পরে হোক মানুষের জ্ঞানে প্রতিফলিত হতে পারে। সামাজিক প্রয়োগে উদ্ভব, বিকাশ এবং বিলয়ের প্রক্রিয়া যেমন অনন্ত, তেমনি মানুষের জ্ঞানেও উদ্ভব, বিকাশ এবং বিলয়ের প্রক্রিয়া অনন্ত। মানুষের প্রয়োগ—যা নির্দিষ্ট চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা

কর্মসূচী অনুযায়ী বস্তুগত বাস্তবতাকে পরিবর্তন করে—যতই অগ্রসর হতে থাকে, বস্তুগত বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানও তদনুযায়ী গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। বস্তুগত বাস্তব জগতে পরিবর্তনের গতিবিধির কখনই যেমন শেষ হয় না, তেমনি প্রয়োগের মাধ্যমে সত্য সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানার্জনেরও কখনই শেষ হয় না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মোটেই সত্যকে নিঃশেষিত করেনি বরং প্রয়োগের ধারায় সত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পথ বিরামহীনভাবে খুলে দিয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিষয়ীগতের ও বিষয়গতের, তত্ত্ব ও প্রয়োগের, জানা ও করার মূর্ত ও ঐতিহাসিক ঐক্য। 'বাম' হোক বা দক্ষিণ হোক—যা মূর্ত ইতিহাস থেকে বিচ্যুত—সে সমস্ত ভ্রান্ত মতাদর্শের আমরা বিরোধী।

সমাজের বিকাশের বর্তমান যুগে দুনিয়াকে সঠিকভাবে জানার এবং পরিবর্তন করার দায়িত্বটি ইতিহাস সর্বহারাশ্রেণী এবং তার পার্টির কাঁধে ন্যস্ত করেছে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অনুযায়ী নির্ধারিত দুনিয়াকে পরিবর্তন করার প্রয়োগের এই প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই দুনিয়ায় এবং চীনদেশে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে পৌঁছে গেছে। এটা মানব ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। অর্থাৎ দুনিয়া থেকে এবং চীন থেকে অন্ধকারকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দেওয়ার এবং দুনিয়াকে একটি অভূতপূর্ব আলোকিত দুনিয়ায় পরিবর্তন করার মুহূর্তে। দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী জনগণের সংগ্রামে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলির পরিপূরণ অন্তর্ভুক্ত: 'বস্তুগত জগতের পরিবর্তন সাধন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের মনোগত জগতের পরিবর্তন সাধন—নিজেদের জ্ঞানার্জন-ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন এবং মনোগত ও বস্তুগত জগতের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্ত সাধন। এরকম পরিবর্তন ইতিমধ্যেই পৃথিবীর এক অংশে—সোভিয়েত ইউনিয়নে—এসে গেছে। সেখানে জনগণ পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চীনের ও বাকী দুনিয়ার জনগণ এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে কিংবা চলবে। এবং যে বস্তুগত জগতের পরিবর্তন করতে হবে, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঐ সমস্ত পরিবর্তন-বিরোধীরাও। তাদের নিজেদের পরিবর্তনের জন্য স্বেচ্ছামূলক সচেতন পরিবর্তনের পর্যায়ে প্রবেশ করার আগে বাধ্যতামূলক একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অবশ্যই যেতে হবে। যেদিন সমগ্র মানবজাতি স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে নিজেকে এবং জগৎকে পরিবর্তন করবে, সেদিনই শুরু হবে বিশ্ব-কমিউনিজমের যুগ।

প্রয়োগের মাধ্যমে সত্যকে আবিষ্কার করুন, এবং আবার প্রয়োগের মাধ্যমে

সত্যকে যাচাই এবং বিকশিত করুন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে শুরু করুন এবং তাকে সক্রিয়ভাবে ধারণাত্মক জ্ঞানে উন্নীত করুন। তারপর ধারণাত্মক জ্ঞান থেকে শুরু করুন এবং বিষয়ীগত ও বিষয়গত এই উভয় জগৎকে পরিবর্তন করার জন্য সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী প্রয়োগ পরিচালনা করুন। প্রয়োগ, জ্ঞান, আবার প্রয়োগ এবং আবার জ্ঞান—এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে অন্তহীন চক্রাবর্তে, এবং প্রত্যেকটি চক্রাবর্তের সাথে সাথে প্রয়োগ ও জ্ঞানের অন্তর্বস্তুটি উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়। এই হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সমগ্র জ্ঞানতত্ত্ব, এই হল জানা এবং করার ঐক্যের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী তত্ত্ব।

টীকা

১। হেগেলের 'যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান'-এর তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রবন্ধ 'ধারণা' সম্পর্কে লেনিনের নোট থেকে উদ্ধৃত; ভি. আই. লেনিন, 'হেগেলের "যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান"-এর সংক্ষিপ্ত সার' (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯১৪) দ্রষ্টব্য।

২। কার্ল মার্কস, 'ফয়েরবাক সম্পর্কে থিসিস' (বসন্ত, ১৮৪৫) এবং ভি. আই. লেনিন, 'বস্তুবাদ এবং এমপিরিয়োক্রিটিসিজম' (১৯০৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে), দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৩। 'সান কুও ইয়ান ই' চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর লো কুয়ান-চুং কর্তৃক রচিত একটি বিখ্যাত চীনা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৪। হেগেলের 'যুক্তি-শাস্ত্রের বিজ্ঞান'-এর তৃতীয় খণ্ড 'আত্মমুখী যুক্তি বা ধারণার মতবাদ' সম্পর্কে লেনিনের নোট থেকে উদ্ধৃত। ভি. আই. লেনিন, 'হেগেলের "যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান"-এর সংক্ষিপ্ত সার' দ্রষ্টব্য।

৫। থাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের আন্দোলন ছিল ১৯ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত ছিং রাজবংশের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে কুয়াংসী প্রদেশের কুইপিং জেলার চিনথিয়ান গ্রামে এই বিপ্লবের নেতা হোং সিউ-ছুয়ান, ইয়াং সিউ-ছিং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন আর ঘোষণা করেছিলেন 'থাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের' প্রতিষ্ঠা। ১৮৫২ সালে থাইপিং বাহিনী কুয়াংসী প্রদেশ থেকে অভিযান শুরু করে, আর হুনান, হুপে, কিয়াংসী ও আনহুই প্রদেশের ভেতর দিয়ে অভিযান চালিয়ে নানকিং দখল করে ১৮৫৩

সাথে। তারপর থাইপিং বাহিনীর একটা অংশ নানকিং থেকে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালিয়ে যেতে যেতে থিয়ানচিন শহরের নিকটে পৌঁছেছিল। কিন্তু থাইপিং বাহিনী তার দখলীকৃত স্থানগুলিতে কোন সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকাই স্থাপন করেনি। উপরন্তু, নানকিংয়ে রাজধানী স্থাপন করবার পরে এ বাহিনীর নেতৃস্থানীয় গ্রুপ অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল করে বসেছিল। সেই সব কারণেই এ বাহিনী অসমর্থ হয়েছিল ছিং সরকারের প্রতিবিপ্লবী বাহিনী এবং বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাসী হামলাকারীদের মিলিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে। আর শেষ পর্যন্ত ১৮৬৪ সালে এই বাহিনী পরাজিত হল।

৬। ই হো থুয়ান আন্দোলন—১৯০০ সালে উত্তর চীনের কৃষক ও হস্তশিল্পীসাধারণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত একটি বিরাট আন্দোলন। এই আন্দোলনে তাঁরা রহস্যময় পদ্ধতিতে গুপ্ত সমিতি গঠন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালান। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ইতালি ও অস্ট্রীয়া এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র শক্তি দিয়ে পিকিং ও থিয়ানচিন দখল করেছিল এবং অবর্ণনীয় বর্বরতার সাথে এই আন্দোলন দমন করেছিল।

৭। ৪ঠা মে'র আন্দোলনটি ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন। এই আন্দোলন ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে শুরু হয়েছিল। সেই বছরের প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরা, অর্থাৎ বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান, ইতালি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ, প্যারিসে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিল লুঠের মাল ভাগাভাগি করে নেবার জন্য। আর এই বৈঠকে তারা স্থির করেছিল যে, চীনের শানতুং প্রদেশে আগের দিনে জার্মানী যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, সে সবই জাপান পাবে। ৪ঠা মে তারিখে, পিকিংয়ের ছাত্ররা সর্বপ্রথম সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। এই আন্দোলনকে দমন করবার চেষ্টায় উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার ত্রিশ জনেরও বেশি ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। প্রতিবাদে ধর্মঘট করে পিকিংয়ের ছাত্ররা, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররাও এই ধর্মঘটে সাড়া দেয়। ৩রা জুন তারিখে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার পিকিংয়ে আরও ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু করে, দুই দিনের মধ্যে প্রায় হাজার খানেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ৩রা জুনের ঘটনা সারা দেশের জনগণের ক্রোধকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ৫ই জুন থেকে শুরু করে শাংহাই ও অন্যান্য অনেক জায়গায়

শ্রমিকরা পরপর ধর্মঘট করে, আর ব্যবসায়ীরাও তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখে। শুরুতে যা ছিল মুখ্যত: বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন, তাই অবিলম্বেই হয়ে উঠল দেশব্যাপী স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন। তাতে যোগ দিল সর্বহারাশ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণী। এই স্বদেশপ্রেমী আন্দোলনের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে ৪ঠা মে'র আগে সূচিত সামন্ততন্ত্রবিরোধী এবং বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের উন্নতিবিধায়ক নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনটি এক ব্যাপক আকারের বলিষ্ঠ বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিকশিত হয়ে ওঠে। আর এর প্রধান ধারাটি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার।

৮। হেগেলের 'যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান'-এর তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রবন্ধ 'ধারণা' সম্পর্কে লেনিনের নোট: 'বুঝতে হলে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুঝতে, অধ্যয়ন করতে শুরু করতে হবে এবং অভিজ্ঞতা থেকে সার্বজনীনতায় উন্নীত হতে হবে।' 'হেগেলের "যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান"-এর সংক্ষিপ্ত সার' দ্রষ্টব্য।

৯। ভি. আই. লেনিন, 'কী করতে হবে?' (শরৎকাল, ১৯০১-ফেব্রুয়ারী, ১৯০২) প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১০। ভি. আই. লেনিন, 'বস্তুবাদ এবং এমপিরিয়োক্রিটিসিজম', দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১১। জে. ভি. স্তালিন, 'লেনিনবাদের ভিত্তি' (এপ্রিল-মে ১৯২৪), তৃতীয় অংশ 'তত্ত্ব'।

১২। ভি. আই. লেনিন, 'বস্তুবাদ এবং এমপিরিয়োক্রিটিসিজম', দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দ্বন্দ্ব সম্পর্কে

(আগস্ট, ১৯৩৭)

বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের নিয়ম, অর্থাৎ বিপরীতের ঐক্যের নিয়ম হল বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের সবচেয়ে মৌলিক নিয়ম। লেনিন বলেছেন: 'প্রকৃত অর্থে দ্বন্দ্ববাদ হচ্ছে বস্তুর একেবারে সারমর্মে (essence) দ্বন্দ্বের পর্যালোচনা।'[১] লেনিন এই নিয়মকে প্রায়ই দ্বন্দ্ববাদের সারবস্তু বলতেন। তিনি এটাকে দ্বন্দ্ববাদের শাঁস বলেও অভিহিত করেছেন।[২] সুতরাং এই নিয়মটি নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে, আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এবং অনেক দার্শনিক সমস্যার আলোচনা করতে হবে। আমরা যদি এসব সমস্যা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ সম্পর্কে একটা মৌলিক উপলব্ধিতে পৌঁছাব। এই সমস্যাগুলো হচ্ছে: দুই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী, দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা, দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা, প্রধান দ্বন্দ্ব ও একটি দ্বন্দ্বের প্রধান দিক, দ্বন্দ্বের দিকগুলোর অভিন্নতা ও সংগ্রাম, দ্বন্দ্বে বৈরিতার স্থান।

সোভিয়েত দার্শনিক মহলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেবোরিন সম্প্রদায়ের[৩] ভাববাদের যে সমালোচনা করা হয়েছে, তা আমাদের মধ্যে গভীর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। দেবোরিনের ভাববাদ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অত্যন্ত বাজে প্রভাব বিস্তার করেছে। এমন কথা বলা যায় না যে, আমাদের পার্টির ভেতরে মতান্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে ঐ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন সম্পর্কে নেই। সুতরাং, দর্শন সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান পর্যালোচনার মূল লক্ষ্য হবে মতান্ধ চিন্তাধারার মূল উচ্ছেদ করা।

১। দুই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী

মানুষের জ্ঞানের ইতিহাসে বিশ্ব-জগতের বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে চিরকালই

দর্শন সম্পর্কে এই রচনাটি কমরেড মাও সে-তুঙ তার 'প্রয়োগ সম্পর্কে' রচনাটির পরে একই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ঐ যুগে পার্টির অভ্যন্তরে বিদ্যমান মতান্ধতাপ্রসূত চিন্তাধারার মারাত্মক ভুলগুলি শোধরানোর জন্য রচনা করেন। সর্বপ্রথমে ইয়েনানে জাপ-বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজে ভাষণরূপে প্রদত্ত এই রচনাটি 'মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী' তে অন্তর্ভুক্ত করবার সময়ে লেখক এটিকে সংশোধন করেন।

দুটি ধারণা চলে এসেছে : আধিবিদ্যক ধারণা এবং দ্বন্দ্ববাদী ধারণা। এ দুটির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে দুটি পরস্পর-বিরোধী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। লেনিন বলেছেন :

বিকাশের (বিবর্তনের) দুটি মূল (অথবা দুটি সম্ভাব্য ? অথবা দুটি ঐতিহাসিকভাবে লক্ষণীয় ?) ধারণা হচ্ছে : হ্রাস ও বৃদ্ধির মধ্যে পুনরাবৃত্তি হিসেবে বিকাশ ; বিপরীতের ঐক্য হিসেবে বিকাশ (পরস্পর ব্যতিরেকী বিপরীতে ঐক্যের বিভাজন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক)।[৪]

এখানে লেনিন এই দুটি পৃথক বিশ্বদৃষ্টির কথাই উল্লেখ করেছেন।

চীনে অধিবিদ্যার আর এক নাম **স্যুয়ান-স্যুয়ে**। ইতিহাসের এক সুদীর্ঘ-কাল জুড়ে চীনে হোক বা ইউরোপে হোক, এই ধরনের চিন্তা, যা ভাববাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, মানবিক চিন্তাধারায় প্রধান স্থান দখল করেছে। ইউরোপে প্রথমদিকে বুর্জোয়াদের বস্তুবাদও ছিল আধিবিদ্যক। ইউরোপের বহু দেশে সামাজিক অর্থনীতি যখন পুঁজিবাদের অত্যুন্নত স্তরে অগ্রসর হয়েছে, উৎপাদনশক্তি, শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিজ্ঞান সব কিছুই ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক স্তরে বিকশিত হয়েছে এবং শিল্প-সর্বহারাশ্রেণী ঐতিহাসিক বিকাশের বৃহত্তম চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে, কেবল তখনই বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর অভ্যুদয় ঘটেছে। এর পরে, প্রকাশ্য এবং নগ্ন প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদ ছাড়াও, বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে স্থূল বিবর্তনবাদের আবির্ভাব ঘটেছে বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের বিরোধিতা করার জন্য।

আধিবিদ্যক বা স্থূল বিবর্তনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন, নিশ্চল ও একদেশদর্শীভাবে দেখে। এটা বিশ্বের সকল বস্তুকে এবং তাদের রূপকে ও তাদের প্রজাতিকে (species) মনে করে চিরস্থায়ীভাবে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তন যা হয় তা কেবল পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি অথবা স্থানের পরিবর্তনে। তাছাড়া, এরকম হ্রাস বা বৃদ্ধি অথবা স্থানের পরিবর্তনের কারন বস্তুর ভেতরে নয়, বাইরে অবস্থিত, অর্থাৎ, এর চালিকাশক্তি রয়েছে বাইরে। আধিবিদ্যকদের মতে, বিশ্বে সকল বিভিন্ন প্রকারের বস্তু এবং তাদের সকল বৈশিষ্ট্য তাদের প্রথম সৃষ্টির কাল থেকে একই অবস্থায় আছে। পরবর্তীকালের যেটুকু পরিবর্তন হয় তা শুধু পরিমাণগত প্রসারণ বা সংকোচন। তাঁরা মনে করেন যে, চিরকাল ধরে একটা বস্তু কেবল একই প্রকারের বস্তু হিসেবে বারংবার নিজের পুনরাবৃত্তি করে যেতে পারে, কিন্তু কোন স্বতন্ত্র বস্তুতে পরিবর্তিত হতে পারে না। আধিবিদ্যকদের মতে ধনতান্ত্রিক

শোষণ, ধনতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতাদর্শ এবং অনুরূপ সবকিছুই প্রাচীন দাসসমাজে বা এমনকি আদিম সমাজেও বর্তমান ছিল, এবং এগুলো চিরকাল অপরিবর্তিতভাবেই বিদ্যমান থাকবে। তাঁরা সামাজিক বিকাশের কারণগুলো দেখিয়ে থাকেন ভূগোল ও আবহাওয়ার মতো সমাজের বাহ্যিক উপাদানের ওপর। তাঁরা বস্তুর বাইরে ঐ বস্তুর বিকাশের কারণগুলোকে খুঁজে থাকেন অতি সরলীকৃত পন্থায়, এবং বস্তুর বিকাশ যে তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই ঘটে থাকে—এই বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মতবাদটিকেই তাঁরা অস্বীকার করেন। ফলে, তাঁরা বস্তুর গুণগত বিভিন্নতা, বা এক গুণের অন্য গুণে পরিবর্তনের মতো ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। ইউরোপে এই ধরনের চিন্তা ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে যান্ত্রিক বস্তুবাদ হিসেবে এবং ১৯শ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্থূল বিবর্তনবাদ হিসেবে বিদ্যমান ছিল। চীনেও যে আধিবিদ্যক চিন্তাধারার অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ এই উক্তিটি—'স্বর্গের পরিবর্তন নেই, সেইরূপ তাও-ও অপরিবর্তনীয়'[৫]। এই মতবাদ দীর্ঘকাল ধরে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক শাসক-শ্রেণীগুলোর সমর্থন পেয়ে এসেছে। গত একশ বছর ধরে ইউরোপ থেকে যা আমদানি করা হয়েছে সেই যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও স্থূল বিবর্তনবাদ পেয়েছে বুর্জোয়া-শ্রেণীর সমর্থন।

আধিবিদ্যক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতে, বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী মনে করে যে, কোন বস্তুর বিকাশ বোঝার জন্য আমাদের বস্তুর অভ্যন্তর এবং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্কগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। অন্য কথায়, বস্তুর বিকাশকে তার আভ্যন্তরীণ ও আবশ্যিক নিজস্ব গতিরূপেই দেখতে হবে। আর প্রত্যেক বস্তুই তার গতিধারায় চতুর্দিকের অন্যান্য বস্তুসমূহের সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পরের ওপর ক্রিয়া করে। বস্তুর বিকাশলাভের মৌলিক কারণ বাহ্যিক নয়, আভ্যন্তরীণ, বস্তুর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই এটা নিহিত। যে-কোন বস্তুর ভেতরে এই ধরনের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, সেটাই বস্তুর গতি ও বিকাশ ঘটায়। বস্তুর ভেতরকার এই ধরনের দ্বন্দ্বই হচ্ছে বস্তুর বিকাশলাভের মৌলিক কারণ। আর অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে কোন একটা বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া হচ্ছে বস্তুর বিকাশলাভের গৌণ কারণ। এইভাবে, বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ কার্যকরীভাবে আধিবিদ্যক যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও স্থূল বিবর্তনবাদ কর্তৃক প্রচারিত বাহ্যিক কারণ বা বাহ্যিক চালিকাশক্তি সংক্রান্ত তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান

করে। এটা পরিষ্কার যে, নিছক বাহ্যিক কারণ থেকে শুধুমাত্র যান্ত্রিক গতিই সৃষ্টি হতে পারে, অর্থাৎ আকৃতিগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু কেন যে বস্তুসমূহ হাজারো দিক দিয়ে গুণগতভাবে পৃথক এবং কেনইবা একে অন্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়, বাহ্যিক কারণ তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বাস্তবিক-পক্ষে, এমনকি বহিঃশক্তির তাড়নায় কোন বস্তুর যান্ত্রিক গতিও তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই উৎপন্ন হয়। গাছপালা ও জীবজন্তুর সহজ বৃদ্ধি এবং পরিমাণগত বিকাশও প্রধানতঃ তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলেই ঘটে। একইভাবে, সমাজের বিকাশ প্রধানতঃ বাহ্যিক কারণে নয়, আভ্যন্তরীণ কারণেই ঘটে। বহু দেশে প্রায়ই একই ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত অবস্থা বিদ্যমান, তথাপি বিকাশের দিক থেকে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ও অসমতা রয়েছে। অধিকন্তু, একটি দেশের ভূগোল ও জলবায়ু অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও, সেই দেশেই সমাজের বিরাট পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং বাইরের দুনিয়ার কাছে রুদ্ধদ্বার সামন্ততান্ত্রিক জাপান পরিবর্তিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী জাপানে, অথচ দেশ দুটির ভূগোল ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘকালব্যাপী সামন্তব্যবস্থার অধীনস্থ চীনে গত একশ বছরে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে, এখন তা স্বাধীন ও মুক্ত এক নতুন চীনের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে, তবুও চীনের ভূগোল ও জলবায়ুর কোন পরিবর্তন হয়নি। সমগ্র পৃথিবী এবং তার প্রত্যেকটি অংশে ভূগোল ও জলবায়ুরও অবশ্যই পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে, কিন্তু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করলে সেগুলো অকিঞ্চিৎকর। ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত পরিবর্তন লক্ষ লক্ষ বছরে আত্মপ্রকাশ করে, আর বিপ্লবের সময়ে সামাজিক পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে কয়েক হাজার, কয়েক শ' বছরে অথবা কয়েক দশকে এবং এমনকি, কয়েক বছরে বা মাসে। বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ অনুযায়ী, প্রকৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে প্রধানতঃ প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিকাশের ফলে। সমাজের পরিবর্তন ঘটে প্রধানতঃ সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিকাশের ফলে, অর্থাৎ উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং নূতন ও পুরানোর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ফলে। এই দ্বন্দ্বগুলোর বিকাশই সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয় এবং নূতন কর্তৃক পুরানো সমাজকে ধ্বংসের প্রেরণা দেয়। বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ কি বাহ্যিক কারণকে বাতিল করে? মোটেই না। বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মতে বাহ্যিক কারণ হচ্ছে

পরিবর্তনের শর্ত, আর আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের ভিত্তি। আভ্যন্তরীণ কারণের মাধ্যমেই বাহ্যিক কারণ সক্রিয় হয়। উপযুক্ত তাপেই মুরগীর ডিম মুরগীর ছানায় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কোন তাপই পাথরকে মুরগীর ছানায় পরিবর্তিত করতে পারে না, কারণ এ দুইয়ের ভিত্তি ভিন্ন। বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে অবিরাম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে। ধনতন্ত্রের যুগে, এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাত অত্যন্ত বেশি। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু রুশ ইতিহাসে নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও এক নূতন যুগের সূচনা করেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের উপর এবং সমভাবে ও বিশেষ গভীরভাবে, চীনের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য ঐ পবিবর্তনগুলো চীনসহ ঐ দেশগুলোর বিকাশের আভ্যন্তরীণ নিয়মবিধির মধ্যে দিয়েই কার্যকরী হয়েছে। দুটি সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ হলে একটি জয়ী হয় এবং অন্যটি পরাজিত হয়। জয় ও পরাজয় উভয়ই আভ্যন্তরীণ কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। জয়ী যে হল তার কারণ, হয় সে শক্তিশালী, না হয় তার পরিচালনা সুযোগ্য। আর যে পরাজিত হল তার কারণ, হয় সে দুর্বল, না হয় তার পরিচালনা অযোগ্য। আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে দিয়েই বাহ্যিক কারণ সক্রিয় হয়। ১৯২৭ সালে চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে সর্বহারাশ্রেণীর পরাজয় ঘটেছিল সে সময়ে চীনা সর্বহারাশ্রেণীর ভেতরে (চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে) বিরাজমাণ সুবিধাবাদের মধ্যে দিয়ে। যখন আমরা এই সুবিধাবাদকে নির্মূল করলাম, চীনা বিপ্লবের অগ্রগতি আবার শুরু হল। পরবর্তীকালে, শত্রুর হাতে চীনা বিপ্লবের পুনরায় গুরুতর বিপর্যয় ঘটেছিল, কারণ আমাদের পার্টির মধ্যে হঠকারিতার উদ্ভব হয়েছিল। যখন আমরা হঠকারিতা নির্মূল করলাম, তখন আমাদের আদর্শ আবার অগ্রসর হল। সুতরাং এটা দেখা যাচ্ছে যে, বিপ্লবকে বিজয়ের দিকে পরিচালনা করতে হলে, একটি রাজনৈতিক পার্টিকে অবশ্যই তার রাজনৈতিক লাইনের নির্ভুলতা ও নিজস্ব সংগঠনের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করতে হবে।

দ্বন্দ্ববাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী চীনে এবং ইউরোপে প্রাচীনকালেই দেখা দেয়। কিন্তু প্রাচীন দ্বন্দ্ববাদের ছিল কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাদামাঠা চরিত্র। সেকালে বিরাজমান সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থায়, তখন পর্যন্ত প্রাচীন দ্বন্দ্ববাদ

একটা তত্ত্বগত প্রণালী গড়ে তুলতে সক্ষম ছিল না। সেজন্য তা বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি এবং পরে অধিবিদ্যা দ্বারা স্থানচ্যুত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল দ্বন্দ্ববাদে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, কিন্তু তাঁর দ্বন্দ্ববাদ ছিল ভাববাদী। সর্বহারা আন্দোলনের মহান নেতা মার্কস ও এঙ্গেলস যখন মানবিক জ্ঞানের ইতিহাসের যথার্থ কীর্তিগুলির সমন্বয় সাধন করে, বিশেষ করে সমালোচনাত্মক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের যুক্তিপূর্ণ উপাদানগুলো গ্রহণ করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মহান তত্ত্ব গড়ে তুললেন, তখনই মানবিক জ্ঞানের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব মহাবিপ্লব সংগঠিত হল। লেনিন ও স্তালিন এই মহান তত্ত্বকে আরও বিকশিত করেন। চীনে এই তত্ত্ব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের চিন্তাজগতে প্রচণ্ড এক পরিবর্তন ঘটে গেল।

এই দ্বন্দ্ববাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী আমাদের প্রধানতঃ শিক্ষা দেয় কেমন করে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের গতিকে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতে হবে, এবং সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কেমন করে দ্বন্দ্বগুলির সমাধানের উপায় বের করতে হবে। এ জন্যই বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের নিয়মকে মূর্তভাবে বোঝা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২। দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা

ব্যাখ্যার সুবিধার্থে আমি প্রথমে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতার কথা আলোচনা করব এবং তার পরে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতার কথায় আসব। দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ মার্কসবাদের মহান স্রষ্টা ও উত্তরসূরীরা—মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী আবিষ্কৃত হবার পর এবং বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদকে মানবিক ইতিহাস ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের নানা দিকের বিশ্লেষণে এবং সমাজ ও প্রকৃতির নানা দিকের পরিবর্তন সাধনে (যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে) প্রয়োগ করে বিপুল সাফল্য অর্জিত হবার পর থেকে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা এখনও অনেক কমরেড, বিশেষ করে মতান্ধরা পরিষ্কারভাবে বোঝেন না। তাঁরা বোঝেন না যে, দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতার মধ্যেই দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা নিহিত। তাঁরা এটাও বোঝেন না যে, বিপ্লবী

প্রয়োগের গতিপথ নির্দেশের জন্য আমাদের সামনের মূর্ত বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনা করা কত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনার উপর জোর দেওয়া এবং তা যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। এই কারণে বস্তুর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের নিয়মের বিশ্লেষণে আমরা প্রথম দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা বিশ্লেষণ করব, পরে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা বিশ্লেষণের উপর বিশেষ জোর দেব এবং পরিশেষে আবার দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতায় ফিরে আসব।

দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা বা অনাপেক্ষিকতার দুটো অর্থ আছে। একটি হচ্ছে, সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকে ; এবং অপরটি হচ্ছে, প্রত্যেক বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বের গতি বিদ্যমান থাকে।

এঙ্গেলস, বলেছেন : 'গতি নিজেই একটি দ্বন্দ্ব।'[৬] লেনিন বিপরীতের ঐক্যের নিয়মের সংজ্ঞাকে 'প্রকৃতির (মন ও সমাজ সহ) সমস্ত দৃশ্যমান ঘটনা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর বিরোধী, পরস্পর ব্যতিরেকী ও বিপরীত প্রবণতার স্বীকৃতি (আবিষ্কার), বলে বর্ণনা করেছেন।[৭] এইসব অভিমত কি সঠিক? হ্যাঁ, সঠিক। সকল বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বী দিনগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সংগ্রাম সকল বস্তুর জীবনকে নির্ধারণ করে এবং সকল বস্তুর বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এমন কিছুই নেই যার মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্ব ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়।

দ্বন্দ্ব হচ্ছে গতির সরল রূপগুলোর (যেমন, যান্ত্রিক গতি) ভিত্তি। গতির জটিল রূপগুলোর ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি প্রযোজ্য।

এঙ্গেলস দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে :

যদি সরল যান্ত্রিক স্থান পরিবর্তনের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে বস্তুর গতির উচ্চতর রূপের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জৈব জীবন ও তার বিকাশের ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য।...জীবন হচ্ছে প্রধানতঃ ও নিশ্চিতরূপে এই যে কোন জীবন্ত জিনিস প্রতি মুহূর্তে সে নিজে যা তাই, অথচ আবার অন্য কিছু। অতএব জীবনও একটি দ্বন্দ্ব, যা বস্তুসমূহের ও প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে বিদ্যমান, এবং যা অবিরামভাবে নিজেকে উৎপন্ন ও বিশ্লিষ্ট করে। এবং যে মুহূর্তে দ্বন্দ্ব থেমে যাই সেই মুহূর্তে জীবনও শেষ হয়ে যায় এবং মৃত্যু এগিয়ে আসে। আমরা অনুরূপভাবে দেখেছি যে, চিন্তার ক্ষেত্রেও আমরা দ্বন্দ্বকে এড়াতে পারিনি এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখেছি, যে, একদিকে মানুষের অন্তর্নিহিত

সীমাহীন জ্ঞানার্জন-ক্ষমতা, অন্যদিকে যে মানুষেরা, বাহ্যিক দিক দিয়ে সীমবেদ্ধ ও সীমিত জ্ঞানের অধিকারী কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই এই জ্ঞানার্জন-ক্ষমতার বাস্তব রূপায়ণ—এই দুয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তার সমাধান প্রাপ্ত হয়, অন্তত: আমাদের পক্ষে, কার্যত: পুরুষানুক্রমিক ধারায় এবং অনন্ত প্রগতিতে

…উচ্চতর গণিতের মূল নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই দ্বন্দ্ব যে, বিশেষ অবস্থায় সরল ও বক্ররেখা অভিন্ন হয়ে পড়তে পারে।…

এমনকি নিম্নতর গণিতও দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ।[৮]

লেনিনও এইভাবে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতাকে ব্যাখ্যা করেছেন :

গণিতে: + ও—, অন্তরকলন (Differential) ও সমাকলন (Integral)।

বলবিদ্যায় : ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

পদার্থবিদ্যায় : ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ।

রসায়নে : পরমাণুগুলির সংযোজন ও বিয়োজন।

সমাজবিজ্ঞানে : শ্রেণী-সংগ্রাম।[৯]

যুদ্ধে, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা, অগ্রাভিযান ও পশ্চাদপসরণ এবং বিজয় ও পরাজয় সবই হচ্ছে পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার। একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। দুটি দিক একই সঙ্গে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ও নির্ভরশীল এবং এটাই একটি যুদ্ধের সমগ্রতাকে গঠন করে, যুদ্ধের বিকাশকে সামনে ঠেলে দেয় এবং যুদ্ধের সমস্যাগুলোর সমাধান করে।

মানুষের ধারণায় প্রতেকটি পার্থক্যকে দেখতে হবে বাস্তব দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসেবে। বাস্তব দ্বন্দ্ব আত্মমুখী চিন্তায় প্রতিফলিত হয় এবং এই প্রক্রিয়া ধারণার দ্বন্দ্বের গতির জন্ম দেয়, চিন্তার বিকাশকে সামনে ঠেলে দেয় এবং অবিরামভাবে মানুষের চিন্তার সমস্যাগুলোর সমাধান করে।

পার্টির ভেতরে বিভিন্ন রকমের চিন্তাধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রাম নিরন্তর চলতে থাকে। এ হচ্ছে পার্টির ভেতরে সমাজের শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের এবং নূতন ও পুরানোর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। পার্টির ভেতরে যদি কোন দ্বন্দ্ব না থাকত এবং তা সমাধান করার জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম না থাকত, তাহলে পার্টির জীবনই শেষ হয়ে যেত।

সুতরাং এটা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার যে, গতির সরল রূপেই হোক বা গতির জটিল রূপেই হোক, বস্তুগত ব্যাপারেই হোক বা মতাদর্শগত ব্যাপারেই হোক,

দ্বন্দ্ব সর্বজনীনভাবে বিদ্যমান এবং সকল প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান। কিন্তু প্রত্যেক প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক স্তরেও কি দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকে? প্রত্যেকটি বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি দ্বন্দ্বের গতি বিদ্যমান থাকে?

দেবোরিন সম্প্রদায়ের সমালোচনা করে লেখা সোভিয়েত দার্শনিকদের নিবন্ধগুলো থেকে জানা যায়, ঐ সম্প্রদায়ের মতে, শুরুতে নয়, বরং যখন কোন প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়, কেবল তখন দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে। যদি তাই হতো তাহলে ঐ স্তরের পূর্বে প্রক্রিয়াটির বিকাশের কারণ হতো আভ্যন্তরীণ নয়, বাহ্যিক। দেবোরিন এইভাবে অধিবিদ্যার বাহ্যিক কারণের ও যান্ত্রিকতার তত্ত্বে ফিরে গেছেন। মূর্ত সমস্যার বিশ্লেষণে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে দেবোরিন সম্প্রদায় সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরাজমান অবস্থায় কুলাক ও সাধারণ কৃষকদের মধ্যে কেবল পার্থকই দেখেন, দ্বন্দ্ব দেখেন না, এবং বুখারিনের সঙ্গে সর্বতোভাবে একমত হয়ে যান[10]। ফরাসী বিপ্লবের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, অনুরূপভাবে বিপ্লবের আগে শ্রমিক, কৃষক ও বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত তৃতীয় এষ্টেটের মধ্যে শুধু পার্থক্যই ছিল, দ্বন্দ্ব ছিল না। দেবোরিন সম্প্রদায়ের এসব মত মার্কসবাদবিরোধী। তাঁরা বোঝেন না যে, প্রত্যেক পার্থক্যের মধ্যেই রয়েছে দ্বন্দ্ব এবং পার্থক্য নিজেই হচ্ছে দ্বন্দ্ব। শ্রমিক ও পুঁজিপতিশ্রেণীর দুটির জন্মের সময় থেকেই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, তবে প্রথমে এই দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠেনি। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরাজমান সামাজিক অবস্থাতেও শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যই হচ্ছে দ্বন্দ্ব, যদিও শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্বের মতো এটা শত্রুতামূলকভাবে তীব্র হয়ে উঠবে না বা শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করবে না। সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে দৃঢ় মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে অগ্রগতির পথে ক্রমে এই দ্বন্দ্বের সমাধান হয়ে যাবে। এটি দ্বন্দ্বের চরিত্রে পার্থক্যের প্রশ্ন, দ্বন্দ্বের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির প্রশ্ন নয়। দ্বন্দ্ব সর্বজনীন ও অনাপেক্ষিক এবং এটা সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান এবং সকল প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান।

একটি নূতন প্রক্রিয়ায় আবির্ভাব দ্বারা কি বোঝায়? যখন পুরানো ঐক্য ও তার মধ্যেকার বিপরীত উপাদানগুলোর বদলে এক নূতন ঐক্য ও তার নিজস্ব বিপরীত উপাদানগুলো আবির্ভূত হয়, তখন পুরানো প্রক্রিয়ার স্থলে শুরু হয় এক নূতন প্রক্রিয়া। পুরানো প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় এবং নূতন প্রক্রিয়া শুরু

হয়। নূতন প্রক্রিয়ায় নিহিত থাকে নূতন দ্বন্দ্ব এবং এই নূতন প্রক্রিয়া দ্বন্দ্বের বিকাশের নিজস্ব ইতিহাসের সূচনা করে।

লেনিন দেখিয়েছেন যে, সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে দ্বন্দ্বের গতি বিদ্যমান থাকে, সেই সম্বন্ধ মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এক আদর্শ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। যে-কোন বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়াকে পর্যালোচনা করতে হলে এই পদ্ধতি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। লেনিন নিজেও সঠিকভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে গেছেন এবং তাঁর সব রচনায় তা অনুসরণ করেছেন।

> মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন বুর্জোয়া (পণ্য) সমাজের সবচেয়ে সরল, সবচেয়ে সাধারণ, সবচেয়ে মৌলিক, সবচেয়ে সর্বজনীন, সবচেয়ে প্রাত্যহিক সম্পর্কটির, কোটি কোটি বার দেখা দিচ্ছে এমন সম্পর্কটির, অর্থাৎ পণ্য বিনিময়ের। বিশ্লেষণ এই অতি সরল দৃশ্যমান ঘটনাটিতেই (বুর্জোয়া সমাজের এই 'জীবকোষ'-টিতে) আধুনিক সমাজের সকল দ্বন্দ্বকে (বা সকল দ্বন্দ্বের বীজকে) তুলে ধরে। পরবর্তী ব্যাখ্যা আমাদের দেখিয়ে দেয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সব দ্বন্দ্বের এবং এই সমাজের আলাদা আলাদা অংশের যোগফলের বিকাশ (বৃদ্ধি ও গতি উভয়ই)।

এর পর লেনিন আরও বলেছেন : 'সাধারণভাবে দ্বন্দ্ববাদকে ব্যাখ্যার (বা পর্যালোচনার) পদ্ধতি এরকমই হতে হবে।'[১১]

চীনের কমিউনিস্টদের অবশ্যই এই পদ্ধতি শিখতে হবে। কেবল তাহলেই তাঁরা সঠিকভাবে চীনের বিপ্লবের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করতে এবং বিপ্লবের ভবিষ্যৎ অনুমান করতে সক্ষম হবেন।

৩। দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা

সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান এবং প্রত্যেক বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান। এটাই হচ্ছে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও অনাপেক্ষিকতা, যা আমরা উপরে আলোচনা করেছি। এখন আমরা দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এই সমস্যাটি কয়েকটি পর্যায়ে পর্যালোচনা করতে হবে।

প্রথমতঃ, পদার্থের গতির প্রত্যেক রূপের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিজস্ব বিশিষ্টতা

রয়েছে। পদার্থ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান হচ্ছে পদার্থের গতির রূপগুলো সম্পর্কে জ্ঞান, কারণ গতিশীল পদার্থ ছাড়া বিশ্বে অন্য কিছুই নেই এবং এই গতিকে অবশ্যই কোন রূপ পরিগ্রহ করতে হবে। পদার্থের গতির প্রত্যেকটি রূপ বিচার করার সময়, ঐ রূপের সঙ্গে গতির অন্যান্য রূপের যেসব বিষয়ে মিল রয়েছে, তা লক্ষ্য করতে হবে। কিন্তু বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হবে, অর্থাৎ ঐ রূপের সঙ্গে গতির অন্যান্য রূপের গুণগত পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। তা করলেই কেবল আমরা বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব। গতির যে-কোন রূপের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে তার নিজস্ব বিশেষ দ্বন্দ্ব। এই বিশেষ দ্বন্দ্বই হচ্ছে সেই বিশেষ সারবস্তু, যা একটা বস্তুকে অপর বস্তু থেকে পৃথক করে। এটা হচ্ছে বিশ্বের বস্তুসমূহের বহু বৈচিত্র্যের আভ্যন্তরীণ কারণ বা ভিত্তি। প্রকৃতিতে গতির অনেক রূপ আছে, যেমন যান্ত্রিক গতি, শব্দ, আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, বিয়োজন ও সংযোজন প্রভৃতি। পদার্থের এই সমস্ত গতির রূপই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু সারবস্তুতে পরস্পর থেকে আলাদা। পদার্থের প্রত্যেক গতির রূপের বিশেষ সারবস্তু নির্ধারিত হয় তার নিজস্ব বিশেষ দ্বন্দ্ব দ্বারা। কেবল প্রকৃতির বেলায় নয়, বরং সমাজসংক্রান্ত ও মতাদর্শগত ব্যাপারেও এটা সত্য। প্রতিটি সামাজিক রূপ ও প্র তটি মতদের্শগত রূপের রয়েছে নিজস্ব বিশেষ দ্বন্দ্ব এবং বিশেষ সারবস্তু।

বিজ্ঞানকে পৃথক করা হয় পর্যালোচনার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর বিশেষ দ্বন্দ্বগুলোর ভিত্তিতে। এইভাবে কোন বিষয়ের বিশেষ কোন দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট শাখার পর্যালোচনার বিষয়বস্তু। যেমন, গণিতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রাশি; বলবিদ্যায় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া; পদার্থবিদ্যায় ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ, রসায়নে বিয়োজন ও সংযোজন; সমাজবিজ্ঞানে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংগ্রাম; রণবিজ্ঞানে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা; এবং দর্শনে ভাববাদ ও বস্তুবাদ, অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গী ও দ্বন্দ্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি—এ সবই হচ্ছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিচার্য বিষয়। এবং এটা ঠিক এই কারণেই যে, প্রত্যেক শাখারই রয়েছে বিশেষ দ্বন্দ্ব ও বিশেষ সারবস্তু। অবশ্য, দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে বস্তুর গতি বা বিকাশের সর্বজনীন কারণ বা সর্বজনীন ভিত্তি আবিষ্কার করার কোন উপায় আমাদের থাকে না। পক্ষান্তরে, দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনা না করলে আমাদের পক্ষে একটি বস্তুর

বিশেষ সারবস্তুকে—যা অন্যান্য বস্তু থেকে তাকে পৃথক করে—নির্ণয় করার কোন উপায় থাকে না, বস্তুর গতি বা বিকাশের বিশেষ কারণ বা বিশেষ ভিত্তি আবিষ্কার করার কোন উপায় থাকে না, উপায় থাকে না একটি বস্তুকে অন্যটি থেকে আলাদা করার বা বিজ্ঞানের বিষয়গুলির সীমানা নির্দেশ করার।

মানুষের জ্ঞানের গতির পর্যায়ক্রম সম্পর্কে বলা যায়, সর্বদাই স্বতন্ত্র ও বিশেষ বস্তুর জ্ঞান থেকে সাধারণভাবে সকল বস্তুর জ্ঞানে একটা ক্রমিক বিকাশ রয়েছে। মানুষ নানা বিভিন্ন বস্তুর বিশেষ সারবস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পরই কেবল সাধারণীকরণের দিকে অগ্রসর হতে এবং বস্তুসমূহের অভিন্ন সারবস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। এই অভিন্ন সারবস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পর মানুষ এটাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করে, যেসব মূর্ত বস্তু এখনও পর্যালোচন করা হয়নি অথবা পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করা হয়নি, সেগুলো পর্যালোচনা করার এবং সেগুলোর বিশেষ সারবস্তু আবিষ্কার করার কাজে অগ্রসর হয়। কেবল এইভাবেই মানুষ ঐ বস্তুসমূহের অভিন্ন সারবস্তু সম্পর্কে নিজের জ্ঞানকে বাড়াতে, সমৃদ্ধ করতে ও বিকশিত করতে পারে এবং এই জ্ঞানের ক্ষয় বা পচন রোধ করতে পারে। জ্ঞানের প্রক্রিয়া এই দুটি: একটি বিশেষ থেকে সাধারণে এবং অন্যটি সাধারণ থেকে বিশেষে। এইভাবে মানবের জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া সর্বদাই চক্রাকারে আবর্তিত হয় এবং প্রত্যেক চক্র (যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক পন্থা কঠোরভাবে অনুসৃত হয়) মানবিক জ্ঞানকে এক ধাপ উঁচুতে এগিয়ে দেয় এবং এইভাবে আরও বেশি গভীর করে তোলে। এ ব্যাপারে আমাদের মতান্ধরা যেখানে ভুল করেন তা হচ্ছে এই যে, একদিকে, তাঁরা বোঝেন না যে, দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতাকে এবং বস্তুসমূহের অভিন্ন সারবস্তুকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পাবার আগে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতাকে পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রত্যেকটি বস্তুর বিশেষ সারবস্তুকে জানতে হবে। অপরদিকে, তাঁরা বোঝেন না যে, বস্তুর অভিন্ন সারবস্তু বোঝার পর আমাদের আরও অগ্রসর হয়ে, যেসব মূর্ত বস্তু পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করা হয়নি বা সবেমাত্র উদ্ভূত হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদের মতান্ধরা হাড়ে হাড়ে অলস। তাঁরা ধৈর্যসহকারে মূর্ত বস্তুর পর্যালোচনা করতে নারাজ। তাঁরা সাধারণ সত্যগুলোকে শূন্যতার মধ্য থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য করেন এবং সেগুলোকে শুধুমাত্র বিমূর্ত দুর্বোধ্য সূত্রে পরিণত করেন। তার ফলে যে স্বাভাবিক পর্যায়ক্রম দ্বারা সত্যকে মানুষ জানতে পারে, তাকে তারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং উল্টে

দেন। বিশেষ থেকে সাধারণে এবং তারপর সাধারণ থেকে বিশেষে—মানবিক জ্ঞানের এই দুটি প্রক্রিয়ার পারস্পরিক সংযোগও তাঁরা বোঝেন না। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্ব তাঁরা আদৌ বোঝেন না।

কেবল পদার্থের গতির রূপসমূহের প্রত্যেকটি বড় ব্যবস্থার বিশেষ দ্বন্দ্বকে এবং এর দ্বারা নির্ধারিত সারবস্তুকেই নয়, উপরন্তু পদার্থের গতির প্রত্যেকটি রূপের বিকাশের দীর্ঘ ধারায় প্রত্যেক প্রক্রিয়ার বিশেষ দ্বন্দ্বকে এবং সারবস্তুকেও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। গতির প্রত্যেকটি রূপে বিকাশের প্রত্যেকটি বাস্তব (কাল্পনিক নয়) প্রক্রিয়া গুণগতভাবে পৃথক। আমাদের পর্যালোচনায় এই বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে এবং এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

গুণগতভাবে ভিন্ন দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান কেবলমাত্র গুণগতভাবে ভিন্ন পদ্ধতির দ্বারাই করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; ব্যাপক জনসাধারণ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; উপনিবেশসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব কৃষির যৌথীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের পদ্ধতির দ্বারা সমাধান করা হয়; কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার দ্বন্দ্ব সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; সমাজের ও প্রকৃতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব উৎপাদন-শক্তির বিকাশসাধনের দ্বারা মীমাংসা করা হয়। প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হয়, পুরানো প্রক্রিয়া ও পুরানো দ্বন্দ্ব বিলীন হয়ে যায়, নূতন প্রক্রিয়া ও নূতন দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হয়, এবং দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসার পদ্ধতিও সেই অনুযায়ী ভিন্ন হয়। রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারী বিপ্লব যে দ্বন্দ্বের সমাধান করে এবং অক্টোবর বিপ্লব যে দ্বন্দ্বের সমাধান করে, তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে, পার্থক্য আছে তাদের সমাধানের পদ্ধতির মধ্যেও। ভিন্ন দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে এমন একটা মূলনীতি, যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের অবশ্যই কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। মতান্ধরা এই মূলনীতি মেনে চলেন না। তাঁরা বোঝেন না যে, বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবে অবস্থার পার্থক্য ঘটে, এবং এজন্য এটাও বোঝেন না যে, ভিন্ন দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা দরকার। পক্ষান্তরে, যেটাকে তাঁরা অপরিবর্তনীয় সূত্র বলে ধরে নেন, সেটাকেই ব্যতিক্রমহীনভাবে

অবলম্বন করেন এবং সর্বত্র নির্বিচারে প্রয়োগ করেন। এটা কেবল বিপ্লবের বিপত্তিই ঘটায়, বা যা বেশ সুষ্ঠুভাবেই সমাপ্ত হতে পারত তাতে একটা শোচনীয় তালগোল পাকিয়ে তোলে।

একটা বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বগুলোর সমগ্রতায় ও পারস্পরিক সংযোগে দ্বন্দ্বগুলোর বিশিষ্টতাকে উদ্‌ঘাটন করার জন্য অর্থাৎ ঐ প্রক্রিয়ার সারবস্তুকে উদ্‌ঘাটন করার জন্য, ঐ প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বগুলোর সবদিকের বিশিষ্টতাকে উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন। অন্যথায় ঐ প্রক্রিয়ার সারবস্তুকে উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব হবে। তার পর্যালোচনায়ও আমাদের গভীরভাবে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

কোন বড় বস্তু বা বিষয়ের বিকাশের ধারায় বহু দ্বন্দ্ব থাকে। যেমন, চীনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারায় পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। সেখানে চীনের সমাজের সকল নিপীড়িত শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, ব্যাপক জনসাধারণ এবং সামন্তব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সর্বহারাশ্রেণী এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, একদিকে কৃষকশ্রেণী ও শহরে পেটি-বুর্জোয়া এবং অন্যদিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বর্তমান রয়েছে। এইসব দ্বন্দ্বের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকার জন্য একইভাবে তাদেরকে মোকাবিলা করা যায় না। তাছাড়া প্রত্যেক দ্বন্দ্বের দুটি দিকের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকে বলে একইভাবে তাদেরকেও মোকাবিলা করা যায় না। আমরা যারা চীনা বিপ্লবে নিয়োজিত রয়েছি, তাদের কেবল দ্বন্দ্বগুলোর সমগ্রতায় অর্থাৎ পারস্পরিক সংযোগে দ্বন্দ্বগুলোর বিশিষ্টতাকে বুঝলেই চলবে না, পরন্তু, প্রত্যেক দ্বন্দ্বের দুটি দিককেই পর্যালোচনা করতে হবে। সমগ্রতাকে বুঝতে হলে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। যখন আমরা একটা দ্বন্দ্বের প্রত্যেকটি দিককে জানার কথা বলি, তখন আমরা প্রত্যেকটি দিক কোন্ নির্দিষ্ট অবস্থান অধিকার করে, প্রত্যেকটি দিক তার বিপরীতের সঙ্গে পরস্পর নির্ভরশীলতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন্ মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে এবং দিক দুটির পরস্পর নির্ভরশীলতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ভেঙে পড়ার পরে প্রত্যেকটি দিক তার বিপরীতের সঙ্গে সংগ্রামে কোন্ মূর্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে, তা জানার কথাই বলি। এই সমস্ত সমস্যার পর্যালোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন যখন বলেছেন, মার্কসবাদের একান্ত সারবস্তু এবং মার্কসবাদের জীবন্ত মর্মবস্তু হচ্ছে মূর্ত অবস্থা-

সমূহের মূর্ত বিশ্লেষণ[১২]—তখন তিনি ঠিক একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমাদের মতান্ধরা লেনিনের শিক্ষাকে লংঘন করেছেন। তাঁরা কখনও কোন কিছুকে মূর্তভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য মাথা ঘামান না। তাঁদের লেখায় ও বক্তৃতায় তাঁরা সর্বদাই অর্থহীন ও শূন্যগর্ভ একঘেয়ে রচনার কায়দা অবলম্বন করেন, এবং তার ফলে আমাদের পার্টিতে কাজের অত্যন্ত বাজে রীতি সৃষ্টি করেন।

সমস্যার পর্যালোচনার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই আত্মমুখিতা, একদেশ-দর্শিতা ও ওপর ওপর দেখা পরিত্যাগ করতে হবে। যাকে আত্মমুখিতা বলে, তা হল সমস্যাকে বাস্তবভাবে না দেখা, অর্থাৎ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে সমস্যাকে না দেখা। আমার 'প্রয়োগ সম্পর্কে' নিবন্ধে এই বিষয়ে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। একদেশদর্শিতার অর্থ হচ্ছে সমস্যাকে সব দিক থেকে না দেখা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেবল চীনকে বোঝা—জাপানকে নয়, কেবল কমিউনিস্ট পার্টিকে বোঝা—কুওমিনতাঙকে নয়, কেবল সর্বহারাশ্রেণীকে বোঝা—বুর্জোয়াশ্রেণীকে নয়, কেবল কৃষককে বোঝা—জমিদারকে নয়, কেবল অনুকূল অবস্থাগুলোকে বোঝা—প্রতিকূল অবস্থাগুলোকে নয়, কেবল অতীতকে বোঝা—ভবিষ্যৎকে নয়, কেবল অংশকে বোঝা—সমগ্রকে নয়, কেবল ত্রুটিকে বোঝা—সাফল্যকে নয়, কেবল ফরিয়াদীকে বোঝা—আসামীকে নয়, কেবল গোপন বিপ্লবী কাজকে বোঝা—প্রকাশ্য বিপ্লবী কাজকে নয়, ইত্যাদি। এক কথায়, এর অর্থ একটা দ্বন্দ্বের উভয় দিকের বৈশিষ্ট্যগুলোকে না বোঝা। একটা সমস্যাকে একদেশদর্শীভাবে দেখা বলতে আমরা এটাই বোঝাতে চাই। অথবা বলা যায় যে, শুধু অংশবিশেষকে দেখা, সমগ্রকে নয়; শুধু বৃক্ষগুলোকেই দেখা, অরণ্যকে নয়। এইভাবে কোন দ্বন্দ্বের সমাধানের পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, অসম্ভব বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করা, অসম্ভব অর্পিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করা, অসম্ভব পার্টির আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত সংগ্রামকে সঠিকভাবে বিকশিত করে তোলা। সামরিক বিজ্ঞান প্রসঙ্গে সুন উ জু বলেছিলেন, 'শত্রুকে জানুন, আর নিজেকে জানুন, তাহলে একশ বার যুদ্ধ করলেও পরাজিত হবেন না।'[১৩] তিনি এখানে যুদ্ধরত দুটি পক্ষের উল্লেখ করেছেন। থাং রাজবংশের আমলে ওয়েই চেং[১৪] যখন বলেছিলেন, 'উভয় পক্ষকে শুনলে আপনি জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হবেন, আর একপক্ষকে বিশ্বাস করলে অজ্ঞানতিমিরে ডুববেন,'—তখন তিনিও একদেশ-দর্শিতার ভুল ধরতে পেরেই একথা বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের কমরেডরা

প্রায়শঃই একতরফাভাবে সমস্যাকে দেখে থাকেন, আর তাই প্রায়ই তাঁরা অপ্রত্যাশিত বাধার মধ্যে পড়েন। **শুই হু চুয়ান** উপন্যাসটিতে সুং চিয়াং তিনবার চু গ্রাম আক্রমণ করেন[১৫]। প্রথম দুবার তিনি পরাজিত হন, কারণ স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং তিনি ভুল পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর পদ্ধতি পরিবর্তন করেন। প্রথমে তিনি অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং রাস্তাগুলোর গোলকধাঁধার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করে তোলেন, তারপর লি, হু ও চু গ্রামের মৈত্রী ভাঙেন এবং বিদেশী গল্পের ট্রয়ের ঘোড়ার মতো ফন্দি[১৬] করে ওঁৎ পেতে থাকার উদ্দেশ্যে শত্রুশিবিরে ছদ্মবেশে নিজের লোক পাঠান। তৃতীয়বার তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হন। **শুই হু চুয়ান** উপন্যাসটিতে বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যার মধ্যে চু গ্রামের উপর তিনবার আক্রমণের উপাখ্যানটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। লেনিন বলেন :

> '...কোন বস্তুকে সত্যি সত্যি জানার জন্য অবশ্যই তার সব দিক, তার সব সংযোগ ও "মধ্যস্থতাকে" গভীরভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলির পর্যালোচনা করতে হবে। কোনদিনই এটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করব না, কিন্তু সর্বতোমুখী বিচার-বিবেচনার দাবি করতে হবে, কারণ এটা আমাদের ভুল ও আড়ষ্টতা থেকে রক্ষা করবে।'[১৭]

তাঁর কথাগুলো আমাদের স্মরণে রাখা উচিত। ওপর ওপর দেখার অর্থ হল দ্বন্দ্বের সামগ্রিকতা ও দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিচার না করা, কোন বস্তুর গভীরে গিয়ে পুংখানুপুংখভাবে দ্বন্দ্বর বৈশিষ্ট্যকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা, শুধু দূর থেকে দেখা এবং এক নিমেষে দ্বন্দ্বের পরিলেখটি (outline) দেখার পর তক্ষুণি তার মীমাংসার চেষ্টা করা (প্রশ্নের জবাব, বিতর্কের মীমাংসা, কার্য চালনা অথবা যুদ্ধ পরিচালানা)। এইভাবে কাজ করলে বিভ্রাট ঘটতে বাধ্য। যে যে কারণে চীনের মতান্ধ ও অভিজ্ঞতাবাদী কমরেডরা ভুল করেছেন, তা তাঁদের বস্তুকে দেখার আত্মমুখী, একদেশদর্শী ও ভাসাভাসা পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত। একদেশদর্শিতা ও ওপর ওপর দেখাটাও আত্মমুখিতা, কারণ সমস্ত বাস্তব জিনিসই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পরস্পর সংযুক্ত এবং আভ্যন্তরীণ বিধিনিয়মের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু এই অবস্থাগুলো যথার্থভাবে প্রতিফলিত করবার দায়িত্ব গ্রহণের বদলে কিছু লোক সেগুলোকে একতরফা ও ভাসাভাসাভাবে দেখেন এবং সেগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ জানেন না, সেগুলোর আভ্যন্তরীণ বিধিনিয়মও বোঝেন না এবং

সেজন্য এ ধরনের পদ্ধতি হচ্ছে আত্মমুখীবাদী পদ্ধতি।

আমাদের শুধু কোন বস্তুর বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বগুলোর গতিতে তাদের পারস্পরিক সংযোগ ও তাদের প্রত্যেকটি দিকের অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোকে লক্ষ্য করলেই চলবে না, উপরন্তু বিকাশের প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলোও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে।

কোন বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় মূল দ্বন্দ্ব এবং ঐ দ্বন্দ্ব দ্বারা নির্ণীত প্রক্রিয়ার সারবস্তু প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না। কিন্তু বস্তুর বিকাশের একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বিকাশের প্রত্যেক স্তরে অবস্থা সাধারণতঃ পৃথক হয়। কারণ, একটা বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় মূল দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়ার সারবস্তু অপরিবর্তিত থেকে গেলেও, ঐ দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় এক স্তর থেকে আরেক স্তরে অতিক্রমণের সাথে মূল দ্বন্দ্বটি ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। তা ছাড়া, মূল দ্বন্দ্ব দ্বারা নির্ণীত বা প্রভাবিত বহু সংখ্যক ছোট-বড় দ্বন্দ্বের মধ্যে কতকগুলো তীব্রতর হয়, কতকগুলো অস্থায়ীভাবে বা আংশিকভাবে মীমাংসিত হয় বা চাপা পড়ে যায়, এবং কয়েকটি নূতন দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য প্রক্রিয়া স্তরসমূহ দ্বারা চিহ্নিত। যদি লোকে একটা বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ার স্তর-সমূহের প্রতি মনোযোগ না দেয়, তাহলে তারা তার দ্বন্দ্বগুলোর যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হল, তখন মূল দ্বন্দ্বে নিয়োজিত শ্রেণী দুটির—যথা সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রকৃতিতে এবং সমাজের ধনতান্ত্রিক সারবস্তুতে কোন পরিবর্তন হল না। যাহোক, এই দুটি শ্রেণীর দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠল, একচেটিয়া পুঁজি ও অ একচেটিয়া পুঁজির দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করল, প্রভু দেশগুলো ও তাদের উপনিবেশগুলোর দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠল, অসম বিকাশের ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিশেষ তীব্র হয়ে দেখা দিল, এবং এইভাবে ধনতন্ত্রের বিশেষ স্তর—সাম্রাজ্যবাদী স্তরের সৃষ্টি হল। লেনিনবাদকে যে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ, তার কারণ, লেনিন ও স্তালিন সঠিকভাবেই এই দ্বন্দ্বগুলির ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই দ্বন্দ্বগুলির মীমাংসার জন্য সঠিকভাবেই সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব ও কৌশল প্রণয়ন করেছেন।

১৯১১ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যার শুরু, চীনের সেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করলেও কতকগুলি বিশেষ স্তর চোখে পড়বে।

বিশেষ করে, বুর্জোয়া নেতৃত্বের পর্যায়কালের বিপ্লব এবং সর্বহারা নেতৃত্বের পর্যায়কালের বিপ্লব দুটি বিরাট পার্থক্যবিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর। অন্য কথায় সর্বহারা নেতৃত্ব বিপ্লবের চেহারাকে মৌলিকভাবে পাল্টে দিয়েছে, শ্রেণীসম্পর্কের নূতন বিন্যাস ঘটিয়াছে, কৃষি-বিপ্লবে এক বিপুল জোয়ার এনেছে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দান করেছে, এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, ইত্যাদি। বিপ্লব যখন বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন ছিল, তখন এর কিছুই সম্ভব ছিল না। যদিও সামগ্রিকভাবে ঐ প্রক্রিয়ার মূল দ্বন্দ্বের প্রকৃতিতে, অর্থাৎ প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ও সামন্তবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রকৃতিতে (যার বিপরীত হচ্ছে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রকৃতি) কোন পরিবর্তন ঘটেনি, তথাপি বিশ বছরে ঐ প্রক্রিয়া কয়েকটি স্তর অতিক্রম করেছে। এই দীর্ঘ সময়কালে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে—১৯১১ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতা ও উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়কদের শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রথম জাতীয় যুক্তফ্রন্টের স্থাপনা ও ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব, যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন ও বুর্জোয়াদের প্রতি-বিপ্লবের পক্ষে যোগদান, নূতন সমরনায়কদের যুদ্ধ, ভূমি-বিপ্লবী যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় জাতীয় যুক্তফ্রন্টের স্থাপনা জাপান-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ ইত্যাদি। এই স্তরগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত, যেমন, কতকগুলো দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভূমি-বিপ্লবী যুদ্ধ ও উত্তর-পূর্বের চারটি প্রদেশের উপর জাপ আক্রমণ[১৮]), কতকগুলো দ্বন্দ্বের আংশিক বা সাময়িক মীমাংসা (দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়কদের ধ্বংসসাধন ও আমাদের দ্বারা জমিদারদের জমির বাজেয়াপ্তকরণ) এবং কতকগুলো দ্বন্দ্বের পুনরায় আবির্ভাব (দৃষ্টান্তস্বরূপ, নূতন সমরনায়কদের মধ্যেকার সংগ্রাম ও দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলো হারানোর পর জমিদারদের দ্বারা জমির পুনর্দখল) ইত্যাদি।

কোন বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরে দ্বন্দ্বগুলোর বিশিষ্টতাগুলো পর্যালোচনা করতে হলে আমাদের শুধু তাদের সংযোগে তা তাদের সমগ্রতায় দেখলে চলবে না, প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক দ্বন্দ্বের দুটি দিককেই পরীক্ষা করতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির কথা ধরুন। একটা দিককে, কুওমিনতাঙকে নেওয়া যাক। প্রথম যুক্তফ্রন্টের পর্যায়কালে কুওমিনতাঙ রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা ও কৃষক-শ্রমিকদের

সাহায্য করা—সান ইয়াৎ-সেনের তিন মহান কর্মনীতি কার্যকর করেছিল'। এজন্য তা ছিল বিপ্লবী ও প্রাণবান এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর একটা মৈত্রী। ১৯২৭ সাল থেকে কুওমিনতাঙ বিপরীত দিকে মুখ ফেরায় এবং জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল জোটে পরিণত হয়। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে সীআন ঘটনার[১৯] পর, গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানোর এবং জাপ সাম্রাজ্যবাদকে সম্মিলিতভাবে বাধা দানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মৈত্রীর দিকে এর আরেকটা পরিবর্তন শুরু হয়। এইই হল কুওমিনতাঙের এই তিন স্তরের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য, নানা ধরনের কারণ থেকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্ভূত হয়েছে। এখন অন্যদিকটিকে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কথা, ধরা যাক। প্রথম যুক্তফ্রন্টের পর্যায়কালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তার শৈশবাবস্থায়। সে ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবকে সাহসিকতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবের চরিত্র করণীয় কাজ ও পদ্ধতিগুলো বোঝার ব্যাপারে তার অপরিপক্কতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং সেই জন্যই ঐ বিপ্লবের শেষের দিকে ছেন তু-সিউবাদের পক্ষে নিজেকে জাহির করা ও বিপ্লবের পরাজয় ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৭ সাল থেকে, সে আবার সাহসিকতার সাথে ভূমি-বিপ্লব যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে হঠকারিতামূলক ভুল করে বসে, যার ফলে সেনাবাহিনীর ও ঘাঁটি এলাকাগুলোর বিপুল ক্ষতি হয়। ১৯৩৫ সাল থেকে পার্টি ঐ ভুল সংশোধন করেছে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য নূতন যুক্তফ্রন্টকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। এই মহান সংগ্রাম এখন বিকাশলাভ করছে। বর্তমান স্তরে কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সেই পার্টি, যা দুটো বিপ্লবের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে এবং বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এটাই হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই তিন স্তরের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোও নানাপ্রকার কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। দুই পার্টির এই বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা না করলে আমরা বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে দুই পার্টির বিশেষ আন্তঃসম্পর্কগুলোকে বুঝতে পারব না, যথা একটা যুক্তফ্রন্টের স্থাপনা, যুক্তফ্রন্টের ভাঙন এবং আরেকটা যুক্তফ্রন্টের স্থাপনা। পার্টি দুটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনার জন্য যা আরও মৌলিক তা হচ্ছে পার্টি দুটির শ্রেণীভিত্তি এবং এর ফলে প্রত্যেকটি পার্টি ও অন্যান্য শক্তিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়কালে উদ্ভূত দ্বন্দ্বগুলো পরীক্ষা করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে প্রথম মৈত্রীর পর্যায়কালে

কুওমিনতাঙের একদিকে ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, এবং এজন্য কুওমিনতাঙ ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ; অন্যদিকে ছিল দেশের ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে দ্বন্দ্ব—কথায় কুওমিনতাঙ মেহনতী জনগণকে অনেক সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে খুবই নগণ্য সুবিধা দিয়াছে বা কিছুই দেয়নি। কমিউনিস্টবিরোধী যুদ্ধ চালানোর পর্যায়কালে, ব্যাপক জনসাধারণের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সাথে সহযোগিতা করেছিল এবং বিপ্লবে ব্যাপক জনসাধারণ যে সমস্ত সুবিধা অর্জন করেছিল তা নির্মূল করেছিল এবং তার ফলে জনগণের সাথে নিজের দ্বন্দ্ব তীব্র করে তুলেছিল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়কালে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সাথে কুওমিনতাঙের দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং সে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মৈত্রীবদ্ধ হতে চায়, কিন্তু একই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও দেশের জনগণের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ও তাদের উপর তার অত্যাচার শিথিল করতে চায় না। কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে বলা যায়, সে সর্বদাই, প্রত্যেক পর্যায়কালে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে থেকেছে। কিন্তু জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়কালে, কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙ ও দেশীয় সামন্তশক্তিগুলোর প্রতি নরম নীতি গ্রহণ করেছে, কারণ কুওমিনতাঙ জাপানকে প্রতিরোধ করার পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। উপরোক্ত পরিস্থিতির ফল দাঁড়িয়েছে পার্টি দুটির মধ্যে কখনো মৈত্রী, আবার কখনো সংগ্রাম, এবং এমনকি মৈত্রীর পর্যায়কালগুলোতেও একই সাথে মৈত্রী ও সংগ্রামের জটিল অবস্থা বিদ্যমান থেকেছে। যদি আমরা দ্বন্দ্বের এইসব দিকের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা না করি, তাহলে আমরা প্রত্যেকটি পার্টির সাথে অন্যান্য শক্তিগুলোর সম্পর্কই শুধু নয়, দুটো পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কটিও বুঝতে ব্যর্থ হব।

এভাবে এটা দেখা যাচ্ছে যে, যে-কোনো প্রকারের দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনায়—পদার্থের গতির প্রত্যেক রূপের দ্বন্দ্ব, বিকাশের প্রত্যেক প্রক্রিয়ায় গতির প্রত্যেক রূপের দ্বন্দ্ব, প্রত্যেক বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বের প্রতিটি দিক, প্রত্যেক বিকাশের স্তরে প্রত্যেক বিকাশের প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব এবং প্রত্যেক বিকাশের স্তরে দ্বন্দ্বের প্রতিটি দিক—এই সবগুলো দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনায় আমাদের অবশ্যই আত্মগত ও খামখেয়ালী হওয়া চলবে না, বরং সেই বিশিষ্টতাকে মূর্তভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। মূর্ত বিশ্লেষণ ছাড়া কোন

দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে লেনিনের কথা : মূর্ত অবস্থাসমূহের মূর্ত বিশ্লেষণ।

মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম এই ধরনের মূর্ত বিশ্লষণের চমৎকার এক আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

যখন মার্কস ও এঙ্গেলস বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের নিয়মকে সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পর্যালোচনায় প্রয়োগ করলেন, তখন তাঁরা আবিষ্কার করলেন উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে, শোষণ ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে এবং ঐ দ্বন্দ্বগুলো থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর (রাজনীতি, মতাদর্শ ইত্যাদি) মধ্যেকার দ্বন্দ্বক, এবং আবিষ্কার করলেন কিভাবে এসব দ্বন্দ্ব বিভিন্ন রকমের শ্রেণীসমাজে বিভিন্ন রকম সমাজবিপ্লবের জন্ম দেয়।

মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পর্যালোচনায় এই নিয়মকে প্রয়োগ করে এটা আবিষ্কার করলেন যে, এই সমাজের মূল দ্বন্দ্ব হচ্ছে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং মালিকানার ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এককভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদনের সংগঠিত চরিত্র এবং সমগ্রভাবে সমাজে উৎপাদনের অসংগঠিত চরিত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্যে ঐ দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে। শ্রেণীসম্পর্কের দিক থেকে এটা আত্মপ্রকাশ করে বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বে।

যেহেতু বস্তুসমূহের বিস্তার অত্যন্ত বিরাট এবং তাদের বিকাশ অনন্ত, সেহেতু যা এক প্রসঙ্গে সর্বজনীন, অন্য প্রসঙ্গে তা-ই বিশেষ। বিপরীতভাবে, যা এক প্রসঙ্গে বিশেষ, তা-ই অন্য প্রসঙ্গে সর্বজনীন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎ-পাদনের সামাজিক চরিত্র ও উৎপাদনের উপকরণগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব যেখানেই ধনতন্ত্র বিদ্যমান ও বিকাশমান এমন সমস্ত দেশেই সাধারণভাবে রয়েছে, ধনতন্ত্রের পক্ষে এ হচ্ছে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা। কিন্তু ধনতন্ত্রের এই দ্বন্দ্ব শ্রেণীসমাজের সাধারণ বিকাশের একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরের ব্যাপার মাত্র, সাধারণ শ্রেণীসমাজে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের পক্ষে এ হচ্ছে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা। যাহোক, ধনতান্ত্রিক সমাজের এসব দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে মার্কস সাধারণ শ্রেণীসমাজে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতার আরও গভীর, আরও পর্যাপ্ত এবং আরও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

যেহেতু বিশেষ সর্বজনীনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং যেহেতু দ্বন্দ্বের শুধু বিশিষ্টতা নয়, তার সর্বজনীনতাও সকল বস্তুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত, বিশিষ্টতার মধ্যেই সর্বজনীনতা বিদ্যমান, সেহেতু কোন বস্তুকে পর্যালোচনা করার সময় আমাদের উচিত বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনতা উভয়কেই ও তাদের আন্তঃসংযোগকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করা, ঐ বস্তুর ভেতরকার বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনতাকে এবং তাদের আন্তঃসংযোগকেও আবিষ্কার করা এবং ঐ বস্তুর সঙ্গে বাইরের নানা বস্তুর আন্তঃসংযোগকে আবিষ্কার করা। স্তালিন যখন তাঁর বিখ্যাত রচনা **লেনিনবাদের ভিত্তি**-তে লেনিনবাদের ঐতিহাসিক উৎসগুলো ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি, যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে লেনিনবাদের উৎপত্তি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেন, সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ধনতন্ত্রের যে দ্বন্দ্বগুলো তাদের চরমে পৌঁছেছে সেগুলো বিশ্লেষণ করেন, এবং কিভাবে এই দ্বন্দ্বগুলো সর্বহারা বিপ্লবকে অবিলম্বে করণীয় বিষয়ে পরিণত করছে ও ধনতন্ত্রের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানার জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তা দেখান। উপরন্তু, কেন রাশিয়া লেনিনবাদের সূতিক-গৃহে পরিণত হল, কেন জারের রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের সকল দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল এবং কেন রাশিয়ার সর্বহারার পক্ষে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সর্বহারার অগ্রগামী বাহিনী হওয়া সম্ভব হল, তার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন। এইভাবে স্তালিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা বিশ্লেষণ করে দেখান, কেন লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ, এবং একই সাথে ঐ সাধারণ দ্বন্দ্বের মধ্যে জারতন্ত্রী রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিশিষ্টতা বিশ্লেষণ করে দেখান, কেন রাশিয়া সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব ও রণকৌশলের জন্মভূমিতে পরিণত হল এবং কিভাবে এই বিশিষ্টতার মধ্যে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা নিহিত রয়েছে। দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনতা এবং তাদের আন্তঃসংযোগকে বোঝার জন্য স্তালিনের বিশ্লেষণ আমাদের একটা অনুকরণীয় আদর্শ প্রদান করেছে।

বস্তুগত প্রতীক ব্যাপার (objective phenomenon) পর্যালোচনায় দ্বন্দ্ববাদ ব্যবহারের প্রশ্নে, মার্কস ও এঙ্গেলস এবং অনুরূপভাবে লেনিন ও স্তালিন সর্বদাই নির্দেশ দিয়েছেন কোনভাবেই আত্মগত ও খামখেয়ালী না হওয়ার জন্য বরং বস্তুগত বাস্তব গতির মূর্ত শর্তগুলো থেকে এসব প্রতীত ব্যাপারের মূর্ত দ্বন্দ্বগুলোকে, প্রত্যেক দ্বন্দ্বের প্রত্যেকটি দিকের মূর্ত অবস্থানকে এবং দ্বন্দ্বগুলোর মূর্ত আন্তঃসংযোগগুলোকে আবিষ্কার করার জন্য। পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই

মনোভাব আমাদের মতান্ধদের নেই এবং এজন্য তাঁরা কখনও সঠিক কিছুকে পান না। তাঁদের ব্যর্থতা থেকে আমাদের অবশ্যই সাবধান হতে হবে এবং এই মনোভাব—যা পর্যালোচনার জন্য একমাত্র সঠিক মনোভাব—অর্জন করতে শিখতে হবে।

দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও বিশিষ্টতার মধ্যেকার সম্পর্ক হচ্ছে দ্বন্দ্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার সম্পর্ক। প্রথমটিতে বুঝতে হবে, সকল প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান এবং প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান; গতি, বস্তু, প্রক্রিয়া ও চিন্তা—সবই হচ্ছে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করার অর্থ সবকিছুকেই অস্বীকার করা। সকল সময় ও সকল দেশের জন্য এটা সর্বজনীন সত্য, যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। এজন্যই দ্বন্দ্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনাপেক্ষিকতা। কিন্তু এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহত, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। যদি সমস্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলা হতো, তাহলে সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোথায় থাকত? প্রত্যেকটি দ্বন্দ্ব বিশেষ বলেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। সকল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য শর্তসাপেক্ষভাবে ও অস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে, এবং এজন্য তা আপেক্ষিক।

সাধারণ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং অনাপেক্ষিকতা ও আপেক্ষিকতা সম্পর্কে এই সত্য হচ্ছে বস্তুসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমস্যার কেন্দ্রীভূত সারবস্তু। এটা না বোঝা দ্বন্দ্ববাদকে পরিহার করার সামিল।

৪। প্রধান দ্বন্দ্ব এবং কোন দ্বন্দ্বের প্রধান দিক

দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আরও দুটি বিষয় আছে, যা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যথা, প্রধান দ্বন্দ্ব এবং কোন দ্বন্দ্বের প্রধান দিক।

একটা জটিল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো দ্বন্দ্ব আছে। এগুলোর মধ্যে একটা স্বভাবতঃই প্রধান দ্বন্দ্ব, যার অস্তিত্ব ও বিকাশ অন্যান্য দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ও বিকাশকে নির্ধারিত বা প্রভাবিত করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধনতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দ্বরত দুই শক্তি সর্বহারাশ্রেণী এবং বুর্জোয়াশ্রেণী জন্ম দেয় প্রধান দ্বন্দ্বের। অন্যান্য দ্বন্দ্ব, যেমন, সামন্তশ্রেণীর অবশেষ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, কৃষক পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সর্বহারা ও কৃষক পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, অ-একচেটিয়া

পুঁজিপতি ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া ফ্যাসিবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সবই নির্ধারিত বা প্রভাবিত হয় ঐ প্রধান দ্বন্দ্ব দ্বারা।

চীনের মতো আধা-ঔপনিবেশিক দেশে, প্রধান দ্বন্দ্ব এবং অপ্রধান দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক একটা জটিল ছবি তুলে ধরে। এরকম একটা দেশের বিরুদ্ধে যখন সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ শুরু করে, কিছুসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া ঐ দেশের সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণী সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা জাতীয় যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এ সময়ে, সাম্রাজ্যবাদ ও ঐ দেশের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হয়, আর দেশের ভেতরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহ (সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্বটি প্রধান দ্বন্দ্বে ছিল, সেটি সহ) সাময়িকভাবে অপ্রধান ও অধীনস্থ স্থানে অবনত হয়। চীনে এই অবস্থা ঘটেছিল ১৮২০ সালের আফিম যুদ্ধে[২০], ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে[২১] ও ১৯০০ সালের ই হো থুয়ান যুদ্ধে। বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধেও এই অবস্থাই চলছে।

কিন্তু অন্য পরিস্থিতিতে দ্বন্দ্বগুলো অবস্থান পরিবর্তন করে। যখন সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের বদলে অপেক্ষাকৃত নম্র উপায়ে, অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপায়ে নির্যাতন চালিয়ে যায়, তখন আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোর শাসকশ্রেণীগুলো সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং উভয়পক্ষ মিলিতভাবে ব্যাপক জনসাধারণকে নির্যাতনের জন্য একটা জোট গড়ে তোলে। এরকম সময়ে, জনগণ প্রায়শঃই সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তশ্রেণীগুলির মৈত্রীর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে, আর সাম্রাজ্যবাদ জনগণকে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সাহায্য করার জন্য প্রায়শঃই প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের পরিবর্তে পরোক্ষ পন্থাগুলো কাজে লাগায়, এবং এইভাবে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলো বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে। এটাই ঘটেছিল চীনে ১৯১১ সালের বিপ্লবী যুদ্ধে, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুদ্ধে এবং ১৯২৭ সাল থেকে দশ বছরব্যাপী কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধে। আধা-ঔপনিবেশিক দেশে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীগুলোর ভেতরকার যুদ্ধগুলো, দৃষ্টান্তস্বরূপ, চীনে সমরনায়কদের মধ্যে যুদ্ধগুলোও, এই শ্রেণীভুক্ত।

যখন একটা বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ এতদূর বিকাশলাভ করে যে, সাম্রাজ্যবাদ ও

তার পা-চাটা কুকুর দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন সাম্রাজ্যবাদ প্রাধান্যই তার শাসন বজায় রাখার জন্য অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে। সাম্রাজ্যবাদ তখন হয় ভেতর থেকে বিপ্লবী ফ্রন্টকে বিভক্ত করার চেষ্টা করে, অথবা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করার জন্য সশস্ত্র সৈন্যদল প্রেরণ করে। এরকম সময়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা খোলাখুলিভাবে একসঙ্গে দাঁড়ায় একপ্রান্তে, আর ব্যাপক জনসাধারণ দাঁড়ায় অন্যপ্রান্তে, এবং এইভাবে গড়ে তোলে দ্বন্দ্বটি, যা আবার অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলোর বিকাশকে নির্ধারিত বা প্রভাবিত করে। অক্টোবর বিপ্লবের পরে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলো কর্তৃক রুশ প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে প্রদত্ত সাহায্য সশস্ত্র হস্তক্ষেপেরই একটা নজীর। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতা বিপ্লবী ফ্রন্টকে বিভক্ত করার একটা নজীর।

কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একটা প্রক্রিয়ার বিকাশের প্রত্যেক স্তরে প্রধান দ্বন্দ্ব মাত্র একটাই, যা পরিচালকের ভূমিকা পালন করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোন প্রক্রিয়াতে যদি অনেকগুলো দ্বন্দ্ব থাকে তাহলে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি হবে প্রধান দ্বন্দ্ব, যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করবে, আর অন্যগুলো দখল করবে গৌণ ও অধঃস্তন স্থান। তাই, দুই বা দুয়ের বেশি দ্বন্দ্ববিশিষ্ট কোন জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেলে, আমাদের অবশ্যই সেগুলির মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্বকে খুঁজে বের করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একবার এই প্রধান দ্বন্দ্বকে হৃদয়ঙ্গম করা গেলে সব সমস্যারই সহজে সমাধান করা যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজ পর্যালোচনার মাধ্যমে মার্কস আমাদেরকে এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন। লেনিন ও স্তালিনও একইভাবে আমাদের এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের পর্যালোচনায় এবং সোভিয়েত অর্থনীতির পর্যালোচনায়। হাজার হাজার পণ্ডিত ও কর্মী এই পদ্ধতি বোঝেন না, এবং তার ফলে ঘন কুয়াশায় দিশেহারা হয়ে তাঁরা সমস্যার মর্মটিই ধরতে পারেন না এবং স্বভাবতই দ্বন্দ্বগুলো সমাধানের পথও খুঁজে পান না।

আগেই বলেছি, কোন একটা প্রক্রিয়ার সমস্ত দ্বন্দ্বকে আমরা সমান গুরুত্ব দিতে পারি না। প্রধান ও গৌণের মধ্যে পার্থক্য করতেই হবে এবং প্রধানটিকে

ধরবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু যে-কোন নির্দিষ্ট দ্বন্দ্বে, তা সেটা প্রধানই হোক বা গৌণই হোক, দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দিককে কি আমরা সমান বলে মনে করতে পারি? আবার বলছি, না। যে-কোন দ্বন্দ্বে প্রতিদ্বন্দ্বী দিকগুলোর বিকাশ অসমান। কখনো কখনো তাদের মধ্যে ভারসাম্য দেখা যায় বটে, কিন্তু তা সাময়িক আপেক্ষিক মাত্র, অসমতাই মৌলিক। দুটি দ্বন্দ্বমান দিকের মধ্যে একটি দিক অবশ্যই প্রধান, অপরটি গৌণ। যেটি প্রধান দিক, সেটিই দ্বন্দ্বের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বস্তুর প্রকৃতি প্রধানতঃ নির্ধারিত হয় দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের দ্বারা, যে দিকটি কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে।

কিন্তু এই অবস্থাটা অপরিবর্তনীয় নয়, দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিকগুলো একে অন্যতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই অনুসারে বস্তুর প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। কোন একটি দ্বন্দ্বের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বা একটি নির্দিষ্ট স্তরে 'ক' হয়ত প্রধান দিক এবং 'খ' অপ্রধান দিক। অন্য একটি স্তরে বা অন্য একটি প্রক্রিয়ার আবার ভূমিকাগুলোই হয়তো পাল্টে যায়। এই পরিবর্তন নির্ধারিত হয় একটি বস্তুর বিকাশের পথে দ্বন্দ্বের অন্য দিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রত্যেক দিকের শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ দ্বারা।

আমরা প্রায়শঃই 'নূতন কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখল'-এর কথা বলে থাকি। নূতন কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখল বিশ্বের সর্বজনীন ও চিরকালীন অলংঘনীয় নিয়ম। বস্তুর নিজের প্রকৃতি ও বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের দ্রুত-অতিক্রমণের মধ্যে দিয়ে একটা বস্তুর অপর একটা বস্তুতে রূপান্তর—এটাই নূতন কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখলের প্রক্রিয়া। প্রত্যেক বস্তুতে নূতন ও পুরাতন দিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, ধারাবাহিকভাবে বহু আঁকাবাঁকা সংগ্রামের জন্ম দেয়। এই সংগ্রামের নূতন দিকটি গৌণ থেকে মুখ্যতে পরিবর্তিত হয় এবং প্রাধান্য লাভ করে আর পুরাতন দিকটি মুখ্য থেকে গৌণে পরিবর্তিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে লয় পেয়ে যায়। এবং যে মুহূর্তে নূতন দিকটি পুরাতন দিকটির উপর প্রাধান্য-লাভ করে, পুরাতন বস্তু গুণগতভাবে নূতন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে, বস্তুর প্রকৃতি প্রধানতঃ নির্ধারিত হয় দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের দ্বারা, যে দিকটি কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে। যে প্রধান দিকটি কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে, সেটি যখন রূপান্তরিত হয়, বস্তুর প্রকৃতিও সেই অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

পুরানো সামন্ততান্ত্রিক যুগে অধীনস্থ শক্তি হিসাবে ধনতন্ত্রের যে অবস্থান

ছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজে তা পরিবর্তিত হয়ে যায় প্রধান্যের শক্তিতে, এবং সমাজের প্রকৃতি সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক থেকে ধনতান্ত্রিকে। নূতন ধনতান্ত্রিক যুগে সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলো তাদের আগেকার প্রাধান্যের অবস্থান থেকে অধীনস্থ অবস্থানে পরিবর্তিত হয়, এবং ক্রমান্বয়ে লুপ্ত হতে থাকে। যেমন, বৃটেন ও ফ্রান্সে এরকম ঘটেছিল। উৎপাদনশক্তির বিকাশের সাথে সাথে, বুর্জোয়াশ্রেণী প্রগতিশীল ভূমিকাযুক্ত এক নূতন শ্রেণী থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাযুক্ত এক পুরানো শ্রেণীতে পরিবর্তিত হয়, এবং সর্বহারাশ্রেণী শেষ পর্যন্ত তাকে উৎখাত করে দেয়। বুর্জোয়াশ্রেণী তখন ব্যক্তিগত উৎপাদনের উপকরণসমূহ থেকে বঞ্চিত ও ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীতে পরিণত হয়, এবং এই শ্রেণীরও ক্রমন্বয়ে বিলুপ্তি ঘটে। সর্বহারাশ্রেণী হচ্ছে একটা নূতন শক্তি, যা বুর্জোয়াশ্রেণীর চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি এবং যা বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনে বুর্জোয়াশ্রেণীরই সাথে যুগপৎ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বহারা-শ্রেণী প্রথমে বুর্জোয়াশ্রেণীর অধীনে থাকলেও ক্রমান্বয়ে শক্তি অর্জন করে একটি স্বাধীন ও ইতিহাসে মুখ্য ভূমিকাবিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং শেষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে পরিণত হয় শাসকশ্রেণীতে। তখন সমাজের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং পুরানো ধনতান্ত্রিক সমাজ নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যে এই পথ গ্রহণ করেছে, অন্যান্য দেশও অবশ্যম্ভাবীরূপেই এই পথ গ্রহণ করবে।

চীনের কথাই ধরা যাক। যে দ্বন্দ্বের ফলে চীন আধা-উপনিবেশ, সেই দ্বন্দ্বে সাম্রাজ্যবাদ প্রধান অবস্থান দখল করে আছে ও চীনা জনগণকে পীড়ন করে চলেছে, আর চীন স্বাধীন দেশ থেকে আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবীরূপে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে, উভয় পক্ষের মধ্যে সংগ্রামে, চীনা জনগণের যে শক্তি সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা অবশ্যম্ভাবীরূপেই চীনকে আধা-উপনিবেশ থেকে একটা স্বাধীন দেশে পরিবর্তিত করবে, পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত হবে এবং পুরানো চীন অবশ্যম্ভাবীরূপে নূতন চীনে রূপান্তরিত হবে।

পুরানো চীনের নূতন চীনে রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলো এবং নূতন জনগণের শক্তিগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণী উৎখাত হবে, শাসক থেকে তারা শাসিতে পরিণত হবে এবং এই শ্রেণী ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হবে।

সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণ শাসিত থেকে শাসকে পরিণত হবে। ফলে চীনের সমাজের প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে এবং পুরানো আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এক নূতন গণতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হবে।

এরকম পারস্পরিক রূপান্তরের দৃষ্টান্ত আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় খুঁজে পাওয়া যায়। চীনকে প্রায় তিনশত বৎসর শাসন করার পর ছিং রাজবংশ ১৯১১ সালের বিপ্লবে উৎখাত হয়েছিল, এবং সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী তুং মেং হুই (মৈত্রী সমিতি) কিছু সময়ের জন্য বিজয়ী হয়েছিল। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুদ্ধে, দক্ষিণে কমিউনিস্ট-কুওমিনতাঙ মৈত্রীর বিপ্লবী শক্তিগুলো দুর্বল অবস্থা থেকে শক্তিশালী অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছিল এবং উত্তরাভিযানে বিজয় অর্জন করেছিল, আর একদা সর্বশক্তিমান উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়করা উৎখাত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর আক্রমণে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের শক্তি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু নিজেদের পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদ নির্মূল করার সাথে তারা আবার ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলোতে কৃষকেরা শাসিত থেকে শাসকে রূপান্তরিত হয়েছে, আর জমিদারদের ঘটেছে ঠিক বিপরীত রূপান্তর। বিশ্বে সর্বদাই এ রকম ঘটেছে—নূতন হটিয়ে দিচ্ছে পুরাতনকে, নূতন পুরাতনের স্থান দখল করছে, পুরাতনকে মুছে দিয়ে নূতনের পথ তৈরী হচ্ছে এবং নূতনের উদ্ভব ঘটছে পুরাতনেরই মধ্য থেকে।

বিপ্লবী সংগ্রামে কোন কোন সময়ে অনুকূল অবস্থার তুলনায় প্রতিকূল অবস্থাই বেশি জোরদার হয়ে ওঠে। এই সময়ে প্রতিকূল অবস্থা হচ্ছে দ্বন্দ্বের প্রধান দিক, অনুকূল অবস্থা হচ্ছে গৌণ দিক। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রয়াসের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থাকে ধাপে ধাপে অতিক্রম করা সম্ভব, নতুন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করাও সম্ভব। এমনি করে প্রতিকূল অবস্থার বদলে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯২৭ সালে চীন বিপ্লবের ব্যর্থতার পর এবং চীনের লালফৌজের দীর্ঘাভিযানের সময় এটাই ঘটেছিল। বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে, চীন আবার একটা প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু আমরা এটা পরিবর্তন করতে পারি এবং চীন ও জাপানের মধ্যেকার অবস্থা মূলগতভাবে, অনুকূল অবস্থা প্রতিকূলে হতে পারে, যদি বিপ্লবীরা ভুল করে। এইভাবে ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়। ১৯২৭ সালের পর দক্ষিণের প্রদেশগুলোতে যে

বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলো গড়ে উঠেছিল সবগুলোই ১৯৩৪ সালের মধ্যে পরাজয় বরণ করে।

আমরা যখন পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে উত্তরণের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম খাটে। মার্কসবাদ পর্যালোচনার একেবারে শুরুতে, মার্কসবাদী সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা বা সামান্য পরিচয়ের সঙ্গে মার্কসবাদের জ্ঞানের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কিন্তু কঠোর অধ্যয়নের ফলে অজ্ঞতাকে জ্ঞানে, সামান্য পরিচয়কে প্রভূত জ্ঞানে এবং মার্কসবাদ প্রয়োগে অন্ধত্বকে নিপুণতায় রূপান্তরিত করা সম্ভব।

কেউ কেউ মনে করে, কোন কোন দ্বন্দ্বের বেলায় এই নিয়ম খাটে না। যেমন, উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে উৎপাদন-শক্তি হচ্ছে প্রধান দিক, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে প্রয়োগ হচ্ছে প্রধান দিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যেকার দ্বন্দ্বে অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে প্রধান দিক, এবং তাদের পারস্পরিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। এটা যান্ত্রিক বস্তুবাদী ধারণা, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণা নয়। এটা ঠিক যে, উৎপাদন-শক্তি, প্রয়োগ ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সাধারণতঃ মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। যে এটা অস্বীকার করে, সে বস্তুবাদী নয়। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে, বিশেষ অবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্ক, তত্ত্ব ও উপরিকাঠামোও পর্যায়ক্রমে মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। যখন উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন ছাড়া উৎপাদন-শক্তির বিকাশলাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। লেনিন যে সময় সম্পর্কে বলেছেন, 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না'[২২], তখন বিপ্লবী তত্ত্বের সৃষ্টি ও প্রচার মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। যখন একটা কাজ (যেটাই হোক না কেন) করা দরকার হয়ে পড়ে, অথচ কোন নির্দেশক পথ, পদ্ধতি পরিকল্পনা বা কর্মনীতি থাকে না, তখন মুখ্য ও নির্ধারক বিষয় হচ্ছে একটা নির্দেশক পথ, পদ্ধতি, পরিকল্পনা বা কর্মনীতি স্থির করা। যখন উপরিকাঠামো (রাজনীতি ও সংস্কৃতি প্রভৃতি) অর্থনৈতিক ভিত্তির বিকাশে বাধা দেয়, তখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার সাধনই মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা নেয়। আমরা কি একথা বলে বস্তুবাদের বিরোধিতা করছি? না। কারণ, আমরা স্বীকার করি যে, ইতিহাসের সাধারণ বিকাশে বস্তুই মানসিকতাকে নির্ধারণ করে, সামাজিক সত্তা সামাজিক চেতনাকে নির্ধারণ

করে। • কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা বস্তুর উপর মানসিকতার প্রতিক্রিয়া, সামাজিক সত্তার উপর সামাজিক চেতনার প্রতিক্রিয়া, এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর উপরিকাঠামোর প্রতিক্রিয়াকেও স্বীকার করি—বস্তুতঃ একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এটা বস্তুবাদকে লংঘন করে না, পক্ষান্তরে যান্ত্রিক বস্তুবাদকে পরিহার করে এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনায়, যদি না আমরা এই দুই ধরনের অবস্থাকে —একটা প্রক্রিয়ার প্রধান ও অপ্রধান দ্বন্দ্ব এবং একটা দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিককে—পরীক্ষা করি, অর্থাৎ যদি না আমরা এই দুই ধরনের স্বতন্ত্র চরিত্রকে পরীক্ষা করি, তাহলে আমরা বিমূর্ততার মধ্যে ডুবে যাব, দ্বন্দ্বকে মূর্তভাবে বুঝতে পারব না এবং তার ফলে দ্বন্দ্বের সমাধানের সঠিক পদ্ধতি বের করতে পারব না। দ্বন্দ্বের এই দুই রকমের অবস্থার স্বতন্ত্র চরিত্র বা বিশিষ্টতা দ্বন্দ্বের মধ্যেকার শক্তিগুলোর অসমতাই প্রকাশ করে। পৃথিবীতে কোন কিছুই অনাপেক্ষিকভাবে সমান বিকাশলাভ করে না। আমাদের অবশ্যই সম-বিকাশের তত্ত্ব বা ভারসাম্যের তত্ত্বের বিরোধিতা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে, দ্বন্দ্বের এই মূর্ত রূপগুলো এবং বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিকগুলোর পরিবর্তনই পুরাতনকে সরিয়ে যে নূতন আসছে, তার শক্তিকে প্রকাশ করে। দ্বন্দ্বগুলোতে অসমতার বিভিন্ন অবস্থার, প্রধান ও অপ্রধান দ্বন্দ্বের এবং দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিকের পর্যালোচনা এমন একটি গুরুত্ব-পূর্ণ পদ্ধতি, যার সাহায্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে তার রণনীতিগত ও রণকৌশলগত কর্মনীতিগুলি নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে পারে। সমস্ত কমিউনিস্টকেই এ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে।

৫। দ্বন্দ্বের দিকগুলোর অভিন্নতা ও সংগ্রাম

দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও বিশিষ্টতা উপলব্ধি করার পর আমাদের অবশ্যই দ্বন্দ্বের দিকগুলোর অভিন্নতা এবং সংগ্রামের সমস্যাটি পর্যালোচনা করতে হবে।

অভিন্নতা, ঐক্য, মিল, আন্তঃঅনুপ্রবেশ (interpenetration), আন্তঃ-অন্তর্ভেদ (interpermeation), পরস্পর-নির্ভরশীলতা (বা অস্তিত্বের জন্য পারস্পরিক নির্ভরতা), আন্তঃসংযোগ বা পরস্পর-সহযোগিতা—এসব ভিন্ন ভিন্ন কথা একই জিনিসকেই বোঝায় এবং নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে: প্রথম, একটা বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় একটা দ্বন্দ্বের দুটি

দিকের প্রত্যেকটির নিজস্ব অস্তিত্বের পূর্বশর্ত হিসাবে অপরটিকে প্রয়োজন এবং উভয়দিকই একক সত্তার মধ্যে সহ-অবস্থান করে; দ্বিতীয়, নির্দিষ্ট অবস্থায় দ্বন্দ্বমান দুটি দিকে প্রত্যেকটি নিজেকে তার বিপরীপটিতে রূপান্তরিত করে। এই হচ্ছে অভিন্নতার অর্থ।

লেনিন বলেছেন: '**দ্বন্দ্ববাদ**' হচ্ছে সেই শিক্ষা, যা দেখিয়ে দেয় কেমন করে **বিপরীতগুলো** অভিন্ন হতে পারে এবং হয়ে থাকে (কেমন করে পরিণত হয়),—কোন্ অবস্থায় তারা অভিন্ন, নিজেদের একটা থেকে অন্যটাতে রূপান্তরিত করে চলে,—মানুষের ধারণায় কেন এসব বিপরীতগুলোকে মৃত, অনড় বলে গ্রহণ না করে বরং জীবন্ত, সর্তসাপেক্ষ, গতিশীল, নিজেদের একটা থেকে অন্যটায় রূপান্তররত বলে গ্রহণ করতে হবে।'[২৩]

এই অনুচ্ছেদটির অর্থ কি?

প্রত্যেক প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বমান দিকগুলো পরস্পর থেকে আলাদা, পরস্পরের সাথে সংগ্রামরত এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে। বিশ্বের সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় এবং মানুষের চিন্তাধারায় এই দ্বন্দ্বমান দিকগুলো বিদ্যমান থাকে, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। একটি সরল প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র একজোড়া বিপরীত দিক থাকে, জটিল প্রক্রিয়ায় থাকে তার বেশি। এবং পর্যায়ক্রমে, বিপরীত জোড়াগুলোও পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত। এইভাবেই বাস্তব বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও মানবিক চিন্তাধারা গঠিত হয় এবং এইভাবে তারা গতিশীল হয়।

এমতাবস্থায়, অভিন্নতা বা ঐক্য বলে কিছুই থাকছে না, তাহলে কেমন করে অভিন্নতা বা ঐক্যের কথা বলা যায়?

ঘটনা হচ্ছে এই যে, কোন দ্বন্দ্বমান দিক একাকী থাকতে পারে না। বিপরীত দিকের অস্তিত্ব ছাড়া, প্রত্যেকটি দিক তার অস্তিত্বের শর্তই হারিয়ে বসে। ভেবে দেখুন তো, কোন বস্তুর বা মানুষের মনে কোন ধারণার কোন একটা দ্বন্দ্বমান দিক কি স্বাধীনভাবে থাকতে পারে? জীবন না থাকলে মৃত্যু থাকত না, মৃত্যু না থাকলে থাকত না কোন জীবন। 'ঊর্ধ্ব' না থাকলে 'নিম্ন' থাকত না, 'নিম্ন' না থাকলে, 'ঊর্ধ্ব' থাকত না। দুর্ভাগ্য না থাকলে সৌভাগ্য থাকত না, সৌভাগ্য না থাকলে থাকত না দুর্ভাগ্য। সুবিধা না থাকলে অসুবিধা থাকত না, অসুবিধা না থাকলে সুবিধা থাকত না। জমিদার না থাকলে কৃষক-প্রজা থাকত না, কৃষক-প্রজা না থাকলে থাকত না জমিদার। বুর্জোয়াশ্রেণী না থাকলে সর্বহারাশ্রেণী থাকত না, সর্বহারাশ্রেণী না থাকলে

থাকত না কোন বুর্জোয়াশ্রেণী। জাতিসমূহের উপর সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন না থাকলে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ থাকত না, উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ না থাকলে থাকত না জাতিসমূহের উপর সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন। সমস্ত বিপরীতগুলোই এই রকমের কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় একদিকে তারা পরস্পর-বিরোধী, আবার অন্যদিকে তারা পরস্পর-সংযুক্ত, পরস্পর-অন্তর্ভেদ্য, পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট এবং পরস্পর-নির্ভরশীল। এই বৈশিষ্টাকেই বলা হয় অভিন্নতা। নির্দিষ্ট অবস্থায় সকল দ্বন্দ্বমান দিকগুলোর থাকে ভিন্নতার বৈশিষ্ট্য, তাই তাদের বলা হয় দ্বন্দ্বমান। কিন্তু তাদের অভিন্নতার বৈশিষ্ট্য থাকে, তাই তারা পরস্পর-সংযুক্ত। লেনিন যখন বলেন যে, দ্বন্দ্ববাদ পর্যালোচনা করে 'কেমন করে **বিপরীতগুলো** হতে পারে...**অভিন্ন**,' তখন তিনি এটাই বুঝিয়েছেন। তাহলে কিভাবে তারা অভিন্ন হতে পারে? কারণ প্রত্যেকটি হচ্ছে অপরটির অস্তিত্বের শর্ত। এটাই হচ্ছে অভিন্নতার প্রথম অর্থ।

কিন্তু দ্বন্দ্বমান দিকগুলোর প্রত্যেকটি অপরটির অস্তিত্বের শর্ত, তাদের মধ্যে রয়েছে অভিন্নতা, এবং ফলস্বরূপ, তারা একক সত্তায় সহ-অবস্থান করতে পারে—এটুকু বলাই কি যথেষ্ট? না, যথেষ্ট নয়। তাদের অস্তিত্বের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরতার সাথেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায় না, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তাদের পারস্পরিক রূপান্তর। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অবস্থায় একটা বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বমান দিকগুলোর প্রত্যেকটি নিজেকে তার বিপরীতে রূপান্তরিত করে, নিজের অবস্থানকে বিপরীতের অবস্থানে পরিবর্তিত করে। এটা দ্বন্দ্বের অভিন্নতার দ্বিতীয় অর্থ।

এখানেও অভিন্নতা রয়েছে কেন? দেখুন, শাসিত সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে শাসকে রূপান্তরিত হয়, একদা যারা ছিল কঠোর শাসক সেই বুর্জোয়া-শ্রেণী রূপান্তরিত হয় শাসিতে এবং তার বিপরীতের আদি অবস্থানে নিজের অবস্থানকে পরিবর্তন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইতিমধ্যে এটা ঘটেছে, এবং ভবিষ্যতে সারা দুনিয়াতেও তাই ঘটবে। যদি নির্দিষ্ট অবস্থায় বিপরীত-গুলির আন্তঃসংযোগ ও অভিন্নতা না থাকত, তাহলে এরকম পরিবর্তন কেমন করে ঘটতে পারত?

আধুনিক চীনের ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে একটা নির্দিষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল কুওমিনতাঙ। সেই কুওমিনতাঙই ১৯২৭ সালের

পরে তার অন্তর্নিহিত শ্রেণীপ্রকৃতি এবং সাম্রাজ্যবাদের চাটুকারিতার দরুন (এইগুলোই শর্ত) একটা প্রতিবিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হল। কিন্তু চীন ও জাপানের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠায় এবং কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রণ্টের নীতি গ্রহণ করায় (এইগুলোই হচ্ছে শর্ত) কুওমিনতাঙ বাধ্য হয়েছে জাপানের প্রতিরোধে সম্মত হতে। দ্বন্দ্বমান বস্তুসমূহ একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হয় এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে নির্দিষ্ট অভিন্নতা।

আমরা যে কৃষি-বিপ্লব কার্যকরী করেছি, তা ইতিমধ্যেই এমন একটি প্রক্রিয়ায় হয়েছে, যাতে জমির মালিক জমিদারশ্রেণী জমিহারা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়, আর যারা একদা তাদের জমি হারিয়েছিল সেই কৃষকরা জমি দখল করে রূপান্তরিত হয় ক্ষুদে মালিকে। এই প্রক্রিয়া আবার হবে। নির্দিষ্ট অবস্থায়, থাকা এবং না থাকা, অর্জন করা এবং হারানো পরস্পর-সংযুক্ত, উভয় দিকেরই রয়েছে অভিন্নতা। সমাজতন্ত্রের অধীনে কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা রূপান্তরিত হয় সমাজতান্ত্রিক কৃষির যৌথ-মালিকানায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইতিমধ্যে এটা ঘটেছে, এবং ঘটবে সর্বত্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে সাধারণ সম্পত্তিতে পৌছানোর জন্য রয়েছে একটা সেতু, যাকে দর্শনশাস্ত্রে বলা হচ্ছে অভিন্নতা, বা পরস্পরে রূপান্তর, বা আন্তঃঅনুপ্রবেশ।

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব বা জনগণের একনায়কত্বকে সংহত করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ঐ একনাযকত্বের অবসানের জন্য, এবং সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে হয়ে যাবে সেই উচ্চতর স্তরে অগ্রগমনের মতো অবস্থা তৈরী করার জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশসাধন করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি ও সমস্ত পার্টি ব্যবস্থারই বিলপ্তির অবস্থা তৈরী করার জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটা বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠন করা এবং বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের স্থায়ী বিলুপ্তির অবস্থা তৈরী কবার জন্য। এই বিপরীতগুলো যুগপৎ পরস্পরের পরিপূরক।

সকলেরই জানা আছে, যুদ্ধ ও শান্তি নিজেদেরকে একে অন্যটিতে রূপান্তরিত করে। যুদ্ধ রূপান্তরিত হয় শান্তিতে। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রূপান্তরিত হযেছিল যুদ্ধোত্তর শান্তিতে, এবং এখন চীনের গৃহযুদ্ধ থেমে গিয়ে তার স্থানে এসেছে আভ্যন্তরীণ শান্তি। শান্তি যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। যেমন, ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা রূপান্তরিত হয়েছিল যুদ্ধে, এবং বিশ্বশান্তির বর্তমান অবস্থা একটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে পারে।

কেন এমন হয়? কারণ শ্রেণীসমাজে যুদ্ধ এবং শান্তির মতো দ্বন্দ্বমান বস্তুর নির্দিষ্ট অবস্থার থাকে অভিন্নতা।

দ্বন্দ্বমান সবকিছুই পরস্পর-সংযুক্ত। নির্দিষ্ট অবস্থায় তারা কেবল একক সত্তায় সহ-অবস্থানই করে না, পরন্তু অপর নির্দিষ্ট অবস্থায় তারা নিজেদের একে অন্যতে রূপান্তরিত করে। এটাই হচ্ছে দ্বন্দ্বের অভিন্নতার পূর্ণ অর্থ। লেনিন যখন আলোচনা করেছেন—'কেমন করে বিপরীতগুলো অভিন্ন হয়ে থাকে (কেমন করে পরিণত হয়),—কোন্ অবস্থায় তারা অভিন্ন, নিজেদের একটা থেকে অন্যটাতে রূপান্তরিত করে চলে', তখন তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

কেন 'মানুষের ধারণায় এসব বিপরীতগুলোকে মৃত, অনড় বলে গ্রহণ না করে বরং জীবন্ত, শর্তসাপেক্ষ, গতিশীল, নিজেদের একটা থেকে অন্যটায় রূপান্তররত বলে গ্রহণ করতে হবে?' কারণ বাস্তব বস্তু বা বিষয় ঠিক এই-ভাবেই বিরাজ করে আসল কথা এই যে, বাস্তব জিনিসে দ্বন্দ্বমান দিকগুলোর ঐক্য বা অভিন্নতা মৃত বা অনড় নয়, বরং তা জীবন্ত, শর্তাসাপেক্ষ, গতিশীল, ক্ষণস্থায়ী এবং আপেক্ষিক। নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রত্যেক দ্বন্দ্বমান দিক নিজেকে তার বিপরীতে রূপান্তরিত করে। মানুষের চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়ে এটাই হয়ে দাঁড়ায় বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। কেবল অতীত এবং বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলি এবং তাদের সেবাদাস আধি-বিদ্যকেরাই মনে করে যে, বিপরীতগুলো জীবন্ত, শর্তসাপেক্ষ, গতিশীল এবং একে অন্যতে রূপান্তররত নয়, বরং মৃত ও অনড়। ব্যপক জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য ঐ ভ্রান্ত মত (fallacy) তারা সর্বদাই প্রচার করে, এবং এইভাবে তাদের শাসন টিঁকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কমিউনিস্টদের কর্তব্য হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল ও আধিবিদ্যকদের এই ভ্রান্ত মতকে খুলে ধরা, বস্তুর অন্ত-র্নিহিত দ্বন্দ্ববাদকে প্রচার করা, এবং এইভাবে বস্তুর রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা এবং বিপ্লবের লক্ষ্যে পৌঁছানো।

নির্দিষ্ট অবস্থায় বিপরীতগুলোর অভিন্নতার কথা বলতে আমরা বাস্তব ও মূর্ত বিপরীতগুলোকে এবং বিপরীতগুলোর একে অন্যতে বাস্তব ও মূর্ত রূপান্তর-কেই বোঝাই। পৌরাণিক কাহিনীতে বহু রূপান্তরের কথা আছে, যেমন **শান হাই চিং** গ্রন্থে সূর্যের সঙ্গে খুয়া ফুর দৌড় প্রতিযোগিতা[২৪], **হুয়াই নান জু** সংকলনে ঈ কর্তৃক নয়টি সূর্যকে তীর মেরে নামানো[২৫], **সী ইয়ে. চী** উপন্যাসে বানর-দেবতার বাহাত্তর রকমের রূপ পরিগ্রহণ[২৬], এবং **লিয়াও চাই. চি ই**[২৭]

নামক গ্রন্থে ভূতদের ও খেঁকশিয়ালদের মানুষের রূপ গ্রহণের বহু কাহিনী। এইসব পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত বিপরীতগুলোর পরস্পরে রূপান্তর মূর্ত দ্বন্দ্বে প্রকাশিত মূর্ত রূপান্তর নয়, এগুলো হচ্ছে বিপরীতগুলোর একে অন্যতে বহু জটিল ও বাস্তব রূপান্তর দ্বারা মানুষের মনে কল্পনায় সাজিয়ে তোলা শিশুসুলভ, অলীক ও মনগড়া রূপান্তর। মার্কস বলেছেন: 'সমস্ত পুরাকাহিনী কল্পনায় এবং কল্পনার মাধ্যমে প্রকৃতির শক্তিগুলোর ওপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য করে এবং তাদের রূপায়িত করে। তাই প্রকৃতির শক্তিগুলোর উপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।'[২৮] পৌরাণিক কাহিনীতে (এবং ছেলেভুলানো গল্পেও) যে অসংখ্য রূপান্তরের কাহিনী রয়েছে, লোককে তা আনন্দ দেয় এই জন্য যে, সেগুলি প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের জয়লাভকে কল্পনায় রূপ দেয়। তা ছাড়া শ্রেষ্ঠ পুরাকাহিনীগুলির রয়েছে 'চিরন্তন সৌন্দর্য' (মার্কসের ভাষায়) কিন্তু পুরাকাহিনী মূর্ত দ্বন্দ্বগুলির নির্দিষ্ট অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়নি এবং এজন্য বাস্তবের বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন নয়। অর্থাৎ পুরাকাহিনী বা ছেলেভুলানো গল্পে একটা দ্বন্দ্বরত দিকগুলোর কেবল কাল্পনিক অভিন্নতা রয়েছে, মূর্ত অভিন্নতা নয়। বাস্তব রূপান্তরগুলোর অভিন্নতার বৈজ্ঞানিক প্রতিফলনই হচ্ছে মার্কসবাদী দ্বন্দ্ববাদ।

একটা ডিম মুরগীর ছানায় রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু একটা পাথর পারে না কেন? যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ ও পাথরের মধ্যে নেই কেন? কেন মানুষ কেবল মানুষকেই জন্ম দিতে পারে, অন্য কিছুকে নয়? কারণ শুধু এই যে, কেবল নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থাতেই বিপরীতগুলোর অভিন্নতা থাকে। এই নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থা ছাড়া কোন অভিন্নতা থাকতে পারে না।

কেন রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীর বুর্জোয়া' গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঐ বছরেই অক্টোবরের সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত ছিল? আবার ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লব কেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত ছিল না, কেন ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউন[২৯] ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল? অন্যদিকে, কেন মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য এশিয়ার যাযাবর ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে? কেন চীনের বিপ্লব পাশ্চাত্য দেশগুলোর পুরানো ঐতিহাসিক পথ গ্রহণ ছাড়াই এবং বুর্জোয়া একনায়কত্বের পর্যায় অতিক্রম না করেই ধনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ পরিহার করতে এবং সরাসরি

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ সময়ের মূর্ত অবস্থা। যখন কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থা বিদ্যমান থাকে, তখন বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় কতকগুলো দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে এবং তদুপরি সেগুলোর মধ্যে নিহিত বিপরীতগুলো পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয় এবং পরস্পরে রূপান্তরিত হয়। অন্যথায় কোনকিছুই সম্ভব হয় না।

এটাই অভিন্নতার সমস্যা। তাহলে সংগ্রাম কি? অভিন্নতা ও সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্ক কি?

> লেনিন বলেছেন: বিপরীতের ঐক্য (মিল, অভিন্নতা, সমক্রিয়া) হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ, সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী এবং আপেক্ষিক। পরস্পরব্যতিরেকী বিপরীতগুলোর সংগ্রাম অনাপেক্ষিক, ঠিক যেমন বিকাশ ও গতি অনাপেক্ষিক।[৩০]

এই অনুচ্ছেদটির অর্থ কি?

সকল প্রক্রিয়ার আছে শুরু ও শেষ, সকল প্রক্রিয়া নিজেদের একে অন্যতে রূপান্তরিত করে। সকল প্রক্রিয়ার স্থায়িত্ব আপেক্ষিক, কিন্তু এক প্রক্রিয়া থেকে অন্য প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের মধ্যে আত্মপ্রকাশকারী পরিবর্তনীয়তা অনাপেক্ষিক।

সকল বস্তুর মধ্যে গতির দুটি অবস্থা আছে—আপেক্ষিক নিশ্চলতা এবং দৃশ্যমান পরিবর্তন। দুটোই বস্তুর মধ্যে নিহিত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী উপাদানের মধ্যেকার সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত। যখন বস্তুটি গতির প্রথম অবস্থাটিতে থাকে, তখন তার পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে, গুণগত নয়, কাজেই মনে হয় সে আপাতঃ নিশ্চল অবস্থায় রয়েছে। যখন বস্তুটি গতির দ্বিতীয় অবস্থাটিতে থাকে, তার আগেই প্রথম অবস্থাটির পরিমাণগত পরিবর্তন কোন চরম বিন্দুতে পৌঁছে যায় বস্তুর একক সত্তার বিয়োজন ঘটায় এবং অবিলম্বে একটা গুণগত পরিবর্তন উদ্ভূত হয়। ফলে তার দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ঐক্য, সংহতি, সংযুক্তি, সামঞ্জস্য, সমতা, অচলাবস্থা, বদ্ধাবস্থা, নিশ্চলতা, সুস্থিতি, ভারসাম্য, জমাট অবস্থা ও আকর্ষণ ইত্যাদি দেখতে পাই। এগুলি সবই হচ্ছে পরিমাণগত পরিবর্তনের অবস্থায় বস্তুসমূহের বাইরের চেহারা। অন্যদিকে, ঐক্যের বিয়োজন অর্থাৎ ঐ সংহতি, সংযুক্তি, সামঞ্জস্য, সমতা, অচলাবস্থা, বদ্ধাবস্থা, নিশ্চলতা, সুস্থিতি, ভারসাম্য জমাট অবস্থা ও আকর্ষণের ধ্বংস এবং প্রত্যেকটির বিপরীতে পরিবর্তন—এ সবই হল

গুনগত পরিবর্তনের অবস্থায়, একটি প্রক্রিয়া থেকে অন্য প্রক্রিয়ায় রূপান্তরকালে বস্তুর বাইরের চেহারা। বস্তু সর্বদাই নিজেদেরকে গতির প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করে চলেছে, আর উভয় অবস্থাতেই বিপরীতগুলোর সংগ্রাম চলছে, এবং দ্বন্দ্বের মীমাংসা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে। এজন্যই আমরা বলি যে, বিপরীতগুলোর ঐক্য হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ, অস্থায়ী ও আপেক্ষিক, আর পরস্পর-ব্যতিরেকী বিপরীতগুলোর সংগ্রাম হচ্ছে অনাপেক্ষিক।

উপরে আমরা যখন বলেছিলাম যে, যেহেতু তাদের মধ্যে রয়েছে অভিন্নতা, অতএব দুটি বিপরীত জিনিস একক সত্তায় সহ-অবস্থান করতে পারে এবং নিজেদের পরস্পরে রূপান্তরিত করতে পারে, তখন আমরা শর্তাধীনতার কথাই বলেছিলাম। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অবস্থায় দুটি দ্বন্দ্বমান জিনিস ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং পরস্পরে রূপান্তরিতও হতে পারে। কিন্তু এসব অবস্থা অনুপস্থিত থাকলে তারা একটা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত করতে পারে না, তারা সহ-অবস্থান করতে পারে না এবং নিজেদর পরস্পরে রূপান্তরিত করতেও পারে না। বিপরীতগুলোর অভিন্নতা কেবল নির্দিষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান থাকে বলেই আমরা বলেছি অভিন্নতা শর্তসাপেক্ষও আপেক্ষিক। এর সঙ্গে আমরা আরও বলি যে, বিপরীতগুলোর মধ্যে সংগ্রাম একটা প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান এবং একটা প্রক্রিয়াকে অপর একটা প্রক্রিয়ার রূপান্তরিত করে, এই সংগ্রাম সর্বব্যাপী, এবং এজন্যই শর্তহীন ও অনাপেক্ষিক।

শর্তসাপেক্ষ ও আপেক্ষিক অভিন্নত এবং শর্তহীন ও অনাপেক্ষিক সংগ্রামের সমন্বয় সকল বস্তুতে বিপরীতগুলোর গতিকে রূপ দেয়।

আমরা চীনারা প্রায়ই বলে থাকি, 'যেসব জিনিস পরস্পর-বিরোধী তারা পরস্পরের পরিপূর্বক।'[৩১] অর্থাৎ পরস্পর-বিরেধী জিনিসের অভিন্নতা রয়েছে। এই উক্তি হচ্ছে দ্বন্দ্ববাদী এবং অধিবিদ্যার বিরোধী। 'পরস্পর-বিরোধী' বলতে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দিকের পারস্পরিক বর্জন বা সংগ্রামকে বোঝায়। 'পরস্পরের পরিপূরক' মানে নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি সংযুক্ত হয় এবং অভিন্নতা অর্জন করে। অধিকন্তু, অভিন্নতার মধ্যেই সংগ্রাম নিহিত এবং সংগ্রাম ছাড়া কোন অভিন্নতা থাকতে পারে না।

অভিন্নতার মধ্যে রয়েছে সংগ্রাম, বিশিষ্টতার মধ্যে রয়েছে সর্বজনীনতা এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য। লেনিনের ভাষায়, '...আপেক্ষিকের মধ্যে রয়েছে অনাপেক্ষিক'[৩২]।

৬। দ্বন্দ্বে বৈরিতার স্থান

বিপরীতগুলোর সংগ্রামের প্রশ্নটির মধ্যে বৈরিতা কি—এই প্রশ্নটিও অন্তর্ভুক্ত। আমাদের জবাব হচ্ছে: বৈরিতা বিপরীতগুলোর সংগ্রামের একটা রূপ, কিন্তু একমাত্র রূপ নয়।

মানব ইতিহাসে শ্রেণী-বৈরিতা থাকে বিপরীতগুলোর সংগ্রামের একটি বিশেষ প্রকাশ রূপে। শোষকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে বিবেচনা করুন। এইসব দ্বন্দ্বমান শ্রেণীগুলি বহুদিন একই সমাজে সহ-অবস্থান করে—সে সমাজ দাসসমাজ, সামন্তসমাজ বা ধনতান্ত্রিক সমাজ যাই হোক না কেন—এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু শ্রেণী দুটির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হওয়ার পরই কেবল প্রকাশ্য বৈরিতার রূপ নেয় এবং বিপ্লবের দিকে বিকাশলাভ করে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শান্তি থেকে যুদ্ধে রূপান্তরে ক্ষেত্রেও একথা খাটে।

বিস্ফোরিত হওয়ার পূর্বে বোমা একটা একক সত্তা, যার মধ্যে বিপরীতগুলো নির্দিষ্ট অবস্থায় সহ-অবস্থান করে। বিস্ফোরণ তখনই ঘটে যখন একটা নূতন অবস্থা, জ্বলন দেখা দেয়। যেসব প্রাকৃতিক ব্যাপার চূড়ান্ত পর্যায়ে পুরানো দ্বন্দ্বের সমাধান এবং নূতন বস্তু সৃষ্টির জন্য প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয়, সেই সবগুলোতেই অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

এ বিষয়টি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদ্বারা আমরা বুঝতে পারি, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ অপরিহার্য, যুদ্ধকে বাদ দিয়ে সমাজ বিকাশের দ্রুত-অতিক্রমণ সম্পন্ন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করা অসম্ভব, অর্থাৎ জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাও অসম্ভব। সমাজবিপ্লব অপ্রয়োজনীয় ও অসম্ভব—প্রতিক্রিয়াশীলদের এই শঠতাপূর্ণ অপপ্রচারের স্বরূপ কমিউনিস্টদেরকে উদ্‌ঘাটন করে দিতেই হবে এবং দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে সমাজবিপ্লবের মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বকে, যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, সমাজবিপ্লব শুধু একান্ত প্রয়োজনীয়ই নয়, সম্পূর্ণ সম্ভবও বটে এবং এটি এমন একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, যা ইতিমধ্যেই মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়যাত্রার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কিন্তু বিপরীতগুলোর প্রত্যেক নির্দিষ্ট সংগ্রামের পরিস্থিতিকে আমাদের অবশ্যই মূর্তভাবে পর্যালোচনা করতে হবে এবং সবকিছুতেই উপরে আলোচিত

সূত্রে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা চলবে না দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম হচ্ছে সর্বব্যাপী ও ধ্রুব। কিন্তু দ্বন্দ্বের মীমাংসার পদ্ধতি, অর্থাৎ সংগ্রামের রূপ দ্বন্দ্বের প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য ভিন্ন রকম হয়। কোন দ্বন্দ্বে রয়েছে প্রকাশ্য বৈরিতা, অন্যগুলোতে তা নেই। বস্তুর নির্দিষ্ট বিকাশানুসারে কোন কোন দ্বন্দ্ব যা শুরুতে ছিল অবৈরী, কিন্তু পরে তা বৈরী দ্বন্দ্বে বিকাশলাভ করে। আবার কোন কোন দ্বন্দ্ব যা শুরুতে ছিল বৈরী, কিন্তু পরে তা অবৈরী দ্বন্দ্ব বিকাশলাভ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যতদিন শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে ততদিন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার নির্ভুল ও ভুল চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব পার্টির ভেতরে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রতিফলন। গোড়ার দিকে, বা কতকগুলি প্রশ্নে, এই ধরনের দ্বন্দ্ব সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বৈরী রূপে প্রকাশ নাও করতে পারে। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের সাথে সাথে সেও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বৈরী হয়ে দাঁড়াতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, লেনিন ও স্তালিনের সঠিক চিন্তাধারা এবং ট্রট্স্কি[৩৩] ও বুখারিন প্রমুখের ভুল চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব গোড়ার দিকে বৈরী রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, কিন্তু পরে ঐ দ্বন্দ্ব বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসেও অনুরূপ ঘটনা আছে। আমাদের পার্টির অনেক কমরেডের সঠিক চিন্তাধারা এবং ছেন তু-সিউ ও চাং কুও-থাও প্রমুখ ব্যক্তিদের ভুল চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব গোড়ার দিকেও বৈরী রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, কিন্তু পরে তা বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে আমাদের পার্টির মধ্যে সঠিক ও বেঠিক চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব বৈরী রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, এবং যে কমরেডরা ভুল করেছেন তাঁরা যদি ভুল সংশোধন করতে পারেন, তাহলে ঐ দ্বন্দ্ব বৈরিতায় পরিণত হবে না। এজন্য, পার্টিকে অবশ্যই একদিকে ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে, এবং অন্যদিকে কমরেডরা ভুল করেছেন তাঁদের সচেতন হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। এমতাবস্থায়, অতিরিক্ত সংগ্রাম স্পষ্টতঃই ঠিক হবে না। কিন্তু যাঁরা ভুল করেছেন তাঁরা যদি ভুলগুলো আঁকড়ে থাকেন এবং সেগুলো বাড়িয়েই চলেন, তাহলে ঐ দ্বন্দ্বের বৈরিতায় পরিণত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অর্থনীতির দিক দিয়ে, ধনতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে বুর্জোয়া-শাসনাধীন শহর গ্রামাঞ্চলকে নির্মমভাবে শোষণ করে এবং চীনে কুওমিনতাঙ শাসিত

এলাকায়, যেখানে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনাধীন শহর চরম বর্বতার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলকে শোষণ করে—শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব একটা প্রচণ্ড বৈরী দ্বন্দ্ব। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং আমাদের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় এই বৈরী দ্বন্দ্ব অবৈরী দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং যখন সাম্যবাদী সমাজে পৌছানো যাবে তখন এই দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

লেনিন বলেছেন, 'বৈরিতা ও দ্বন্দ্ব মোটেই এক ও অভিন্ন নয়। সমাজ-তন্ত্রের অধীনে, প্রথমটার বিলুপ্তি ঘটবে, কিন্তু দ্বিতীয়টা থাকবে।'[৩৪] অর্থাৎ বৈরিতা হচ্ছে বিপরীতগুলোর সংগ্রামের একটা রূপ, কিন্তু একমাত্র রূপ নয়। বৈরিতার সূত্রকে সর্বত্র নির্বিচারে প্রয়োগ করা যায় না।

৭। উপসংহার

আমরা এখন সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলতে পারি। বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের নিয়ম, অর্থাৎ বিপরীতের মধ্যে ঐক্যের নিয়ম হল প্রকৃতি ও সমাজের মৌলিক নিয়ম, এবং এজন্য তা চিন্তারও মৌলিক নিয়ম। এটা অধিবিদ্যার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী। এটা মানবিক জ্ঞানের ইতিহাসে এক বিরাট বিপ্লবের পরিচায়ক। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী বাস্তবতঃ বিরাজমান বস্তুর এবং মনোগত চিন্তার সমস্ত প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, এবং সকল প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবাহমান। এটা হচ্ছে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও অনাপেক্ষিকতা। প্রত্যেক দ্বন্দ্বের এবং তার প্রত্যেকটি দিকের রয়েছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য। এটা হচ্ছে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকতা। নির্দিষ্ট অবস্থায় বিপরীতগুলোর থাকে অভিন্নতা। কাজেই তারা একক সত্তায় সহ-অবস্থান করতে পারে এবং প্রত্যেকে নিজের বিপরীতে পরিণত হতে পারে। এটাই আবার দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকতা। কিন্তু বিপরীতগুলোর সংগ্রাম বিরামহীন। যখন বিপরীতগুলো সহ-অবস্থান করছে, বা যখন তারা নিজেদের পরস্পরে রূপান্তরিত করছে, উভয় সময়েই সংগ্রাম চলতে থাকে, এবং যখন তারা নিজেদের পরস্পরে রূপান্তরিত করছে, তখন এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটাই, হচ্ছে আবার দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও অনাপেক্ষিকতা। দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষি-কতা পর্যালোচনায় আমাদের অবশ্যই প্রধান ও অপ্রধান দ্বন্দ্বের মধ্যে এবং একটা দ্বন্দ্বের মুখ্য দিক ও গৌণ দিকের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি মনোযোগ দিকে

হবে। দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যেকার বিপরীতগুলোর সংগ্রাম পর্যালোচনা করার সময় আমাদের অবশ্যই সংগ্রামের বিভিন্ন রূপের মধ্যেকার পার্থক্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, অন্যথায় আমরা ভুল করব। যদি, পর্যালোচনার মাধ্যমে, আমরা উপরিবর্ণিত মূল বিষয়গুলোর প্রকৃত উপলব্ধি অর্জন করতে পারি, তাহলে আমরা মতান্ধ চিন্তাধারা ধ্বংস করতে সক্ষম হব, যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলনীতির পরিপন্থী এবং আমাদের বিপ্লবী আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর। এবং আমাদের অভিজ্ঞ কমরেডরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে নীতিতে বিন্যস্ত করতে পারবেন এবং অভিজ্ঞতাবাদী ভুলের পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে সক্ষম হবেন। এগুলো হচ্ছে দ্বন্দ্বের নিয়ম সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা থেকে লব্ধ কয়েকটি সহজ সিদ্ধান্ত।